

গ্রন্থসূচি

সূচনা

সমাজ মানুক বা না মানুক, সকল সাধক জানেন যে, তাঁরা সকলেই অহংকারের পত্নী হয়ে ঘরসংসার করছেন। তাঁরা খুব ভালো করে জানেন যে, এই সংসারে উনি পত্নী কম হন, দাসী অধিক হন। আর এই দাসত্ব যখন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখনই সে সাধনা করতে উদ্যত হয়।

সেই সাধনা করা ব্যক্তির সামনে দুটিই মাত্র বিকল্প রয়েছে এইজগতে, তন্ত্র আর বৌদ্ধ সাধন ধারা। এঁদের মধ্যে বৌদ্ধ সাধনধারা লঘু হতে হতে, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছেন। আর তন্ত্র, যার সূত্রপাত হয়েছে এই বঙ্গদেশে, মহর্ষি মার্কণ্ডের হাত ধরে, তা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন একটি সাধনধারা।

এই তন্ত্রধারা অনুসারে যারা প্রকৃত সাধক, তাঁদের সাধনধারা এমনই হয় যে, তানর জনমধ্যে, সমাজমধ্যে বা সংসারে স্থাপিত হতেই পারেন না, উপরন্তু তাঁদেরকে সমাজ থেকে বহুদূরে, গহন অরণ্যে স্থাপিত হয়ে নিজেদের সাধন করতে হয়। এঁরা নিজেদের কঠিন পন্থাদ্বারা অহংকে আবাহন করে, তাঁকে ভক্ষণ করে, ধূমাবতী হয়ে, সেই অহংকে শিষ্যরূপে স্থাপিত রেখে, অবশেষে তাঁকে সমর্পিত করে শবরূপে স্থাপিত করে, চেতনাকে কালিকা বেশে তাঁর হৃদমধ্যে স্থাপন করে তন্ত্রসিদ্ধ হন।

তবে এই সমস্ত করার কালে তাঁদের ধারা এমনই হয়ে যায় যে তাঁরা আর কনোদিনই সাধারণ সমাজে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন না, উপরন্তু সেই গহন অরণ্যে স্থাপিত হয়েই এই মহাতন্ত্র শিক্ষাদ্বারা আগত মুষ্টিমেয় শিষ্যদের শিক্ষিত করতে থাকেন। তাই এই মতধারা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে মোক্ষমুখী হলেও, অনেক সাধক, সাধনার ইচ্ছা রাখলেও সেই ধারাপাতে চলতে পারেন না, কুণ্ঠিত হন, বা ভীত হন।

আর এই সমস্ত কিছুর কারণে অনেক সাধকই সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। বৌদ্ধধারাও অত্যন্ত গভীর ভাবে মোক্ষমুখী। এই মতধারাতে একাধিক অবতারও চলে সত্যলাভ করেছেন, কিন্তু সেই ধারাকে প্রত্যক্ষ ভাবে গ্রহণ করা, আজকের সমাজের কাছে অনেকভাবেই দ্বিধার কারণ, যার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা।

আর এই দুটি ছাড়া, সাধনধারা আর জগতের বুকে তৃতীয়টি নেই। আর তাই, জগন্মাতার ইচ্ছা ও নির্দেশে, একটি এমন সাধন পথের নির্মাণ করা হলো, যা অভ্যাস করার কালে, সাধককে কনো গহন অরণ্যে যাত্রা করতে হবেনা, আর না তাঁকে কনো দুর্গম তুষারদেশে যাত্রা করতে হবে। যে যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে স্থিত হয়েই যাতে সাধন করে, অহংকারের সাথে তাঁর সংসারকে ভেঙে মোক্ষমুখী হতে পারেন, তার জন্যই এই সাধনধারা নির্মিত।

এই সাধনধারা অনুসারে, বাহ্যিক কনো ক্রিয়ার কনো আবশ্যকতাই নেই, কারণ এই সাধন সম্পূর্ণ ভাবে আন্তরিক এবং অভ্যন্তরীণ। আর তাই, সংসারে থেকেও, সমাজে থেকেও, সাধারণ পোশাকআশাক এবং সাধারণ জীবনযাপন করেই, এই সাধনপথে চলমান হওয়া সম্ভব, আর তাই আগামীদিনে সমস্ত সাধকদের কাছে এটি একটি জগন্মাতার উপাহার, যা ধারণ করে তাঁরা সকলের সম্মুখে থেকেও, সকলের অলক্ষ্যে সাধন করতে সক্ষম হবেন।

কৃতান্ত সেই সাধনমার্গের সম্পূর্ণ দর্শন ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সমাহার, যেখানে কৃতান্ত শব্দের অর্থই হলো কর্তার অন্ত, বা অহংকারের নাশ। আর যিনি নিজের কর্তাভাবের নাশ করতে সক্ষম হবেন এই মতধারা অনুসারে, তিনি হলেন কৃতান্তিক। কৃতান্ত সেই কৃতান্তিক গঠনের সমস্ত প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করে, যেখানে আচার অনুষ্ঠান বলে কিছুই নেই, সমস্তই চেতনার অনুশীলন এখানে।

অর্থাৎ, সামগ্রিক ভাবে সামান্য ব্যক্তি হয়ে থেকে, অতি স্বাভাবিক ও সাধারণ উভোভোজী জীব হয়ে থেকে, বাহ্যিক ভাবে কনো আচার অনুষ্ঠান না করে, অর্থাৎ বাইরে থেকে অনুমান লাগানো সম্ভব যে আপনি সাধনা করছেন, তার সম্ভাবনাই স্তব্ধ করে দিয়ে, কি ভাবে নিজের চেতনাকে অনুশীলন করিয়ে, মোক্ষদ্বারে স্থিত হওয়া যায়, তারই বিস্তারকথা হলো কৃতান্ত।

আর তাই, যদি আপনারা সাধনা করে মোক্ষলাভে রুচি রাখেন, অর্থাৎ সমস্ত জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হবার ব্যকুলতা রাখেন, তবেই এই গ্রন্থ পাঠ করুন। যারা সেই সাধনা করার জন্য অভিলাষী নন, বা যারা জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হবার আশ রাখেন না, তাঁরা এই মহাদিব্য গ্রন্থ থেকে দুরেই থাকুন।

এটিকে একটি সতর্কবার্তাও বলতে পারেন, কারণ এই গ্রন্থ কেবলই সামান্য একটি ধর্মগ্রন্থ নয়। এটি একটি মহাদিব্যগ্রন্থ, এবং এই গ্রন্থের শব্দাবলীর মধ্যে ঐশ্বরিক চেতনাশক্তি সঞ্চিত আছে, যা যেমন কৃতান্তকে ধারণ করে কৃতান্তিক হবার জন্য প্রয়াসশীল ব্যক্তিকে যেমন তাঁদের সাধনপথে সুরক্ষিত রাখার জন্য যত্নশীল, তেমনই যারা কৃতান্তকে ধারণা করতে উদ্যত নন, তাঁদের ভৌতিক জীবনকে, অর্থাৎ সাংসারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করে দেবে।

এই সতর্কবার্তা স্মরণে রেখে, প্রথমে নিশ্চিত হন যে আপনি আপনার সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তারপরেই কৃতান্ত পাঠ করুন। যদি দেখেন যে এই বন্ধন আপনাকে বিব্রত করছেনা, আর আপনি আপনার সমস্ত মোহবন্ধনে বেশ আনন্দেই আছেন, আর নিজের মোহবন্ধনকে আরো একটু মজবুত করার বুদ্ধি লাগবে আপনার, অর্থাৎ আপনার সংসার যাতে সুখী হয়, বা আপনার ও আপনার পরিবারের সামাজিক বা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা আরো ভালো হোক, এমন চাইছেন, তাহলে এই গ্রন্থ আপনার কশটি করে দেবে। তাই এঁর থেকে দূরে থাকুন দয়া করে।

আপনি যেমন থেকে আনন্দ পাচ্ছেন, তাতেই জগন্মাতা আনন্দিত। আপনার আনন্দের ভাবকে জগন্মাতা কখনোই বিনষ্ট করতে চান না। তাই দয়া করে, এই গ্রন্থের থেকে দূরে থাকুন আপনি, যদি আপনি নিজের সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির কামনা রাখেন। একমাত্র যদি আপনি নিজের সমস্ত জন্মমৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করতে চান, তবেই পাঠ করুন কৃতান্ত।

জন্মলীলা

মানবতা তখন বিপর্যস্ত, মানুষ তখন সত্যের সন্ধান ছেড়ে একের পর এক কল্পনার বিস্তারে সদাব্যস্ত। নিজেদের পঞ্চভূতদের প্রতি তাঁদের প্রবল আসক্তি, আর ধরিত্রীর পঞ্চভূত, অর্থাৎ আকাশ বা গগন, ভূমি, অগ্নি, জল ও বায়ুকে নিজেদের বশে রাখার প্রবল উন্মাদনা। বেদে বলেছে, এই পঞ্চভূতকে জয় করে নিতে পারলেই, যে কেউ ভগবান। আর তাই সমস্ত মানুষ ভগবান হতে সদাব্যস্ত সেই কালে। আর সেই ব্যস্ততার কারণে, সর্বক্ষণ ভূমির কর্ষণ করে চলেছে তাঁরা, সর্বক্ষণ বায়ুকে, জলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাঁধের আর সেতুর রচনা করে চলেছে তাঁরা, আর সর্বক্ষণ অগ্নিকে বশে রাখার জন্য, ভূগর্ভের অগ্নিকে পসমিত করার উন্মাদনায়, ভূমির অন্তরের সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যকে অপসারিত করে চলেছে, আর একই ভাবে সর্বক্ষণ গগনকে চিরে দেবার জন্য পরিকল্পনা করতে মত্ত তাঁরা।

এই উন্মাদনায়, সমস্ত রিপু, সমস্ত পাশকে আবেগ রূপে ধারণ করে, সকলের মন যেমন এক যুদ্ধের উদঘোষণায় রত, তেমনই সর্বক্ষণ বুদ্ধি এই সমস্ত কিছুরই বিচার করে চলেছে, আর মানব সমাজ সেই যুদ্ধতৎপরতাকেই মানবতার উন্নতি রূপে ধরে নিয়েছে। এমনকি স্বয়ং বিচার ও বিবেক, তথা ত্রিদেব অর্থাৎ ত্রিগুণও এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতিশীল। আর তাই প্রচণ্ড ভাবে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা হলেও, ধরিত্রীদেবীর কনো জায়গা নেই যেখানে গিয়ে তিনি এই সমস্ত কিছুর থেকে মুক্তির আশ্বাসবাণী লাভ করবেন। এমন একটিও ভূপতি নেই, যিনি তাঁর ব্যাথা বোঝেন, এমন একটিও ভুসন্তান নেই, যিনি তাঁর এই বেদনায় সহমর্মী। লাভ হবেনা জেনেও, তিনি তাই প্রথমে গেলেন ইন্দ্রদেবের কাছে।

ধরিত্রীর অভিশাপ

ইন্দ্রদেব ধরিত্রীদেবীকে দেখে বিনম্রতার সাথে উপহাস্য প্রদান করে বললেন, ‘কি ব্যাপার ধরিত্রীদেবী! আপনাকে এমন ক্ষতবিক্ষত এবং বিধ্বস্ত কেন দেখাচ্ছে? আপনিও দেবাসুর সংগ্রামে গেছিলেন নাকি?”

ইন্দ্রদেবের উপহাস শুনে, ধরিত্রীদেবীর মধ্যে যে যৎসামান্য আশা ছিল যে তিনি তাঁর সমস্যার সুরাহা করার প্রয়াস করবেন, তা ত্যাগ করে, সমান ভাবে উদাসীনতা মিশ্রিত উপহাস দ্বারা বললেন, "কি করবো বলুন আর! ... আপনারা যে দেবাসুর সংগ্রাম ছেড়ে, অসুরদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে বসে রয়েছেন। তা রাজা নিজের কর্তব্য ভুলে যেতেই পারেন; কর্তব্য স্মরণ রাখার অধিকার যখন তাঁর আছে, তখন কর্তব্য ভুলে যাবার অধিকারও নিশ্চয়ই তাঁর আছে। কিন্তু প্রজাকে যে নিজের কর্তব্য স্মরণ রাখতেই হয়। তাই সেই স্মৃতি নিয়েই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, যদি এই প্রজার গুহারে কেউ কর্ণপাত করেন, সেই আশা নিয়ে"।

ইন্দ্রদেবের অহংকার ধরিত্রীদেবীর এই কথনে বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, তিনি একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, "কি হয়েছে আপনার, একটু খুলে বলবেন আমাকে?"

ধরিত্রীদেবী ব্যাঙ্গের হাসি হেসে হেসে বললেন, "না থাক, আপনাকে সেই কথা বলে আর কাজ নেই। যেই রাজা নিজেকে ভগবান মনে করেন, তাঁর কাছে গুহার লাগানোর থেকে মৃত্যুও অনেক শ্রেয়। রাজা যখন ভুলে যান যে তিনি কেবলই প্রজার ভালোমন্দ দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মচারী, এবং তা ভুলে গিয়ে প্রজার ভগবান রূপে নিজেকে স্থাপন করে বসেন, তিনি নিজের নেত্রে তো রাজাই থাকেন, কিন্তু প্রজার নেত্রে একজন অধম অসুর ছাড়া অন্য কিছুই থাকেন না। তাই অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে মহারাজ দেবেন্দ্র যে, আপনি আর দেবও নেই, রাজাও নেই, আপনি একজন অসুরে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন।

তাই তো বলি, এমন রাজা আমাদের সঙ্গে থাকতেও কি করে তাঁর থেকে জাত সকল মানুষের মন আসুরিক আবেগ নিয়ে উলমালা থাকতে পারে! স্বয়ং তিনিই যখন আবেগে তরান্বিত, তখন তাঁর থেকে উপাদান লাভ করা মানুষের মন, কি করে আবেগে তরান্বিত না হয়ে থাকতে পারে! আপনি বরং আপনার আবেগের সমুদ্রে মহানন্দে মহাস্নান করুন। তাঁর কাছে নিজের বেদনা ব্যক্ত করতেও নেই, যিনি সেই বেদনার কারণ দূর করার সামর্থ্য ধরেন না, তাই আমি আপনার কাছে আমার বেদনা ব্যক্ত করার জন্য আর চিন্তিত নই।"

ইন্দ্রদেব এই কথাতে উগ্রমূর্তি ধারণ করে, উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "ধরিত্রীদেবী! ... আপনি নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন! আপনি ভুলে গেছেন যে আপনি আপনার রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন! ... রাজার নেপথ্যে রাজার নিন্দা করাও রাজদ্রোহ, কিন্তু রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁকে সাখ্যাতে অপমান করা সে যে ঘোর বিদ্রোহ! এই বিদ্রোহের সাজা আপনাকে পেতেই হবে!"

ধরিত্রীদেবী এবার ব্যঙ্গাত্মক হাস্য হেসে বললেন, "দণ্ড! ... একজন মৃত্যুপথযাত্রী প্রজাকে এক মূর্খ রাজাই দণ্ড দিতে পারে। ... তা দিন দণ্ড। আপনি রাজা! আপনার দণ্ড তো আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। ... তবে স্মরণ রাখবেন এই অধম প্রজার এই কটাক্ষকে। একদিন, অন্তত একজনের উপর, আপনি আপনার রাজত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হবেনই। আর যেদিন তা হবেন, সেদিন আমার এই ভবিষ্যৎবানী স্মরণ রাখবেন, হে রাজন, সেই একজনের থেকে অসংখ্য তেমন ব্যক্তির জন্ম হবে, যার উপর আপনার রাজত্ব বিস্তার লাভ করবেনা, আর সেদিন আপনার রাজাসন এমনই ভাবে চলে যাবে, যা আর ত্রিদেবও আপনাকে প্রদান করতে পারবেন না।... আপনার দণ্ডবানী প্রদান করে দেবেন, আমি সহর্ষে সেই দণ্ডবিধান পালন করে নেব, কিন্তু আপনার ন্যায় আত্ম-অহংকারী রাজার অহংকারমিশ্রিত দণ্ডবিঁধি শোনার জন্য আমি অপেক্ষা করতে বাধ্য নই"।

ক্ষতবিক্ষত ধরিত্রীদেবীর মুখ থেকে এমন সুতীক্ষ্ণ বানীবাণ গ্রহণে দেবরাজ একদমই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বিচার করতে শুরু করলেন, "এমন কি করে ফেলেলাম আমি, যার জন্য দেবী ধরিত্রী এমন কটুশব্দ শুনিয়ে গেলেন আমাকে! এবার নিশ্চয়ই ধরিত্রীদেবী ত্রিদেবের কাছে গমন করবেন। তাঁরা যদি আমার উপর রুষ্ট হন! তাহলে আমি কার কাছে যাবো!"

ইন্দ্রদেব যেই ভয় পেয়েছিলেন, তাই সাকার হলো; দেবী ধরিত্রী গেলেন ত্রিদেবের কাছে। সেখানে যাবার কালে, তিনি বিচার করলেন, 'আমার এমন অবস্থা নিয়ে, আমি ত্রিদেবের কাছে একের পর এক যাত্রা করতে পারবো না। একজনের কাছে যেতে হবে, যেখানে গিয়ে আমি আমার বেদনার নিরাময় লাভ করবো। কিন্তু সেটা কোথায় হবে? ব্রহ্মলোক নাকি বৈকুণ্ঠ নাকি কৈলাস!'

এমন বিচার করছিলেন, তখন সামনে থেকে বরুণদেব, অগ্নিদেব, পবনদেব নবগ্রহ এবং সমস্ত নক্ষত্রদের নিয়ে, সমস্ত আসুরিক আবেগদের একত্রে নিয়ে মহাসমারোহে কোথাও যাচ্ছিলেন। দেবী ধরিত্রীকে এই অবস্থায় দেখে, বরুণদেব সম্মুখে এসে বললেন, "একি অবস্থা আপনার দেবী! ... আপনি এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর কতদিন অবস্থান করবেন? আমাদেরকে দেখুন! আমরা কেমন রাজার হালে রয়েছি! আপনি কেন বুঝতে চাইছেন না! দেখুন, স্বয়ং ত্রিদেব আবেগদের সাথে একাত্ম হয়ে রয়েছেন। স্বয়ং বিবেক অর্থাৎ গজানন এই আবেগদের নিয়ে মেতে রয়েছেন। স্বয়ং বিচার অর্থাৎ কার্ত্তিক মেতে রয়েছেন সমস্ত চিন্তা আর কল্পনাকে নিয়ে। আর এঁদের সাথে স্বয়ং ত্রিদেব অর্থাৎ ত্রিগুণও মিশে রয়েছেন। তাই এঁদের সাথে মিশে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই নয় কি?"

অগ্নিদেব সম্মুখে এসে বললেন, "দেখুন ধরিত্রীদেবী! মানুষ আমাদের থেকেই উপাদান নিয়ে পঞ্চভূতে ভূষিত। ইন্দ্রদেব হলেন আকাশতত্ত্ব, তাঁর উপাদানে মানুষ পেয়েছে মন; বরুণদেব হলেন জলতত্ত্ব, তাঁর উপাদানে মানুষ পেয়েছে বুদ্ধি; আমি অগ্নিদেব, আমার উপাদানে মানুষ পেয়েছে উর্জা; পবনদেবের উপাদানে মানুষ পেয়েছে প্রাণ; আর আপনার উপাদানে মানুষ পেয়েছি দেহ। ... এবার মানুষের মনে বাসা বেঁধেছে আমাদেরকে নিজের বশে রাখার বাসনা ও কামনা, আর তার থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য আবেগ অর্থাৎ অসুর। আর এই অসুরদের আজ বাড়বাড়ন্ত, কারণ এঁদেরকে স্বয়ং সুরক্ষা দিচ্ছেন ত্রিদেব এবং কার্ত্তিক গণেশ অর্থাৎ বিচার ও বিবেক।

এবার আপনিই বলুন, যখন স্বয়ং ত্রিদেব এঁদের সঙ্গে, তখন এঁরা আমাদেরকে তো বশ করে নেবেই, কে আটকাবে এঁদেরকে? তাই তো আমরা সকলে এঁদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বসে আছি, নাহলে যে আমাদেরও অবস্থা আপনার মতই হতো। ... আমাদের কথা মানুন, আপনিও আমাদের মত হয়ে যান, আপনিও সুরক্ষিত হয়ে যাবেন"।

ধরিত্রীদেবী মুখমণ্ডলকে কঠিন করে বললেন, "আর এর থেকে নিরাময়! আছে না সম্ভবই নয়?"

পবনদেব হেসে বললেন, “সে তো ত্রিদেবই জানেন। তাঁরা যদি কনোদিন এই আবেগদের প্রতি বিরক্ত হন, যদি কনোদিন এঁদের মনে হয় যে, আমাদেরকে অধীনে স্থাপন করার প্রয়াস করে মানুষ ভুল করছেন, তাহলেই এর নিরাময় সম্ভব। তাঁরা তো সকল মানুষের মধ্যেই ত্রিগুণ হয়ে বিরাজ করেন, তাই না! আপনিও তো এই তত্ত্ব জানেন দেবী! ... তাঁরা যদি চান যে মানুষের এই দৌরাত্বকে স্তব্ধ করবেন, তাহলে তাঁরা তা সহজেই করবেন, আর নাহলে করবেন না। আমরা এর মধ্যে কি করে হস্তক্ষেপ করতে পারি বলুন?”

দেবী ধরিত্রী বিষণ্ণ ভাবে বললেন, “কিন্তু আপনারা একটিবারও ত্রিদেবের কাছে নিজেদের এই দুরবস্থার কথা বলবেনও না! ... হতে পারে, তাঁরা মনে করছেন যে আপনারা যখন খুশী আছেন, তাই তাঁদের আর করনিয় কিছুই থাকেনা। তাই হয়তো তাঁরা কিছু করছেন না! আপনারা একটিবার তো তাঁদেরকে বলুন, আপনারা কি দুর্বিপাকে পরেছেন, সেই কথা!”

অগ্নিদেব বললেন, “দুর্বিপাক! কিসের দুর্বিপাক! ... আমি অগ্নি, আমি আপনার গর্ভে বিরাজ করি। আমাকে সেই গর্ভ থেকে তুলে নিয়ে এসে, মানুষরা কত সম্মান দিচ্ছে! হ্যাঁ আমাকে তুলে আনার জন্য, আপনার ত্বক পুড়ে ঝলসে যাচ্ছে, সেটা আপনার সমস্যা, আমার নয়। ... এই যে ইন্দ্রদেব, আকাশতত্ত্ব, তাঁকে তো আপনি কিছু দিতেনই না! কেবল কর বাবদ কিছু বায়ু দিতেন, আর বাষ্প দিতেন। এখন মানুষ আপনার গর্ভের সমস্ত বায়ুকে নিয়ে গিয়ে আকাশের বুকে দিচ্ছেন, আর ইন্দ্রের রাজকোষ ভরছেন, এতে আপনার অসুবিধা হতে পারে, ইন্দ্রিদেবের কিভাবে অসুবিধা হচ্ছে?

ধন আপনি হারাচ্ছেন, আমাদের রাজা তো সেই ধনে ধনবান হয়ে উঠছেন, তাহলে তিনি কেন এর বিরোধ করবেন? পবনদেবকে আপনি সর্বদা নিজের মধ্যে আগলে রাখতেন, কনো রকম স্বাধীনতা দিতেন না। আজ মানুষকে দেখুন, তাঁরা সেই পবনদেবকে নিজেদের কক্ষে নিয়ে চলে গেছে, স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন পবনদেবকে। আজ তাঁরা পবনদেবকে নিজেদের নির্মিত যন্ত্র দ্বারা জন্মও দিচ্ছেন, তাতে পবনদেবের সম্মানবৃদ্ধি হচ্ছে। আপনার মান যাচ্ছে, তাতে পবনদেবের কি? তাঁর তো সম্মানবৃদ্ধি হয়েছে! ...

আর বরুণদেব! বরুণদেবকে আপনি কেবলই বিশুদ্ধতার পাঠ পড়িয়ে বশে রেখেছিলেন। কি দিতেন বরুণদেবকে? কেবলই আমাকে ব্যবহার করে তাপ দিতেন, আর সেই তাপে বাষ্প হয়ে গেলে, তাঁকে কর রূপে ইন্দ্রদেবের কাছে দিয়ে দিতেন। এই কি ছিল বরুণদেবের জীবন! তিনি মানুষের বুদ্ধি, মানুষকে তিনি সমস্ত কিছু নিজের অধিকারে স্থাপিত করার প্রেরণা দিয়েছেন, আর প্রতিদানে মানুষ কত কিছু দিচ্ছেন দেখুন উনাকে? আজ উনার বক্ষে আপনার গর্ভে যা যা উপাদান আপনি নিজের সম্পদ বলে আগলে রাখতেন, সেই সমস্ত কিছু এসেছে, মানুষের তৈরি কলকারখানার বর্জ্য হয়ে। আমরা তো দেবী, ফুলে ফেঁপে উঠেছি, মানুষের আবেগের জন্য। ক্ষয় আপনার হয়েছে, তো আপনি গিয়ে ত্রিদেবকে অভিযোগ জানান। দেখুন তাঁরা কি বলেন আপনাকে”।

ধরিত্রীদেবী আর একটিও কথাও এই বিষয়ে ব্যয় করলেন না। তিনি বেশ বুঝে গেছেন, সমস্ত দেব মানুষের আবেগরূপী আর চিন্তারূপী অসুরদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এঁদের সাথে কথা বলে আর কনো লাভ নেই। এমন বিচার করে তিনি প্রশ্ন করলেন, “তা আপনারা এমন সমারোহ করে যাচ্ছেন কোথায়?”

বরুণদেব বললেন, “আর বলেন কেন? মাতারা, অর্থাৎ ত্রিদেবীরা তো স্বস্বধামে থাকলে, এই আবেগদের আর চিন্তা কল্পনাদের প্রবেশ করতেই দেন না, কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে আর ব্রহ্মলোকে। তা তাঁরা আজ কিছুদিন সেখানে নেই। তাঁরা কোথাও একটা গেছেন তিনজনে একত্রে। তাই কৈলাসে আজ একটি মহাসমারোহ। ত্রিদেব, বিচার ও বিবেককে এখন কনো কাজই করতে হয়না। সমস্ত কাজই মানুষের মন আর বুদ্ধি সামলে নেয়, এই আবেগদের আর চিন্তা কল্পনাদের মাধ্যমে। তাই তাঁদের প্রতি আভার ব্যক্ত করার চিন্তা ত্রিদেব বহুদিন করছিলেন। আজ ত্রিদেবী সেখানে না থাকাতে সেই সুযোগ তাঁদের কাছে এসে গেছে। আর তাই আমরা সকলে সেখানে যাচ্ছি, এবং মহানন্দ করে, সেখান থেকে বিদায় নেব। ... এখন আমরা ইন্দ্রদেবের কাছে যাচ্ছি। সেখানে থেকে তিনি আমাদের সাথে যুক্ত হলে, আমরা একত্রে কৈলাস যাবো”।

দেবী ধরিত্রী হেসে বললেন, “বেশ আপনারা আনন্দ করুন। আমাকে অনুমতি প্রদান করুন”।

দেবী ধরিত্রী সেখান থেকে প্রস্থান করে কৈলাসে এসে উপস্থিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাক পারলেন, “মাতা! ... মা! ... মাগো! আমি ধরিত্রী, এসেছি তোমার দর্শন কামনায়। ... দেখা দাও মা!”

মাতা তো সেই ডাকে বাইরে এলেন না, বাইরে এলেন কার্ত্তিক ও গণেশ। ধরিত্রীদেবী তাঁদের দেখে আনন্দিত চিত্তে বললেন, “প্রণাম প্রথমপূজ্য, প্রথম দেবসেনাপতি। আপনার দর্শন প্রথমেই লাভ করেছি প্রথমপূজ্য, নিশ্চয়ই আমার গুহার বাস্তবায়িত হবে। হে লম্বোদর, আপনি তো এখন অতি নির্বিঘ্নে রয়েছেন, কারণ যেই মানুষের হৃদয় থেকে আপনার সঞ্চার হয়, সেই হৃদয়দেশই তো এখন নিষ্ক্রিয়। আর দেবসেনাপতি, আপনাকেও আর বিচারের বাণ নিক্ষেপ করতে হচ্ছেনা, কারণ দেবাসুর সংগ্রামই তো হচ্ছেনা। ... তা আপনাদের সময় কাটছে কি ভাবে?”

গজানন হেসে বললেন, “হর্ষ আর উল্লাস, মানুষ সর্বক্ষণ সেই নিয়েই মেতে রয়েছে, তাই আমরাও সেই নিয়েই উলোমালা। আপনি ভালো দিনেই এসেছেন। মাতাকে গোপন করেই আজকের উৎসব রাখা হয়েছে। কিন্তু মাতার কাছে অজ্ঞাত আর কি থাকে। তাই তিনি আমাদেরকে গোপনে বলেছিলেন যাতে আপনাকে আমরা নিমন্ত্রণ করি আজকের উৎসবে। তা আপনি স্বয়ংই এসে গেছেন, ভালোই হয়েছে”।

দেবী ধরিত্রী লজ্জা রূপ আবরণ ধারণ করে বললেন, “এ মা, আমি তো তাহলে খুব খারাপ দিনে এসে গেছি! মাতা যতই বলুন আমাকে নিমন্ত্রণ করতে, আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি তো আপনারা! সেই অর্থে আমি তো অনিমন্ত্রিত অতিথি! ছি ছি! আপনাদেরকে লজ্জায় ফেলে দিলাম। আপনারা আনন্দ করুন হে হরগৌরী পুত্ররা, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনাদের উৎসব সমাপ্ত হলে, আমি নয় একদিন মাতার কাছে আসবো”।

ত্রিদেব অন্তর থেকে বাইরে আসতে আসতে বললেন, “কে এসেছেন কার্ত্তিকগণেশ, অতিথিরা কি এসে পরেছেন!”... বাইরে বেড়িয়ে এসে, দেবী ধরিত্রীকে দেখে তাঁরা বললেন, “ও দেবী ধরিত্রী! আপনি! ... আসুন, কি মনে করে?”

দেবী ধরিত্রী একটু ব্যঙ্গের ছলেই বললেন, “আপনাদের এই হতভাগ্য সেবিকাকে আপনারা কতটা ভুলে গেছেন, তাই দেখতে এসেছিলাম প্রভু। তা দেখলাম, আমার স্মৃতিটাই কেবল ভুলেছেন আপনারা, আমার রূপকে এখনো স্মরণ রেখেছেন। তাই দেখুন না, আমাকে দেখেই আপনারা কেমন আমাকে চিনে ফেললেন”।

দেবী ধরিত্রীর এই কথা যে ত্রিদেবকে তির্যক ভাবে অপমান করার জন্যই বলা, তা বুঝে নিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হলো না। আর সেই কথা শুনে মহাদেবের একটু ক্রোধও হলো। আর তা বুঝে, পরিস্থিতি সামাল দিতে, নারায়ণ বললেন, “ছাড়ুন অসব কথা, কি আবদার নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন, তা বলুন”।

দেবী ধরিত্রী মৃদুহেসে বললেন, “এ মা, আপনাদের আর কি বলবো প্রভু! আপনারা তো ত্রিকালদর্শী, অন্তর্যামী! আপনাদেরকে কিছু বলার অর্থ এই যে, আপনাদের ত্রিকালদর্শন আর অন্তর্যামী হওয়াকেই অস্বীকার করা। আমি তো আমার মাতাকে কিছু বলতে এসেছিলাম। আসলে তিনি তো আর অন্তর্যামী বা ত্রিকালদর্শী হবার দাবি করেন না। তাই তাঁর কাছে এসেছিলাম কিছু সুখদুঃখের কথা বলতে। অন্য কিছু নয় প্রভু, আমি তাঁর সামান্য কন্যা, তাই নিজের মাতার কাছে এসেছিলাম, তাঁর কাছে নিজেকে সামান্য সঁপে দিতে”।

ব্রহ্মদেব গম্ভীর হয়ে বললেন, “কিন্তু ত্রিদেবী তো নিজের নিজের ধামে নেই, তাঁরা কনো স্থানে বিহারে গেছেন, তবে কোথায় গেছেন, তা বলতে পারবো না। তুমি তো জানোই ধরিত্রী, ত্রিদেবীদের গতিবিধি ত্রিকালদর্শীও জানতে পারেন না, তাই তাঁদের গন্তব্যস্থল বা গন্তব্যস্থলে যাত্রার মনসা, দুইই আমাদের জানা নেই”।

দেবী ধরিত্রী বিনম্রের মত বললেন, “ঠিক আছে তাহলে। আজকে অনুমতি দিন হে প্রভু, অন্য একদিন মাতার কাছে না হয় আসবো”।

নারায়ণ সম্মুখে এসে বললেন, “এমন কি কথা দেবী, যা স্বামীর কাছেও বলা যায় না!”

দেবী ধরিত্রী আবারও মিষ্টহাস্য প্রদান করে বললেন, "এ মা, এমন বলবেন না প্রভু। ... অবশ্যই স্বামীকে সমস্ত কিছু বলা যায়, তাও বলা যায় যা মাতাকে বলা যায়না, তবে সেই স্বামীকেই তো তা বলতে হয়, যিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করেন নি। কিন্তু যিনি তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিয়েছেন, তাঁকে কি করে সমস্ত কথা বলা যায় বলুন! ... ক্ষমা করবেন, আমার ধৃষ্টতাকে, কিন্তু নাথ, আপনি তো বরাহরূপ ত্যাগ করার কালেই আমাকে ত্যাগ দিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর তো আর খবরও রাখেন নি আমার। তাই আপনাকে প্রাক্তন স্বামী না বলে কি করে বর্তমান স্বামী বলি, আপনিই বলুন!"

মহাদেব এবার সম্মুখে এসে বললেন, "আমি তখন থেকে শুনছি, আপনার যেন আমাদের ত্রিদেবের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলার আছে! অনেক অভিযোগ রয়েছে আপনার। ... যা বলার স্পষ্ট করে বলুন, এমন তির্যক কথা শুনতে আমরা পছন্দ করছি না"।

দেবী ধরিত্রী হেসে বললেন, "ভুল ভাবছেন ভোলানাথ, আমার তো আপনাদেরকে কিছু বলারই নেই। আমি কেবলই মায়ের দর্শন লাভ করার অভিলাষেই এখানে এসেছিলাম। আপনাদের কাছে কিছু বলার কি করে থাকতে পারে! ... আপনারা তো সদাই বলে গেছেন, দেবও আপনাদের কাছে যা, অসুরও আপনাদের কাছে তা, আর দুইএরই আপনারা রক্ষক। তাই আপনাদের কাছে যদি এমন কিছু বলি যে অসুরদের সাথে হাত মিলিয়ে দেবতারা আমার সর্বনাশ করে দিয়েছে, তাতে আপনাদেরই বা কি! ...

আর তাছাড়া, আমি তো এও জেনেছি যে, দেবতাদের অসুরদের সাথে হাত মেলানতে তাঁদের অনেক সমৃদ্ধি হয়েছে, আর তাই আপনারা এই দেবাসুর মিলন নিয়ে খুবই আনন্দিত। ক্ষমা করবেন প্রভু, এই ধরিত্রী আপনাদের দাসী, আর এক দাসীর এত ধৃষ্টতা কোথায় যে, সে তাঁর মনিবদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটায়!... অনুমতি দিন প্রভু। মাতা ফিরলে, আমি আবার আসবো"।

মহাদেব এবার দেবী ধরিত্রীর উপর রুষ্ট হয়ে বললেন, "দেবী ধরিত্রী, আপনি তখন থেকে মিষ্ট মিষ্ট কথার মাধ্যমে আমাদের ত্রিদেবকে মিছরির ছুরিকা আঘাত করে চলেছেন। এই অপমানের

কারণ কি? এই তিরস্কারের উদ্দেশ্য কি? দেখুন, হয় স্পষ্ট করে বলুন আপনার মনসা কি, নয় এই অহেতুক অপমান করা বন্ধ করে দিন, কারণ এই অহেতুক অপমান আমরা আর সহ্য করবো না!”

দেবী ধরিত্রী হেসে বললেন, “আপনি অযথাই ক্রোধিত হচ্ছেন হে ত্রিপুরারি, আমার তো আপনাদেরকে কিছু বলারই নেই। আমি তো তখন থেকে আপনাদের কাছ থেকে প্রস্থানের অনুমতি চাইছি মাত্র”।

মহাদেব এবার ভয়ানক ক্রোধিত হয়ে উঠে বললেন, ‘কি বলতে চান আপনি, আমাদেরকে কিছু বলার নেই, এমন শব্দ প্রয়োগ করে! ... আমরা কি মূর্খ যে আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারবো না! আমরা কি বুঝছি না যে আপনি এই শব্দ প্রয়োগ করে এ কথা বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদেরকে কনো কথা বলে কনো লাভ নেই, তাই আপনি আমাদেরকে কিছু বলতে চান না! ... দেখুন দেবী ধরিত্রী, আমরা ত্রিদেব, আমাদের কথাতেই আপনার ব্রহ্মাণ্ড চলে, আর আপনার ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অজস্র মানুষের, ও অন্য ৮৪ লক্ষ যোনির ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে। সেই কথা আশা করি আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা। তাই আপনি আপনার ব্রহ্মাণ্ডের মালিকের সাথে এমন অভব্য আচরণ করে, তাঁকে নিচু দেখানোর প্রয়াস করে, কি প্রমাণ করতে চাইছেন! ... আপনি আমাদের অধীন থেকে মুক্ত!”

দেব ধরিত্রী মৃদু হেসে বললেন, “আমি তো মুক্ত নই নাথ, আপনারা একটু বলে দেবেন, কে আপনাদের অধীন থেকে মুক্ত? আসলে আমি তাঁরই সন্ধান করছি, যিনি আপনাদের অধিকার থেকে মুক্ত, কারণ আমার সমস্যার সমাধান একমাত্র তিনিই করতে পারবেন”।

নারায়ণ, যিনি এতক্ষণ মহাদেবের ক্রোধকে শান্ত করার প্রয়াস করছিলেন, তিনিও এবার ক্রোধিত হয়ে উঠে বললেন, “দেবী, আপনি আপনার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবার। ... আপনি ত্রিদেবকে বলছেন, তাঁদের অধিকার থেকে কে মুক্ত? আপনি কি আমাদের নিয়ে রসিকতা করছেন? আপনি জানেন না যে আমাদের অধিকার থেকে কেউ বলতে কেউ মুক্ত নয়!”

দেবী ধরিত্রী এবার বিদ্রূপের সুরে বললেন, “ব্রহ্মদেব বোধ করি মিথ্যা বলেন না। তিনি যে বললেন, ত্রিদেবী তাঁদের নিয়ন্ত্রণের অতিতে বিরাজ করেন, আশা করি সেটি সত্য বচন, তাই না নাথ?... যদি তাই হয়, তবে আপনাদের অধীনে স্থিতা নন, এমন তো আছেন! আপনি যে বললেন কেউ নেই যিনি আপনাদের অধীনে থাকেন না!”

ব্রহ্মদেবের কথা টেনে এনে, ত্রিদেবের মধ্যে বিভ্রান্তির রচনা করছেন দেখে, ব্রহ্মদেব এবার তিরস্কার করার ছলে বললেন, “ধরিত্রীদেবী, আপনি বোধ করি ভুলে যাচ্ছেন যে ত্রিদেবী আমাদের পত্নী, আর পত্নী পতির অধিকারেই স্থিতা থাকেন। তাই যদি আপনি মনে করেন যে আপনার কথা আপনি আমাদেরকে না বলে, ত্রিদেবীকে বললে কাজে দেবে, আপনি আকাশকুসুম চিন্তা করছেন”।

শিবশঙ্কর এবার ভয়ানক কুপিত হয়ে উঠে বললেন, “আপনার এই ঔদ্ধত্যের জন্য আপনাকে দণ্ড ভোগ করতেই হবে ধরিত্রী, সজ্জ হয়ে যান, আমাদের দণ্ড গ্রহণ করার জন্য”।

দেবী ধরিত্রী এবার বিকট এক হাস্য প্রদান করে বললেন, “দেব, এই একই কথা আমি এই একটু আগে ইন্দ্রদেবকেও বলে আসছি, আর আপনাদেরকেও বলছি। ... এক মরণাপন্নকে দণ্ড দিয়ে আপনারা যদি শান্তি পান, তবে দিন দণ্ড। আমি তো আপনাদের দাসী, তাই আপনাদের দণ্ড আমি মাথা পেতে গ্রহণ করতে বাধ্য। ... তবে আরো একটি কথা তাঁকেও বলেছিলাম, আর আপনাদেরকেও বলছি। হ্যাঁ, যদি আমার এই কথাকে অভিশাপ রূপে গ্রহণ করতে চান, তবে তা অভিশাপই, কিন্তু আমার এই বচন যে, একদিন একটি সামান্য মনুষ্যের কাছে আপনারা সকলেই অবশ হয়ে যাবেন, আর সেদিন আপনারা বুঝতে পারবেন যে, আপনারা অন্য সমস্ত মনুষ্যের দাস হয়েই বিরাজ করছেন, যতই আপনারা তাঁদেরকে নিজেদের অধীনে স্থিতরূপে জ্ঞান করে তৃপ্ত হন।

হ্যাঁ, হে ত্রিদেব। এটিই সত্য যে, আপনারা আজ সমস্ত মানুষের দাস হয়ে গেছেন। কিন্তু ধূর্ত মানুষরা আপনাদের সম্মুখে অভিনয় করে যাচ্ছেন যে, তাঁরা আপনাদেরকে খুব শ্রদ্ধা করেন, আর

সেই অভিনয়ের নেপথ্যে আপনাদের থেকে নিজেদের কল্পনাকে সুরক্ষিত করে রেখে, আপনারা যেই ব্রহ্মাণ্ডের কথা বললেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূতকে নিজেদের দাস করে নিচ্ছেন, আর আপনারা তাঁদের অভিনয়ে মজে গিয়ে, তা বুঝতেও পারছেন না। তবে হ্যাঁ, শীঘ্রই তা পারবেন আপনারা, যখন একটি সামান্য মনুষ্যকে আপনরা শতপ্রচেষ্টা করেও নিজেদের অধীনে রাখতে পারবেন না, তখন বুঝবেন এই সত্য। ... আপনাদের দণ্ড আপনারা শুনিয়ে দেবেন। সেই দণ্ড আমি সাগ্রহে স্বীকার করবো, তবে তা শ্রবণ করার জন্য আপনাদের মত বশীকরণ হয়ে যাওয়া দেবের সম্মুখে স্থিত থেকে, আমি আমার উর্জা নষ্ট করতে পারবো না"।

ত্রিদেবী সংবাদ

এত বলে, সেখান থেকে ধরিত্রী দেবী মনের দুঃখে নিজের ধামে প্রত্যাবর্তন করলে, ত্রিদেব নিজেদের মধ্যেই আস্ফালন করতে থাকলেন, দেবী ধরিত্রীর কটুবচনকে নিয়ে।

অন্যদিকে ধরিত্রীদেবী মনের দুঃখে, নিজের সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন, যেখানে ত্রিদেবও নিজেদের মহিমায় স্থিত থাকতে পারেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রবেশ করার কালে, তিনি দেখলেন, সেখানে এক দিব্য উর্জা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই দেখে আনন্দিত হয়ে, দেবী ধরিত্রী এসে দেখলেন, তাঁর তিন মাতা সেখানে অবস্থান করছেন। দেবী ধরিত্রী পূর্ণভক্তি সহকারে তাঁদের সম্মুখে উপনীত হয়ে বললেন, "মাতা, আমি আপনাদেরই সাখ্যাত পেতে কৈলাসে গেছিলাম। আপনারা সেখানে নেই জেনে, আমি এখানে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আপনাদের উর্জার আভাস পেয়ে, আনন্দিত হয়ে চলে এলাম এখানে"।

দেবী শ্রী বললেন, "মিথ্যা কথা তোমাকে শোভা পায়না ধরিত্রী। তুমি তো আমরা কৈলাসে বা আমাদের নিজের নিজের ধামে নেই জেনেই সেখানে গেছিলে!"

দেবী পার্বতী সবিনয়ী হয়ে বললেন, "যাই হোক, আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী ধরিত্রী। তুমি আমার ধামে গিয়ে অপমানিত হয়ে চলে এলে, তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী"।

দেবী ধরিত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, “না মা, এমন বলবেন না। ... হ্যাঁ লক্ষ্মীদেবী সঠিকই বলছেন, আমি জেনেই গেছিলাম কৈলাসে যে আজকে আপনাদের অনুপস্থিতিতে কৈলাসে মহাসমারোহ হচ্ছে। দেবতা ও অসুররা সেখানে পৌঁছানোর আগেই আমি সেখানে যাই, এই উদ্দেশ্যে যে ত্রিদেব যদি একবার আমার প্রতি করুণা দৃষ্টি রাখেন। হে মাতা, যতই হোক, এই ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে তো তাঁরাই রয়েছেন। তাই তাঁদেরকে একটিবার সুযোগ না দিয়ে, যারা তাঁদেরকে সেই দায়িত্ব প্রদান করেছেন, সেই ত্রিদেবীর কাছে শরণাপন্ন হওয়া তাঁদেরকে অপমান করা হবে। তাই একবার তাঁদের সন্নিকটে গেছিলাম”।

দেবী সরস্বতী স্নেহের হাসি হেসে বললেন, “কিন্তু তাতে কনো লাভ হলো না, তাই তো? তাঁরা তোমার কথা শোনা তো দুরের কথা, তোমাকে এমন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেখে, একটিবার তোমার কুশলতার সংবাদও গ্রহণ করলেন না, উপরন্তু নিজেদের সর্বেসর্বা রূপে প্রদর্শন করে, তুমি যে তাঁদের অধীনে স্থিতা এক দাসী, তা প্রমাণিত করার প্রয়াস করলেন। এই তো?”

দেবী ধরিত্রী বললেন, “স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করা এক স্ত্রীর জন্য নিজের অপমানের থেকেও অধিক অপমানের। তাই আপনাদের সম্মুখে আপনাদের স্বামীদের নিন্দা করবো না মাতা। ... ক্ষমা করবেন। আপনাদের অপমান করার ধৃষ্টতা আমি দেখাতে পারবো না। ... মাতা, আপনারা কোথাও গেছেন, কিন্তু কোথায় গেছেন কেউ জানেনা। তাই প্রশ্ন জাগছে মনে, আপনারা কোথায় গেছিলেন?”

দেবী শ্রী হেসে বললেন, “আমরা তোমার কাছেই এসেছিলাম ধরিত্রী। ... কিন্তু কেন এসেছি, কি উদ্দেশ্য আমাদের আগমনের, সেই সমস্ত পরের কথা। আগে তুমি উপবেশন করো। তোমার দেহের এই হাল, তাতে তোমাকে দণ্ডায়মান রাখাই তোমার উপর অকথ্য অত্যাচারের সমান। ... আগে আমাদের সম্মুখে বসো, তারপর আমরা আমাদের কথা বলছি তোমাকে”।

দেবী ধরিত্রী একাসনে উপবেশন করলে, প্রথমে মাতা পার্বতী তারপর একে একে সকল ত্রিদেবীই ভূমিতে দেবী ধরিত্রীর পাশে বসলে, দেবী ধরিত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন, “এ কি

করছেন মাতা! ... আপনারা আমার আরাধ্যা, আমার গুরু; গুরুর আসন কি করে শিষ্যের আসনের সমান্তরাল হয়। আপনারা আমার থেকে উচ্চ আসনে বিরাজ করুন”।

দেবী পার্বতী বললেন, “আগে সিদ্ধান্ত নাও ধরিত্রী, আমরা তোমার মাতা না গুরু! কোনটি আগে? যদি গুরু আগে হয়, তবে আমরা উচ্চ আসনে উঠে যাচ্ছি, আর যদি মাতা আগে হয়, তবে মাতার তো অধিকার আছে, সন্তানের আসনে বিরাজ করে, তাঁর বেদনার সহভাগি হবার, তাই না!”

দেবী ধরিত্রী সেই কথাতে কান্নায় ভেঙে পরে দেবী পার্বতীর কাঁধে মাথা রেখে বললেন, “খুব কষ্টে আছি মা, আর আমার সব থেকে বড় কষ্ট এই যে আমার কষ্ট কেউ জানার বা বোঝার চেষ্টাও করছে না!”

দেবী শ্রী ধরিত্রীর মাথায় স্নেহের করস্পর্শ করে বললেন, “জানি মা! ... আর জানি বলেই তো কারুকে কিছু না বলে, তোমার কাছে আমরা ছুটে এসেছি”।

দেবী সরস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে পদচারণ করতে করতে বললেন, “মানুষ অত্যন্ত গভীর ভাবে মনের ও বুদ্ধির প্রতি আসক্ত হয়ে রয়েছে, আর সেই আসক্তির কারণে তাঁরা তাঁদের আবেগের, কল্পনার ও ইচ্ছার পূজা অর্চনা করছেন। কিন্তু এই আবেগ, কল্পনা ও ইচ্ছাকে তাঁরা অত্যন্ত সুকৌশলে লুকিয়ে রাখার জন্য, দেবরাজ ইন্দ্রকে নিজেদের মিত্র করে নিয়ে, তাঁর স্বার্থ দেখিয়ে, তোমার গর্ভের সমস্ত ধরনের বায়ুকে তাঁর কাছে মুক্ত করে দিচ্ছেন, ও তাঁর ধনবৃদ্ধি করছেন।

একই ভাবে, বরুণদেবকে, অগ্নিদেবকে এবং পবনদেবকে ক্ষতি করেও, তাঁদের ক্ষতিকেই তাঁদের কাছে স্বার্থসিদ্ধি রূপে দেখিয়ে, তোমার উপর চূড়ান্ত হারে লুণ্ঠন করে চলেছে। এই সমস্ত কিছু করার কালে যাতে তাঁরা ত্রিদেবের প্রকোপে না পরেন, সেই কারণেই এই দেবদের নিজেদের সন্ধি করে নিয়েছেন মানুষ। আর যেহেতু দেবরা অসুরদের সাথে মিশে রয়েছেন, সেহেতু ত্রিদেবও মহানন্দে রয়েছেন। আর যাতে এরপরেও ত্রিদেব রুষ্ট না হন, তাই মানুষ

তাঁদেরই আরাধনা করছেন এবং নেপথ্যে আরাধনা করছেন নিজেদের আবেগ, ইচ্ছার ও কল্পনার।

আর ত্রিদেব যখন দেখছেন যে তাঁদেরকে কিছু না করতে হয়েও, তাঁরা পূজনীয় হয়ে অবস্থান করছেন, তখন তাঁরা এই মানুষদের কল্পনাকে, অমার্জিত ইচ্ছাকেই, আর আবেগকেই পশ্রয় দিয়ে চলেছেন, আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে তোমার অবহেলা হচ্ছে, তোমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, তোমার অস্তিত্বকেই বিনষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, জন্মমৃত্যুর চক্রকেই স্তব্ধ করে দিয়ে, মানুষের মধ্যে যে মোক্ষের সম্ভাবনাকে এই জন্মমৃত্যু জাগ্রত রাখতো, তাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু না দেবরা বুঝতে রাজি যে আসলে তাঁদের হিত নয়, তাঁদের অস্তিত্বকেই বিনাশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আর না ত্রিদেব জানতে আগ্রহী যে মানুষকে এই কল্পনা করতে দিয়ে, এই আবেগের আরাধনা করতে দিয়ে মানুষের তথা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ ডেকে আনছেন তাঁরা। ... এই তো তোমার বেদনার কারণ ধরিত্রী!”

দেবী ধরিত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, “মা, আপনারা কত কষ্ট করে, কত সাধ্যসাধনা করে এই মানুষ নামক যোনির নির্মাণ করেছিলেন যে এবার সমস্ত ভ্রমিত আত্মরা নিজেদের স্বরূপ জানতে পারবে আর নিজেদের জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করে, আপনাদের মধ্যে লীন হয়ে যাবে। কিন্তু তা কোথায় হলো মা! ... মানুষ তো সম্পূর্ণ ভাবে যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে! কামনা বাসনার দাস হয়ে গেছে তারা। আবেগের দাস, কল্পনা ও ইচ্ছার দাস হয়ে গেছে! যেই কল্পনা, আবেগ ও ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হবার জন্য তোমরা মানুষের জন্ম দিলে, তা হলো কই মা?”

দেবী পার্বতী এবার গভীর হয়ে বললেন, “তা যে হবেই, তেমনটা তোমাকে বলবো না ধরিত্রী। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বলবো যে, ইন্দ্রকে ও ত্রিদেবকে তুমি যা বলে এসেছ, অর্থাৎ একদিন একটি সামান্য মানুষকে তাঁরা বশ করতে না পেরে, তাঁরা নিজেদের যেই অধিকারের কথা বলছেন, সেই অধিকারের বাস্তবিক পরিচয় পাবেন, তা আমরা সিদ্ধ করবই। হ্যাঁ হতেও পারে যে, সেই পরাজয়ে, ত্রিদেব ও দেবরা নিজেদের ভুলকে বুঝতে পেরে, মানুষের আবেগ, কল্পনা

এবং ইচ্ছাকে মূল্য দেওয়া বন্ধ করে দেবেন, আবার এও হতে পারে যে এতকিছুর পরেও, তাঁরা অহংকারে মত্ত থাকবেন।

হ্যাঁ যদি, এই সমস্ত কিছুর পরেও তাঁরা অভিমানে আবদ্ধ থাকেন, তবে এই মা যেমন মানবকে জন্ম দিয়েছিল, তেমন মানবের নাশও সুনিশ্চিত করবে, এবং মানবের থেকেও উন্নত যোনিকে প্রসব করবেন। তবে তা করার আগে, একটিবার সকলকে সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। ধরিত্রী, তুমি একটি অবয়ব নির্মাণ করো, আর তাকে এমন স্থানে নির্মাণ করো যা অত্যন্ত সাধারণ হবে”।

দেবী ধরিত্রী ব্যকুল নয়নে তাকালে, দেবী শ্রী বললেন, “দেবী পার্বতীর কথার অর্থ এই যে, সেই মানুষ না তো ধনবান হতে পারবে, যে ত্রিদেব বলবেন ইনি ধনী বলে তাঁদের মানছেন না, আর না ধনহীন হতে পারেন যাতে ত্রিদেব বলতে না পারেন যে ইনি ধনহীন বলে, ইনাকে বশ করা সম্ভব হচ্ছেনা। ... অর্থাৎ এমন অবস্থায় এই দেহ নির্মাণ করো তুমি, যাতে ত্রিদেব, সমস্ত দেব বা সমস্ত অসুর অতি সহজেই এঁকে বশ করে নিতে পারে”।

দেবী ধরিত্রী বিস্মিত হয়ে ত্রিদেবীকে দেখলে, দেবী সরস্বতী হেসে বললেন, “তুমি নির্মাণ করো ধরিত্রী, আমরা স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে সক্রিয় হয়ে নিবাস করবো। তারপর দেখবো, তাকে কে কে বশ করে। যখন কেউ তাঁকে বশ করতে পারবেনা, তখন আমি তাঁর মাধ্যমে সেই শিক্ষার প্রসার করবো যে কিভাবে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন করলে, সে সমস্ত দেব, সমস্ত অসুরের অধীন থেকে মুক্ত থাকতে পারে, এবং তাঁর মাধ্যমে নতুন করে মোক্ষে যাত্রার চেতনার বিস্তার করবো। ... হ্যাঁ, ত্রিদেবের অহংকার বিনষ্ট হবে কিনা জানিনা, তবে আঘাত অবশ্যই পাবে। ... তাই যাতে তাঁরা নিজেদের অহংকার ত্যাগ করেন, সেই সম্ভাবনার সৃষ্টি অবশ্যই একবার করবো”।

দেবী ধরিত্রী হাসিমুখে বললেন, “অর্থাৎ মা, তোমরা একত্রে অবতার গ্রহণ করবে?”

ত্রিদেবী হাস্যমুখে বললেন, “হ্যাঁ, আমরা ত্রিদেবী একত্রে অবতার গ্রহণ করবো। যার দেহকে ধারণ করে আমরা অবতরণ করবো, তাঁর নাম হবে ব্রহ্মসনাতন। আর তাঁর হৃদয়ে স্থিতা

আমাদের সম্মিলিত রূপকে সে স্বয়ংই নামকরণ করবে সর্বাম্বা। এমন ভেবো না যে ব্রহ্মসনাতন ত্রিদেব, দেব বা অসুরের সাথে যুদ্ধ করবেন। বরং সর্বাম্বা তাঁর হৃদয়ে আসীন হয়ে, এই যুদ্ধ করবে, এবং ত্রিদেব, দেব এবং অসুরদের পুনরায় স্মরণ করাবে যে যতই তাঁরা অধিকারের জয়ঘোষ করুক, আমার উপর তাঁদের না তো কনোদিন অধিকার ছিল, আর না কনোদিন তা থাকা সম্ভব"।

দেবী ধরিত্রী আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে কি করবেন বুঝতে পারলেন না। একবার তিনি ত্রিদেবীর চরণবন্দনা করলেন, একবার তাঁদের আলিঙ্গন করলেন। আবার একবার তাঁদেরকে আলিঙ্গনে করে তাঁদের কপোলে শিশুর ন্যায় চুম্বন করতে থাকলেন। দেবী ধরিত্রীর এই লম্ফঝম্প দেখে, ত্রিদেবী বাৎসল্যপূর্ণ হাস্য প্রদান করে বললেন, "ধরিত্রী, তোমার অবস্থা খুবই খারাপ, এমন লম্ফঝম্প করো না"।

দেবী ধরিত্রী উত্তরে বললেন, "মা, আজ আমার কনো দুঃখ নেই, কনো বেদনা নেই। আজ আমি সর্বাধিক সুখী। স্বয়ং ত্রিদেবী একত্রে আমার বুকে দেহ ধারণ করে, বিরাজ করবেন। মা, আমি শীঘ্রই সেই তনুর নির্মাণ করছি। সর্বাঙ্গসুন্দর তনু করবো আমি তাঁর। গৌর হবে তাঁর অঙ্গবর্ণ, সুঠাম হবে তাঁর উন্নত বক্ষদেশ; কোমল হবে তাঁর শ্রীঅঙ্গ, আর তাঁর অঙ্গকে তোমাদের সমস্ত চিহ্নদ্বারা আমি ভূষিত করবো। ... আমার যে আজ থেকে মহোৎসবের শুরু! ... কিন্তু মা, কোথায় তাঁর জন্ম হবে?"

দেবী শ্রী বললেন, "সেখানে, যেখানে দেবী পার্বতীর সত্ত্বগুণের আরাধনা হয় মহাধুমধাম করে। সেখানে যেখানে তাঁর বিশাল কায়া মূর্তি হয়, আর সেই মূর্তিকে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে, নিজেদের অন্তরে মাতার প্রতি যেই অব্যক্ত ভালোবাসা, তাকে ব্যক্ত করে। সেখানে যেখানে, নিজেদের সর্বস্ব ধন উজাড় করে দেয়, তাঁদের মাতার নামে। সেই গঙ্গা তীরবর্তী মহাতীর্থে হবে ব্রহ্মসনাতনের জন্ম, যা মহাতীর্থ হয়েও, তাকে মহাতীর্থ বলে কেউ চেনেও না, জানেও না। ... বুঝতে পেরেছ কোন স্থানের কথা বলছি আমি?"

দেবী ধরিত্রী হেসে বললেন, "বুঝে গেছি মা!... সেই স্থান, যাকে তোমরা ত্রিদেবী সুরক্ষা প্রদান করো। সেই স্থান যেখানে আমি কচ্ছপের ন্যায় আকার ধারণ করে থাকি, সে যে সেই চাঁদের নগর, যেখানের মানুষ কেবল আর কেবল তোমার জন্যই জীবিত থাকে, যেখানের মানুষ কেবল তোমাকেই চেনে, আর তোমার জন্য তাঁরা সর্বক্ষণ সর্বস্ব ত্যাগ করতে সদাপ্রস্তুত থাকে"।

ত্রিদেবী হেসে বললেন, "যাও ধরিত্রী, নির্মাণ করে এসো সেই তনু। ... আমরা নিজধামে প্রত্যাবর্তন করবো না, বা বলতে পারো এবার আমরা নিজধামেই প্রত্যাবর্তন করবো। ... মূলাধারে পিতৃলোক স্থাপিত, স্বাধিষ্ঠানে গন্ধর্বলোক, মনিপুরে স্বর্গলোক স্থিত, অনাহততে ব্রহ্মলোক; বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধ স্থাপিত ও কৈলাসে আজ্ঞা। কিন্তু এই সমস্ত লোকের একটিও যে আমার ধাম নয়। আমার ধাম যে সহস্রার, আর তাই তা মাতৃলোক। আমরা এবার সেখানে যাত্রা করবো, তবে আমাদের চরণ আমরা একত্রে রাখবো ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে। যাও ধরিত্রী, ব্রহ্মসনাতনের তনু নির্মাণ করো। আমরা সেখানেই চরণ রাখবো, না কৈলাসে রাখবো, না বৈকুণ্ঠে আর না অনাহতে।

কৈলাস, বৈকুণ্ঠ বা ব্রহ্মলোক, আমাদের পৃথক পৃথক উর্জা তো সহন করে নিতে সক্ষম, কিন্তু আমাদের একত্রিত উর্জা সহন করার সামর্থ্য তাঁদের কারুর নেই। তাঁদের একত্রিত উর্জা ধারণ করার ক্ষমতা যার আছে, আমরা এবার তাঁর কাছে যাত্রা করবো। যাও তাঁর তনু নির্মাণ করো ধরিত্রী।

কল্পনা বিস্তার

ত্রিদেবী নিজেদের রূপকে অতিসূক্ষ্মে স্থাপিত করে, ব্রহ্মাণ্ড থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে লুপ্ত হলেন। আর তাঁদের আভাস লাভ না করে, ত্রিদেব তথা সকল দেবদের অবস্থা হলো ভয়ানক। দিকে দিকে তাঁরা ছড়িয়ে গেলেন, মাতাদের সন্ধানে। কিন্তু কোথাও তাঁদের খুঁজে পেলেন না। আর আবেগদের কাছে, এটি হলো মহাসুযোগ। এতকাল তাঁরা যেন ত্রিদেবীর ভয়েই গুটিয়ে ছিল।

আর আজ ত্রিদেবী অবলুপ্ত হওয়াতে, তাঁদের আনন্দের কনো সীমাই রইল না। তবে আবেগরা এই সুযোগকে হাতছাড়া করতেও নারাজ। কিন্তু তাঁদের মধ্যের ঐক্য নেই বললেই চলে। তাই তাঁরা এই সুযোগকে কাজে লাগানোর চিন্তা করলেও, কিছু করে উঠতে পারে না।

ত্রিদেবী অবলুপ্ত হওয়ায় আনন্দ কেবল আবেগদেরই হয়নি, আনন্দ হয়েছে চিন্তা ও ইচ্ছাদেরও। আর তাঁদের জ্যেষ্ঠা হলেন দেবী কল্পনা। দেবী কল্পনা সকলকে ডেকে বললেন, “দেখো ত্রিদেবী এখন অবলুপ্ত হয়েছেন। কি করার জন্য তাঁরা অবলুপ্ত হয়েছেন, আমরা কেউ জানিনা, তবে এটা নিশ্চিত যে, তাঁরা একটা বড় কিছু করতে চলেছেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্যে যাই হোক, আমাদের কাছে এটি একটি বড় সুযোগ, আর এই সুযোগে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আমাদেরকে ছড়িয়ে যেতে হবে। আমরা পৃথিবীর পঞ্চভূতের সাথে একাত্ম হয়ে আছি বলে, আমরা যেকোনো জীবের মধ্যেই থাকতে পারি, কারণ যখন জীব নিজেদের ভূত উপাদান রূপে পৃথিবীর পঞ্চভূতদের গ্রহণ করে, তখন আমাদেরও তাঁরা গ্রহণ করে”।

দেবী ইচ্ছা বললেন, “কিন্তু কি লাভ দেবী, মানুষদের সাথে যুক্ত হওয়ায়? বিশেষ করে যখন মানুষ যেই প্রকৃতিতে নিবাস করে, সেই প্রকৃতিতেই আমরা মিশে রয়েছি?”

দেবী কল্পনা হেসে বললেন, “মানুষ হলো ত্রিদেবীর রচিত সেই যোনি, যে সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করতে সক্ষম। কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা এমনকি সমস্ত আবেগদেরও অতিক্রম করার সামর্থ্য ধরে মানুষ। মানুষের রচিত আধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে তোমাদের ধারনা আছে! এই আধ্যাত্মবাদ আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম, কেবল এই নয়, এমনকি ত্রিদেবের অস্তিত্বও বিনষ্ট করে দিতে সক্ষম। আর একবার একটি মনুষ্যও যদি এই কাজ করতে পারে, তাহলে সমস্ত দেব, সমস্ত দেবী, এমনকি আমাদেরকেও তাঁর দাস হয়ে থাকতে হবে।... আর কেবল এই নয়, সেই একটি ব্যক্তি, নিজের মত অজস্রকে জন্ম দিতে সক্ষম, আর তা করলে, আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। ... তাই আমাদেরকে এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের থেকে সাবধান হতে হবে”।

দেবী চিন্তা বললেন, "কিন্তু কেন দেবী? আধ্যাত্মবাদের চর্চা তো বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি করছেন! আর যেহেতু সমস্ত দেব, সমস্ত ত্রিদেব আমাদের সাথে মিলে আছেন, তাই তাঁরা আমাদেরকে স্বীকার করেই রয়েছেন। তারপরেও আমাদের তাঁদের থেকে সাবধান থাকার কিই বা প্রয়োজন?"

দেবী কল্পনা দৃঢ়চিত্ত হয়ে বললেন, "ত্রিদেবী যদি আমাদের কিছু করতে পারেন, আমার বিশ্বাস যা তাঁরা করার চেষ্টাও করছেন, তা এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সাহায্যেই করবেন। তাই আমাদেরকে এমন আধ্যাত্মবাদের বিস্তার করতে হবে সর্বত্র, যেখানে আবেগ আর কল্পনাকেই সর্বস্ব কিছু মানা হবে, যেখানে কনো গুরু আমাদের থেকে মুক্ত হওয়ার কথাই বলবে না। আমরা যদি তেমন করতে পারি, তবে ত্রিদেবী যদি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সাহায্যে আমাদেরকে প্রতিরোধ করতেও চান, তাও তাঁরা সক্ষম হবে না"।

দেবী চিন্তা ও ইচ্ছা একই সঙ্গে বললেন, "দেবী যদি আমাদের এমন করতেই হয়, তবে আমাদের শক্তিশালী সন্তানের প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের কাছে তো কনো পুরুষই নেই! তাহলে আমরা বংশবৃদ্ধি করবো কি করে?"

দেবী কল্পনা বললেন, "উচিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছ তোমরা। ... এই বিষয়ে আমাদের সহায়ক হবেন আবেগরা। ... কিন্তু তাঁরা বড়ই অসংযত, আর বড়ই ছন্নছাড়া; একে অপরের সাথে লড়াই সংগ্রাম করতে ব্যস্ত। ... চলো তবে আমরা তাঁদের রাজ্যে যাই, আমরা তিনজন। ... আমরা গিয়ে, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী অহংকে নিজেদের অধীনে স্থাপিত করি। ... একবার তাকে নিজেদের বশে স্থাপিত করতে পারলে, আমরা তাঁকে বিবাহ করবো এবং তাঁকে আমাদের সমাজের রাজা করে স্থাপন করবো। তার থেকে বলশালী পুত্র লাভ করে, আমরা আমাদের সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত বলশালী গড়ে তুলবো, আর সমস্ত আবেগদের একত্রিত করে রাখবো।

আর একবার আমাদের মন্ত্রণা অনুসারে আমরা কাজ করতে পারলে, আমরা অসংখ্য তেমন আধ্যাত্মবাদীর জন্ম দেব, যারা আবেগে বশীভূত হবে, যারা কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তায় গ্রসিত হবে।

... আর তা করে নিতে পারলে, আর ত্রিদেবীদের থেকে কনো চিন্তা থাকবে না। যদি ত্রিদেবী ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অবতারও গ্রহণ করেন, তাও তো এই আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদেরই সঙ্গ গ্রহণ করবেন, আর তাঁরা তাঁদেরকে আবেগ, কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তারই পাঠ প্রদান করবে।

আর যদি কনো অবতার দেহ ধারণ করার ফলে তাঁরা সক্রিয় হয়েও ওঠেন, এবং সক্রিয় হয়ে উঠে সমস্ত দেব, এমনকি ত্রিদেবেরও অভয় লাভ করে ফেলেন, তা সত্ত্বেও, আমাদের বলশালী পুত্ররা তাঁকে বশ করতে সক্ষম হবে। ... তাই চলো, আমাদের আবেগদের সাম্রাজ্যে যাওয়া উচিত। ... তাঁদের সংঘবদ্ধ করে, তাঁদের নৃপতিরূপে অহংকে স্থাপন করে, অহংএর সঙ্গিনী হয়ে আমরা বলশালী পুত্রদের জন্ম দেব। ... আর স্মরণ রেখো, আমাদের বিবাহে ত্রিদেবও নিমন্ত্রিত থাকবেন আর সকল দেবও। তাঁদের থেকে আমরা আমাদের, আমাদের পতির ও আমাদের সন্তানের জন্য এমন বরদান কামনা করবো যে, যদি কনো অবতারদেহে ত্রিদেবী সমস্ত ত্রিদেব ও দেবদের বশ করেও নেন, তাও আমরা তাঁর বশ্যতা থেকে মুক্তই থাকবো”।

এমন বিচার করে, দেবী কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা গেলেন সেখানে যেখানে অহং ও অন্য আবেগরা বিরাজ করছিলেন। সেখানে গমন করে, তাঁরা দেখলেন আবেগরা ও অহং ইতিস্তত বিচরণ করছেন। সেই দেখে, দেবী কল্পনা চোখের ঈসারা করলেন দেবী ইচ্ছা ও চিন্তাকে, এবং তিনজনেই রমণীসুলভ আচরণ করতে শুরু করলেন। বিভিন্ন প্রকার ঠমক ও দেহসৌন্দর্য প্রকাশ করে, উপস্থিত সমস্ত পুরুষদের প্রলোভন দিতে থাকেন তাঁরা।

ক্রমশ তাঁদের এই অঙ্গভঙ্গি সকলের চিত্তাকর্ষণ করতে শুরু করে, আর একটা সময়ের পর, সকলে সকল কাজ ছেড়ে এই তিন রমণীর দেহসৌন্দর্যকে দেখতেই একত্রিত হলেন। দেবী কল্পনা যখন দেখলেন যে, তাঁদের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তখন দেবী ইচ্ছাকে বললেন, “চল ইচ্ছা! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। বড় সাধ জেগেছিল, কনো শক্তিশালী মরদের সঙ্গিনী হবো, তা এখানে উপস্থিত কারুর মধ্যে সেই বলই নেই। চলো অন্যত্র দেখি, কনো বলবান পুরুষ পাই কিনা!”

তিন রমণীর কথা শুনে, সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু কেউ সাহস করে আগে এলেন না। অবশেষে সমস্ত আবেগদের সরিয়ে সামনে এলেন অহং, আর এসে বললেন, “বলশালী কিনা, তার প্রমাণ কি করে নেবে তোমরা?”

দেবী কল্পনা নিজের মন্ত্রণায় সফল হলেন দেখে, রমণীয় ঠমক দেখিয়ে বললেন, “যদি বলি, কে প্রমাণ করবে নিজেকে বলশালী বলে? তুমি?”

অহং হুংকার দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ আমি! ... কেন আপত্তি আছে আমাকে সঙ্গী করতে!”

দেবী ইচ্ছা বললেন, “আপত্তি তো এমনি নেই, দেহগঠন দেখে তো তোমাকে রমণীয়ই মনে হচ্ছে, কিন্তু কেবল রমণসঙ্গী হলেই কি আর হবে! ... তুমি কি এঁদের রাজা! ... আমরা এমন রূপসী, রাজা ছাড়া কারুর কি আমাদের সঙ্গিনী করে পাওয়া উচিত! “

দেবী চিন্তা বললেন, “দেখে তো মনে হচ্ছেনা, ইনি রাজা! চলো দেবরাজ ইন্দ্রের কাছেই যাওয়া যাক”।

অহং আবার হুংকার দিয়ে বললেন, “আমাদের এখানে কেউ রাজা নেই। ... তারপরেও আপনারা যখন বলছেন, তখন আমরা সকলে এই বচন দিলাম যে, যিনি আপনাদের বলের পরীক্ষায় সফল হয়ে আপনাদের একসঙ্গে তিনজনের সঙ্গী হতে পারবে, সেই আমাদের মধ্যে রাজা হবে, তবে এক রাজার তিন রানী থাকতে পারে, কিন্তু মহারানী তো একজনই হবে, তাই না! তাহলে আপনারাই বলুন, আপনাদের মধ্যে মহারানী কে হবে? আমরা কথা দিচ্ছি, আমাদের রাজ্যের প্রধান রাজা হবেন না, মহারানী হবেন”।

দেবী ইচ্ছা মৃদু হেসে বললেন, “বেশ আমাদের তিনজনের মধ্যে মর্দন যুদ্ধ হবে। আমাদের মধ্যে যার বাহুপাশের থেকে অন্যরা নিজেদের মুক্ত করতে পারবেননা, তিনিই হবেন মহারানী। ... যদি আপনারা এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন, তবে আপনাদের মধ্যে রাজা রূপে আমরা তাঁকেই বেছে নেব, যিনি বাকি সমস্ত পুরুষদেরকে ভূপতিত করে দেবেন”।

সকলে সম্মত হলে, দেবী কল্পনা, দেবী ইচ্ছা ও দেবী চিন্তা নিজেদের মধ্যে মর্দন যুদ্ধ শুরু করলেন। এই যুদ্ধ প্রস্তাব যেন কেবলই এই উদ্দেশ্যে যে, এই মর্দন যুদ্ধের কালে, সমস্ত পুরুষ তাঁদের শরীরের রমণসৌন্দর্যকে গভীর ভাবে দর্শন করে, কামনার জ্বালায় দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে যাবে, আর তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্যে বেশ ভালো ভাবেই সফল হলেন। মর্দন যুদ্ধ চলা কালীন, তিন রমণীর দেহসৌন্দর্য যেন কামনার জ্বালায় সমস্ত পুরুষকে অস্থির করে দিলেন। কেবল এই নয়, বরং তিন রমণীর দেহমর্দন সমস্ত স্ত্রী আবেগদেরও কামনাগ্রস্ত করে তুলল।

দীর্ঘকাল সেই যুদ্ধ চলাতে, যখন পুরুষরা আর নিজেদের কামনাকে গোপন রাখতেই পারছিলেন না, তখন দেবী কল্পনা দুই অন্যদেবীকে নিজের পাশে আবদ্ধ করে, মহারানী রূপে নিজেকে স্থাপিত করলেন। কামনার জ্বালায় অস্থির পুরুষরা এবার অধীর হয়ে উঠলেন, এই তিন রমণীকে সঙ্গিনী করে পাবার জন্য। আর তাই প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন নিজেদের মধ্যে, কিন্তু অহং-এর বল এঁদের সকলের মধ্যে এতটাই অধিক যে তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে উঠলেন না।

অহং বিজেতা হলে, তিনি তিন রমণীর দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু অন্য আবেগ পুরুষরা এই তিন রমণীদের না লাভ করার জন্য অত্যন্ত ব্যাথিত হয়ে উঠলেন। তাই দেবী কল্পনা সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “এতো বিমর্ষ হয়ে উঠছো কেন তোমরা! তোমাদের মধ্যেও তো বহু রমণী রয়েছেন, যারা তোমাদের সাথে সঙ্গমে অস্থির। যাও তোমরা তাদের সঙ্গী হয়ে, তাঁদের থেকে নিজেদের সন্তান লাভ করো”।

সমস্ত আবেগরা এই ভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাহ করে, পুরুষরা স্ত্রীদের, এবং স্ত্রীরা পুরুষদের সম্ভোগে রত হলে, দেবী কল্পনা, দেবী চিন্তা, এবং দেবী ইচ্ছা একত্রে অহংকে বিবাহ করতে আগ্রহী হলেন। অহং নিজের কামনার উপর অঙ্কুশ স্থাপন করতে না পেরে, তিন রমণীর সাথেই সঙ্গমে রত হতে ইচ্ছুক হলে, দেবী কল্পনা বললেন, “দাঁড়ান নাথ। যেই আবেগদের জন্য সমস্ত ভূতরা আজ সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন, ত্রিদেবদের আজ কনো ক্রিয়া করতেই হচ্ছেনা, তাঁদের সকলের বরদানও যে আমাদের রাজা ও রানীদের কাম্য, তাই না! ... তা লাভ করতে গেলে,

সামান্য সংযম তো করতেই হবে নাথ! আমাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ করতে হবে, যেখানে সমস্ত দেব, সমস্ত অসুর, এবং ত্রিদেব স্বয়ং নিমন্ত্রিত থেকে, আমাদের বরদান প্রদান করবেন"।

দেবী কল্পনার মন্ত্রণাতে সকলে রাজি থাকলে, সমস্ত আবেগরা মিলে তাঁদের রাজা ও রানীদের বিবাহ অনুষ্ঠানকে মহাসমারোহে পালন করতে উদ্যত হলেন। মহারানী কল্পনার মন্ত্রণায়, রাজা অহং স্বয়ং কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলকে, স্বর্গে, গন্ধর্বলোকে, এবং পিতৃলোকে গমন করে বিবাহের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন নির্দিষ্ট দিনের। আর তাই সেই নির্দিষ্ট দিনে, আবেগলোকে সমাগম হলো সমস্ত দেবদের এবং আবেগ অর্থাৎ অসুরদের।

প্রধান অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত হলেন মহাদেব, নারায়ণ, ব্রহ্মদেব, ইন্দ্রদেব, রবি অর্থাৎ সূর্যদেব, শনিদেব, এবং অন্য ভূতগন, চতুর্বিংশতিতত্ত্বগন, গন্ধর্বগণ, কার্ত্তিক, গণেশ, পিতৃগণরা, এবং নবগ্রহ তথা নক্ষত্ররাজি। সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ করলে, ত্রিদেব অহং এবং দেবীদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "অহং, দেবী কল্পনা, আপনারা বলুন, আপনারা আমাদের সকলের থেকে পৃথক পৃথক ভাবে উপহার কামনা করেন, নাকি সকলের হয়ে আমরা ত্রিদেব আপনাদেরকে কিছু বরদান প্রদান করি, তা কামনা করেন?"

দেবী কল্পনা সম্মুখে বিনয়ী হয়ে এসে বললেন, "দেব, শত উপহারের থেকে, একটি মোক্ষম বরদান যে সর্বোত্তম, তার শিক্ষা তো আপনারাই দিয়েছেন। তাই আমরা সেই একটি বরদানের কামনা রাখি, তবে আমি এই রাজ্যের মহারানী, তাই প্রভু আমার একটিই আবদার, যা কিছু দেবেন, তার ভাগ যেন আমার সমস্ত প্রজাও পায়"।

ত্রিদেব একে অপরের সাথে সলাপরামর্শ করে নিয়ে সম্মুখে এসে বললেন, "যথোচিত বলেছ তুমি কল্পনা। ... আর আমরা তোমাদের এই সমাজগঠনের প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত হর্ষিত ও উল্লসিত। তাই আমরা তোমাদেরকে এই বরদান প্রদান করছি যে, বাকি সমস্ত আবেগ সমস্ত ভূতদের সাথে একাত্ম হয়ে থাকবে। যেখানে যেখানে মন অর্থাৎ ইন্দ্র বিরাজ করবে, সেখানে সেখানে সমস্ত আবেগ বিরাজ করবে। যেই যেই ভাবে ইন্দ্র বিরাজ করবে কারুর মধ্যে, সেই

সেই ভাবে তোমরাও বিরাজ করবে সেই ব্যক্তির মধ্যে এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে। যেহেতু ইন্দ্রের নাশ সম্ভব নয় এই ব্রহ্মাণ্ডে, সেহেতু কনো আবেগেরও নাশ হবেনা। তবে কখনো যদি তোমরা এই সম্যক ব্রহ্মাণ্ডে, বা তাতে বিরাজ করা কনো একটি যোনির কনো একটি জীবের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রের বিরোধিতা করো, তাহলে সমস্ত আবেগকে সেই জীবের মধ্যে ইন্দ্রের মধ্যেই লীন হয়ে গিয়ে ইন্দ্রের মতই তাঁদেরকে চলতে হবে।

আর পরে রইল তোমাদের কথা, তোমরা আমাদের ত্রিদেবের সাথে সর্বক্ষণ মিশে থাকবে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের অবস্থান যা হবে, তোমাদেরও তাই হবে। যদি এই সম্যক ব্রহ্মাণ্ডে, বা এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে স্থিত সমস্ত জীবের নিজের নিজের ব্রহ্মাণ্ডে তোমরা আমাদের বিরোধিতা করো, তবে তোমাদেরকে আমাদের মধ্যে লীন করে নেওয়া হবে, যাতে করে তোমরা আমাদের মতধারা অনুযায়ী চলতে বাধ্য হও"।

দেবী ইচ্ছা ও চিন্তা ত্রিদেবের এই কথাতে ইতস্তত করে বললেন, "প্রভু, আপনি আমাদের অক্ষয় হয়ে থাকার বরদান প্রদান করলেন, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদেরকে পরাধীনও করে দিলেন!"

দেবী কল্পনা সকলকে চুপ করিয়ে বললেন, "সেতো উত্তম কথা দেবীরা, এতে আমরাও ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মেই চলতে থাকবো, আর তাই ব্রহ্মাণ্ড সঠিক অবস্থাতে সর্বক্ষণ বিরাজ করবে। ... তবে প্রভু, আপনারা আমাদের তো বরদান প্রদান করে দিলেন, কিন্তু আমাদের সন্তানদের যে কিছুই দিলেন না!"

মহাদেব হেসে বললেন, "বেশ, কি বরদান চাও বলো তোমাদের সন্তানদের জন্য। আমরা তোমাদের আচরণে অত্যন্ত তৃপ্ত। তোমরা তাঁদের অমরত্ব ছাড়া যা চাইবে, আমরা প্রদান করবো"।

দেবী কল্পনা হাস্যপ্রদান করে বললেন, "ধন্যবাদ প্রভু, প্রভুর জয় হউক। ... প্রভু, আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য এই বরদান চাই যে, তাঁরা অত্যন্ত বলশালী হবে, এবং স্বয়ং ত্রিদেবী যদি একাত্ম হয়ে একদেহী হন, তবে তাঁর সন্তানই এঁদের হত্যা করতে সক্ষম হবেন। আর

আমার পৌত্রদের জন্যও আমি এই বরদান চাই যে, তাঁদের মৃত্যু কেবল ও কেবল নিয়তির হস্তেই হউক। স্বয়ং নিয়তি ছাড়া, তাঁদের দমন কেউ করতে সক্ষম হবেনা। ... তবে প্রভু, আপনারা যে ত্রিদেব, আমি যে দুটি বরদান চাইলাম, আপনাদের থেকে যদি তিনটি বরদান না চাওয়া হয়, তবে যে আপনাদের ত্রিদেবের যেকোনো একজনকে অপমান করা হয়। তাই অনুমতি প্রদান করুন যাতে আমি তৃতীয় বরদান কামনা করে, আপনাদের ত্রিদেবকেই তৃপ্ত করতে পারি"।

নারায়ণ হেসে বললেন, "বেশ, আমি তোমাদের পুত্রদেরকে এই বরদান প্রদান করলাম যে, তাঁদের মৃত্যু কেবল ও কেবল ত্রিদেবীর একদেহী রূপের সন্তানই করতে পারবেন, অন্য কেউ নন"।

ব্রহ্মদেব বললেন, "আমিও তোমাদের পৌত্রদের জন্য এই বরদান প্রদান করলাম যে, তাঁদের মৃত্যু তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে, যিনি কর্মের ফল প্রদন করেন না, বরং যিনি কর্ম করান; যিনি শক্তি যুক্ত করেন না, বরং যিনি নির্ধারণ করেন যে কার কাছে কতটা শক্তি ও কিরূপ শক্তি যুক্ত হবে; যিনি মনের ভাব অনুযায়ী শব্দের অবতারণা করান না, বরং যিনি মনের ভাব কি হবে, তাই নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ তোমাদের পৌত্রদের নিধন তাঁর হাতেই সম্ভব হবে, যার ইশারাতেই সমস্ত শব্দের রচনা হয়, এবং যার ইশারাতেই সমস্ত জীব বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেন। তাঁর হাতেই নিহত হবে তোমাদের পৌত্ররা, যিনি কর্ম করান সকলকে দিয়ে, যিনি শক্তি ধারণ করান সকলকে দিয়ে, আর যিনি সমস্ত কিছুর পার, অর্থাৎ নিয়তির কাছেই তোমাদের পৌত্রের মৃত্যু সম্ভব হবে"।

মহাদেব হেসে বললেন, "এবার তুমি যেমন বললে, তৃতীয় বরদানের কথা। তা কামনা করো কল্পনা। সেই বরদান আমি তোমাকে প্রদান করবো"।

দেবী কল্পনা হাস্যপ্রদান করে বললেন, "ধন্য হলাম আমরা সকলে প্রভু, আপনাদের কৃপা লাভ করে। প্রভু আপনি আমাকে এই বরদান প্রদান করুন যে, আমার পৌত্রদের দমন না হলে,

আমার পুত্রদের দমন সম্ভব হবেনা। আর আমার পুত্রদের দমন সম্ভব না হলে, আমাদেরকে আপনারা কিছুতেই আত্মসাৎ করতে পারবেন না নিজেদের মধ্যে। ... অর্থাৎ প্রভু, আমরা এই চাই যে, যেমন আপনি বললেন, যদি আমরা কনোদিন আপনাদের বিরোধ করি, তাহলে আপনাদের মধ্যে আমরা লীন হয়ে যাবো, তা তখনই সম্ভব হয় যেন, যখন আমার পুত্ররা ও পৌত্ররা আর জীবিত থাকবেনা। যতক্ষণ আমার পুত্র ও পৌত্ররা জীবিত থাকবে কনো ব্রহ্মাণ্ডে, ততক্ষণ সেই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা এই তিন ভগিনী, অর্থাৎ আমি কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভাবে স্বতন্ত্র থাকবো"।

ত্রিদেবের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে এই কথা শুনে। দেবী কল্পনা বিনম্র হয়ে বললেন, "প্রভু আমরা কি কিছু অন্যায় চেয়ে ফেললাম? ... বিচার করে দেখুন প্রভু, আমরা তো আপনাদের এমনিই অনুগত। তাই প্রশ্নই ওঠেনা যে আমরা আপনাদের অবমাননা করবো। তাও যদি আমরা এমন কিছু করে ফেলি, সেই হেতু প্রভু আমরা এই বরদান কামনা করলাম, যাতে আমরা আপনার মধ্যে লীন হয়ে গিয়ে নই, বরং স্বেচ্ছায় ও নিজের নিজের প্রচেষ্টায় আপনাদের অনুগামী হয়ে ওঠার পুনরায় সুযোগ লাভ করি। আমরা আপনাদের কাছে স্বেচ্ছায় অনুগামী হয়ে থাকতে চাই প্রভু। আর সেই কারণেই এই বরদান কামনা আমাদের। অন্য কনোরূপ মনসা নেই আমাদের"।

মহাদেব হেসে বললেন, "বেশ তাই হোক। আমি বরদান প্রদান করলাম তোমাকে যে, নারায়ণ ও ব্রহ্মদেবের বরদানের অনুযায়ী তোমাদের পুত্র ও পৌত্রদের মৃত্যু হবে, আর তোমাদের পুত্রের দমনের আগে, তোমাদের পৌত্রদের দমন হতে হব, এবং তোমাদের আমাদের মধ্যে যদি লীন হতে হয়, তার আগে তোমাদের পুত্রদের দমন হতে হবে"।

ত্রিদেব ও সমস্ত দেব সেখান থেকে প্রস্থান করলেন মহাভোজ গ্রহণ করে, ও বরবধূদের বারংবার আশীর্বাদ প্রদান করে। আর তারপর অহং-এর স্বপ্ন, এবং কল্পনা, ইছা ও চিন্তারও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, তাঁরা সঙ্গমে লিপ্ত হতে থাকলে, দেবী কল্পনা বলদম্ভ নামক এক মহাবলশালী পুত্রের জন্ম দিলেন, দেবী ইচ্ছা জন্ম দিলেন উপপতির, এবং দেবী চিন্তা জন্ম

দিলেন আবর্তের। আর এই তিন মহাবলশালী পুত্র, তিন অহং পত্নীকে রত্নগর্ভা করে তুললেন। এবং যেমন ত্রিদেব বচন দিয়েছিলেন, তেমন ভাবেই, অহংএর সম্পূর্ণ পরিবার ত্রিদেবের সাথে মিশে গিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করলেন, এবং সমস্ত জীবের নিজের নিজের ব্রহ্মাণ্ডেও বিরাজমান হলেন। আর সমস্ত আবেগ ইন্দ্রের সাথে মিশে গিয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করলেন, এবং সমস্ত জীবের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে মনের সাথেই তাঁরা বিরাজমান হলেন।

তনু গঠন

সর্বত্র আবেগ ও অহংপরিবার ছড়িয়ে পরলে, তাঁরা ইন্দ্রের সাথে ও ত্রিগুণের সাথে একাত্ম হয়ে সমস্ত জীবদের যান্ত্রিক করে তুলতে শুরু করলেন, আর যেই যেই জীব যান্ত্রিক হলেন না, সেই সেই যোনিকেই অবলুপ্ত করে দিতে থাকলেন। আর এই সমস্ত কিছু এমনই নাট্যের আকারে করলেন তাঁরা যে, ত্রিদেব ও ভূতরা মনে করতে থাকলেন যে, এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে তাঁদেরই প্রসিদ্ধি হচ্ছে। তাঁরা মনে করতে থাকলেন, যখন একমাত্র মানুষই হলো শ্রেষ্ঠ যোনি, তখন অন্য যোনিদের আর প্রয়োজন কি! ... আর মানুষের ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করতে থাকলেন যে, সমস্ত সুখসুবিধা তাঁরা ভোগ করছেন, যেকালে সমস্ত কাজ করছে আবেগরা, অহং এবং তাঁর তিনস্ত্রী, তাই মহানন্দে সুখভোগ করতে শুরু করলেন ত্রিদেব ও সমস্ত ভূতদেবরা।

এরই নেপথ্যে, দেবী ধরিত্রী সেই তনু নির্মাণ সমাপ্ত করেন, যার নির্মাণের কথা ত্রিদেবী তাঁকে বলেছিলেন। যেমন তিনি বলেছিলেন ত্রিদেবীকে, তেমন ভাবেই গৌর বর্ণের তনু গঠন করলেন; যেই স্থানে তাঁকে স্থাপন করার কথা বলেছিলেন, সেই স্থানেই স্থাপন করলেন; এবং এমন একটি পরিবারে দেহটি রাখলেন, যেখানে ত্রিদেব, দেব, নবগ্রহ তথা আবেগ, কল্পনা, অহং, ইচ্ছা ও চিন্তা সহজেই তাঁকে নিজেদের বশে রাখতে পারেন।

জন্মের কালে, ত্রিদেবী একত্রিত হয়ে, সেই শিশুর হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁদের একত্রিত রূপ কেমন তা যে ত্রিদেবেরও অজানা, তাই ত্রিদেবী যে একত্রে অবতার গ্রহণ

করেছেন, তা সকলের অজানাই রইলো। শিশু যখন কিছু মাসের হয়, এবং জনকজননীকে চিনতে শেখে তখন থেকেই ত্রিদেব, নবগ্রহ তথা আবেগ, কল্পনারা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেন সাধারণত। আর সেই শিশুর ক্ষেত্রেও তাঁরা তেমনই করবেন বলে নিশ্চয় করেন, কারণ সেই শিশু যে তাঁদের নজরে আর পাঁচটা শিশুর মতনই।

কিন্তু ত্রিদেবী একত্রে তাঁর মধ্যে নিজেদের বিস্তার শুরু করেন, যখন তাঁর বয়স মাত্র সাত দিন। শিশু ব্রহ্মসনাতন মাতার রূপ দেখে বিভোর হয়ে গেলেন। মাতার সত্ত্বগুণী বেশের আরাধনা যেই গঙ্গাতীরবর্তী গড়যুক্ত শহরে হয়, সেই শহরে তাঁর জন্ম। তাই সাতদিনের মাথাতেই মাতা তাঁকে নিজের সেই সত্ত্বগুণী রূপের দর্শন করালেন, এবং শিশু ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে মাতার প্রতি আকর্ষর্ণকে মাত্র সাতদিনের মাথাতেই স্থির করে ফেললেন।

ধরিত্রী দেবী মাতাদের আবাহন করলেন, নিজের মনের একটি প্রশ্নের কারণে। মাতা তাঁকে নিজের একত্রিত রূপের নিরাকার শূন্যতা প্রদর্শন করে বললেন, "কি জানার আছে তোমার ধরিত্রী, শীঘ্র বলো আমাকে। আমি শীঘ্রই তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে, অবলুপ্ত হবো। আমি আমার অবতার গ্রহণের সংবাদ কারুকে জানতে দিতে চাইনা। তাই শীঘ্র প্রশ্ন করো"।

দেবী ধরিত্রী গদগদ হয়ে প্রশ্ন করলেন, "মাতা, আমি যে স্ত্রীদেহের নির্মাণ করেছিলাম, আপনি তাঁকে পুরুষ রূপে জন্ম দিলেন কেন?"

মাতা হাস্যকুতুকের বেশে বললেন, "এর দুটি কারণ। প্রথম এই যে ত্রিদেব তথা সকল দেব আমাদের সন্ধান করছেন, আর তাই প্রতিটি স্ত্রীসন্তানের মধ্যে আমাকে সন্ধান করছেন তাঁরা। এমনকি আমাকে সন্ধান করার জন্য, তাঁরা নারী স্বাধীনতারও বিস্তার করছেন, যাতে আমি সেই স্বাধীনতা লাভ করে, নিজের বিস্তার করলে, তাঁরা আমাকে সহজেই সনাক্ত করতে সক্ষম হন। তাই আমি পুরুষ দেহ ধারণ করলাম, তাঁদের দৃষ্টির থেকে আচ্ছাদিত ও লুক্কায়িত থাকতে। আর দ্বিতীয় তোমার জন্য ধরিত্রী। তুমি স্বয়ং দেহ গ্রহণ করে আমার এই রূপের পত্নী হবে, এবং এঁর দেখভাল করবে।

স্মরণ রেখো ধরিত্রী, এই শিশু অত্যন্ত সহজ ও সরল হবে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে, এই শিশু নিজের সমস্ত ভূত, সমস্ত ত্রিগুণকে নিজের বশে রাখবে, তাই সে অসামান্য হবে, কিন্তু সে আমাকে ধারণ করে অবস্থান করছে, তাই সে আমার মতই বালিকা স্বভাবের হবে। সর্বদা সে শিশুর মত সরল হবে, কিন্তু অসত্যের কাছে সে হবে পর্বত প্রমাণ দৃঢ়। তাই সেই সহজ সরল আমাতে ভোলা শিশুর দেখভাল করা সহজ হবেনা। আর তা ছাড়াও, তুমি আমাদের সেবা করতে চেয়েছিলে, তাই তুমি এঁর স্ত্রী হয়ে অবস্থান করে, এঁর দেখভাল করবে।

এবং বেশকিছু ঋষিপত্নী জন্মজন্ম ধরে আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছা রাখতেন। কিন্তু যেহেতু আমরা ত্রিদেবী রূপে অবস্থান করি, এবং স্বামীর অধীনে স্থিতা থাকি, তাই তাঁরা নিজেদের সেই ইচ্ছাকে অপূর্ণই রেখে দিয়ে অবস্থান করছেন। তাঁরাও যথাসময়ে দেহ ধারণ করে, আমার কন্যাস্থানীয় হয়ে, আমার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর সর্বাপেক্ষা কথা হলো, আমি যে লিঙ্গহীনা, পুরুষও আমি, স্ত্রীও আমিই, তাও প্রমাণ করার আছে আমার এই পূর্ণ অবতারের মাধ্যমে, আর তাই এঁর হৃদয়কে নারী করে রেখে, আমরা এঁর তনুকে পুরুষের করে রেখে দিয়েছি”।

দেবী ধরিত্রী মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নিজে স্ত্রীরূপ ধারণ করে অবতরণের কর্মে নিযুক্তা হলেন। অন্যদিকে মাতা ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে স্থিতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করলেন। এবং যখন শিশু ব্রহ্মসনাতনের বয়স ছয় মাস হয়, তখন সমস্ত আবেগ, কল্পনা, ইচ্ছা, অহং, নবগ্রহ, তথা ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদেব এসে এই শিশুকে নিজেদের অধিকারে নিতে সক্রিয় হলেন। কিন্তু সেই কর্ম অতি সহজ হলো না।

কল্পনা নিজের প্রসার তো করলেন, ইন্দ্রদেব অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের মনের মাধ্যমে, কিন্তু যতই কল্পনা শক্তির প্রসার হতে শুরু করে ব্রহ্মসনাতনের, তাঁর কল্পনার বিষয় হয়ে ওঠে মাতার সত্ত্বগুণী রূপই কেবল। ইচ্ছা ও চিন্তা বুদ্ধির মাধ্যমে বিস্তার করার প্রয়াস করলে, শিশু ব্রহ্মসনাতনের বিচার কেবলই তাঁর মাতাকে নিয়েই হয়।

অহং নিজের বিস্তার করতে চেষ্টা করলে, শিশু ব্রহ্মসনাতনের একটিই অহং জন্ম নেয় যে সে মাতার তেমন সেবক হবেন, যার কাছে মাতা স্বয়ং এসে নিজের মনের কথা বলবেন। ... তাঁর বিচার তাঁকে দেখায় যে সকলে মাতার কাছে এসে নিজেদের মনের ব্যাথা ব্যক্ত করেন, কিন্তু মাতা কার কাছে গিয়ে নিজের মনের বেদনা প্রকাশ করবেন! এমন বিচারের কারণে, তাঁর মধ্যে এই অহং জন্ম নেয় যে, তিনি হবেন সেই আধার, যার কাছে মাতা স্বয়ং এসে নিজের মনের বেদনা ব্যক্ত করবেন।

সেই প্রশ্নও তিনি করলেন মাতার সত্ত্বগুণীরূপের পূজারিকে, আর উত্তর এই আসে যে, 'যদি এমন চাও যে মাতা তোমার কাছে এসে নিজের মনের বেদনা ব্যক্ত করবেন, নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করবেন, নিজের চিন্তা ব্যক্ত করবেন, তাহলে, তোমাকে চিন্তাশূন্য হতে হবে , ইচ্ছামুক্ত হতে হবে'।

শিশুহৃদয়ে সেই কথা অত্যন্ত মনে ধরে, আর তাই ক্ষুদে বয়সেই সে একটি সংকল্প নিয়ে নেয় যে তাঁর কনো ইচ্ছা থাকবে না, কনো চিন্তা থাকবেনা। আর তেমন সংকল্প সেই শিশু নিলে, কপালে চিন্তার ভাঁজ পরলো দেবী চিন্তা ও দেবী ইচ্ছার। দেবী কল্পনা ও অহংও যে অত্যন্ত তৃপ্ত ছিলেন এই বালকের প্রতি, তা কখনই নয়। যেখানে সমস্ত বালক উচ্চাশার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, সেখানে এই বালক কেবলই মাতাকে নিয়ে চিন্তিত। যেখানে প্রতিটি বালকের মধ্যে তাঁদের জনকজননী এই অহং জাগাতে সক্ষম হচ্ছেন যে তাঁদেরকে বৃহৎ কিছু হতে হবে, সেখানে এই শিশু ক্রমশ ব্যকুল হয়ে যাচ্ছেন যে মাতার কাছে তিনি নিজেকে নিবেদন করবেন।

তবুও অহং বা কল্পনাকে অস্বীকার করেনি শিশু, কিন্তু চিন্তা বা ইচ্ছাকে তো অস্বীকার করা শুরু করে দিয়েছেন। তাই দেবী চিন্তা ও ইচ্ছা উপস্থিত হলেন ত্রিদেবের সন্নিকটে। দেবী ইচ্ছা ও চিন্তা ব্যাকুল হয়ে বললেন, "হে প্রভু, আপনারা আমাদের বরদান দিয়েছিলেন যে, আপনারা যেমন ভাবে অবস্থান করবেন কনো ব্রহ্মাণ্ডে, তেমন ভাবেই আমরাও অবস্থান করবো। কিন্তু একটি বালক আছে, যে ইচ্ছা ও চিন্তাকে গ্রহণ করতেই অস্বীকার করছে। এমন কি করে সম্ভব প্রভু! তবে কি আপনাদের বচন মিথ্যা হয়ে যাবে!"

বিষ্ণু বললেন, ‘‘চিন্তা করবেন না দেবীরা’’। এত বলে বরুণদেবকে স্মরণ করলেন নারায়ণ। বরুণদেব সেখানে উপস্থিত হলে, তিনি এই বালকের ব্যাপারে বিবৃতি চাইলেন। উত্তরে বরুণদেব বললেন, ‘‘এ এক অদ্ভুত বালক প্রভু। এই বালক যে কিছু বিচার করতেই চায়না! কেবলই মাতার রূপ দেখে, মাতাতেই মজে থাকে আর সে সংকল্প নিয়েছে যে সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা ত্যাগ করবে সে, যাতে মাতা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের মনের কথা বলতে পারেন’’।

মহাদেব সমস্ত কথা শুনে বললেন, ‘‘এক কাজ করো বরুণদেব। ওর বুদ্ধিকে মাতার ত্রিরূপ দর্শন করাও। ত্রিদেবীর রূপ দর্শন করে, তাকে বিচার করতে বাধ্য করো যে, এই তিনরূপের মধ্যে কাকে সে চায় যে তাঁর কাছে এসে মনের কথা বলবে। একবার সেই বিচার করতে শুরু করলে, তার মধ্যে দেবী চিন্তা, আপনি বিরাজ করবেন। আর দেবী ইচ্ছা, আপনিও ওর মধ্যে তখন বিবিধ ইচ্ছা স্থাপন করতে পারবেন, যেখানে দেবী কল্পনা আপনাদের কাজে সাহায্য করবেন’’।

মহাদেবের বিচারে সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যাবর্তন করলে, বরুণদেব মহাদেবের কথা মত, কিশোর ব্রহ্মসনাতনকে ত্রিদেবীর রূপের সম্মুখে স্থাপন করলেন। যেমন মহাদেব বলেছিলেন, তেমনই হলো, ব্রহ্মসনাতন চিন্তিত হয়ে পরলো। কিন্তু তার চিন্তা বিরূপ হলো। তাঁর চিন্তা হতে শুরু করলো যে, কেন মাতা তিনরূপ? কেন তিনি একটিই রূপ নন। তিনি যদি একটিই রূপ হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে আমার কাছে এসে তাঁর মনের কথা বলা সহজ হতো। তিন মাতা হলে, কারুর কথা আমি শুনলে, কারুর কথা তো বাদ চলেই যাবে!

এমন চিন্তা ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে আসতেই, দেবী ইচ্ছা তার মধ্যে স্থাপিত হওয়া শুরু করলেন, আর তাঁর প্রভাবে ব্রহ্মসনাতন ইচ্ছা প্রকট করলেন যে, যেন ত্রিদেবী একত্রিত হয়ে যান। ক্রমে, তাঁর ইচ্ছার সাথে কল্পনা যুক্ত হতে শুরু করে, আর তিনি মাতার সত্ত্বগুণীরূপকে দেখে দেখে, তাঁকেই ত্রিদেবী কল্পনা করা শুরু করে দিলেন।

এই বিচিত্র কল্পনার কারণে, দেবী কল্পনা, দেবী ইচ্ছা, এবং দেবী চিন্তা ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে বিরাজ তো করতে পারলেন, তবে যেহেতু মাতা ব্যতীত তাঁর কনোদিকে মন নেই, তাই ব্রহ্মসনাতনের উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করতে পারলেন না। অন্যদিকে, এই ইচ্ছা, এই চিন্তা, এবং এই কল্পনা করার পর, ব্রহ্মসনাতন নিজের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগই করে দিলেন প্রায়। বরুণদেবকে ত্যাগ করার ফলে, তাকে সকলে গর্ধব বলতে শুরু করে, বোকা ও বুদ্ধিহীন বলতে শুরু করে, কিন্তু তাতে ব্রহ্মসনাতনের কনো হুঁশ নেই। সে নিজের মাতাকে নিয়ে সর্বদা উলমালা।

ত্রিদেব বিচার করে বললেন, "বেশ, এই শহরে থাকলে, দেবীর সত্ত্বরূপের এমন বিস্তার যে, ওর হৃদয় সর্বদা দেবীতেই রমে আছে। আমরা স্বয়ং কাল। আমরা এক কাজ করছি, ওকে এই স্থান থেকে অপসারিত করছি। তখন দেখবে, ও নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে বাধ্য হবে। কিছুদিনের জন্য, দেবী ইচ্ছা, দেবী চিন্তা, দেবী কল্পনা, আর অহং, তোমরা ওর থেকে দূরে থাকো। একবার বুদ্ধিকে অর্থাৎ বরুণদেবকে ওর উপর ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে দাও। উর্জ্জা ওর মধ্যে ক্রিয়াশীল হতে শুরু করেছে, ওর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়েছে। একবার বুদ্ধিও সক্রিয় হয়ে গেলে, তারপর, তোমরা সকলে ওর উপর সম্পূর্ণ ভাবে অধিকার স্থাপন করে নেবে"।

ত্রিদেবের কথা অনুসারে, ব্রহ্মসনাতনকে শহর থেকে অপসারিত করে দেওয়া হলো, আর এমন স্থানে প্রেরণ করা হলো, যেখানে কেবল আর কেবল যন্ত্রের চর্চা হয়, আর বুদ্ধির চর্চা হয়। ত্রিদেব ভাবলেন, তাঁরা তাঁদের কর্মে সফল হয়েছেন, কিন্তু এই স্থানান্তকরন যে স্বয়ং মাতারই ইচ্ছা ছিল, তার খবর আর ত্রিদেব কি করে পাবেন! স্বয়ং নিয়তির গর্ভে কি আছে, তা যে কালের অতীত, আর ত্রিদেব যে কেবলই ত্রিকালদর্শী, নিয়তিকে তাঁরা যে জানেনও না, চেনেনও না আর তা ফলিত হবার আগে বোঝেনও না! তাই ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে এক নতুন লীলার সঞ্চার হতে শুরু করলো"।

গুহ্যলীলা

যতই কালদর্শী হও, নিয়তিকে জানা তাও সম্ভব হয়না। নিয়তি যে মহাবলবান, আর তার কাছে যে কালজ্ঞাতাও নিতান্তই শিশুসম। এই সত্যের ত্রিকালদর্শী ত্রিদেব বহুবার সম্মুখীন হলেও, সম্পূর্ণ রূপে তা বোঝেন নি, কারণ মাতা সর্বদা ত্রিদেবী রূপেই বিরাজ করতেন, এর পূর্বে কখনই তাঁর স্বরূপ, নিয়তিবেশে বিরাজ করেন নি।

কিন্তু এই প্রথম যখন তিনি সম্পূর্ণ নিয়তির অবতার ধারণ করেছেন, তা কি সামান্য কীর্তি করার জন্য! এই লীলা যে তিনি শুরুই করেছেন, এক মহামার্গ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই অবতার দেহ ধারণ করার পূর্বেই তিনি ধরিত্রীদেবীকে বলেছিলেন, একটি অন্তিম প্রয়াস তিনি করবেন, মানবযোনিকে অক্ষত রাখার। যদি তাতেও মানবযোনির মধ্যে মোক্ষচেতনা না আসে, তবে নিশ্চিত ভাবেই তিনি স্বয়ং মানবযোনির বিনাশ-অনুষ্ঠানের সমারোহ করবেন।

তাই সেই কীর্তি কি সামান্য হতে পারে! ... ব্রহ্মসনাতন মাতার অবতার, মাতা তাঁর হৃদয়ে সম্পূর্ণ নিয়তিবেশে আবির্ভূতা। এতক্ষণ তিনি কেবলই ব্রহ্মসনাতনকে তাঁর লীলা সঞ্চালিত করার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এবার তাঁর লীলা করার পালা, আর সেই লীলা করার জন্যই ব্রহ্মসনাতনকে তাঁর সত্ত্বগুণী রূপের সম্মুখ থেকে অপসারণ করা আবশ্যক ছিল, না হলে যে তিনি ব্রহ্মসনাতনের অন্তরে সম্পূর্ণ স্থানই গ্রহণ করতে পারছিলেন না! ব্রহ্মসনাতন যে সেখানে অবস্থান করলে সর্বক্ষণ তাঁর সেই রূপ নিয়েই আসক্ত, চিন্তিত, এবং কল্পনায় মত্ত থাকেন; কিন্তু তা হলে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ হৃদয়কে নিজের চরণতল করে, কি করে নিজের লীলা সম্পন্ন করবেন।

তাই ত্রিদেব ভাবলেন, তাঁরা নিজেদের মন্তব্যে সফল হয়েছেন ব্রহ্মসনাতনকে তাঁর জন্মভিটা থেকে মুক্ত করে, কিন্তু তা যে মাতারই লীলা! কারণ মাতার ইচ্ছা ব্যতীত যে একটি গাছের পাতাও আন্দোলিত হয় না! ... আগেও যখন ব্রহ্মসনাতনকে ত্রিদেবীর রূপে চিন্তিত করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন ত্রিদেব, তাও যে মাতারই লীলা ছিল, কারণ মাতা যে একত্রিত রূপ ধারণ করে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে অবস্থান করবেন এবং লীলা করবেন। ... তাই ত্রিদেব অজান্তে মাতারই লীলায় অংশগ্রহণ করতে থাকলেন, আর ভাবতে থাকলেন তাঁরা সফল হচ্ছেন,

ভাবতে থাকলেন যে তাঁরাই প্রকৃত কর্তা। কিন্তু এবার মাতার লীলার শুভারম্ভ হলো, কারণ ব্রহ্মসনাতনকে যেই অবস্থায় স্থাপন করে সেই লীলা শুরু করা যাবে, তা করা হয়ে গেছে। এবার ত্রিদেবের অবস্থা কিরূপ হলো?

ভূত পরিণয়

নতুন যান্ত্রিক ও বুদ্ধিমত্তার স্থানে উপস্থাপন করার পর, ব্রহ্মসনাতনের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াল হয়ে উঠলো। আর তা এতটাই ভয়াল হয়ে উঠলো যে সে অন্তর্মুখী হতে বাধ্য হলো। তাঁর কল্পনায় ত্রিদেবী একত্রিত একরূপ, এক রূপেরই তিন প্রকাশ। তাই সেই একাত্ম রূপ হয়েই, মাতা এক সামান্য পরমাসুন্দরী স্ত্রীরূপ ধারণ করে ব্রহ্মসনাতনের নিকটে এলেন। মাতার একত্রিত রূপকে দেখে ব্রহ্মসনাতন বিগলিত হয়ে, মাতার কাছে নিজেকে অর্পণ করতে থাকলেন, এবং মাতাকে সকলের অম্বা অর্থাৎ সর্বাম্বা নামকরণ করে, অন্তরে পূর্ণঅধিকার প্রদান করলেন।

বুদ্ধি কিছুতেই ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়কে পরিবর্তিত করতে না পেরে, এবার আক্রোশে সরাসরি ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়, অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু আক্রমণ কি করবেন, মাতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, বুদ্ধি সম্পূর্ণ হতবম্ব হয়ে গেলেন। মাতা বললেন, “ভ্রাতা বোধি! তুমি এলে শেষমেশ! ... আমি তোমার অপেক্ষায় কবে থেকে বসে আছি! আর কেবল কি আমি! আমার দিদি কবে থেকে তোমার অপেক্ষা করে বসে রয়েছেন!”

এত বলে, দেবী সর্বাম্বা ইন্দ্রদেবকে অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের মনকে ডাকতে থাকলেন, “দিদি মানসী! ... দিদি মানসী! দেখ কে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে!”

ইন্দ্রদেব দেখলেন, এই ১৮ বছরের মধ্যে প্রথমবারের জন্য ব্রহ্মসনাতনের হৃদয় তাঁকে ডেকেছে। এই তো সুযোগ তাকে বশীকরণ করার! এমন ভেবে, তিনি সবার অলক্ষ্যে দেবী মানসীর রূপ ধারণ করে, সারা দিলেন, “কে ভগিনী, কে এসেছেন!”

দেবী সর্বাম্বা সেই কথাতে সারা দিয়ে বললেন, “একবার দেখবেই এসো না, কে এসেছেন!”

মাতা সর্বাম্বার রূপ অত্যন্ত দিব্য। তাঁর অঙ্গের বর্ণ গোলাপি, নিষ্কলঙ্ক রূপ, পদ্মের ন্যায় ন্যাত্র, তাতে নীলাভ বর্ণের নয়নমণি বাদামী পটভূমি ধারণ করে অবস্থান করে। জবাকুসুম বর্ণের ওষ্ঠ তাঁর, স্নেহময় থুতনি ও সুন্দরী দেখানোর জন্য কপোল যতটা উন্নত দেখানো দরকার, ততটাই তা উন্নত। মুখআকৃতি তাম্বূলপত্রের ন্যায় নিটোল, এবং দেহগঠন সুদীর্ঘ, তবে ততটাই যতটা হলে, তাঁর পরনের শাড়ী তাঁকে পরমাসুন্দরী করে প্রকাশিত করে। নিতম্ব তাঁর মানানসই, মাতৃরূপ বিশিষ্টা; স্তনদেশ তাঁর উন্নত, তা সুআকৃতি যুক্তা, এবং শালীনতা পূর্ণরূপে সেখানে স্থাপিতা। কটিদেশ তাঁর পাহাড়ের চটির ন্যায় বিস্তৃতা, আর তাঁর ঊর্ধ্বে নাভি দেশ যেন বিস্তৃত নির্মল তুষারমরুর মধ্যে মরূদ্যানের মত শোভিতা। পৃষ্ঠদেশ ও হস্তদ্বয়, এবং দেহের অন্যসমস্ত অঙ্গ, যা শাড়ীর আচ্ছাদনের থেকে মুক্ত, তা যেন মসৃণ পলিমাটির দ্বারা নির্মিত, এমনই দেখায়, তবে তার বর্ণ পূর্ণ প্রকাশিত গোলাপের ন্যায়।

এই সমস্ত রূপ একত্রিত করে, দেবী সর্বাম্বাকে পরমাসুন্দরী বললেও যেন কম বলা হয়, তবে তাঁর সমস্ত রূপ এমনই এক যত্নহীন মার্জিত ও শালীন ভাবযুক্ত যে তাঁকে দেখা মাত্রই বোধির মধ্যে এক সম্ভ্রমের উদয় হয়। একই সম্ভ্রম দেবী মানসীর মধ্যেও প্রকাশ পায়, দেবী সর্বাম্বাকে প্রথমবার দর্শন করে। তবে দেবী মানসী, যিনি প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রদেব, তাঁকে দেখে বোধির মধ্যে তীব্র কামনা সঞ্চারিত হয়।

অঙ্গের বর্ণ মরুর বালুকার ন্যায়; সুন্দরী মুখশ্রী, আর তা সুন্দর সুন্দর আভূসনে আবৃত হওয়ায় দেবী সর্বাম্বার থেকেও তাকে অধিক আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল। উন্নত ও রমণীয় স্তনদেশ, কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ, নাভিদেশ ও নিতম্ব, বোধিকে এমনই ভাবে কামাক্রান্ত করলো যে, তার সেই স্থানে দণ্ডায়মান থেকেই, বীর্যপাত হয়ে গেল। বোধি যে আসলে বুদ্ধি অর্থাৎ বরুণদেব, তা দেবী মানসীরও অজ্ঞাত ছিল। তাই বোধির সুঠাম ও বীর্যপূর্ণ দেহগঠন তাঁকেও কামাবেগে আবিষ্ট করে দেয়। আসলে মহামায়ার মায়া এমনই যে, বোধি ও মানসী একে অপরের প্রতি এতটাই

তীব্র ভাবে আকৃষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা নিজেদের প্রকৃত ভূতপরিচয়ই হারিয়ে ফেলে স্মৃতির প্রেক্ষাপট থেকে।

কিন্তু বোধি যখন নিজের অযাচিত বীর্যপাতকে অনুভব করলেন, তখন দেবী সর্বাম্বা ও দেবী মানসীর উপস্থিতির কথা স্মরণ করে, অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন, এবং সেখান থেকে প্রাণপণে পলায়ন করতে শুরু করলেন। দেবী মানসীও বোধির প্রতি তীব্রভাবে কামাসক্ত হয়ে গেছিলেন। তাই তাঁর এইরূপ পলায়ন তাঁর রমণীয়তাকে প্রশ্নচিহ্নে ভূষিত করার অপমানে, ও বোধির প্রতি তীব্র আকর্ষণের কারণে, তিনিও বোধির পশ্চাৎধাবন করলেন।

দেবী সর্বাম্বা নিরুত্তাপ হয়ে সেখানে দণ্ডায়মান রইলেন। এবং বোধিমানসীর প্রণয়লীলাকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে থাকলেন। অন্যদিকে বোধি বহুদূর গমন করলেও, দেবী মানসী সমানে তাঁর উদ্দেশ্যে আবাহন করতে থাকলেন প্রাণপণে, আর বলতে থাকলেন, “শুনছেন! আপনি আমাকে ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছেন! যদি ছেড়েই যাবেন, তবে আমার মধ্যে কামনার সঞ্চার কেন করলেন!”

এমন কথা বিবিধবার শুনে, বোধির মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়। এবং সে একস্থানে দাঁড়িয়ে যায়, এই নির্ভয়ে যে সেখানে একাকী দেবী মানসী এসেছেন, দেবী সর্বাম্বা উনার সাথে নেই। দেবী সর্বাম্বার সম্মুখে স্থিত থাকলে, তাঁর মধ্যে কামনা জন্ম নিলেও, সেই কামনা যেন তাঁর নিজের কাছেই অভিশাপের মত ধারণা হয়। এখানে তিনি নেই, তাই তাঁর কামনাও যেন স্বতন্ত্র, যেন সেই অভিশাপ বরদানে পরিণত। দেবী মানসী তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালে, বহুক্ষণ দ্রুতবেগে চলার জন্য, হাঁটুর উপর দুটি কর স্থাপন করে, দেহকে ঈষৎ সম্মুখে অগ্রসর করে, হাঁপাতে থাকলেন দেবী মানসী।

এমন অবস্থায়, দেবী মানসীর তনুগঠন যেন অধিক রমণীয় হয়ে উঠেছে, যেন তাঁর অঙ্গের রমণঅভিব্যক্তি নিজের সর্বোত্তম ভাব ব্যক্ত করতে চাইছে। এমন অনুভব করে, বোধির তনুমন পুনরায় তীব্র কামনায় আক্রান্ত হলো, আর তা এমনই সুতীব্র গতি ধারণ করলো যে, বোধি আর

নিজের তনুকে সম্মুখের দিকে হেলাতেও পারলো না। নিজের পিছনেই থাকা একটি বৃক্ষতে নিজের পৃষ্ঠদেশকে স্থাপন করে, ক্রমশ নিজের কামনাকে অনিয়ন্ত্রিত হতে দেখলেন বোধি।

বোধি এমন ভাবে নিজের তনু এলিয়ে দিলে, তাঁর বীর্যবান দেহ যেন উন্মুক্ত হয়ে গেল দেবী মানসীর নিকট, আর তা দেবী মানসীর কামনাকেও উগ্রতার আস্ফালনে ভূষিত করে দিল। এতপরে নিজেকে না তো সংযত রাখতে চাইলেন দেবী মানসী, আর না পারলেন সংযত রাখতে। নিজের রমণীয়তনুকে বোধির বীর্যবান লোমাবৃত বপুস্থলে স্থাপন করলেন। বোধিও নিজের কামনার অগ্নিতে ঘৃত লাভ করে, সেই ঘৃতকে আত্মসাৎ করে নিতে উদ্যত হলেন, আর শীঘ্রই বোধিমানসীর পরস্পরের প্রতি কামনা তাঁদের ভিন্নতনু থেকে একটি তনুতে পরিণত করে দিলে, তাঁরা গভীর সঙ্গমে আবদ্ধ হলেন।

দীর্ঘকাল সঙ্গমে আবদ্ধ হয়ে, বোধিমানসী তাৎক্ষনিক ভাবে তৃপ্ত হলেও, যেন তাঁরা অতৃপ্তই রয়ে গেলেন, এবং পুনঃপুন একে অপরকে আস্বাদন করায় রুচিশীল রইলেন। কিন্তু সেই তাৎক্ষনিক তৃপ্তির অবকাশে, দেবী সর্বাম্বা সেই সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে যেতে থাকলেন, "দিদি! ... দিদি মানসী! ... ভ্রাতা ! ভ্রাতা বোধি!" এমন আস্ফালন করতে করতে। স্বেদপরিপূর্ণ ও সঙ্গমতৃপ্ত ও পুনঃসঙ্গম অভিলাষী দেবী মানসী ও বোধি তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভগিনীর আগমন সম্ভাবনা অনুধাবন করে, নিজেদের পুনরায় বস্ত্রে আবৃত করতে থাকলে, সেখানে দেবী সর্বাম্বার উদয় হয়।

যেন কি হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ না করলেও, তার সম্পূর্ণ ধারণা করে ফেলে লজ্জিত হয়েছেন, এমন ভাব দেখিয়ে, দেবী সর্বাম্বা তাঁদের উদ্দেশ্যে ওষ্ঠদেশে কর থাপন করে অর্ধেক প্রত্যক্ষ এবং অর্ধেক পরোক্ষ হাস্য প্রদান করলে, দেবী মানসী ও বোধি উভয়েই লজ্জিত হয়ে, নিজের নিজের বস্ত্র ঠিক ভাবে অঙ্গে ধারণ করেছেন কিনা, সেই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকলেন।

সেই দেখে দেবী সর্বাম্বা মায়াবী স্বরে বললেন, “থাক থাক, হয়েছে। আমিও নাবালিকা নই। ভালোই বুঝি তোমাদের পারস্পরিক রসায়ন। ... এবার চলো দিদি! ... একবার মা আর বাবার কাছে গিয়ে তোমাদের প্রণয়ের সংবাদ দেবেনা! ... তোমাদের নেত্রের ভাষা তো স্পষ্ট বলছে, তোমরা কেবলই ক্ষণিকের জন্য তৃপ্ত হয়েছ, আগামীদিনে তোমরা সেই তৃপ্তিকে সর্বাত্মক করে নিতে সার্বিক ভাবে আগ্রহী। তা, তোমরা কি কেবলই সঙ্গমে তৃপ্ত, নাকি সঙ্গমের ফল যা লাভ হবে, তাকেও দুইজন একাত্ম ভাবেই লালন ও পালনে রুচি রাখো!”

দেবী মানসী সেই কথাতে লজ্জিত হয়ে গেলে, বোধি সাহস করে বললেন, “যদি মিলনের ফলকেই গ্রহণ না করি, তাহলে যে আমাদের মিলনই অপরিপূর্ণ থেকে যাবে ভগিনী! ... সেই ফলকে আমরা দুইজন মিলে লালন ও পালন করলে, তবেই না তাঁরা আমাদের নেত্রে আমাদের একে অপরের প্রতি প্রীতিকে দেখে, প্রীতিপরায়ণ হবে, তাই না!”

দেবী সর্বাম্বা শিশুর ন্যায় হাস্য প্রদান করে বললেন, “তাহলে তো সেই কথা আমাদের পিতামাতার সম্মুখেও বলতে হয় ভ্রাতা! ... তা নাহলে, তোমরা যে আর পুনঃপ্রণয়ের সুযোগ লাভই করবেনা! ... তা চলো, আমাদের পিতামাতার কাছে এসো!”

দেবী মানসী এই কথাতে একটু চমকেই গেলেন, এই ভেবে যে তাঁর পিতামাতা কে! তিনি তো তাঁদেরকে চেনেনই না! তবে বোধির সেই বোধ নেই। তাই অবিচল থেকেই দেবী সর্বাম্বার পশ্চাতে দেবী মানসীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দেবী সর্বাম্বা তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, “এসো তোমরা, আমি বরং ততক্ষণে পিতামাতাকে গিয়ে তোমাদের প্রণয়বার্তা প্রদান করি। ... আর হ্যাঁ, এই ভাবে তোমরা এসো না! নিজেদের অঙ্গের স্বেদকে সম্পূর্ণ ভাবে মুছে এসো। স্মরণ রেখো, তাঁদের প্রণয়ের ফল আমরা, তাই তোমাদের এই অবস্থায় দেখলে, তাঁরা সহজেই বুঝে যাবেন যে তোমাদের প্রণয়পর্ব তাঁদের অজ্ঞাতেই শুভারম্ভ হয়ে গেছে!” এই কথা বলে সলাজে হাস্যপ্রদান করে, দেবী সর্বাম্বা শিশুর চালে ছুটে অরণ্যের বাইরে চলে এলেন।

আর সেখানে এসে “পিতা! ... মহাশয় হুতাশন!” ডাকে অগ্নিদেবকে আবাহন করলেন; এবং “মাতা! ... দেবী দখিনা!” ডাকে পবনদেবকে আবাহন করলেন। মাতার ডাক কেই বা অদেখা করতে পারে! ... তাঁর ডাক যে মাতার ডাক, সেই বোধটুকুও হয়নি পবনদেব ও অগ্নিদেবের, অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের প্রাণ ও উর্জ্জার, কিন্তু মাতার ডাকের মধ্যে যেই সাবলীলতা, যেই অকথ্য ও অবর্ণনীয় বিশ্বাস, স্নেহ ও প্রীতির সুর মিশ্রিত থাকে, তাকে অদেখা করা বোধ করা যায় যে সম্ভবই নয়।

পার্বতীর এক ডাকে, শিব বিরক্তি ত্যাগ করে বৈরাগী হয়েছিলেন, শ্রীর এক ডাকে নারায়ণ সমুদ্রমন্থন অনুষ্ঠিত করেছিলেন, এক বীণাপাণির বীণার সুরে ব্রহ্মা চতুরানন হয়েছিলেন! এতো তিন মাতার একত্রিত আবাহন! তাঁর ডাকে আপ্লুত হবেন না, এমন কেই বা সম্ভব! ... তাঁর ডাককে তাঁর ডাক বলে চিহ্নিত না করতে পেরেও, কেবলই এক অজানা অভিলাষ যে, এই কণ্ঠস্বর যেই বালিকার, তার পিতামাতা হবো, সেই অভিলাষই অগ্নিদেবকে দেবী সর্বাম্বার পিতা করে দিলেন, আর পবনদেবকে সর্বাম্বার মাতা।

তাঁরা সম্মুখে এসেছিলেন এক বাৎসল্যতার অনুভবে। আর সম্মুখে এসে যখন এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী নারীর মাতাপিতা রূপে নিজেদের দেখলেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলেও গেলেন যে তাঁদের নিজেদের কনোদিন প্রণয়ও হয়নি, আর তাঁদের উভয়ের কনো সন্তানও লাভ হয়নি। এক অজ্ঞাত মায়া যেন তাঁদেরকে বেষ্টন করে নিলো আর বলতে থাকলো, “ধন্য হয়ে গেছি, এমন কন্যার পিতামাতা হয়ে!”

তাঁরা সবিনয়ে বললেন, “কি হয়ছে মা! ... এমন ভাবে ডাকছিস কেন?”

দেবী সর্বাম্বা হাস্যবিনিময় করে বললেন, “এমন ভাবে কি দেখছো মা আমাকে! আমি তোমাদের সর্বা গো, তোমাদের প্রাণের প্রিয় কনিষ্ঠ কন্যা সর্বা!”

দেবী দখিনা, কন্যার মুখে মা নাম শুনে আপ্লুত হয়ে উঠলেন, আর হুতাশন চিন্তন করতে থাকলেন, “কনিষ্ঠ কন্যা, তারমানে আমাদের আরো এক কন্যা আছে!” ... মায়া হয়েও যেন

যথার্থ! আর সেই কারণেই তো মাতা হলেন মহামায়া! ... যেখানে তিনি, সেখানে সমস্তই যথার্থ, মায়া হলেও, মাতার সাখ্যাতে তাকে মায়া বলে কি করে মনে হতে পারে!... তিনি তো নিরাকারা, কিন্তু যখন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাঁর সম্মুখে সাকার বেশে অবতীর্ণ হন, তখন ভক্তের কোথায় স্মরণ থাকে যে, এই যে সাকার রূপ, তা মায়া!

তেমনই দেবী দখিনা ও তাঁর স্বামী, হুতাশন সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গেলেন যে, তাঁরা না তো বিবাহ করেছেন, আর না কনো সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। উপরন্তু এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পিতামাতা হবার জন্য গর্ব অনুভব করতে থাকলেন, আর মনে মনেই ধারণা করতে থাকলেন, আমাদের জ্যেষ্ঠ কন্যাও না কতই সুন্দরী হবে!

দেবী সর্বাম্বা, এবার দেবী দখিনার সম্মুখে এসে, তাঁর হাত ধরে, শিশুর মত আবর্তন করতে থাকলেন, আর বললেন, "জানো মা! আজ তোমাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রণয়ে যুক্তা হয়েছেন! ... তিনি তাঁর প্রণয়সঙ্গীকে নিয়ে এলেন বলে! ... তাঁরা একে অপরকে পরিণয় করতে চান, সন্তানের জন্ম দিতে চান, এবং সন্তানের লালনপালন করতে চান! ... মা, তুমি দিদিমা হতে চলেছ! ... তোমার নাতিনাতনি হতে চলেছে!"

দেবী দখিনা যেন স্বেচ্ছায় সমস্ত কিছু ভুলতে চাইলেন যে, তিনি স্ত্রী নন, তিনি মাতা নন, তিনি বিবাহিতা নন। যেন সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে, এই সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা, যার পরিচয় তিনি এটুকুই জানেন যে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয় সে, তাঁকে নিয়ে উলমালা থাকতে চাইলেন। হুতাশনেরও একই ভাব। এরই মধ্যে যখন কামনায় ও প্রণয়সুখে আপ্লুত দেবী মানসী বোধিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন সেই স্থানে, তখন যেন সুখী পরিবার নিয়ে উলমালা হয়ে গেলেন হুতাশন ও দখিনা। বোধি যে আসলে ব্রহ্মসনাতনের বুদ্ধি এবং মানসী যে তাঁরই মন, অর্থাৎ বরুণদেব ও ইন্দ্র, তা তাঁরা জানলেনও না, আর জানার প্রয়াসও করলেন না। তাঁদের কাছে মানসী এখন কেবলই তাঁদের কন্যা, এবং বোধি তাঁদের জামাতা, ও তাঁরা তাঁদেরকে দাদুদিদিমা হবার সুখ প্রদান করতে চলেছেন।

একেই বোধহয় বলে মহামায়ার মায়া। তাঁর মায়ার জেরে, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অগ্নি, সকলেই মায়ামত্ত হয়ে গেলেন, এবং দেবী সর্বাম্বাকে লাভ করে সকলে ধন্য হয়ে গেছেন, এমন মনোভাব নিয়ে একত্রে নিবাস করতে শুরু করলেন। দেবী মানসী একদিকে যেমন পিতামাতা রূপে অগ্নি ও পবনের প্রেম লাভ করতে থাকলেন, তেমনই তাঁর প্রাণনাথ, বোধির দেহগন্ধে সদাউন্মত্ত রইলেন। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর থেকেও অধিক আকর্ষণীয় তাঁর কাছে হতে থাকলো, তাঁর ঐকান্তিক ভাবে প্রিয়, তাঁর ভগিনী সর্বাম্বার সঙ্গ।

তিনি সকলের আদরের সর্বা। বোধিরও আদরের ভগিনী তিনি; মানসীর যেন প্রাণই তিনি; আর দখিনা হুতাশনের নয়নের মণি তিনি। তাঁর মধুর কণ্ঠধ্বনি, তাঁর অপরিসীম স্বাভাবিকভাবেই মার্জিত চালচলন, এবং তাঁর সরল শিশুর ন্যায় আচরণ, সমস্ত কিছুই যেন তাঁর পরমাত্মীয় দিব্যভাব আর সেই দিব্যভাব যেন সকলকে মুখরিত করে রাখতে থাকলো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, যতই দিনযাপন হতে থাকলো, আর মানসী বোধি একে অপরে আসক্ত হতে শুরু করলো, এবং দখিনা হুতাশন, তাঁর দুই কন্যায় মোহগ্রস্ত হয়ে উঠলো, তত তাঁরা ভুলেই গেলেন যে সর্বাম্বা ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়; তাঁদের কাছে সর্বাম্বা তাঁদের সর্বাধিক প্রিয়জন; তাঁদের সর্বস্বকিছু হয়ে উঠলো সর্বাম্বা, তাঁদের সর্বা।

আর অন্যদিকে, চারভূতের যে এই পরিণতি হয়েছে, তা সকলের কাছেই রইল অজানা। যেখানে স্বয়ং নিয়তি নিজহস্তে কিছু কাজ সম্পন্ন করছেন, সেখানে সেই কাজের সংবাদ কার কাছেই বা থাকতে পারে! স্বয়ং ত্রিদেবও ভূতদের এই পরিণতি সম্বন্ধে অনবগতই রইলেন, আর কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা, অহং সহ সকল আবেগ ও তাঁদের সন্তানরাও এই ভূতদের পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞাতই রইলেন।

কিন্তু এই অজ্ঞাত থাকা, তাঁদের স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়নি। বরং তাঁদের সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ আছে যে, বরুণদেব ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়কে আক্রমণ করতে গেছিলেন, কিন্তু আর ফেরেননি সেখান থেকে। সেই স্মৃতিকে নিয়েই সমস্ত অসুরকুল, অর্থাৎ অহং, তাঁর স্ত্রীরা এবং আবেগরা উপস্থিত হলেন ত্রিদেবের নিকটে।

একাত্মত্রি

ত্রিদেবের সম্মুখে সমস্ত আবেগদের একত্রিত ভাবে উপস্থিত করে, সমস্ত অসুরলোকের অধীশ্বরী, তাঁদের মহারানী, দেবী কল্পনা বললেন, "প্রভু, এ আমাদের সাথে কেমন অবিচার হচ্ছে! ... আপনারা এবার স্বয়ং হস্তক্ষেপ করুন, নাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের অতিতে চলে যাবে"।

নারায়ণ মৃদু হেসে বললেন, 'কি হয়েছে, সেটা তো বলো কল্পনা! ... তোমাকে এতটা ব্যকুল কেন দেখাচ্ছে!"

দেবী কল্পনা রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "প্রভু, আপনারা বচন দিয়েছিলেন যে সমস্ত ভূতদের সাথে আমার আবেগসন্তানগণ সদা যুক্ত থাকবে, কিন্তু সেই ভূতদেরই আজ সন্ধান মিলছে না! ... আমরা কার আশ্রয়ে থাকবো তাহলে প্রভু! ... আবেগরা ব্রহ্মসনাতনকে সামান্যভাবেও স্পর্শ করতে পারছেনা! আর তারফলে ব্রহ্মসনাতন আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে, একটি মাত্র জীব হয়ে উঠেছে, যে সমস্ত আবেগশূন্য হয়ে বিরাজমান! প্রভু এমন যদি চলতে থাকে, তাহলে চিন্তা কেবল আমাদের নয়, আপনাদের জন্যও তা অতিকায় চিন্তার বিষয় হয়ে যাবে! ভুলে যাবেন না প্রভু, আমাদের প্রভাবেই আপনারা সমস্ত জীবের কাছে অধীশ্বর।

তাই আমরা যদি কারুর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে অক্ষম হই, তাহলে আপনারাও তাঁর উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে অক্ষম হয়ে যাবেন, আর সেই ক্ষেত্রে, আপনারা আর ভগবানের পদমর্যাদায় স্থাপিত থাকবেন না। আপনারা ভগবানের আসনে স্থাপিত কারণ আপনারা পঞ্চভূতদের নিজেদের বশে রাখেন। যদি আপনাদের অধিকার থেকে পঞ্চভূতকে কেউ অপসরণ করে নেয়, তাহলে আপনারা কি করে আর ভগবান থাকবেন প্রভু! ... তাই কৃপা করে, আমাদের হিতের জন্য নয়, আপনারা অন্তত নিজেদেরকে ভগবান আখ্যায় ভূষিত রাখার উদ্দেশ্যে ভূতদের সন্ধান করুন, এবং তাঁদের মাধ্যমে এই অবাধ্য মানব ব্রহ্মসনাতনকে আমাদের বশে আনতে সাহায্য করুন"।

ব্রহ্মদেব বললেন, “বরুণদেব তো আগ্রাসী হয়ে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়কে আক্রমণ করতে গেছিলেন, তাই না! ... মাতার চিন্তা করে করে, ব্রহ্মসনাতনের হৃদয় শক্তিশালী হয়ে গেছে। তাই দেখগে যাও, সেখানেই হয়তো বরুণদেব এখনও রয়েছেন। হয়তো নিজের গাণ্ডিব ধারণ করে, মহাবিক্রমে এখনো তিনি যুদ্ধে রত”।

দেবী চিন্তা বললেন, “না প্রভু! আমরা সেখানে সর্পের রূপ ধরে প্রবেশ করেছিলাম, কারণ অন্য কনো বেশে সেখানে প্রবেশই করতে পারছিলাম না। কিন্তু সেখানে কনো যুদ্ধ হচ্ছে না। সেখানে কিছুজন মহানন্দে নিবাস করছে; দুটি মানবমানবি সদাসঙ্গমে লিপ্ত , দুটি মানবমানবি সদা সন্তানসুখে তৃপ্ত, আর একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী, সর্বদা এঁদের সকলকে আনন্দে মজিয়ে রেখেছেন। ... কনো যুদ্ধ নেই সেখানে, আর না দেখা পেলাম বরুণদেব, ইন্দ্রদেব, পবনদেব বা অগ্নিদেবের! ... আমরা সমস্ত কিছু দেখে যখন কনো কিছু নিরীক্ষণ করতে পারলাম না, তখনই আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি”।

মহাদেব বললেন, “এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে, এমন কনো কাল হতে পারেনা, যা আমাদের দৃষ্টির বাইরে স্থিত, এমন কনো স্থান হতে পারেনা, যা আমাদের গমনের অতীত, আর এমন কনো পাত্র থাকতে পারেনা, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের থেকে মুক্ত। দাঁড়াও, আমি ত্রিকাল দর্শন করে বলে দিচ্ছি বরুণদেব কি কি করলেন আর এখন কোথায় আছেন, আর কি করছেন”। ...

এতবলে, মহাদেব নিজের নেত্রবন্ধ করে, তৃতীয়নেত্রকে সক্রিয় করে, বরুণদেবকে সন্ধান করতে থাকলেন। বিস্তর সময় ধরে তিনি বারংবার দেখেন, অথচ কিছুই নিরীক্ষণ না করতে পেরে, তিনি নিজের নেত্রযুগল উন্মুক্ত করলেন, আর উচাটন হয়ে বললেন, “নারায়ণ, এ কি করে সম্ভব! ... বরুণদেব ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে প্রবেশ তো করলেন, কিন্তু সেখান থেকে নির্গত হলেন না! ... আর আমার ত্রিকালদর্শন ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে প্রবেশই করতে পারলো না! ... তাই পরবর্তীতে কি হলো, কিছু দেখতেই পেলাম না!”

নারায়ণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "সমস্যা অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হচ্ছে মহাদেব। চলুন, আমরা তিনজন ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে প্রবেশ করি আর বরুণদেবকে উদ্ধার করে আনি। আমি নিশ্চিত, সেখানে প্রবেশের পরে, বরুণদেবের কনো বিপদ হয়েছে, আর যেমন আমরা সেখানে নিজেদের দৃষ্টি রাখতে পারছিনা, তেমন ভাবেই বরুণদেব আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছেন না!"

ব্রহ্মদেব চিন্তিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু এমন কি জাদু জানে অই আহাম্মক ব্রহ্মসনাতন! ... এমন তো কনো জাদুই সম্ভব নয়, যা আমাদের ধারণার অতীত! আমাদেরকে ধারণ করেই তো সমস্ত জাদুশক্তির আবির্ভাব! তাহলে, এ কি শক্তি, যার হদিশই আমরা পাচ্ছিনা! ... না! নারায়ণ ঠিক বলছেন, মহাদেব, আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে। হতে পারে সেই শক্তি এখন নবীন অবস্থায় অবস্থান করছে, আর তাকে আমরা শীঘ্রই বিনষ্ট করতে সক্ষম হবো। আর এমনও হতে পারে যে, কিছুকাল অপেক্ষা করলে, সেই শক্তি আমাদের সম্মুখে এক মহাদানবের রূপ ধরে অবস্থান করবে। ত্রিদেবীও নেই, তাই আদিশক্তি বা অষ্টলক্ষ্মী যে আমাদের উদ্ধার করবেন, বা মহাশ্বেতা যে আমাদেরকে উদ্ধারের মার্গ বলে দেবেন, তাও সম্ভব হবেনা। তাই আমাদেরকে শীঘ্রই সেই শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে, তার নাশ করতে হবে"।

মহাদেব বললেন, "যথার্থ বলেছেন ব্রহ্মদেব, চলুন নারায়ণ, আমরা তিনজনেই সেখানে গমন করি, আর সেই অশুভ শক্তির নাশ করে আসি"।

নারায়ণ এবার দেবী কল্পনার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমরা যতক্ষণ না ফিরে আসি, দেবী কল্পনা, আপনি অস্থির হবেন না। ... আর যদি দেখেন যে সুদীর্ঘকাল হয়ে গেছে, তবুও আমরা ফিরিনি, তবে আপনারাও অত্যন্ত সতর্ক হয়ে যাবেন"।

এতবলে, ত্রিদেব একত্রে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়দেশে যাত্রা করলেন। ... হৃদয় দেশে প্রবেশ করা মাত্র, গহন বনে প্রবেশ করে গেলেন যেন ত্রিদেব। তাঁদের নিজেদের জ্যোতিই কেবল সেই স্থানের একমাত্র আলোক। আর তাই দেখে ব্রহ্মদেব বললেন, "এহেন ঘন বন তো দারুকার বনও ছিলনা মহাদেব! ... আপনি কখনো এর আগে এমন গহন বন দেখেছেন!"

মহাদেব চিন্তিত হয়ে বললেন, “একটি জিনিস লক্ষ্য করেছেন ব্রহ্মদেব, আমাদের তিনজনের মিলিত উর্জ্জার আলোকও যেন এই বনের কাছে অত্যন্ত সামান্য বোধ হচ্ছে!”

নারায়ণ চিন্তিত হয়ে বললেন, “তার থেকেও চিন্তার বিষয় এই মহাদেব যে, যতই আমরা বনের অন্দরে প্রবেশ করছি, ততই যেন আমাদের উর্জ্জা সীমিত হয়ে যাচ্ছে! যেন মনে হচ্ছে, কনো এক গহন অন্ধকারে আমরা হারিয়ে যাচ্ছি সমানে!”

এমন বার্তালাপ করতে করতে বহুদিন যাবত ত্রিদেব যাত্রা করার পর, নিজেদের মধ্যে কথা বললেন আরো সন্তর্পণে, আরো গহন চিন্তাযুক্ত হয়ে। নারায়ণ বললেন, “মহাদেব, ব্রহ্মদেব, আমাদের উর্জ্জাজ্যোতি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে থাকলে, আমাদের নিজেদেরকে গহন বনের মধ্যে তিনটি জোনাকি মনে হচ্ছে! আমরা যে কনো পথই আর নিরীক্ষণ করতে পারছিনা! ... আমার মনে হয়, আমাদের একত্রিত হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা একত্রিত হয়ে গেলে, আমাদের জ্যোতি আরো অনেকগুণ প্রসারিত হবে। তাহলে আমরা সম্মুখে পথ দেখতে পাবো”।

ব্রহ্মদেব বললেন, “নারায়ণ ঠিক বলেছেন মহাদেব, আমাদেরকে এবার একাত্ম হতেই হবে, নাহলে আমরা সম্মুখের পথ দেখতে পাচ্ছিনা”। এই জল্পনা করে, ত্রিদেব একত্রিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁদের মিলিত উর্জ্জার প্রকাশও তাঁদেরকে সীমিত পথই প্রদর্শন করায়। আর একটা সময় পরে, তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে গহন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন, এবং দশদিশায় তাঁরা কনো পথ দেখতে পেলেন না; কেবলই গহন অন্ধকার; যেন কনো কিছুরই কনো অস্তিত্ব নেই কনো দিশায়!

পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে, তাঁরা যে কতকাল ইতস্তত্ব ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন না। অন্যদিকে ত্রিদেব বহুকালের জন্য অনুপস্থিত হয়ে গেলে, দেবী কল্পনা, অহং, তথা অহংএর অন্য স্ত্রীরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। আবেগরাও চিন্তিত হয়ে উঠলে, অহংএর তিন পুত্র, বলদম্ভ, উপপতি এবং আবর্ত অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। উপপতি তাঁদের মাতাদের কাছে এসে বললেন, “চিন্তিত কেন হচ্ছেন মাতা! ... যা হয়েছে, তা তো আমাদের জন্য এক মহাবরদানের

থেকে কনো অংশে কম নয়! ... ত্রিদেব আপনাদের অস্তিত্বের অভয়দান করেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁদের কাছে পরাধীন ছিলেন। আজ যখন তাঁরা অবলুপ্ত হয়েছেন, তখন আপনারাই হলেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আমরা তিন ভ্রাতাই ত্রিদেব হয়ে অবস্থান করবো এবার”।

বলদম্ভ বললেন, “কিন্তু এই ভাবে নয়! আমাদের কনো পত্নীও তো থাকা দরকার! ... কনো সুন্দরী যদি আমাদের পালঙ্ককে উত্তপ্ত না করে, তবে ত্রিদেব হয়েই বা আনন্দ কোথায়? চলো আমরা কনো সুন্দরীকে বিবাহ করে আসি”।

আবর্ত সেখানে ছিলেন না তখন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি এসে উপস্থিত হলেন দেবী কল্পনার সম্মুখে, আর বললেন, “মহারানী! আপনার নির্দেশে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলাম আমি। আর সেখানে অন্য কিছু দেখি বা না দেখি, একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রী দেখলাম। দেখে মনে হলো, তাঁকে না পেলে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লাভ করে ফেললেও, কনো শান্তি নেই। মাতা, হতে পারে, সেই স্ত্রীকেই সকলে অন্বেষণ করতে যাচ্ছেন ... মানে ভূতরা আর ত্রিদেবও, আর তাঁর মোহেই আবদ্ধ হয়ে গিয়ে, তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলছেন”।

বলদম্ভ হুংকার দিয়ে বললেন, “হতে পারে, ভূতরা পথ হারিয়েছে, হতে পারে ত্রিদেব পথ হারিয়েছে, কিন্তু আমরা পথ হারাবো না। আমাদের তো একমাত্র ত্রিদেবীর একাত্ম অবস্থায় জন্মদেওয়া সন্তানই দমন করতে সক্ষম। তাই আমাদের কারুকে ভয় নেই। ত্রিদেবী কনোদিনও একাত্ম হবেন না, আর তাঁদের কনোদিনই সন্তান হবেনা। আর তাই আমরা হলাম সর্বশক্তিমান; আমরাই হলাম, এই ত্রিভুবনের ত্রিদেব”।

দেবী কল্পনা উগ্র হয়ে বললেন, “মূর্খের মত কথা বলো না বলদম্ভ। যেখানে ভূতরা পথ হারিয়ে ফেলছেন, যেখানে ত্রিদেব পথ হারিয়ে ফেলছেন, তুমি কি ভেবেছ, তোমরা সেখানে গিয়ে পথ না হারয়ে ফিরে আসবে!”

উপপতি ব্যঙ্গাত্মক হাস্য হেসে বললেন, “কিন্তু মহারানী, তেমনই তো হলো! দেখুন, ফল তো আপনার সম্মুখে প্রত্যক্ষ। ... আবর্ত তো সেখানে গেছিল, সেই স্ত্রীকে দেখেওছে, তাঁকে লাভ

করার কামনাও করেছে, কিন্তু তাও সে প্রত্যাবর্তন করে ফিরে এসেছে! এর অর্থ তো তাই হলো যা ভ্রাতা বলদম্ভ বললেন, তাই না! ... আমরা অজেয়, ত্রিদেবকেও বশীকরণ করা সম্ভব, পথভ্রষ্ট করা সম্ভব, কিন্তু আমাদেরকে নয়। ... আমার মতে, মাতা, আমাদের তিনজনের সেখানে যাওয়া উচিত, আর সেই স্ত্রীকে আমাদের করে নেওয়া আবশ্যক, যাকে সকলেই বশে স্থাপিত করতে চেয়ে, অবশ হয়ে গেছে। ... একবার যদি আমরা তাঁকে বশ করে নিতে সক্ষম হই, তাহলে ত্রিদেব যদি প্রত্যাবর্তন করেনও, তাও আমাদেরকেই ত্রিদেব করে রেখে দেবেন, কারণ আমরা তাঁদের থেকেও অধিক যোগ্য সেই পদের জন্য"।

আবর্তও উপপতির সাথে সুরমিলিয়ে বললেন, "ভ্রাতা সঠিকই বলেছেন মাতা। আমাদের সেঝানে গিয়ে, সেই স্ত্রীর উপর নিজেদের অধিকার স্থাপন করে আসাই হলো আমাদের জন্য আবশ্যক কর্ম"।

মহারাজ অহং উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্ররা, তবে এই কর্মে তোমরা একাকী যাবেনা। আমি স্বয়ং আমার সাথে সম্পূর্ণ আবেগ সেনাকে নিয়ে যাত্রা করবো। ... পুত্ররা, ত্রিদেবের বরদান আছে আমাদের সাথে, আমি স্বয়ং ত্রিদেবের সাথে একাকারবদ্ধ, এবং সমস্ত আবেগরা ভূতদের সাথে একাকারবদ্ধ। আর তাই আমরা ত্রিদেব ও ভূতদের সন্ধান করতে যেতেই পারি, আমাদের তা অধিকারের মধ্যে স্থিত। সেই কারণে, আমরাও তোমার সাথে যাবো। সেই স্ত্রীকে তোমরা হনন করে, সম্ভোগ ও বিবাহ করবে, আর আমরা তোমাদের সুরক্ষা কবচ হয়ে অবস্থান করবো।

হ্যাঁ পুত্র, আমরা ভূতদের উল্লঙ্ঘন করবো না, ত্রিদেবকে উল্লঙ্ঘন করবো না। ফলে, আমরা দণ্ডের পাত্রও হবো না। আর তাই আমরা তোমাদের রক্ষাকবচ হয়ে অবস্থান করবো। যদি ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে সাখ্যাত ত্রিদেবীর কেউ একজনও বিরাজ করেন, তিনি তোমাদের এই স্ত্রীহননের জন্য দণ্ড দিতে আসতেই পারেন। ত্রিদেবী সমস্ত বরদানের কবচ ভেদ করার সামর্থ্য ধরেন, তাই তাঁদের মধ্যে যে কেউ তোমার সম্মুখে এসে, ত্রিদেবের দেওয়া বরদানকে ভঙ্গ করে, তোমাদেরকে দণ্ড দিতেই পারেন। কিন্তু আমরা যেহেতু আমাদের বরদানের মহিমা ভঙ্গ না করে

অবস্থান করবো, অর্থাৎ আবেগরা ভূতদের অনুসরণ না করে তাঁদের বিরোধিতা করেনি যেহেতু, আর আমি ত্রিদেবের অনুসরণ না করে বিরোধিতা করিনি যেহেতু, তাই আমাদেরকে বরদানের কবচকে তিনি কিছুতেই ভেদ করবেন না। আর এই ভাবে আমরা তোমাদের রক্ষাকবচ হয়ে থাকবো"।

দেবী কল্পনা অহংএর কথার সমর্থন করে বললেন, "তোমাদের পিতা উচিত কথা বলেছেন। তাঁর প্রস্তাবকে স্বীকার করো পুত্ররা। স্মরণ রেখো যে তোমরা একটি যুদ্ধে অবতরণ করতে যাচ্ছ, আর তাই তোমাদের রক্ষাকবচ ধারণ করে সেখানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে"।

বলদম্ভ, আবর্ত ও উপপতি একত্রে দেবী কল্পনা ও অহংএর কথার সমর্থন করে, তিন মাতাকে প্রণাম করে, পিতা অহং এবং সমস্ত আবেগদের একত্রে নিয়ে, ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ে গমন করলেন। অন্যদিকে, ত্রিদেবের একত্রিত রূপ সমস্ত বিকারের অতীত। তাই কনো কথাই তাঁরা বলতে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা মানবিয় দেহ ধারণ করবেন। আর তাই একটি গৌরাঙ্গ লঘুলোমাবলি যুক্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর পুরুষের রূপ ধারণ করে আবাহন করতে থাকলেন, "মাতা! ... হে ত্রিদেবী, আমাদের রক্ষা করুন। আমরা গহন অন্ধকারে হারিয়ে গেছি। আমাদের রক্ষা করুন দেবী!"

মাতা সর্বাত্মা ত্রিদেবের সেই একাত্মত্রি রূপ, যার নাম অখণ্ড, তাঁকে স্বীকার তো করলেন, কিন্তু তাঁর আহ্বানে প্রত্যক্ষ সারা দিলেন না। তিনি অখণ্ডের সম্মুখে একটি সূক্ষ্ম আলোক রেখে তাঁদেরকে পথ দেখালেন। অখণ্ড সেই আলোককে দেখে, সেই আলোককে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকলেন। কিন্তু মানবিয় দেহ ধারণ করার ফলে, দীর্ঘকাল সেই পথ পদচারণ করায়, অখণ্ড অত্যন্ত দুর্বল হতে থাকলেন।

অন্যদিকে, অহংএর তিনপুত্র ব্রহ্মসনাতনের হৃদদেশে প্রবেশ করে, তাঁদের আকাঙ্খিত স্ত্রীকে সনাক্ত করলেন, আবর্তের হস্তক্ষেপে। সেই স্ত্রী অন্যকেউ নন দেবী মানসী স্বয়ং। উপবনের মধ্যে মালঞ্চ স্থাপন করে, দিবারাত্র দেবী মানসী বোধির সাথে সঙ্গমে রত থাকেন। সেই সঙ্গমের

উপরান্তে যখন তিনি স্নানে যান, তখন তাঁর স্বেদপরিপূর্ণ বালুকান্যায় দেহের উপর চন্দ্রের আলোকস্থাপিত হলে, তাঁর যেই সুন্দররূপ হয়, তাকে অহংপুত্ররা নিত্য দর্শন করতেন, এবং নিজেদের বীর্যপাত করতেন। সেই বীর্য ধারণ করতেন ব্রহ্মসনাতনের হৃদদেশের তরুরাজিরা, এবং তাঁরা তা গ্রহণ করে পরিপুষ্ট হতে শুরু করেন।

অন্যদিকে, দেবী মানসীর সেই তনুরূপ দর্শন করে উত্তপ্ত হতে হতে, একসময়ে ত্রিঅহংপুত্রের কামনা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেলে, রাত্রে নদীতে স্নান করতে যাওয়া দেবী মানসীকে তাঁরা অপহরণ করেন এবং তাঁর মুখবন্ধ করে, নিজেদের অস্থায়ী তাঁবু, যেখানে অহং ও আবেগরা আছেন, সেখানে নিয়ে যান। সেই পথেই তাঁরা দেবী দখিনাকেও দেখেন, এবং তাঁকেও সম্ভোগের ইচ্ছা রাখলে, তাঁরও হনন করেন।

এমন অবস্থায় যখন এই দুইস্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন আবর্তরা, তখন বোধি ও হুতাশন তাঁদেরকে দেখতে পান। নিজনিজ স্ত্রীদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, এমন দেখে তাঁরা সম্পূর্ণ বলদ্বারা আক্রমণ করেন ত্রিঅহংপুত্রদেরকে, কিন্তু উপপতিদের প্রকাণ্ড বলের সামনে তাঁরা যেন অসহায় বোধ করেন। অবশেষে, তাঁরা ভূপতিত হলে, আবর্ত বললেন, “এঁদেরকে বন্দি করো। ... এঁরা নিশ্চয়ই এঁদের স্বামী, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই যে, এঁরা বলশালী। আমাদের মাতারা বহুদিন ধরে বলে আসছেন যে, তাঁরা আমার পিতার বীর্যতে সন্তুষ্ট নন, তাঁরা অতি বলশালী পুরুষের ঔরস গ্রহণ করতে আগ্রহী। এই দুই পুরুষকে আমাদের মাতাদের কাছে তাঁদের জন্য উপহারস্বরূপ নিয়ে যাবো”।

সেই কথাতে আবেগরা যখন বোধি ও হুতাশনকে মূর্ছিত অবস্থায় অপহরণ করে নিয়ে যেতে আগ্রহী হন, তখন আলোকদর্শন করে করে অখণ্ড এঁদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। একনজরে সংজ্ঞাচ্যুত বোধি ও হুতাশনকে দর্শন করেই, দুর্বলদেহধারি অখণ্ড তাঁদেরকে বরুণদেব ও অগ্নিদেব রূপে সনাক্ত করে নেন। তাই তিনি আবেগদের থেকে তাঁদেরকে ছাড়িয়ে নিতে উদ্যত হন। দুর্বল হয়ে গেছেন তিনি, আর মানবিয় দেহে থাকার কারণে, মানবিয় অপগুণও তাঁর মধ্যে

বিদ্যমান। তাও তাঁর বলের সম্মুখে আবেগরা নিজেদেরকে অসহায় বোধ করলে, তাঁদের মহারাজ অহংকে আবাহন করলেন।

মহাবলশালী অহং-এর সম্মুখে দুর্বল হয়ে যাওয়া অখণ্ডকে নিতান্তই অসহায় দেখালো। তিন চার আঘাতেই অখণ্ডকে মূর্ছিত প্রায় করে দিলে, অখণ্ড কনোক্রমে সেখান থেকে পলায়ন করলেন, এবং কি ভাবে বোধি ও হুতাশনকে এঁদের গ্রাস থেকে মুক্ত করা যায়, তাই চিন্তা করতে থাকলেন। ফলমুল আহার করতে থাকলেন তিনি, এবং অবশেষে কিছু সামর্থ্য একত্রিত করে, তিনি পুনরায় অহংএর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলেন ভূতদ্বয়কে উদ্ধার করতে।

গুহ্যা উদয়

কিন্তু অখণ্ডের এই প্রত্যাবর্তনের সময়কাল প্রায় তিনদিবস ব্যাপী হয়। আর ততক্ষণ, নিজের জ্যেষ্ঠাকে মাতা সর্বাম্বা সেই অসুরদের কবলে রাখতে পারবেন না, বিশেষ করে যেখানে তিনি জানেন যে তাঁর ভগিনীকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যই হলো তাঁর সম্ভোগ করা। তাই তিনি উগ্রচণ্ডী হয়ে যাত্রা করলেন অহংএর তাঁবুতে।

ইনার কথা আবর্ত জানতেন, আর তাই তাঁর ভ্রাতা ও সকলকে সতর্কও করেছিলেন সর্বাম্বার বিষয়ে। তিনি বলেন, “ভ্রাতারা, এই দেবী মানসীর আরো একটি ভগিনী আছে, আর তিনি অপার সৌন্দর্যের অধিকারী। তবে তাঁর সৌন্দর্যকে দেখে কামনা জাগেনা। জাগে সম্ভ্রম। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই যে, তাঁর মায়াতেই এঁরা সকলে আবদ্ধ। তিনি এঁদের সকলের নয়নের মণি। তাঁর কিছু অসম্ভব শক্তি আছে কিনা, আমি জানিনা!”

অহং চুপ করে থেকে বললেন, “তিনি ত্রিদেবীর কনো এক দেবী নন তো? যদি তেমন হন, তাহলে তাঁর থেকে আমাদেরকে সাবধান হতে হবে”।

বলদম্ভ হেসে বললেন, ‘পিতা, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন। এমন ভয় পেয়ে কি আর ত্রিদেব হওয়া যায়! ... ত্রিদেব হতে হলে, ত্রিদেবীদের তো আমাদের আত্মসাৎ করতেই হবে। আজ নয়তো কাল, তাঁদের শয্যাসঙ্গিনী করতেই হবে আমাদের। আর এক সামান্য স্ত্রীর বলকে আপনি ভয় পাচ্ছেন! এমন ভয় পেয়ে আপনি আমাদের তিন ভ্রাতার বলকেই সন্দেহ করছেন। আর আমাদের বল আপনার ঔরস থেকে লব্ধ, তাই আপনি নিজের ঔরসকেও অপমান করছেন। ... কৃপা করে এমন করবেন না! ... সেই স্ত্রী যদি এঁদের নয়নের মণি হন, তবে নিশ্চিতই তিনি এঁদের উদ্ধার করার জন্য এদিকে আসবেন। ... চলো উপপতি, চলো আবর্ত, আমরা সেই স্ত্রীকে প্রথম সাখ্যাত করবো, আর হতে পারে যে আমরাই তাঁকে প্রথম সম্ভোগ করবো... চলো, আমরা সেই স্ত্রীর অপেক্ষা করি শিবিরের বাইরে গিয়ে”।

এইকথা বলে, আবর্ত, উপপতি এবং বলদম্ভ শিবিরের বাইরে স্থিত হয়ে, দেবী সর্বাম্বার অপেক্ষা করতে থাকলেন। সেখানে স্থিতা হয়ে, আবর্ত বললেন, “সাবধান ভ্রাতারা, আবারও বলছি, এই পরমাসুন্দরীর মোহতেই সমস্ত জন এখানে স্থিত থাকতেন, তাই হলেও হতে পারে যে, উনার বিশেষ সামর্থ্য আছে। সেই জন্য সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক”।

বলদম্ভ মৃদুহেসে বললেন, “সেইসব কথা বাদ দাও, আর আমাদের এটা বলো যে, এই স্ত্রীর অপার সৌন্দর্যের কথা আগে আমাদের বলো নি কেন?... তাঁর সৌন্দর্য কি এই দুই স্ত্রী, যাদের অপহরণ করে এনেছি, তার থেকেও অধিক?”

আবর্ত বললেন, “এই দুই স্ত্রী আভুসনদ্বারা নিজেদের সর্বক্ষণ ভূষিত রাখতেন, যেন এঁরা ওই যে বলে না, জন্মজন্মান্তর, সেই জন্মজন্মান্তরে প্রথমবার স্ত্রী বেশে এসেছেন। আর সেই স্ত্রী যেন স্ত্রী হয়ে বরাবর অবস্থান করেছেন, তাই তাঁর যেন স্ত্রী হবার কনো অহংকার নেই। তাই উনার বেশভূষা অত্যন্ত সাদামাটা। পরনে একটি নরম ও উজ্জ্বলবর্ণের শাড়ী থাকে এবং তিনি এঁদেরই মত একবস্ত্রা; গণ্ডদেশে তাঁর থাকে একটি স্বর্ণমালা, এবং অন্য একটি বক্ষ স্থল পর্যন্ত বিস্তারিত। বাহুতে একটি করে সুন্দর স্বর্ণবালা এবং বাজুতেও তাই, চরণে মল, কর্ণে নাসিকায় ও শিরে থাকে একটি করে গহনা মাত্র।

অর্থাৎ ইনার সাজসজ্জা অত্যন্ত সীমিত ও সাবলীল। ইনার স্বভাবও অত্যন্ত সাবলীল, সহজ ও সরল। কনো প্রকার রমণীসুলভ অঙ্গভঙ্গি আমি ইনার মধ্যে দেখিনি। মার্জিত, শোভিত, এবং সম্ভ্রমস্ফীতা তিনি। সত্য বলছি ভ্রাতারা, এই দুইস্ত্রীকে যেমন রমণীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা আমি দর্শন করেছিলাম, তেমনই দৃষ্টিকোণ দ্বারা ইনাকেও দেখার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু ইনার নেত্রের দিকে তাকাতেই যেন মনে হয়েছিল, ইনি মাতা! ... আমার নেত্র সেই মুহূর্তে উনার নেত্রের থেকে নেমে আসে, এবং তাঁর চরণে স্থাপিত হয়। সেই কারণে উনার উল্লেখ আমি তোমাদের কাছে করিনি।

আসলে ভ্রাতারা, মাতা যতই সুন্দরী হন না কেন, তিনি সম্মানের পাত্রী, তিন সম্ভোগের পাত্রী হননা। তাই তাঁর কথা তোমাদের বলার সাহস করতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, যদি রমণীসুলভ আচরণকে, এবং দেহাভূষণকে তথা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারি পন্থাকে পৃথক করে দাও, তবে ইনার রূপের সমতুল্য আজ পর্যন্ত কনো নারীরূপই আমি দেখিনি। গোলাপি ইনার দেহের বর্ণ, যা স্বাভাবিক ভাবে শ্বেতবর্ণের বলেই বোধ হয়, পরিশ্রমে এবং উত্তেজনায় তা গোলাপি হয়ে ওঠে। দেহগঠনও এমন যেন ইনার দেহের প্রতিটি অংশে ঠিক ততটাই মেদ অবস্থান করে, যতটা হলে তাঁকে সুন্দরী দেখায়।

ভ্রাতা ইনার মুখশ্রী অপরিসীম সুন্দর, এক স্নেহময় জননীর মত; আর পবিত্রতা! ... ইনার অঙ্গ থেকে সর্বদা এক চন্দনের সুবাস প্রকাশিত হয়, যা স্বাবাভিক অর্থে, ইনার অঙ্গের নিকটে গেলেই, তবে লাভ করা যায়, তবে যদি ইনি উত্তেজিত হন, তবে সেই সুবাস এতটাই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই গন্ধে মজিত হয়ে থাকে। ... ইনার রূপের ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য আমার নেই ভ্রাতা। এক কথায় বলতে পারি যে ইনার মত রূপসী যেন সমস্ত ব্যাখ্যার অতীত। এমন কনো শব্দই শব্দকোষে উপস্থিত নেই, যার দ্বারা তাঁর রূপের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব”।

উপপতি কৌতুকধারণ করে বললেন, “ভ্রাতা, তাহলে তো সেই স্ত্রীই হলেন উচিতরম্য! ... ইনার সঙ্গে রমণের চিন্তাই আমাদের মত বলশালীদের শোভা পায়, তাই না! ... আচ্ছা তুমিই বলো ভ্রাতা, যদি তুমি ইনার সাথে রমণের সুযোগ লাভ করো, তুমি কি তা পরিত্যাগ করবে!”

আবর্ত ভ্রুকুঞ্চিন্ত করে বললেন, “এই কথা শুনে আমার মনের মধ্যেও প্রলোভন জাগ্রত হচ্ছে!”

বলদম্ভ হুংকারময় হাস্য প্রদান করে বললেন, “তাহলে আর চিন্তা কেন ভ্রাতা, চলো আমরা সম্মুখে যাই, আর তাঁর অপেক্ষা করি। প্রথম তো তাঁকে সম্ভোগ করেই, আমরা আমাদের সম্ভোগ উৎসবের সূত্রপাত করবো, তারপর জগতের সমস্ত সুন্দরী স্ত্রীদের অন্বেষণ করবো আমরা”।

তিন অহংপুত্র যখন এইরূপ বিচার করছেন, তখন উপপতি বলে উঠলেন, “ওই দ্যাখো ভ্রাতা, কে যেন এইদিকে আসছেন! ... এই কি সেই রমণী!”

আবর্ত ভ্রুকুঞ্চিত করে, নিজের দৃষ্টিশক্তিকে দূরদৃষ্টি প্রদান করে দেখে বললেন, “হ্যাঁ ভ্রাতা, ইনিই সে! তবে আজ মনে হচ্ছে উনি উগ্র!”

বলদম্ভ বক্র ওষ্ঠে হাস্য প্রদান করে বললেন, “হ্যাঁ উনিই সে, আর আজ সে উগ্র। ঠিকই বলেছ, উগ্র হলে, তাঁর অঙ্গের চন্দনের গন্ধ সুদূর পর্যন্ত বিস্তারিত থাকে। এখান থেকে তাঁর অঙ্গের সুবাস পাচ্ছি আমি। ... তোমরা কি পাচ্ছ সেই সুবাস!”

উপপতি হেসে বললেন, “পাচ্ছি ভ্রাতা, আর যত পাচ্ছি, ততই সম্ভোগ ইচ্ছা ব্যকুলতায় পরিপূর্ণ হচ্ছে”।

বলদম্ভ আসুরিক হাস্য প্রদান করে বললেন, “উগ্র রমণীকে সম্ভোগ করার আনন্দই আলাদা হবে। ... চলো, আমরা সম্মুখে যাই। ... আমাদের বলশালী বাহু ও বপু দর্শন করে, এঁর উগ্রতা হতে পারে এঁর মধ্যে উগ্র রমণের শৃঙ্গার প্রবাহিত করবে। ... আর একবার তা করলে, বুঝতে পারছ ভ্রাতারা, আজ আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন হতে চলেছে”।

এত বলে তিন ভ্রাতা মহাউৎসাহে সম্মুখের দিকে গেলেন, এই ইচ্ছা নিয়ে যে, সর্বাম্বা তাঁদের সকলকে দেখে উগ্ররমণভাবে ভাবিত হয়ে, তাঁদের প্রতি আকর্ষিত হবে। হ্যাঁ, উগ্র তিনি পূর্ব থেকেই ছিলেন, তবে রমণউগ্রতা নয়, ধ্বংসের উগ্রতা যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গ থেকে প্রকাশিত হতে থাকছিল। বলদম্ভ ও উপপতি সম্মুখে ছিলেন, আর আবর্ত পিছনে। দেবী সর্বাম্বা যেন এই দুই বলবান পুরুষকে দেখতেও পেলেন না, এমনই উগ্রতা সম্পন্ন হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলেন।

এই উপেক্ষা বলদম্ভ ও উপপতিকে যেন অতিশয় আঘাত প্রদান করে উগ্র করে তুলল। সেই উগ্রতা নিয়ে বলদম্ভ বললেন, "রমণীকে রমণীর মতই থাকা শোভা পায়। দুর্বল ও কমল তনুযুক্তা রমণীকে কি যুদ্ধের বেশে মানায়! ... বলশালী পুরুষ দেখলে, তাঁদেরকে রমণদৃষ্টি দ্বারা দেখাই রমণীর বিশেষত্ব। ... এই স্ত্রী তো দেখছি, কেবল স্ত্রীর দেহই লাভ করেছে, স্ত্রীসুলভ আচরণই জানেন না এই স্ত্রী!"

উপপতি বিদ্রূপের হাস্য হেসে বললেন, "তুমি বুঝলে না ভ্রাতা। কনো স্ত্রী রমণের ইঙ্গিত কমনীয়তা দ্বারা প্রদান করেন, তো কনো স্ত্রী তা ব্যক্ত করেন কমনীয়তাকে আকর্ষণ করে। এই স্ত্রী চান যে আমরা সেই কমনীয়তা নিয়ে এঁর উপর ঝাঁপিয়ে পরি, আর এঁকে সম্ভোগ করি। ... চলো ভ্রাতা, ইনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করা যাক"।

এতো বলে, তাঁরা দুই ভ্রাতা দেবী সর্বাম্বার দিকে নিজেদের দীর্ঘবাহু প্রসারিত করলে, না তো সর্বম্বার তনুকে স্পর্শ করতে পারলেন তারা, আর না শাড়ীর আঁচলকে। উপরন্তু, তাঁরা গতিশীলা সর্বাম্বার কেবলই সুদীর্ঘ কেশস্পর্শ করতে পারলেন। আর তা স্পর্শ করেই, প্রবল আকর্ষণের সাথে সেই কেশকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করলে, দেবী সর্বাম্বা এবার রণমূর্তি ধারণ করে, কেবলই নিজের তনুকে অর্ধচক্র আবর্তন করালেন।

আর সেই আবর্তনের গতিতে, বলদম্ভ ও উপপতি যেন সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্যে স্থিত হয়ে আবর্তন করে দূরে পতিত হলেন। দূরে পতিত হয়ে, তাঁরা পাথরের উপর আছার খেলে, তাঁদের

তনু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আর এবার তাঁরা অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে দেবীকে আক্রমণের ভঙ্গিতে ভূমি থেকে উঠলেন। এই দৃশ্য দেখে আবর্তও কঠিন হয়ে গেলেন। তিনি হুংকার সহ বললেন, "দেবী, আপনার এই আক্রমণকে আমি শত্রুর আক্রমণ রূপেই দেখতে পাচ্ছি! ... তাই সজ্জ হয়ে যান আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য"।

দেবী সর্বাম্বা এক উগ্র অথচ মিষ্ট হাস্য প্রদান করে বললেন, "বরদান তোদের সুরক্ষা করছে, তাই আমি তোদের হত্যা করতে পারছিনা। তবে এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে সেই বরদানের কারণে তোরা আমার থেকে সুরক্ষিত হয়ে গেছিস। ... হত্যা তো তোদের আমি করবো না, কিন্তু তোদের সহস্র টুকরো করে, মহাশূন্যে ভাসমান রেখে দেব। এমনই দুরাবস্থা করবো যে তোরা তোদের মৃত্যু যাতে হয়, সেই কারণে তপস্যা করতে শুরু করবি"। ... এই কথা বলে, আবর্ত যতক্ষণে নিজের অস্ত্রসন্ধান করলেন, ততক্ষণে দেবী সর্বাম্বা তাঁর বক্ষস্থলে একটি পদাঘাত করলেন, আর সেই পদাঘাতে আবর্তের তনু যেন শূন্যে ভাসমান হয়ে, কয়েক শত হাত দূরে, তাঁদের শিবিরের সম্মুখে পতিত হলেন।

বলদম্ভ ও উপপতি সেই দৃশ্য দেখে, নিজেদের অস্ত্র সন্ধান করে, দেবী সর্বাম্বার দিকে উগ্র আস্ফালনসহ ধাবিত হলে, মাতা সর্বাম্বা পশ্চাতে ঘূর্ণন করে, একটি গহন শ্বাস ছাড়লেন। যেন হলাহলের অগ্নি প্রবাহিত হলো সেই শ্বাসের মাধ্যমে, এমনই মনে হলো বলদম্ভ এবং উপপতির। আর সেই অগ্নির প্রচণ্ডতা তাঁদেরকে মহাশূন্যে উত্তোলন করে দিলে, দেবী সর্বাম্বা শূন্যে থাকা বলদম্ভ ও উপপতির কেশ আকর্ষণ করে, ভূমিতে সজোরে আছার দিলে, দুই ভ্রাতার এমন দশা হয় যেন তাঁরা আর কনোদিনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না।

কিন্তু দুই ভ্রাতা, বলদম্ভ ও উপপতি মরণাপন্ন হলেও দমলেন না। যেন তাঁদের পুরুষত্বের অহংকার তাঁদেরকে দমতে দিলো না! তাঁরা পুনরায় নিজেদের দীর্ঘবাহু প্রসারিত করে, দেবী সর্বাম্বার চরণকে আকর্ষণ করে, তাঁকে বলপূর্বক নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে, ভূপতিত আবর্তেরও পুরুষত্ব জাগ্রত হয়েছে। এক স্ত্রীর কাছে এমন ভাবে পরাজয়

সেও স্বীকার করে নিতে পারছিলো না। প্রবল বেগে, দেবী সর্বাম্বার কটিদেশকে আকর্ষণ করে, তাঁকে ভূশায়িত করার মনসা নিয়ে সে দেবী সর্বাম্বার দিকে ধাবিত হতে থাকলো।

বলদম্ভ ও উপপতির তাঁর চরণ আকর্ষণ করে, গতিরোধ করার প্রয়াস এবং আবর্তের এই প্রগলের ন্যায় তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে আসা, এই দুই যেন মাতাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ করে তুলল। আর সেই ক্রোধ এতই বিষম হয়ে উঠলো যে, এবার তিনি রুদ্ধশ্বাসে আস্ফালন করতে শুরু করলেন। আর সেই আস্ফালন ক্রমশ এতটাই তীব্র হয়ে গেল যে সর্বত্র চন্দনের গন্ধ বিস্তৃত হতে শুরু করলো। মাতার দেহের তাপ বৃদ্ধি হতে শুরু করলো। আর সেই তাপ এমনই উচ্চসীমা ধারণ করলো যে, তাঁর অঙ্গের সমস্ত বস্ত্রখণ্ডে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো; তাঁর অঙ্গের সমস্ত গহনা বিগলিত হতে শুরু করলো।

বস্ত্র ক্রমশ পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। মাতার দেহের গোলাপি বর্ণও যেন রক্তবর্ণ কাষ্ঠআংরা হয়ে উঠলো, আর ক্রমশ তা ঘন গহন কালো বর্ণের হয়ে উঠতে শুরু করলো। ... তাঁর অঙ্গের গহনা বিগলিত হয়ে, তাঁর সমস্ত অঙ্গকে স্বর্ণ ও রজত ময় করতে শুরু করলো। ... ক্রমশ মাতার রূপ এমন হয়ে উঠলো যেন তিনি মহাগুহ্যা প্রকাণ্ড কালোবর্ণা। তাঁর বিভিন্ন অঙ্গে কনক রজতের গহনা গলিত হয়ে শোভা বিকশিত করতে থাকলো। এবং তাঁর নেত্র, ওষ্ঠ, কর্ণকুহর, দিগম্বরী তনুর কুঁচবাঁট, এবং দেহের প্রতিটি স্থান যেখানে দুই অঙ্গখণ্ড মিলিত হচ্ছে, তা রক্তাভ হয়ে উঠলো।

বলদম্ভ ও উপপতি আর দেবীর চরণ স্পর্শ করে থাকতে পারলেন না। প্রবল তাপ তাঁদেরকে আর মাতার অঙ্গস্পর্শ করতে দিলো না। কিন্তু এতেই কি সমস্ত কিছু ক্ষান্ত হলো! না! এই তো সবে শুরু দেবী গুহ্যার তাণ্ডবের। সম্পূর্ণ ভাবে দিগম্বরী, কালবর্না তিনি, আর তাঁর আফালনে যেন সাখ্যাত কালাগ্নি নৃত্য করতে শুরু করলো। তাঁকে কিচ্ছুই করতে হলো না। কিন্তু তাঁর সামান্য গতিতেই ভূমিকম্প হতে থাকলো, আর ভূমিগর্ভ থেকে অগ্নি ঝর্ণার ন্যায় প্রবাহিত হতে শুরু করলো। ... তিনি কেবলই শ্বাস নিচ্ছেন ও ত্যাগ করছেন। কিন্তু সেই শ্বাস গ্রহণের সময়ে সমস্ত গাছগাছালি, প্রস্তরাদি শূন্যে ভাসমান হয়ে তাঁর নিকটে চলে আসছে, এবং তাঁর উর্জার

প্রকাণ্ড প্রকাশে তা অগ্নিপ্রজ্বলিত হয়ে যাচ্ছে। আর তাঁর শ্বাস ত্যাগের সময়ে সেই জ্বলন্ত, অগ্নিপ্রজ্বলিত গাছ, গাছালি, প্রস্তর ইত্যাদি প্রবল গতি ধারণ করে পতিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু পুনরায় মাতা শ্বাস গ্রহণ করার জন্য, তারা ভূমিতে পতিত হতেই পাচ্ছেনা।

আর তাঁকে কিছুই করতে হলো না। কেবলই তাঁর দেহউর্জা ও শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর চারিপাশের প্রায় ১০০ হাত স্থানকে উগ্র ভাবে বিনাশ করতে থাকছে, যেন সেই স্থানে কালাগ্নি স্থাপিত হয়েছে। বলদম্ভ, উপপতি এবং আবর্তকেও আর কিচ্ছু করতে হলো না। কেবল তাঁরা মাতার শ্বাসগ্রহণের সময়ে তাঁর নিকটে উড়ন্ত ভাবে এগিয়ে আসেন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যান, এবং মাতার শ্বাস ত্যাগের সময়ে, তাঁদের সেই অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত তনু দূরে পতিত হতে আগ্রহী হয়। তবে তাঁদের তনুও ভূপতিত হতে পারেনা, কারণ পরবর্তী মাতার শ্বাস গ্রহণ তাঁদের পুনরায় নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়, আর পুনরায় তাঁদের অগ্নিতে দগ্ধ করতে শুরু করে।

শিবিরের বাইরে যখন এমন তাণ্ডব চলছিল, তখন শিবিরের মধ্যে, একদিকে যেমন দেবী মানসী ও দেবী দখিনার মূর্ছা ত্যাগ হয়, তেমনই বোধি ও হুতাশনেরও মূর্ছা ত্যাগ হয়। আর অন্যদিকে, মাতা শিবিরের নিকটে চলে আসার জন্য, শিবিরেও সেই অগ্নি স্পর্শ করে, এবং শিবিরকেও মাতার প্রকাণ্ড শ্বাস আকর্ষণ করে ভূমি থেকে উৎপাটিত করে দেয়। শিবির শূন্য অবস্থায় স্থিত হবার কারণে, দেবী মানসী, দেবী দখিনা, বোধি ও হুতাশন এখন সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত। আর একই সঙ্গে আবেগ ও অহং মাতার এই ভয়াবহ রূপ দর্শন করে তটস্থ।

দেবী মানসী, দেবী দখিনা, হুতাশন ও বোধির কাছে মাতার এই গুহ্যা রূপ অজ্ঞাত এক রূপ। তাঁদের পরিত্রাতা তিনি, যিনি তাঁদেরকে কারাগার থেকে ও মূর্ছা থেকে মুক্ত করেছেন, কিন্তু প্রকাণ্ড তিনি, যার রূপকে ঠিক করে নিরীক্ষণই করা যায় না, কারণ সেই রূপকে যে কালাগ্নি বেষ্টন করে রেখে দিয়েছে। ... অন্যদিকে, অহং ও আবেগরা ভয়ার্ত, মাতার এই রূপ দর্শন করে। ... তবুও অহংকে সাহস জোগাতেই হয় নিজের মধ্যে, কারণ তাঁর পুত্ররা তখন শূন্যে ভাসমান হয়ে অগ্নিতে প্রজ্বলিত। মাতার শ্বাসের সঙ্গে তাঁরা মাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, অগ্নিদগ্ধ হচ্ছেন, এবং মাতার নিশ্বাস ত্যাগের সাথে তাঁরা শূন্যেই ভাসমান হয়ে এগিয়ে আসছেন

অহংএর দিকে। কিন্তু তাঁদের তনু ভূপতিত হবার পূর্বেই, মাতার শ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে পুনরায় মাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, পুনরায় অগ্নিদগ্ধ হবেন বলে।

পুত্রদের এমন করুনদশা দেখে, ব্যকুল হয়ে উঠলেন অহং। এবং কি করবেন তা কিছুতে বুঝে উঠতে পারলেন না। এই অগ্নি থেকে পুত্রদের উদ্ধারের চেষ্টা, নিশ্চিত ভাবে তাঁর নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে, আর যদি তা না করেন তিনি, তবে নিশ্চিত ভাবে তাঁর তিনপুত্রের মৃত্যু আর কেবলই ক্ষণিকের অপেক্ষা।

অন্যদিকে মাতা যখন এমন বীভৎস রূপ ধারণ করে শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন, তখন যেই উষ্মা বাতাসে প্রবাহিত হয়ে উঠলো, আর তা অখণ্ডকেও আকর্ষণ করে আনলো সেই স্থানে। সেখানে অখণ্ডের আগমন হলে, মাতার এমন তাণ্ডবমূর্তি দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন, এবং বিস্মিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, আজকে যে ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ নিশ্চিত! ... আমারও সামর্থ্য নেই আজ ব্রহ্মাণ্ডকে বিনাশের থেকে বাঁচানোর! কি করা যায়! ... না কিচ্ছু করার নেই, যেই উদ্দেশ্যে মাতা এমন রূপধারণ করেছেন, তা ক্ষান্ত হবার আগে, মাতাকে শান্ত করার সামর্থ্য কারুর নেই, কনো কিচ্ছুর নেই।

অহং মাতার এই ভয়ঙ্করী রূপ দর্শন করে নতজানু হয়ে করজোড়ে মাতার কাছে নিবেদন করলেন, “মাতা, আমার পুত্রদের পরিত্রাণ দিন!... তাঁদের এই নিষ্কলঙ্ক পিতা, তাঁদের হয়ে আপনার কাছে গুহার লাগাচ্ছে। দেখুন এই নিরপরাধ আবেগগণও রয়েছেন। এঁরা কি করেছে বলুন! ... এঁরা তো নিজেদের সীমারেখাকে অতিক্রম করেননি! ... এঁরা কনো ভূতদের বিরক্ত করেননি; আমি স্বয়ং ত্রিদেবকে কখনো বিরোধ করিনি। তবে আমাদের সাথে এমন অবিচার কেন?”

দেবী গুহ্যা প্রথমবার নিজের হুংকারসহ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করালেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শব্দ আচ্ছাদিত হয়ে যায়। সেই গগনভেদী শব্দ করে তিনি বললেন, “মূর্খ অহং! ... হ্যাঁ মূর্খই তুমি। ... তাই তো দেখতে পাচ্ছ না! ... ভালো করে দেখো দেবী মানসীকে, দেবী

দখিনাকে, বোধিকে, আর হুতাশনকে। ... কিছু দেখতে পাচ্ছ! ... ভালো করে দ্যাখো। এঁরা হলেন চারভূত। ... মানসী হলেন ইন্দ্র, দখিনা পবন, বোধি হলেন বরুণ, আর হুতাশন হলেন অগ্নি। ...

মূর্খ অহং, যারা অন্যদের মূর্খ মনে করেন, শ্রেষ্ঠ মূর্খ তো তাঁরা স্বয়ংই। ... তোরা কি ভেবেছিলিস, তোদের এই ভূততোষামোদির অন্তরালে থাকা, ভূতদের শোষণ করে, নিজেদের ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী করে স্থাপিত করে রেখে, সমস্ত জীবকে আবেগসর্বস্ব করে রেখে দেওয়ার কামনার ভান কেউ করতে পারবে না! ... ভুলে গেছিলিস তুই, আমি ত্রিদেব নই, আমি ত্রিদেবীর সম্মিলিত রূপ; পরাপ্রকৃতি আমি। আমার কাছ থেকে কারুর কনো মানসিকতাই লুক্কায়িত থাকেনা। না তোর, না আবেগদের, না তোর স্ত্রীদের, না তোর পুত্রদের, না এই ভূতদের, আর না ত্রিদেবের বা অন্য সকল দেবদের। ...

এই আবেগরা যাদেরকে আশ্রয় করে অবস্থান করতো, আর প্রতিনিয়ত তাঁদেরকে নিজেদের বশে রাখতে চাইতো, আজ তাদের সেই মানসিকতাকেই সম্মুখে আনার জন্য, আমি আমার প্রেরণায় ও মায়ায়, এই ভূতদের স্ত্রী ও পুরুষ রূপ প্রদান করে, তাঁদের সম্মুখে ভেদ উপস্থিত করিয়েছি, আর তাঁদেরকে সনাক্ত না করতে পেরে, এঁরা তাঁদেরকেই অপহরণ করার অপরাধ করেছে। আর তাঁরা নিজেদের বরদান ভঙ্গ করার জন্য, আজ আমি তাঁদের সকলকে ভস্ম করে, ভূতদের অধীনে তাঁদের স্থাপন করবো এই ব্রহ্মাণ্ডে। আর যখন যখন যেই যেই ব্রহ্মাণ্ড আমাকে নিজের সর্বস্ব অর্পণ করবে ব্রহ্মসনাতনের ন্যায়, তার তার সঙ্গে আমি এমনই ন্যায় করবো।

আর তুই! ... তুইও তো ত্রিদেবকে আশ্রয় করে, নিজেরই প্রশস্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলিস, তাই না! প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে, স্বয়ং ধরিত্রীর ব্রহ্মাণ্ডে নিজের প্রভুত্বই স্থাপন করতে চেয়েছিলিস তুই আর তোর পত্নীরা, আর চেষ্টা করেছিলিস যাতে সম্মুখে ত্রিদেব থাকেন। ত্রিদেব জানবেন যে প্রশস্তি তাঁদের হচ্ছে, কিন্তু ক্ষমতা ও বল তোদের হবে। ... ত্রিদেব তথা সকল দেব হবে নিজেদের কর্ম থেকে নিবৃত্ত, আর তোরা করবি সমস্ত কর্ম, আর এই ভাবে সমস্ত কিছুকে

নিজেদের অধিকারে স্থাপিত রাখবি। ... ছলনা সর্বত্র করতে পারবি, যেখানে আমি প্রকাশিত নই। ছলনা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে করতে পারবি যেখানে আমার কাছে সেই ব্রহ্মাণ্ড আত্মসমর্পণ করেনি।

কিন্তু ব্রহ্মসনাতন নিজের সর্বস্ব আমাকে অর্পণ করেছে, তাই আমি তাঁর ব্রহ্মাণ্ডে সক্রিয়। আর যেখানে আমি সক্রিয়, সেখানে কারুর কনো প্রকার ছলনা স্থাপিত থাকতে পারেনা। না আবেগদের ছলনা, না তোর ছলনা, না তোর পুত্রদের ছলনা, না তোর স্ত্রীদের ছলনা, আর কেবল এই নয়, যেখানে আমি সক্রিয়, সেখানে ত্রিদেব, অন্য দেব, এমনকি ভূতদের ছলনাও স্থান পেতে পারেনা। ... ত্রিদেব ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের অধিকারে স্থাপিত বলে ভেবে গেছেন। তা আমিও দেখবো, আমি তাঁর ব্রহ্মাণ্ডে সহযোগই করবো না, সে কি করে ব্রহ্মাণ্ডকে চালনা করতে পারে! আর ভূতরা! ... ভূতরাও ভেবে গেছেন যে, সমস্ত কাজ তুই আর তোর পরিবার করে চলেছে, আর তাঁরা কেবলই সুখভোগ করছে। তাঁদের এই মনোবৃত্তিরও ফল তাঁদেরকে পেতেই হবে।

তুই কি ভাবছিস, তুই নিষ্কলঙ্ক! ... তুই নিজে তো বরদানের অপমান করিসনি! ... দেখ এই অখণ্ডকে। ... নিরীক্ষণ করে দ্যাখ। ... ত্রিদেবের সম্মিলিত রূপ ইনি। সাখ্যাত ব্রহ্মাণ্ডের আত্ম ইনি। আর তুই তাঁকেই আঘাত করেছিলিস। ... হ্যাঁ, আমিই বাধ্য করেছিলাম তাঁকে সম্মিলিত রূপ ধারণ করার জন্য, ত্রিদেব থেকে অখণ্ড হবার জন্য, কারণ তুই এই অখণ্ডরূপের ভেদ করতে পারবি না, আর তুই তাই করবি যা তুই করতে চাস, কিন্তু ত্রিদেবকে নিজের বিরুদ্ধে চালিত হতে দিবিনা বলে, কেবলই অভিনয় করে যাস।

তাই আজ আমি প্রথম তোদের নাশ করবো। সমস্ত আবেগ বিনষ্ট হয়ে, ভূতদের অন্তরে স্থান পাবে, এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য হবে। তোর নাশ করবো। তুই অখণ্ডের অন্তরে স্থান পেয়ে, তাঁর নির্দেশ পালনে বাধ্য হবি। ... আর তোর ত্রিসন্তানকে একটি শেষ সুযোগ প্রদান করলাম, তাঁরা কতটা তুচ্ছ এই পাঠ পড়িয়ে। যদি সংযত হয়ে যেতে পারে, তবে তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণে নিজেদের সমর্পিত করবেন, আর তা না হলে, তাঁদের সমূলে উৎপাটন আমিই করবো কালের সাথে সাথে।

তোর স্ত্রীরাও ত্রিদেবকে মূর্খ করে, তাঁদের নাম করে ব্রহ্মাণ্ডকে চালনার প্রয়াস করেছে। তাই তাঁরাও আমার হাত থেকে নিস্তার পাবেনা। ... আর ভাবিস না যে ত্রিদেব বা ভূতরা আমার থেকে বেঁচে যাবে। ... তোদের বিনাশ করার পর, আমি এখানে থেকে অবলুপ্ত হবো, যাতে তাঁরা আমার সান্নিধ্য না পেতে পারে। ... তাঁদের অধিকার স্থাপনের প্রয়াস, নিজেদের পুরুষত্বের অহংকার আর যেখানেই চলুক, ব্রহ্মসনাতনের এই ব্রহ্মাণ্ডে চলবে না, কারণ এখানে আমি সক্রিয়, আর তার কারণ ব্রহ্মসনাতন স্বয়ং নিজেকে আমার কাছে নিবেদিত করেছে"।

এতবলে মাতা সর্বাম্বা গুহ্যা বেশে প্রবল বেগে অগ্রসর হলে, অহং তথা আবেগরা তাঁর থেকে পলায়নের প্রয়াস করলেন, কিন্তু মাতার শ্বাস তাঁদেরকে নিজের নিকটে টেনে আনলে, তাঁরা আর এগোতে পারেন না, আর মাতার শ্বাসের বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্রই, সমস্ত আবেগ ভস্মীভূত হয়ে দেবী মানসী, দেবী দখিনা, বোধি, হুতাশন এবং ধরিত্রীর মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। আর একই ভাবে অহংও ভস্মীভূত হয়ে গেলে, তিনি স্থান পেলেন অখণ্ডের মধ্যে। কিন্তু সেই কর্ম সম্পন্ন হতেই, মাতা সেখান থেকে অবলুপ্ত হলেন। পরে রইলেন তাপে ঘর্মাক্ত মানসী, দখিনা, হুতাশন ও বোধি; পরে রইলেন মনঃপ্রাণে ব্যথিত অখণ্ড; এবং পরে রইলেন অর্ধদগ্ধ যৌনশক্তি থেকে প্রতিহত আবর্ত, উপপতি এবং বলদম্ভের দেহ।

গুহ্যাবন্দনা

মাতা সেখান থেকে অবলুপ্ত হলে, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেন ত্রিঅহংপুত্ররা। অন্যদিকে দেবী মানসী ও দেবী দখিনা হাহুতাশ করে ক্রন্দন করে উঠলেন, "সর্বা! ... কোথায় গেলি মা!... হয়তো আমরা অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে তুই আমাদের সর্বস্বকিছু! আমরা তোকে ছাড়া বাঁচতেই চাইনা এই ব্রহ্মাণ্ডে। ... আয় ফিরে আয় মা! ... মাতপিতা চলে গেলে সন্তান অনাথ হয়ে যায়, কিন্তু সেই মাতাপিতা তো কেবলই তাঁর দেহের জনকজননী, বাস্তব মাতা তো তুই, আর কেবল তুই। তাই সমাজ যাকে অনাথ বলে, সে যে অনাথ হয়েও অনাথ নয়, আর সেই কারণেই যে কত কত অনাথ জীবিত থাকে, তোর ছত্রছায়াতে। কিন্তু মা, তুই যে

আমাদের সত্য অর্থে মা, আমাদের সমস্ত কিছুর মা, আমাদের সর্বস্ব কিছুর মা, আমাদের সর্বাম্বা তুই। তোর অভাবে যে আমরা সেই অনাথ, যার আর জীবিত থাকার কনো অর্থই হয়না! ... ফিরে আয় মা! ফিরে আয়!"

অখণ্ড তাঁদের কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "দোষ আমার দেবী মানসী, দেবী দখিনা। দোষ আমার বোধি, হুতাশন। ... আমিই অহমিকা ধারণ করে, তাঁকে নিজের দাসী করে রাখার মত ভান করে গেছি, আর স্মরণ থেকেও ভুলতে ইচ্ছা করেছি যে, তিনিই আমার প্রকৃত অস্তিত্বের কাণ্ডারি। আজ আমি বুঝতে পারছি যে, কেন তিনি আমাকে ও আমাদের সকলকে ত্যাগ করে অবলুপ্ত হয়েছিলেন। আসলে আমরা যে তাঁকে লাভ করার যোগ্যতা থেকেই স্খলিত হয়েছিলাম। আমরা যে তাঁকে লাভ করার উপযুক্ততাই হারিয়ে বসেছিলাম! আমরা সকলে তাঁর কাছে অপরাধী, কিন্তু সেই অপরাধের উত্তরদায়িত্ব আমার।

আপনারা হলেন ভূত, যাদের আধার আমি স্বয়ং। কিন্তু আমি! আমার আধার যে তিনি, আর একমাত্র তিনিই। তাঁকে ছাড়া যে আমি, আমিই নই, আমি আমার অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলি। আমার কর্তব্য ছিল, আপনাদেরকে সত্য বলা যে, আমি নই, তিনিই হলেন সে, যার কারণে সমস্ত কিছু অস্তিত্বে অবস্থান করে। কিন্তু আমিই যে অহমিকায় মত্ত হয়ে অবস্থান করছিলাম। আর অবস্থান করেছিলাম বললেই বা সত্য কথা কোথায় হলো তা! এই ব্রহ্মাণ্ডের অতিতে এখনো যে আমি আমার অহমিকা নিয়েই অবস্থান করছি, আর আপনারাও। কেবলই এই ব্রহ্মাণ্ডে, আমরা আমাদের অহমিকাকে, আমাদের নির্বুদ্ধিতাকে, আমাদের মূর্খতাকে প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

আর সব থেকে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, অন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, এবং এই ধরিত্রীর ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা যেই অবস্থায় স্থাপিত করে রেখেছি, তাতে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যা উপলব্ধি করলাম, তা স্থাপন করাও সম্ভব নয়; অন্তত রাতারাতি তো নয়ই। তাই বড় হতাশ লাগছে নিজেকে। ভুল করেছি তা মানলাম এবং ব্যথিতও হলাম, কিন্তু সেই ভুলকে সঠিক করে নিতে চেয়েও তা পারছিনা, এই প্রসঙ্গ আমাকে অত্যন্ত পীড়া প্রদান করছে"।

দেবী মানসী সম্মুখে এসে বললেন, "প্রভু, আমরা কি আমাদের ভুলকে এই ব্রহ্মাণ্ডেও সঠিক করতে পারবো না! সেই চেষ্টা তো আমরা করতেই পারি, তাই না!"

বোধি সম্মুখে এসে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, মানসী সঠিক বলেছে। মাতার ছত্রছায়ায় থেকে, আমাদের কি প্রয়োজন যে আমরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বা পবন হয়ে বাঁচবো! ... আমরা তো মানসী, বোধি, দখিনা এবং হুতাশন হয়েই, যেমন মাতাতে শিশু নির্ভরশীল থাকে, তেমন ভাবেই আমাদের মাতার উপর নির্ভরশীল থাকতে পারি! পারিনা বলুন!"

দেবী দখিনা সম্মুখে এসে করজোড়ে বললেন, "প্রভু, হতে পারে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি, তবে হয়তো আমরা ঠিকটা বা যথার্থ কি, তা বুঝিনি এখনো। যদি বুঝতাম, তাহলে মাতা নিশ্চয়ই আমাদেরকে এই ভাবে ছেড়ে চলে গিয়ে আমাদের অনাথ করে যেতেন না! "

অখণ্ড নিজের মস্তক আন্দোলিত করে সকলের কথাকে সমর্থন করে বললেন, "সঠিক কথা, যথার্থ আর ভুল বোঝার মধ্যে ঢের পার্থক্য রয়েছে। আমরা ভুল করেছি, সেটা তো বুঝেছি, কিন্তু কেন সেই ভুল করলাম! কারণ আমরা সত্য সম্বন্ধে অনবগত, আর সেই সত্যই হলো যথার্থ। তাই হতে পারে, আমাদের সকলের প্রিয় সর্বাম্বা, যেহেতু আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছি, সেহেতু আমাদেরকে যথার্থতার সাথে, সত্যের সাথে পরিচিয় করাতে চান, যাতে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রান্তিমুক্ত হয়, আর তা সম্ভব হলে, এঁর মাধ্যমে অন্য ব্রহ্মাণ্ডরাও ভ্রমমুক্ত হতে থাকবে, আর একদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ভ্রমমুক্ত হয়ে উঠবে"।

হুতাশন বললেন, "এর অর্থ প্রভু, আপনি যেই আক্ষেপ করছিলেন যে, আমরা ভুল বুঝতে পেরেও ভুলকে সংশোধন করতে পারছিনা, তারই নিরাময় প্রদান করছেন আমাদের সকলের জননী। ... আমাদের তাই মাতার অনুসরণ করতে হবে। হ্যাঁ, তাঁকে আমরা যথার্থ মর্যাদা প্রদান করিনি। কিন্তু আমরা এই কয়দিন মাতার সাথে থেকে যা বুঝেছি, তা এই যে তাঁর পদমর্যাদার প্রতি কনো মোহই নেই। অর্থাৎ তিনি এই কারণে আমাদের থেকে মুখ মোড়েন নি যে আমরা তাঁকে উচিত পদমর্যাদা প্রদান করিনি। ... আসলে তিনি সত্য অর্থেই মাতা, আর আমরা তাঁর

সন্তান। যেহেতু আমরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, সেই কারণে আমাদের মাতা আমাদের প্রতি রুষ্ট"।

দেবী মানসী পুনরায় বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রতি রুষ্ট কিনা তা আমরা জানিনা, কিন্তু আমাদের মাতা আমাদের প্রতি রুষ্ট। প্রভু, ঈশ্বরের আশীর্বাদ না পেলে আমাদের কি হবে, তা আমরা জানিনা, আর আজ তা জানতেও ইচ্ছা করছেনা। তবে আমাদের মায়ের স্নেহ যদি আমরা লাভ না করি, তাহলে আমরা এই অনাথ হয়ে আর অধিক দিন বাঁচতে পারবো না। প্রভু, বিশ্বাস করুন, মাতা আমাদের ঈশ্বরী হয়ে থাকতেই চান না, তিনি শুধুই আমাদের মা, আর আজ আমাদের মা আমাদের প্রতি রুষ্ট।

মাতা আমাদের প্রতি রুষ্ট এই কারণে হয়েছেন কারণ আমরা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি; যা সত্য নয় তাকে সত্য মেনে চলেছি, আর যা সত্য তাকে আমরা না তো মানছি, আর না জানছি বা জানার প্রয়াসও করছি। অর্থাৎ তিনি আমাদের মা। আর মা আজ রুষ্ট কারণ তাঁর সন্তানরা বেঠিক পথে চলছে বলে। মান অপমান, সম্মান, এসব তাঁর কিচ্ছু চাইনা, তাঁর তো তাঁর সন্তানের কল্যাণ চাই প্রভু। ... আর কিসে আমাদের কল্যাণ, তা আমরা জানছিনা বলেই, আমরা এমন ভুল করেছি। অর্থাৎ মাতা আমাদের সেই অবস্থায় উন্নীত করতে চাইছেন, যেই অবস্থায় স্থিত হলে আমরা ভুল করাই বন্ধ করে দেব, কারণ ভুলটি কি তা আমরা সনাক্ত করতে শিখবো। ... আর সেই কারণেই আমার প্রাণের ভগিনী আমার থেকে অবলুপ্ত হয়েছে"।

নেত্রের অশ্রু মুছে দেবী মানসী আবার বললেন, "প্রভু, আমি স্মরণ রাখতে চাইনা, আমি ইন্দ্র। আমি মাতার প্রিয়তমা ভগিনী হয়েই থাকতে চাই! ... তাঁর স্নেহস্পর্শ লাভ করে, আমি আপ্লুত, আর তা এই মুহূর্তে লাভ করতে না পেরে, আমি নিজেকে যেন বিধবা এমন বোধ করছি, সন্তানহারা হয়ে গেছি, এমন বোধ করছি। ... প্রভু, আমি তাঁর ভগিনী হয়েই থাকতে চাই। ... কৃপা করুন আমার উপর। তাঁর ভগিনী হয়েই আমি তাঁর থেকে সত্য জানতে চাই, যা তিনি আমাদের জানাতেও ব্যকুল"।

দেবী দখিনা ব্যকুল হয়ে বললেন, “হ্যাঁ বাবা অখণ্ড, আমার কন্যাকে আমার কাছে এনে দাও। ... তাঁকে ছাড়া আমার যে একদণ্ডও অস্তিত্বে থাকতে ইচ্ছা করছেনা! বিনা আকাঙ্ক্ষায়, কেবলই প্রেম দেবার আকাঙ্ক্ষায় স্নেহ যে কি অপ্রতিম শক্তিশালী, আমি আজ তা বুঝতে পারছি। আমাদের সর্বা আমাদের সেই স্নেহ প্রদান করেছে, যেখানে সে আমাদের থেকে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চায়নি, কেবলই আমাদের দুহাত ভরে প্রেম দিয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি এখন, কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু জানিনা তাঁকে আমরা। বাবা অখণ্ড, আমাদের উপর কৃপা করো বাবা! আমাদেরকে ইন্দ্র, বরুণ, পবন, অগ্নি হতে বলো না! আমরা এই মাতা, পিতা, ভগিনী, ভ্রাতা বেশেই থাকতে চাই, আর আমাদের সর্বাকে জানতে চাই, চিনতে চাই, বুঝতে চাই, আর তাঁর সাথে একাত্ম হতে চাই”।

অখণ্ড চিন্তিত হয়ে বললেন, “সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এখন আমি কি করি, তাই বুঝতে পারছিনা! ... আমাকে কেন তিনি মাতাপিতা, ভ্রাতাভগিনী কিছু রূপেই স্বীকার করলেন না! ... আমি কি এতটাই অহংকারী হয়ে গেছি যে মাতা আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করে দিলেন! ... আমি কি করি এখন! আমি এখন কোথায় যাই! ... সর্বাকে ছেড়ে, আমিই আর কি ভাবে থাকি!”

হুতাশন বললেন, “কেন বাবা! ... তুমি আমাদের পুত্রসমান হয়েই থাকো না! ... তা হয়ে থাকতে কি তোমার আপত্তি আছে! ... আমরা সকলে মিলে আমাদের সর্বস্ব যিনি, তাঁর কাছে আবেদন করি। ... মাতা তিনি আমাদের, আমরা তাঁর সন্তান। ভুল করে ফেলেছি। অজ্ঞান আমরা। নিজেদের অজ্ঞানতাকেই নিজেদের জ্ঞান মানার ভ্রান্তি করে ফেলেছি। তিনি তো আমাদের নিজের জননী। আমাদের উপর তিনি কি অধিক দিন রুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন! ... মানছি বৈরাগী তিনি, কিন্তু প্রেমদ্বারাই যে তাঁর সর্বাঙ্গ নির্মিত! তিনি যে স্বয়ং প্রেমের প্রতিমূর্তি! সন্তানকে প্রেম না করে কি করে আমাদের সর্বা বৈরাগী হয়ে থাকবে! ... আমি বেশ বুঝতে পারছি, অনুভব করছি, আমার কন্যাও আমাদের ছেড়ে রয়েছে বলে চরম বেদনার অনুভব করছে, ঠিক যেমনটা আমরাও করছি। ... চলো না বাবা অখণ্ড, আমরা সকলে মিলে, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি!”

বোধি ছলছল নেত্র নিয়ে বললেন, "মাতা সমস্ত আবেগদের আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তাই আর আবেগরা, অন্তত এই ব্রহ্মাণ্ডে স্থিত হয়ে আমাদেরকে বিরক্ত ও ভ্রমিত করবে না। মাতা অহংকেও আপনার অনুগত করে দিয়েছেন অখণ্ড, তাই সেও আর আপনাকে ভ্রমিত বা বিরক্ত করবেনা। ... এর থেকে অধিক সুযোগ আর কিই বা লাভ হতে পারে, মাতাকে জানার ও চেনার। এই অহং আপনাকে চিনতে দেয়নি তাঁকে। এই আবেগরা আমাদের চিনতে দেয়নি তাঁকে। আর তাঁকে আমরা চিনতে পারিনি বলেই, আমরা বারবার ভ্রমিত হয়েছি, আর তাঁকে চিন্তা পারিনি বলেই, আমরা ধরিত্রীকে বেদনাগ্রস্ত দেখেও, অবিচল থেকেছি"।

দেবী মানসী করজোড়ে অখণ্ডের সম্মুখে নতজানু হয়ে বললেন, "প্রভু অনুমতি দিন না কৃপা করে, আমরা এই ভাবেই থেকে, মাতার থেকে সত্য জানি। ইন্দ্র পরিচয় বড় অহংকার দেয়। সেই অহংকার ধারণ করার মুহূর্তেই, আমাদের নিজেদের মা আমাদের কাছে দেবী হয়ে যায়, আর আমাদের মা দেবী হয়ে বিরাজ করে পূজা পেতেই চায়না। সে যে মা হয়ে সন্তানকে বুকে আগলে রাখাকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম বোধ করেন। তাই প্রভু অনুমতি দিন না, আমরাও নিজেদের সন্তানভাবকে অনুভব করে, আমাদের একমাত্র মায়ের মমতাকে অন্বেষণ করি। তাঁর প্রেম এইকয়দিন ইন্দ্রের অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করেই যে নেশা হয়ে গেছেন প্রভু!"

অখণ্ড দেবী মানসীকে নিজের দুইবাহু দ্বারা উত্তোলন করে বললেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তত আপনি আমার জ্যেষ্ঠা। তাই নতজানু হবেন না কৃপা করে। ... আর হ্যাঁ, বোধি ঠিকই বলেছে, আবেগদের কারণে তোমরা ভ্রমিত ছিলে, যা এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তত স্তব্ধ হয়েছে, কারণ দেবী সর্বাম্বা সমস্ত আবেগদের তোমাদের অন্তর্গত করে দিয়েছেন। আর আমার ক্ষেত্রে, কেবলই অহং আমাকে ভ্রমিত করেনি, কল্পনা, ইচ্ছা তথা চিন্তাও আমাকে ভ্রমিত করে রেখেছে। ...

এটুকু তো আমি স্পষ্ট ভাবে জেনে গেছি যে, এই অহং, কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা, তথা আবেগদের যদি কনো ব্রহ্মাণ্ড নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করতে পারে, তা কেবলই পরাপ্রকৃতির কৃপায় অর্থাৎ আমাদের সর্বাম্বার কারণে। আর এও বুঝে গেছি এতক্ষণে যে, যতক্ষণ না এই আবেগদের, চিন্তাদের, ইচ্ছাদের, কল্পনাদের, এবং অহংকে আত্মসাৎ করে, নিজেদের মধ্যে লয় করে দেওয়া

না হচ্ছে, ততক্ষণ সত্য জানা অসম্ভব। আর এও জেনে গেছি যে সত্য একমাত্র আমাদের সর্বাম্বা। তাঁকে জানাই সত্যজানা, আর তাঁকে না জানাই হলো অজ্ঞান থাকা।

আর এও বুঝে গেছি যে, সত্যকে না জানলে, যেমন আমাদেরকে আবেগরা, ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা, অহং নিজেদের অধীনে স্থাপন করে নিয়েছেন, তেমন করতেই থাকবেন। একমাত্র সত্য জানলেই, আমরা এঁদের সকলের থেকে মুক্ত হয়ে নির্মলতা লাভ করতে পারবো, আর তখনই ব্রহ্মাণ্ডকে তার পরমার্থে স্থাপিত করতে পারবো। ... বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডে, অর্থাৎ ধরিত্রীর ব্রহ্মাণ্ডে, তা এখনই করার সম্ভাবনা নেই, কারণ আমরা যে সত্য জানিই না। ... কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতন মাতার সম্পূর্ণরূপের অবতার, তাই তাঁর মধ্যে যেমন অহং ও আবেগ নিয়ন্ত্রিত করেছেন দেবী সর্বাম্বা, তেমনই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকেও তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন, এবং আমাদেরকে সত্যজ্ঞাতা করবেন।

আর একবার যদি আমরা সত্যজ্ঞাতা হই, তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডের থেকে সেই সত্যজ্ঞান অন্য ব্রহ্মাণ্ডতেও আমরা বিকশিত করতে থাকবো, আর এক সময়ে তা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপিত করবো। আর তেমন করতে পারলে, আর কনোদিনই আমাদেরকে অহং, কল্পনারা বা আবেগরা নিজেদের অধিকারে স্থাপন করতে পারবেন না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড নিজের পরমার্থতে স্থাপিত হতে সক্ষম হবে তখন। ... আর এর সাথে সাথে এও বুঝে গেছি আমি যে, যদি তা সম্ভব হয়, যদি সত্য জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়, তবে এই ব্রহ্মাণ্ডেই তা সম্ভব।

আর এও বুঝেছি যে, মাতার থেকে সত্যজ্ঞান লাভ তখনই সম্ভব যখন আমরা অভিমান ত্যাগ করে, মাতা আমাদেরকে যেই রূপে, যেই ভাবে স্থাপিত রেখেছেন, তাকেই সহজ স্বীকার করে নিয়ে, তাঁর প্রতি নিবেদিত থাকি। তাই আপনারা উচিত বলছেন।... আমি কেবলই অখণ্ড, আপনারাও কেবলই মানসী, বোধি, দখিনা এবং হুতাশন, অন্য কিচ্ছু নই। ... হ্যাঁ, আমরা ভুল করেছি, আর আমরা ব্যকুল আমাদের ভুলকে সঠিক ভাবে জেনে, সেই ভুল থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হয়ে যেতে। ... আর তাই আমরা আমাদের আরাধ্যার কাছে করুণালাভের গুহার জানাবো। ... আর্জি জানাবো তাঁর কাছে যে, মা, আমাদেরকে সত্যের সাথে সাখ্যাতকার করাও। সত্য না

জেনে, আমরা বারংবার ভুল করেছি, আর আমাদের সন্দেহ যে আমরা আবারও ভুলই করবো। তাই আমাদের সত্য জানাও মা"।

দেবী মানসী যেন অখনদের এতকথার অর্থই বুঝলেন না। তিনি ও অন্যভূতরা যেন আজ সত্য অর্থেই শুধুই সন্তান, আর মাকে দেখতে না পেয়ে সন্তান আজ দিশাহারা। তাই এতকথার পরেও মাতা সর্বাম্বা প্রকাশিত না হলে, কান্নায় ভেঙে পরে বললেন, "মা কি আমাদের আর সারা দেবেন না ভাই অখণ্ড! ... মা! ... আমাদের সারা দাও না! ... আমাদের সারা দিয়ে ভর্ৎসনা করো, তাও আমাদের কাছে অতি প্রিয় হবে, কিন্তু এইভাবে আমাদের অনাথ করে দিও না! ... মা! সারা দাও না আমাদের ডাকে!"

দেবী দখিনা এবং হুতাশন ক্রন্দনের সুরে বললেন, "মা! ... কোথায় গেলে মা! ... আমাদের এই ভাবে পরিত্যাগ করে দিসনা মা! ... আমাদেরকে সারা দে মা! ... মা! মাগো!"

বোধি কনো কথা না বলতে পেরে ভূমির দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে বললেন, "মাতা অবয়ব ধারণ করে আছেন, তাই তা বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবলুপ্ত হতে পারেন না, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তার সন্ধান লাভ করা অসম্ভব, কারণ যিনি সেই সন্ধান জানেন, আমরা তাঁর কাছেও অপরাধী"।

মানসী জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, "কার কথা বলছেন আপনি! দেবী ধরিত্রী!... হ্যাঁ, তিনিই নিশ্চয় হবেন! ... তাঁর সেই দুঃসহ অবস্থায় আমরা তাঁকে তিরস্কারই করেছি কেবল। যেখানে তাঁর সমস্যার কারণ জানার প্রয়োজন ছিল আমাদের, সেখানে আমরা তাঁকে অবহেলা করে গেছি। ভুলেই গেলাম যে যেই ব্রহ্মাণ্ডের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের দম্ভ করে চলেছিলাম আমরা, সেই ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই অবয়ব"।

হুতাশন বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্রী মানসী, আবেগদের তাড়নায় আমরা তাড়িত হবার কারণে, কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা ও অহংএর তাড়নায় আমরা তাড়িত হবার কারণে, সম্পূর্ণ মনুষ্যলোক ভগবান হয়ে ওঠার উন্মাদনায় সমস্ত ধরিত্রীকে লুণ্ঠন করে চলেছে। তাঁর সমস্ত অস্থি

মাংসরূপী খনিজকে হনন করে চলেছে তাঁরা, তাঁর শ্বাসগ্রহণের বায়ুমণ্ডলকে মহাকাশযান ও কলকারখানার দ্বারা অশুদ্ধ করে দিচ্ছে, তাঁর লহুর ন্যায় জলধারাকে সর্বক্ষণ দুষিত করে যাচ্ছে। আর আমরা সেই সমস্ত কিছু দেখেও, নিজেদের সম্মানবৃদ্ধি হচ্ছে, এই ভ্রমে সমস্ত কিছুকে সমর্থন করে এসেছি! ... আমরা তো তাঁর কাছে অপরাধী বটেই"।

দেবী দখিনা বেদনাগ্রস্ত হয়ে বললেন, "মানুষের একটি লোমকে, একটি কেশকে উত্তোলন করে নিলে, তাঁরা ব্যকুল ভাবে তারস্বরে চিৎকার করে। অথচ ধরিত্রীর সমস্ত দেহের লোমাবলি, যাকে বৃক্ষরাজি বলে জানি, তাকে উৎপাটন করে ধরিত্রীকে পীড়া প্রদান করে চলেছে, আর আমরা তার সমর্থন করে এসেছি! ... মানুষের মুখমণ্ডলে সামান্য লোম জাগলে, তাকে তাঁরা কেটে ফেলার জন্য উদগ্রীব থাকে, অথচ ধরিত্রীর মুখের মধ্যে বৃক্ষরোপণ করে করে, তাঁরা ধরিত্রীকে কুৎসিত করে তুলছে, আর আমরা তার সমর্থন করে এসেছি, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে, এমন মিথ্যা ধারণা নিয়ে"।

অখণ্ড বললেন, "সঠিক বলেছেন আপনারা। ... দেবী ধরিত্রী আমার কাছে এসেছিলেন নিজের এই বেদনার কথা বলতে, কিন্তু আমি কি করলাম! আত্মসুখে মত্ত হয়ে, মনুষ্য আমাদের পূজা অর্চনা করছেন তাঁকে কষ্ট দিয়েও, তাই আমি তাঁর গুহারকে অস্বীকার করে দিয়েছি। ... মানুষ যে এই আবেগদের বশবর্তী হয়ে, ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা ও অহংএর বশবর্তী হয়ে, কেবলই পূজার নামে ছলনা করছে, অভিনয় করছে, চাতুরী করছে, নাট্য করছে, তা তাদের নাটকীয়তা দেখেও অদেখা করে এসেছি। ...

তারস্বরে চিৎকার করে, তাঁরা ভক্তি নয়, ভক্তির অভিনয় করছে, তা দেখেও দেখিনি। ক্রন্দন করছে না, ক্রন্দনের নাট্য করে নিজেদের ভক্ত বলে আমাদের কাছে দাবি করে গেছে, আর আমরা তাঁদেরকে ভক্ত বলে এসেছি, আর ধরিত্রীকে অবমাননা করে এসেছি। ভণ্ডামি করে নিজেদেরকে আমাদের ভক্ত বলে চিহ্নিত করে, সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে অধিকার স্থাপনের লড়াই করে চলেছে, তা দেখেও আমরা দেখিনি, এই ভেবে যে আমাদের নামের প্রসার তো হচ্ছে। ... সঠিক বলেছেন আপনারা, আমাদের প্রথম ধরিত্রী দেবীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা

উচিত। ... তিনি দেবী সর্বাম্বার অবস্থান জানুন আর না জানুন, আমাদের বলুন আর না বলুন, আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, কারণ আমরা তাঁর সাথে অভদ্রতা করেছি, তাঁকে অপমান করেছি, তাঁর প্রতি অপরাধ করেছি"।

এতবলে, অখণ্ড, স্বামীসহ মানসী, এবং স্বামীসহ দখিনা ব্যাকুল নয়নে, দেবী ধরিত্রীকে আবাহন করলে, দেবী ধরিত্রী সেখানে উপিস্থিত হলেন ও বললেন, "আপনাদের সকলকে আমার হৃদয় থেকে ধন্যবাদ। আপনারা যদি আমার প্রতি অনাচার না করতেন, আর না করতে দিতেন মানুষকে, তবে মাতা এই ভাবে প্রথমবার নিজের সমস্ত উর্জাসহ আমার গর্ভে স্থিতা হয়ে অবতরণ করতেনই না। ... আপনারা আমাকে মাতার স্পর্শসুখ অনুভব করতে দিয়েছেন। তিনি ব্রহ্মসনাতনের দেহধারণ করে, আমার বক্ষে নিজের চরণ স্থাপন করেন; আমার বক্ষে তিনি নিজের সুতনু স্থাপন করে নিদ্রা যান, আমাকে তিনি যেই পরিমাণ আনন্দ প্রদান করেছেন, আর আমার কনো বেদনা নেই। ...

তিনি এক্ষণে ব্রহ্মসনাতনের কুলকুণ্ডলিনীর মূলাধারে অবস্থান করছেন, এবং ক্রমশ তিনি উন্নত হতে হতে সহস্রারে নিজেকে স্থাপন করে, ব্রহ্মসনাতনকে তাঁর বাস্তবিক পরিচয়, অর্থাৎ তিনি যে সাখ্যাত পরাপ্রকৃতির পূর্ণঅবতার, সেই পরিচয় প্রদান করবেন। তিনি নিজের কর্ম থেকে অপসারিত হবেন না। আপনারা তাই সেখানে গমন করে, তাঁর সাথে যুক্ত হন। বাকি সমস্ত লীলা তিনি সেখানে স্থিতা হয়েই করবেন। তাই শীঘ্রই গমন করুন সেখানে। আমি আপনাদের সাথে সেখানে গমন করবো না, কারণ মাতারই নির্দেশে আমি ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ তনু নির্মাণ করে, তাতে স্থিতা হয়ে, ব্রহ্মসনাতনের পত্নী হবার পথে অগ্রসর"।

অখণ্ড বললেন, "ধরিত্রী, তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আমরা তোমার সাথে অন্যায় করেছি, অধর্ম করেছি, অপরাধ করেছি তোমার সাথে"।

ধরিত্রী দেবী হাস্যমুখে বললেন, "আর কথায় কথায় সময় নষ্ট করবেন না নাথ; আপনারা শীঘ্রই গমন করুন মূলাধারে, একবার মাতা সেখান থেকে অনাহতে উপনীত হলে, মূলাধারের দ্বার

সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না সেখানে। তাই শীঘ্রতা করুন”।

দেবী ধরিত্রীর কথা মত অখণ্ড সকলকে নিয়ে মূলাধারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অন্যদিকে উপপতি, বলদম্ভ এবং আবর্ত অতিশয় কষ্টে নিজেদের দেহকে উত্তোলন করলেন, কিন্তু তাঁদের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ছিল, তাই তাঁরা সমস্ত কথা শুনে নিয়েছেন অখণ্ডদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা হতাশ। আবর্ত বললেন, “মাতা যে বলেছিলেন, তিনি আমাদের হত্যা তো করবেন না, কিন্তু এমন অবস্থা করবেন যাতে আমরা নিজেরাই আমাদের হত্যার ইচ্ছা প্রকট করি, তা উনি সঠিকই বলেছিলেন। আজ আমাদের হাল দেখে তো তাই মনে হচ্ছে ভ্রাতা!”

উপপতি বললেন, “সর্বাম্বা ত্রিদেবীর কনো একটি রূপ নয়, সম্পূর্ণ রূপ, অর্থাৎ ইনিই হলেন তিনি! এর মানে তো, আমাদের হত্যা কেবলই সময়ের অপেক্ষা! ... ত্রিদেবও অখণ্ড বেশে একদেহী হয়ে উপস্থিত এখানে। অর্থাৎ ইনার ও মাতা সর্বাম্বার সন্তানও এলেন বলেই। ... আমাদের কিছু করা প্রয়োজন। এখন না করলে যে অতিরিক্ত বিলম্ব হয়ে যাবে ভ্রাতারা!”

বলদম্ভ বললেন, “কিন্তু কি করা যায়! কি আর করতে পারবো আমরা! ... আমাদের যা অবস্থা করেছেন সর্বাম্বা, আমরা তো আর বীর্যবানও হতে পারবো না আশা করি! ... আমাদের সন্তান থাকলে, তারা আমাদের রক্ষাকবচ হতো। ... ত্রিদেবীর একাকীত্ব রূপ এসে গেছে, অর্থাৎ তাঁর সন্তানও এসেই যাবে। পরানিয়তি নেই, তাই আমাদের সন্তান থাকলে, তাঁদের হত্যা হতো না, আর তাঁদের হত্যা না হলে, আমাদেরও বিনাশ সম্ভব হতো না। কিন্তু তা আর এখন কি করে সম্ভব!”

আবর্ত বললেন, “আর সেই সমস্ত কিছু ভেবে লাভ নেই ভ্রাতারা। যদি আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন, তাহলে একমাত্র আমাদের মাতারাই বাঁচাতে পারেন। পিতা আর আমাদের আবেগ ভাইদের তো আর কনো পৃথক অস্তিত্বই রইলো না এই ব্রহ্মাণ্ডে। ... আমাদেরকে এই ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুক্ত হতে হবে। তা নাহলে, আমাদের আর কনো রেহাই নেই”।

এত বলে, তিন ভ্রাতা ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়দেশ থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রাণপণে যাত্রা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এই যাত্রার পথে দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হলো ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই। যেই উপবন থেকে তাঁরা দেবী মানসীকে অপহরণ করেছিলেন, সেই স্থান যখন তাঁরা পদচারণ করে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁদের সম্মুখে তিনটি তরুণ এসে উপস্থিত হন।

বলদম্ভ তাঁদের দেখে হতচকিত হয়ে বললেন, “কে তোমরা! ... এখানে কি চাই! ... আমরা কনো যুদ্ধ করতে চাইনা এখন। আমাদের দেহে আর যুদ্ধ করার বল নেই। আমাদের পথ ছাড়ো”।

সেই তিন কিশোর সম্মুখে এসে বললেন, ‘পিতা, আমরা আপনাদেরই ঔরসে জাত সন্তান। ... আমার নাম হিম্লহু, আমার নাশ ততক্ষণ করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ আমার লহু প্রবাহিত হতে থাকবে, কারণ আমার প্রবাহিত লহুর থেকে জন্ম নেয় অসংখ্য প্রাণ, অর্থাৎ যতক্ষণ আমার লহু প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষণ আমার বলের বৃদ্ধি হতেই থাকবে। ... এই আমার ভ্রাতা ঋপু, এঁর উপর কনো ধাতু ক্রিয়া করেনা। তাই কনো অস্ত্রদ্বারা এর নিধন সম্ভবই নয়। এঁর নিধন তিনিও করতে পারবেন না, যিনি কর্মের দ্বারা সীমাবদ্ধ, যিনি নাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ, বা যিনি বিচারের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

পিতা দেখুন এঁকে! দেবী শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী স্বয়ং মায়া, আর মায়া মাত্রই বিচারের থেকে উৎপন্ন, আর তাই তিনি বিচারের দ্বারা সীমাবদ্ধ। পিতা, বাগদেবী সরস্বতীও নাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেই নাদ উৎপন্ন হয়নি, তিনি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। নাদ উৎপন্ন হলে, সেই নাদকে তিনি পরিবর্তন করতে সক্ষম, ইন্দ্রাসনকে নিদ্রাসন রূপে উচ্চারিত করাতে সক্ষম। তাই ঋপু দেবী সরস্বতী দ্বারাও বদ্ধ নয়। আবার দেবী আদিশক্তি; তিনি কর্মের কর্মফল প্রদান করেন, কিন্তু কে কি কর্ম করবেন, তার নিয়ন্তা তিনিও নন। তাই আপনার এই পুত্র, আদিশক্তি দ্বারাও বদ্ধ নন, আর তাই ত্রিদেবী নিজনিজগুণসহ একত্রিত হয়ে একটি রূপ ধারণ করলেও, এঁর নিধন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

আর পিতা, আমাদের এই তৃতীয় ভ্রাতাকে দেখুন, এর নাম ভাঞ্চ, এর মৃত্যু সম্ভবই নয়, একমাত্র এঁকে মহাশূন্যে বিলীন করা সম্ভব, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই এঁর নাশ করতে সক্ষম। ... পিতা আমাদের বরণ করে নিন। ... আমরা কে, আপনাদের কার সন্তান, তা জানিনা, কারণ আপনারা দেবী মানসীকে দেখে যেই বীর্যপাত করেছেন, তার থেকে আমাদের জন্ম। তাই এমনও হতে পারে যে আমাদের তিনজনের মধ্যেই আপনাদের তিনজনেরই বীর্য উপস্থিত আছে"।

বলদম্ভদের যেন এই তরুণদের কথা শুনে নবজীবন প্রত্যাবর্তন করলো। তাঁরা উজ্জীবিত হয়ে বললেন, "ধন্য হয়ে গেলাম আমরা। আমরা যে তোমাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম। এসো আমাদের সাথে এসো, রাজমাতারাও তোমাদের দর্শন লাভ করে তৃপ্ত হবেন"।

এতো বলে ত্রিপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অহংপুত্ররা ব্রহ্মসনাতনের হৃদয় থেকে নির্গত হয়ে, ব্রহ্মসনাতনের মস্তিষ্কে গমন করা শুরু করলেন, কারণ সেখান থেকেই ধরিত্রীর ব্রহ্মাণ্ডের আবেগলোকে গমন সম্ভব। কিন্তু ততদুর আর যেতে হলো না, কারণ মহারানী কল্পনা, এবং রানী ইচ্ছা ও চিন্তা, হৃদয়ের দ্বারেই অপেক্ষা করছিলেন। মাতাদের দর্শন লাভ করে, বলদম্ভরা আপ্লুত হলে, দেবী কল্পনা বললেন, "কি হয়েছে তোমাদের! ... তোমাদের এই হাল কি করে হলো?"

আবর্ত বললেন, "মাতা, যেই স্ত্রীকে আমরা অপহরণ করতে গেছিলাম, তিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের মন সে। এখানে ব্রহ্মসনাতনের মন মানসী বেশে উপস্থিত, বুদ্ধি অর্থাৎ বরুণদেব বোধি বেশে মানসীর স্বামী; পবনদেব দেবী দখিনা বেশে দেবী মানসীর মাতা, এবং হুতাশন বেশে থাকা অগ্নির স্ত্রী। আর এই দেবী দখিনা ও হুতাশনের কনিষ্ঠা কন্যা হয়ে অবস্থান করছেন দেবী সর্বাম্বা, যিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং ত্রিদেবীর একত্রিত রূপ"।

উপপতি বললেন, "মহারানী, আমাদের এই অবস্থা যার কারণে হয়েছে, তিনি হলেন সেই দেবী সর্বাম্বা, যিনি দখিনা হুতাশনের কনিষ্ঠা কন্যা, এবং মানসীর ভগিনী হয়ে অবস্থান করছেন, এবং সাখ্যাতে তিনি হলেন ত্রিদেবীর একত্রিত রূপ। ... মাতা, তিনি আমাদের পিতা অহংকে

ভস্মীভূত করে, ত্রিদেবের মিলিত একাত্মপ্রকাশ অখণ্ডের মধ্যে বিলীন করে দিয়ে, ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে অহংকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মের অধীনে স্থাপন করে দিয়েছেন। আর তিনিই সমস্ত আবেগদের ধুলায় পরিণত করে, সমস্ত ভূতদের মধ্যে বিলীন করে, তাঁদের দাস করে দিয়েছেন। ... আমাদের পিতা আর নেই মহারানী! আর আমাদের প্রজারাও সমস্ত নিহত হয়ে গেছে"।

এই কথাতে তিন দেবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁদের নেত্র ছলছল করে এলো পতির বিয়োগে। এমন অবস্থায় বলদম্ভ বললেন, "কিন্তু চিন্তা করবেন না মাতা! ত্রিদেবীর মিলিত রূপও যাদের নিধন করতে পারবেনা, তেমন তিনপুত্রের পিতা হয়েছি আমরা এখানে এসে। এটিই আমাদের এখানে গমনের প্রাপ্তি বলতে পারেন। ... এই দেখুন মাতা, আমাদের তিন পুত্র, হিম্লহু, ঋপু ও ভাঞ্চ। হিম্লহুকে যতই আঘাত করা হবে, ততই ওর বলবৃদ্ধি হবে; ঋপুকে তো ত্রিদেবী মিলিত ভাবেও হত্যা করতে সক্ষম নয়; আর ভাঞ্চ! তার তো মৃত্যুই সম্ভব নয়"।

দেবী কল্পনার সেই কথাতে নেত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, "বলদম্ভ, আবর্ত, উপপতি! এবার সময় এসেছে, তোমরা ও তোমাদের এই তিন বীর পুত্রকেও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিকশিত করে দাও। এই ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং ত্রিদেবীর মিলিত উর্জা বর্তমান। হতেও পারে, তিনি তোমাদের নাশ করে দেবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে যদি বিস্তৃত হয়ে যাও তোমরা সকলে, তাহলে তোমাদের অস্তিত্ব সদাবর্তমান থাকবে। ... তাই তোমরা ছড়িয়ে যাও এই ব্রহ্মাণ্ডে। তবে আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডেই থাকবো, যতক্ষণ না আমাদের স্বামীর মৃত্যুর প্রতিকার নিতে পারছি"।

বলদম্ভ বললেন, "মাতা, বিস্তার তো আমরা করবোই। তবে যিনি আপনাদের স্বামী, তিনি আমাদের পিতা। পিতার মৃত্যুর প্রতিকার না গ্রহণ করে চলে যাওয়া, এ যে কায়েরের কর্ম। আমরা কায়ের হয়ে থাকতে পারবো না। তাই আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে এই ব্রহ্মাণ্ডতেই বিরাজ করবো, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে নেবার পরেই, আমরা অন্য ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করবো। এই মুহূর্তের খবর এই মাতা যে, অখণ্ড ও অন্য ভূতরা মূলাধারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, দেবী সর্বাম্বাকে মানানোর জন্য। আমাদেরও সেই উদ্দেশ্যেই যাওয়া উচিত,

নাহলে সুষুম্নার দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, আর আমাদের প্রতিকার নেওয়া হবেনা। ... চলুন মাতা, শীঘ্রতা করুন"।

নিয়তলীলা

নিয়তির লীলা সত্যিই অপার। সমস্ত কর্ম তিনিই করেন, কিন্তু তিনি এক অদ্ভুত নিঃস্বার্থ চিত্রকর যেন! চিত্রকর নিজের চিত্র অঙ্কন করে, তাতে নিজের সাক্ষর রেখে দেন, যাতে সেই চিত্র যে তাঁর অঙ্কিত, তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু নিয়তি এমনই চিত্রকর, যিনি নিজের অঙ্কিত চিত্রতে নিজের সাক্ষরটিও করেন না। ফলে, সেই চিত্র যে নিয়তির দ্বারা অঙ্কিত, তা আমরা জানতেও পারি না। ঠিক যেমন যেই চিত্রে সাক্ষর নেই, তাকে আমরা নিজেদের নামে চালিয়ে দিয়ে, সেই চিত্র আমার দ্বারা চিত্রিত, এমন দাবি করে থাকি প্রায়শই, তেমনই সাক্ষরহীন নিয়তিদ্বারা প্রস্তুত করা চিত্রকে আমরা নিজেদের চিত্রাঙ্কন বলে চালিয়ে থাকি।

সাক্ষরহীন নিয়তির দ্বারা করা সমস্ত কর্মকে আমরা বলতে থাকি যে, আমারা করেছি, আর এই ভাবে নিজেদের কর্তা জ্ঞান করতে থাকি। হয়তো প্রথম প্রথম, আমাদের স্মরণও থাকে যে সেই কর্ম আমরা করিই নি। কিন্তু ক্রমাগত যা অসত্য, তাকেই সত্য জ্ঞান করার জন্য, একসময়ে আমরা ভুলতেই শুরু করে দিই যে আমরা প্রকৃত কর্তাই নই, আর সেখান থেকেই আমাদের কর্তাবধের সঞ্চার হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলতে গেলে, অজস্র উদাহরণ সম্মুখে আসে। এদের মধ্যে কিছু উদাহরণ বড়ই প্রত্যক্ষ ভাবে বলে দেয় যে আমাদের স্বভাবই হলো যেই কর্তা আমরা কখনোই ছিলাম না, সেই কর্মের কর্তাও আমরা নিজেদেরকেই বলি। যেমন ধরে নেওয়া যাক, একটি ব্যক্তি কনো উচ্চপদস্থ চাকুরী লাভ করলেন। সেই চাকুরী লাভ করার পর, তিনি ও তাঁর পরিবার বলে ফেরেন যে সেই ব্যক্তি কতই না পরিশ্রম করে সেই চাকুরী নিজের জন্য জুটিয়েছেন। কিন্তু সেই কথা বলার ক্ষেত্রে, তাঁর একবারও স্মরণ আসেনা যে সেই চাকুরীর কথা তিনি জানলেন কি করে!

কারুর না কারুর মুখ দ্বারা নিয়তিই সেই চাকুরীর সংবাদ প্রেরণ করেন তাঁর কাছে, প্রেরণা প্রেরণ করেন তাঁকে সেই চাকুরী করার জন্য, এবং সেই প্রেরণার জোরেই তিনি সেই চাকুরী লাভ করেন। কিন্তু আমাদের স্বভাব হলো আমাদের কর্তাভাবকে সকলের সম্মুখে এমনকি

নিজের দৃষ্টির সম্মুখেও প্রদর্শিত করা, তাই আমরা সেই বার্তালাভকে সহজেই ভুলে যাই, সেই প্রেরণালাভকে সহজেই ভুলে যাই।

একই কীর্তি আমরা করে থাকি সন্তানকে ভালো বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার কালে, ভালো সঙ্গীতগুরু, ভালো শিক্ষাগুরু ইত্যাদি লাভের ক্ষেত্রেও। ভুলেই যাই আমরা যে সেই গুরুর সন্ধান আমরা স্বয়ং করিনি; সেই গুরুর নির্মাণ আমরা স্বয়ং করিনি, সেই গুরুর সাথে আমাদের আলাপও আমাদের স্বয়ংএর প্রয়াসে হয়নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা এই কীর্তি করে থাকি, এমনকি আমাদের বিবাহের ক্ষেত্রেও বা সন্তানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও ।

কারুকে বিবাহ করে, আমরা ধন্য হয়ে গেছি। সেক্ষেত্রেও আমরা কৃতিত্ব আমাদের কর্তাভাবকেই প্রদান করি। আমরা বলতে থাকি, কত সাধ্যসাধনা করে তোমাকে নিজের পতি বা পত্নী করে পেয়েছি, আমার পছন্দ কেমন, সেটা বলো! ... কিন্তু এই কথা বলার ক্ষেত্রে, যা আমাদের একটিবারও স্মরণ থাকেনা, তা হলো সেই পাত্র বা পাত্রীর যে জগতে অস্তিত্ব আছে, সেই সংবাদ আমরা কি করে পেলাম! ... সেই পাত্রকে বা পাত্রীকে কি আমরা নিজের প্রয়াসে, নিজের প্রচেষ্টায় নিজেদের সামনে উদিত করেছি, আর নিজের চেষ্টায় উদিত করে, তার প্রতি প্রণয় আকৃষ্ট হয়েছি! ...

যদি একটিবারও তা স্মরণ রাখতাম, তাহলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম যে, নিয়তি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রেখে দিয়েছিলেন আমাদের বিবাহ, আর তাই আমি সেই পাত্র বা সেই পাত্রীর সম্মুখে উপস্থিত হই; কেউ না কেউ আমার সম্মুখে সেই পাত্র বা পাত্রীকে উপস্থিত করেন; আর সকলেই আমাদেরকে পতিপত্নিরূপে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। ... একই ভাব আমাদের সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষেত্রেও আমরা করে থাকি। আমার সন্তান, আমার সন্তান, এমন দিবারাত্র করতে থাকি আমরা।

এমন করি আমরা যেন, সেই সন্তানের নির্মাণ করেছি আমরা। আচ্ছা বলুন তো, আপনার দ্বার থেকে কেউ মাটি তুলে নিয়ে গেলেন, আর আপনার বাড়ির বারন্দায় থেকে, সেই ব্যক্তি সেই

মাটিদিয়ে একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। সেই মূর্তি কে নির্মাণ করলেন, সেই ব্যক্তিটি, নাকি আপনি, যার বাড়ির মাটি আর উঠান নেওয়া হয়েছে, সেই মূর্তি নির্মাণের জন্য! সেই শিল্পীই তো এই মূর্তির নির্মাতা, তাই না!

তাহলে আপনারাই বলুন, আপনাদের মাটি, অর্থাৎ আপনাদের বীর্য গ্রহণ করা হয়, এবং আপনাদের পত্নীর গর্ভ অর্থাৎ উঠানে সেই মাটি দিয়ে মূর্তি নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেই মূর্তির নির্মাতা কি করে আপনারা হতে পারেন! কিন্তু আমরা সর্বক্ষণ সেই দাবিই করে যাচ্ছি, আর যেই আমি কর্তা কখনোই নই, শিল্পী কখনোই নই, তাকেই শিল্পীর তকমা দিয়ে চলেছি সর্বক্ষণ। নিয়তিই হলেন সমস্ত কিছুর নির্মাতা, সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা, সমস্ত প্রেরণা তাঁর থেকেই আসে, সমস্ত যোগাযোগ তিনিই সৃষ্টি করেন। অথচ আমরা নিজেদেরকে ও সকলকে সর্বক্ষণ অসত্য বলে চলেছি যে, আমরাই হলাম কর্তা।

আপনারা সত্যকথা মিথ্যা কথার ব্যাপারে খুবই চর্চা করেন, সকলেই করেন, কিন্তু বাস্তব এই যে এই সমাজে সত্যবাদী কেউ নেই। যিনি যিনি নিজেকে কর্তা জ্ঞান করেন, তাঁরা সকলেই মিথ্যাবাদী, কারণ তাঁরা সর্বক্ষণ মিথ্যা কথাই বলছেন, নিজেকেও এবং সকলকে। ব্রহ্মসনাতনের অন্তরেও তখন সেই মিথ্যার অপসরণ হচ্ছিল এবং সত্যের সঞ্চার হচ্ছিল, কারণ সেখানে তাঁর ত্রিগুণ, তাঁর সমস্ত ভূত নিজেদের পোশাকি কর্তাভাব ত্যাগ করে, নিয়তিকেই, মাতা সর্বাম্বাকেই কর্তা জ্ঞান করার উদ্দেশ্যে চলছিলেন।

মিলন সংসার

আর সেই উদ্দেশ্যকে না জেনেই , অখণ্ড নিজের সাথে মানসী , বোধি, দখিনা এবং হুতাশনকে নিয়ে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয় দেশ থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁরই মূলাধারের দিকে। অন্যদিকে দেবী কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাও তাঁদের তিন অর্ধপ্রজ্বলিত পুত্র , আবর্ত, উপপতি এবং বলদম্ভকে

সঙ্গে নিয়ে, এবং তাঁদের সন্তানদের অর্থাৎ হিম্লহু , ঋপু ও ভাঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে সেই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে থাকলেন।

দেবী ধরিত্রীর কথা মত, যখন অখণ্ড অন্য সকলকে নিয়ে সুষুম্নার দ্বারে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা দেখলেন এক প্রকাণ্ড গুহাদ্বার তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত। যেন সেই গুহার কনো অন্তই দেখা যাচ্ছেনা! ... গহন অন্ধকার সেই গুহার অন্তরে। অখণ্ডকে হুতাশন প্রশ্ন করলেন , "প্রভু, আমি অগ্নি, আমাকে কি নিজের অগ্নির সঞ্চার করতে হবে, এই গুহার মধ্যস্থলকে আলোকিত করার জন্য?"

দেবী মানসী উত্তরে বললেন , "না আপনি অগ্নিদেব নন।... আপনি কেবলই আমার পিতা , আমার সর্বার পিতা, আমার মাতা দেবী দখিনার স্বামী, এবং আমার স্বামী বোধির শ্বশুর। ... কেন নিজের অভিমানকে ভুলতে পারছেন না আপনি! ... যেই অভিমানের কারণে, আমাদেরকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে আবেগদের দাস হয়ে থাকতে হচ্ছে , যেই অভিমানের কারণে আমরা ধরিত্রীর অপমান করেছি, আমরা স্বয়ং আমাদের জননীর অপমান করেছি, আপনার কাছে এখনো সেই অভিমান এতো প্রিয়!"

হুতাশন সেই কথা শ্রবণে লজ্জিত হয়ে নিজের মস্তক নিম্নগামী করলে, অখণ্ড বললেন, "সঠিক বলেছে দেবী মানসী। আমাদের কেবলই মাতার উপর ভরসা রেখেই সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এমন হতে পারে যে, মাতা আমাদের প্রতিমুহূর্তে পরীক্ষা গ্রহণ করবেন যাতে আমরা যেই অভিমান দ্বারা সমস্ত মিথ্যাকে আশ্রয় করে ছিলাম , সেই মিথ্যার পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করি। আমাদের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে , মুক্ত করতেই হবে আমাদের সমস্ত অভিমান কে আমাদের থেকে, আর সমর্পিত হতে হবে মাতার প্রতি।

এখন আমরা কেবলই মাতার শিষ্য, আর এক সেই শিষ্য কেমন শিষ্য যিনি গুরুর প্রতি সমর্পিত নন, যিনি গুরুর উপরে নিজের অভিমানকে , নিজের ধারণাকে, নিজের সংস্কারকে, নিজের অতীতকে স্থান দেন! ... আমাদের এখন যোগ্য শিষ্য হবার সময় আসন্ন। যদি আমরা

নিজেদেরকে যথার্থ শিষ্যরূপে স্থাপন করতে পারি , তবেই আমাদের গুরু, স্বয়ং দেবী সর্বাম্বা আমাদেরকে সত্যের জ্ঞান প্রদান করবেন"।

গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে করতে , বোধি বললেন, "এ এক বিকট পরিস্থিতি অখণ্ড। আমাদেরকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে মাতা সর্বাম্বা স্বয়ং পরাপ্রকৃতি , আমাদের সকলের জননী, কিন্তু আমাদেরকে ভুলতে হবে যে আমরা কে। একই সঙ্গে, দুটি বিপরীতগামী তরঙ্গের সাখ্যাত করতে হচ্ছে আমাদের, তাই না!"

দেবী মানসী সামান্য বিরক্ত হয়েই বললেন , "ভক্তিকে ধারণ করুন নাথ, ভক্তি আমাদেরকে সর্বদাই এই দুই তরঙ্গের মধ্যে স্থাপিত রাখে। ... এক ভক্ত একদণ্ডের জন্যও ভোলেন না যে যার উপর তিনি আশ্রিত, তিনি তাঁর আরাধ্যা। কিন্তু পাশাপাশি, তাঁর আরাধ্যা তাঁর পরমাত্মীয়া, তাঁর প্রাণের প্রিয় তিনি, সেটাও তিনি একদণ্ডের জন্য ভোলেন না । যিনি নিজের আরাধ্যাকে আরাধ্যার সিংহাসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য করেন নিজের পরমাত্মীয়তার বলে, তিনিই তো ভক্ত, তাই না নাথ!...

সিংহাসনে আঢ়ুর যিনি, তিনি তাঁরা আরাধ্যা, এই জেনে, সর্বক্ষণ তাঁর উদ্দেশ্যে আচারবিচার ইত্যাদি করতে থাকেন যিনি, তিনি পূজারি হতে পারেন, ভক্ত কি হতে পারেন! ... যিনি সর্বক্ষণ এটিই স্মরণ রাখেন যে সিংহাসনে যিনি বিরাজমান, তিনি আরাধ্যা, আর তাঁর কাছে সর্বক্ষণ কিছু না কিছু কামনা করতে থাকেন, কারুর না কারুর সুস্থতা, সামর্থ্যতা বা সমৃদ্ধি কামনা করতে থাকেন, তিনি কি ভক্ত হন? না, তিনি যাচক হয়েই থেকে যান"।

দেবী দখিনা সহমত পোষণ করে বললেন , "মানসী সঠিক বলেছে পুত্র বোধি। যিনি ঈশ্বরীর থেকে যাচনা করতে থাকেন , তিনি হলেন যাচক ; যিনি ঈশ্বরীর প্রতি আচারবিচার করতে থাকেন, তিনি হলেন পূজারি; কিন্তু এঁদের একজনও ঈশ্বরীর কাছে ভক্তরূপে পরিগণিত হননা। ... ভক্ত তিনি, যিনি তাঁকে ঈশ্বরী বলে জানেনও, চেনেনও, কিন্তু সেই সমস্ত কিছুর পূর্বে, সেই সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে, তিনি তাঁর কাছে পরমাত্মীয়া। তিনি তাঁর কন্যা , তাঁর মাতা, তাঁর ভগিনী,

তাঁর সখি, তাঁর প্রেমিকা... আর সেই বোধ তাঁর মধ্যে সর্বক্ষণ উজ্জ্বল থেকে , তিনি নিজের আরাধ্যের আনন্দের চিন্তায় রত।

কি করলে আমার আরাধ্যের আনন্দ হবে , ভালো সুরেলা ও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাবো , সুন্দর সুস্বাদু ও রসনার সমস্তভাগকে তথা উদরের সমস্ত প্রাণরসকে সঞ্চারিত করবে এমন আহার করাবো, সুন্দর করে সজ্জিত করবো , বিবেকবৈরাগ্য জাগরণকারী কথা শ্রবণ করাবো , সর্বক্ষণ তিনি আমার তথা সকলের জীবনকে মার্গদর্শন করছেন , তা প্রত্যক্ষ করবো, এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক ভক্ত থাকেন। এক ভক্ত নিজের জন্য কিছু চাইতেই পারেন না নিজের আরাধ্যার থেকে, চাইবেন কি করে? তিনি যে নিজেকে দেখতেই পান না! ... সর্বক্ষণ নিজের আরাধ্যাতেই এমন উলমালা তিনি যে, নিজেকে কখন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, তা তিনি নিজেই জানেন না!"

দেবী মানসী পুনরায় বললেন, "সঠিক কথা, এক ভক্ত নিজেকে নিজের স্মৃতিপট থেকেই হারিয়ে ফেলেন। তাঁর কাছে, এক তাঁর আরাধ্যাই হলেন সমস্ত কিছুর কর্তা; তাঁর সঙ্গে হয়ে চলা সমস্ত ঘটনা, সমস্ত অপমান, সমস্ত তিরস্কার, সমস্ত কিছু তাঁর আরাধ্যাই তাঁকে প্রদান করছেন, কারণ তিনি মার্গভ্রষ্ট। আর তাই এক ভক্ত যে সকলের তিরস্কার , সকলের করা অপমানের মধ্যেও নিজের আরাধ্যার প্রেমকে অনুভব করেন"।

বোধি বললেন, "ঠিক যেমন দেবী ধরিত্রী আমাদের বললেন, তেমন! ... জগতবাসীর করা সমস্ত অত্যাচার, আমাদের করা সমস্ত অপমানকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন যে , সকলে তাঁকে এমন অবহেলা করেছেন বলেই, তিনি আজ নিজের বক্ষস্থলে মাতার চরণস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে গেছেন। তেমনটা!"

অখণ্ড হেসে বললেন, "সেই শব্দটি শুনে তোমার কেমন লেগেছিল?"

বোধি বললেন, "বিস্মিত হয়ে গেছিলাম। মনে হয়েছিল, এত অপমান, এত অত্যাচারকেও কেউ কি করে ধন্যবাদ দিতে পারে!"

দেবী মানসী হেসে বললেন , “একেই ভক্তি বলে নাথ! ভক্তি যে আমাদের আমিকে দেখতেই দেয়না। সে কেবলই দেখায় যে আমার আরাধ্যা আমাকে কতটা প্রেম করেন, সে এটা দেখতেই পায়না যে সে নিজে তাঁর আরাধ্যাকে কতটা প্রেম করেন। আর নিজের প্রেমকে দেখতে না পেয়ে, কেবলই নিজের আরাধ্যার প্রেমকে দেখতে পাবার জন্যই যে তিনি ভক্ত, আর তাঁর সেই অসামান্য ভাবের কারণে যে স্বয়ং তাঁর আরাধ্যা , স্বয়ং আমাদের মাতা তাঁকে নিজের হৃদয়ে আগলে রাখেন। ... চরম প্রাপ্তি, ... সত্যই চরম প্রাপ্তি”।

দেবী মানসীর এই কথা বলার সময়ে নেত্র অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে উঠলো। ... তিনি আবার বললেন, “পুরুষত্বের অহংকারে চূড় ছিলাম, তাই এই স্বাদ কনোদিনও পাইনি। আজ প্রথমবার, স্ত্রী হয়ে, মাতাকে নিজের ভগিনীরূপে লাভ করে, যখন তাঁর হৃদয়ে মাথা রেখেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, মিথ্যাই আমি ইন্দ্র , মিথ্যা সমস্ত কিছু , এক ও একমাত্র সত্য হলো আমার সর্বাম্বার প্রেম। ... মোহগ্রস্ত ছিলাম, আপনার সাথে রমণে সদারত ছিলাম নাথ, কিন্তু মন পরে থাকতো আমার ভগিনীর ক্রোরে। সে এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা, যেন সত্য আর মায়ার টানাটানির মধ্যে স্থিত হয়ে আমি পিষে যাচ্ছিলাম! ...

একদিকে মায়া আমাকে আপনার সঙ্গলাভে রমণসুখ লাভ করতে বাধ্য করছে, আবার অন্যদিকে যখন সেই রমণসুখ আমি লাভ করছি, তখন আমার হৃদয় সর্বক্ষণ ক্রন্দন করছে, আমার সর্বার থেকে দূরে চলে আসার জন্য। ... ব্যকুল হয়ে থাকতাম , কখন এই রমণপর্বের সমাপ্তি হবে , আর কখন আমার সর্বার কাছে প্রত্যাবর্তন করবো। ... সর্বা আমাকে ভক্তির স্বাদ চাকিয়েছে , আর আমাকে ধন্য করে দিয়েছে। দেবরাজ হয়েও যেই তৃপ্তি লাভ করিনি , তা লাভ করিয়েছে আমাকে দিয়ে। সত্ত্বার চিন্তা না থাকলেও যে এমন আনন্দ লাভ করা সম্ভব , এমন তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব, সেই বোধ আমার মধ্যে জাগিয়েছে আমার সর্বা।

তাই নাথ , এই বিড়ম্বনা আর আমার মধ্যে বিরাজ করেনা। আমি ইন্দ্র না দেবরাজ না আকাশতত্ত্ব না মন, এই সমস্ত পরিচয়ের আমার কাছে আর কনো মূল্য নেই। আজ আমার কাছে আমার একটিই পরিচয় প্রিয়, আর তা হলো আমি সর্বার ভগিনী , আমি আমার সর্বার আদরের,

স্নেহের, যতনের আত্মীয় l আর এই পরিচয় লাভ করে , আমি এতই আনন্দ পেয়েছি যে বাকি সমস্ত পরিচয়ই আমার কাছে বড় ফিকে লাগছে। ভক্তির রঙ এমন , তা আমার পূর্বে জানাই ছিলনা! ...

ভক্ত কেন ঈশ্বরীকে তাঁর সিংহাসন থেকে নামিয়ে নিয়ে নিজের পরমাত্মীয় বোধ করেন , সেই নিয়ে আমারও আপত্তি ছিল এককালে। ভাবতাম , এত ধৃষ্টতা কি করে হয় তাঁর! ... এক তুচ্ছ মনুষ্য হয়ে, স্বয়ং ঈশ্বরীকে সিংহাসন চ্যুত করে দেয়! নিজের আহার করা এঁটো প্রদান করে! নিজের ধারণ করা বস্ত্র, নিজের ধারণ করা গহনা প্রদান করে! এই সমস্ত দেখে, আমি এঁদেরকে তুচ্ছ, অজ্ঞানী মনুষ্য মনে করতাম। মনে করতাম, এঁদের সামান্য শুচিঅশুচির বোধ পর্যন্ত নেই, এঁরা ঈশ্বরীকে অশুদ্ধ করে দিচ্ছে!

অপরদিকে দেখতাম, মাতা তাঁদের কাছেই যান, আর তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেই চাননা যারা আমার ন্যায় আচারবিচার করেন। ঈশ্বরীর জন্য পৃথক বস্ত্র , পৃথক খাদ্য, পৃথক গহনা, পৃথক সমস্ত কিছু করি , আর কারুকে স্পর্শ করতে দিইনা সেই সমস্ত কিছুকে। ... দেখে অবাক লাগতো, আর নিজেকে নিজে বোঝাতাম , মা যেমন নিজের দুর্বল সন্তানের কাছেই থাকেন , তেমনই করেন এইক্ষেত্রে।

কিন্তু আমার সর্বা আমাকে ধন্য করে দিয়েছে এই দেহ প্রদান করে। এই দেহ প্রদান না করলে, তাঁর ভগিনী হয়ে বিরাজমান না থাকতে পারলে, হয়তো আমি কনোদিনও জানতে পারতাম না, আচারবিচার থেকে মুক্ত হয়ে, ঈশ্বরীকে পরম আপন, পরমাত্মীয় জ্ঞানে কাছে টেনে নেওয়ার অর্থ কি। জানতেই পারতাম না যে , এই কাছে টেনে নেওয়ার জন্য ঈশ্বরীকে যখন ভক্ত সিংহাসনচ্যুত করে নিজের হৃদয়ে স্থান প্রদান করেন , এবং সর্বক্ষণ তাঁকে হৃদয়ে ধারণ করে থাকেন, খেতে, বসতে, উঠতে, শুতে, এমনকি বাহ্যের কালেও , নিদ্রার কালেও , রমণের কালেও, সর্বক্ষণ যখন একজন ভক্ত নিজের হৃদাসনে নিজের ঈশ্বরীকে স্থাপন করেন , তার মাহাত্ম আমি কনোদিনও উপলব্ধি করতে পারতাম না, যদি না আমার সর্বা এই দেহ না দিতো আমাকে, যদি না আমাকে তাঁর ভগিনী করে রেখে দিতো সে।

এই দেহ লাভ করে , আমি উপলব্ধি করলাম , যেমন সন্তানের কাছে মাতার মুখের আহারই সর্বাধিক প্রিয় হয়, যেমন স্ত্রীর কাছে তাঁর স্বামীর ওষ্ঠচুম্বনই সর্বাধিক প্রিয় হয়, কারণ তা সমস্ত ভেদভাবের ঊর্ধ্বে, সমস্ত শুচিঅশুচির ঊর্ধ্বে গমন করে পরমাত্মীয়তা স্থাপন করে সেই আহার লাভ, সেই চুম্বন লাভ, তেমনই দিব্যভাব থাকে যখন ভক্ত সমস্ত আচারবিচারের থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করে, নিজের পরিধান করা বস্ত্রদ্বারা ঈশ্বরীকে সাজান , যখন নিজেরমুখের আহার দ্বারা ভগবতীকে আহার করান , যখন নিজের অঙ্গের প্রিয় গহনাকে খুলে নিয়ে তাঁর প্রিয়তমা জননীকে সাজান ।

এই ভাবের মধ্যে কনো অহং থাকেনা , কনো কল্পনা থাকেনা, কনো চিন্তা থাকেনা, কনো ইচ্ছা থাকেনা, থাকে কেবল নির্মলতা , থাকে কেবলই সরলতা , থাকে কেবলই ঘনিষ্ঠতা , থাকে কেবলই পরমাত্মীয়তা, থাকে কেবলই সমর্পণ, থাকে কেবলই আত্মকে নিবেদন করে দেবার চরম ভাব । আর এই পরমাত্মীয়তার ভাব এতটাই গভীর, গহন, গুহ্য এবং প্রেমামৃত মিশ্রিত যে, আমাদের ঈশ্বরী সেই প্রেমরস পান করতে ব্যাকুল হয়ে সেই ভক্তের হৃদয়ে সর্বক্ষণ বিরাজ করেন ।

আজ সেই পরমাত্মীয়তার ভান আমার সর্বার কৃপাতে অনুভব করে ধন্য হয়ে গেছি। তাই আজ আমার কাছে কনো বিড়ম্বনা নেই নাথ। আর আমার কাছে এই বিড়ম্বনা নেই যে আমি ইন্দ্র হয়েও কেন মানসী, কারণ আজ আমি কেবলই মানসী , আমার একটিই পরিচয়, আমি সর্বার ভগিনী”।

বোধি, দখিনা, হুতাশন একটিও কথা বললেন না দেবী মানসীর এই আলাপের মধ্যে , কেবলই নিজেদেরও অন্তরের ভাব যে মানসীর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক, তা অনুভব করে নিজেদের নেত্রে অশ্রু ধারণ করলেন। বেদনার অশ্রু নয় তা , প্রেমের অশ্রু, তাঁরা সর্বাত্মার সান্নিধ্য লাভ করে , যেই অপরিসীম প্রেম লাভ করেছেন , সেই অনুভূতির প্রমাণ এই অশ্রু। আর সেই দেখে অখণ্ড ভাবলেন, “কি অপরিসীম সরলতা আমার সর্বার! ... যেই ভাব সহস্র বৎসর তপস্যা করলেও লাভ করা যায়না, তা সামান্য সঙ্গদান করেই উপলব্ধি করিয়ে দিলেন তিনি। ... ব্রহ্মসনাতনের

মন, প্রাণ, উর্জা, বুদ্ধি সমস্ত ভগবতীর প্রেমে বিসর্জনপ্রাপ্ত হয়েছে। ... এবার আমার পালা , এবার ব্রহ্মসনাতনের আত্ম, এই অখণ্ড বিসর্জন লাভ করবে তাঁর সর্বাত্মাতে। ... কিন্তু কি করে! এখনো যে তাঁর কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা তাতে লয় হয়নি!”

যেন প্রশ্ন তাঁর, আর উত্তর প্রদান করছেন মাতা স্বয়ং , আর তাঁরই বচন যেন তাঁর মন , প্রাণ, উর্জা ও বুদ্ধি প্রদান করছে! ... দেবী দখিনা জানতেনও না অখণ্ডের মনের মধ্যে কি প্রশ্ন চলছে, কিন্তু তিনি উত্তর দেবার মত করেই বললেন , “আমরা যা কিছু আজ উপলব্ধি করেছি , তাতে আমাদের কনো প্রয়াসও নেই , আমাদের কনো উদ্যমও নেই। ... সমস্ত কিছু আমার সর্বাই আমাদের মধ্যে স্থাপন করেছে। সে-ই আমাদেরকে এই অসাধারণ অনুভূতি প্রদান করে , আমাদের আচাবিচারের চিন্তা, ন্যায়-অন্যায়ের ইচ্ছা, ধর্মাধর্মের কল্পনাকে মুছে দিয়ে, আমাদেরকে পরমাত্মীয় করে নিয়েছে। ... তাই আমার বিশ্বাস , যদি আমাদের অন্তরে যেই মহাভাবের জাগরণ হয়েছে, তা আমার সর্বাই করে থাকে , তবে সেই মহাভাবের কারণে যেই ব্যকুলতার সঞ্চার হয়েছে তাঁর প্রতি, তাও তিনিই নিরাময় করবেন”।

অখণ্ড সেই উত্তর লাভ করে এমনই মনে করলেন যে , তাঁর প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মাতাই দিচ্ছেন , যেখানে দেবী দখিনা হলেন তাঁর মুখ যা তাঁরই শব্দের উচ্চারণ করছেন। তাই বিচার করলেন , “সত্যই তো, আমি কি ভেবেছিলাম যে আমি ত্রিদেব থেকে একাত্মত্রি হয়ে অখণ্ড হয়ে উঠবো! ... আমি কি ভেবেছিলাম যে ইন্দ্রকে মানসী বেশে দেখবো আর তাঁকে ঈশ্বরীয়প্রেমে হাঁকপাঁক খেতে দেখবো! আমি কি ভেবেছিলাম যে সমস্ত আবেগ ভূতদের অধীনে স্থাপিত হয়ে যাবে দেবীগুহ্যার তাণ্ডবের ফলে! ... আমি কি ভেবেছিলাম যে স্বয়ং অহং আমাতে লীন হয়ে যাবে! ... আর আমরাই কি স্বয়ং প্রচেষ্টা করে জানতে পেরেছিলাম যে আমাদের সর্বাত্মা এই সুষুম্নাতে আছেন!”

অখণ্ড আবার ভাবতে থাকলেন , “যা কিছু হয়েছে , তা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে , আর যা কিছু আমরা জেনেছি, তাও তাঁর ইচ্ছাতেই জেনেছি। তাই আগেও তাই হবে , যা তাঁর ইচ্ছা হবে। আর যা কিছু হয়েছে, তা যেমন আমাদের কল্যাণের জন্যই হয়েছে , তেমনই আগেও যা হবে,

তাও আমাদের কল্যাণের জন্যই হবে। ... আমার সর্বাম্বা যে সকলের জননী। মা কি কখনো সন্তানের অকল্যাণ হতে দেন! ... আর যখন আমাদের মায়ের হাতেই সমস্ত কাল স্থাপিত, সমস্ত নাদ স্থাপিত, সমস্ত সমৃদ্ধি স্থাপিত, তখন আমাদের চিন্তা করার কি আছে! তিনি যা কিছু করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্যই করেছেন, আর আগামীদিনেও কল্যাণই করবেন। কেবল অহং, কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা ও আবেগরাই আমাদেরকে বলতে থাকে যে আমাদের কল্যাণ হচ্ছে না, আর তা তারা বলে কারণ যা কিছু হচ্ছে তা তাদের অস্তিত্বকে প্রশ্নচিহ্ন প্রদান করে দেয়।

এমন কথোপকথন করতে করতে, কখন যে তাঁরা মূলাধার পেরিয়ে, স্বাধিষ্ঠান পেরিয়ে, ব্রহ্মসনাতনের মনিপুরে স্থাপিত হয় গেছেন, তাঁরা জানততেও পারেননি। সেই দিকে সকলের নজর যেতে, হুতাশন বললেন, "আচ্ছা গুহার মধ্যে গহন অন্ধকার ছিল, তাহলে আমরা এতদূর এলাম কি করে?"

দেবী মানসী হেসে বললেন, "পিতা, আপনার কি আশপাশ দেখে মনে হচ্ছে যে গহন অন্ধকার বিরাজ করছে এখানে! ... ভালো করে দেখুন পিতা, এক সৌম্য আলোক যেন আমাদের বেষ্টন করে রয়েছে। আর সেই আলোককে অনুসরন করতে করতেই আমরা এখান পর্যন্ত পৌঁছেছি"।

বোধি বললেন, "কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, ততই যেন আলোক রশ্মি আরো স্পষ্ট হচ্ছে, এ কেমন রহস্য!"

দেব দখিনা হেসে বললেন, "কারণ এই আলোক আমার কন্যা, সর্বার তেজালোক। ... তাঁর তেজেই এই সম্পূর্ণ সুষুম্না গুহা আলোকিত, আর আমরাও তাঁর তেজালোককে অনুসরণ করে করেই তাঁর কাছে যাচ্ছি"।

হুতাশন হেসে বললেন, "বৃথাই আমরা সকল সময়ে চিন্তা করি। ... যা কিছু হচ্ছে, তা যে আমাদের সর্বা মা-ই করছে। এই সহজ সত্যটা ভুলে যাওয়ার জন্যই আমরা সর্বক্ষণ আকাশপাতাল চিন্তা করে মরি, আর আমাদের এই চিন্তার কারণে দেবী চিন্তা এত সক্রিয় থাকতে পারেন"।

অখণ্ড যেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেতেই থাকলেন , আর এমন যখন প্রশ্নোত্তর চলছে , তখন মূলাধারের দ্বার বন্ধ হতে শুরু করে। দেবী কল্পনা , চিন্তা ও ইচ্ছা সবে গুহার দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছেন। উপপতি, আবর্ত ও বলদম্ভ সঠিক ভাবে চলতেও পারছেন না, আর তার কারণে তাঁরা এখনো গুহার দ্বার পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি। কিন্তু গুহার দ্বার বন্ধ হচ্ছে দেখে , হিম্লহু, ঋপু ও ভাঞ্চ নিজেদের পিতাদের ক্রোরে ধারণ করে মহাগতি নিয়ে সুষুম্নার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করলেন , আর তাঁরা প্রবেশ করতেই, দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

অন্যদিকে সর্বাম্বা অনাহততে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে , অখণ্ডরা মনিপুরের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে, মাতা সর্বাম্বার ভাবস্থ দেহের দর্শন লাভ করেছেন। আর যেহেতু মাতা অনাহত পর্যন্ত যাত্রা করে ফেলেছেন, তাই মূলাধারে তাঁর তেজালোক বড়ই ক্ষীণ। তাই প্রবল অন্ধকারের মধ্য দিয়েই পথ নিরীক্ষণ করে করে , দেবী কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা চলতে থাকলেন , আর তাঁদের পশ্চাতে রইলেন তাঁদের পরিবার।

অন্যদিকে, তাঁদের সর্বাকে দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠলেন দেবী মানসী ও দেবী দখিনা। হুতাশন তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, “ধীরে দখিনা, ধীরে মানসী, সর্বা এখন ভাবস্থ। তোমাদের উল্লাস, তাঁর ভাবকে ভঙ্গ করে দেবে”।

বোধি ব্যকুলতার সাথে মণিপুর ত্যাগ করে, অনাহততে যাবার প্রয়াস করলে, এক বিষম তরঙ্গ তাঁকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে, ভুমিসায়ি হতে বাধ্য করলো। সেই দেখে, হুতাশন বললেন, “আমরা কি মণিপুর ত্যাগ করে, আমাদের সর্বার কাছে যেতে পারবো না!... অখণ্ড, তুমি দেখো না! ... তুমি তো বলো, তোমার অগম্য কেবলই সহস্রার, বাকি সমস্ত স্থানে তুমি যাত্রা করতে পারো। ... একবার দেখো না , একবার আমাদের সর্বার কাছে গিয়ে বলো না , যাতে আমাদেরকে সে এইভাবে বর্জন না করে, আমাদের যেন তাঁর সান্নিধ্য প্রদান করে!”

অখণ্ড অন্তরে অন্তরে ভয় পাচ্ছিলেন, তাঁর মুখদর্শন করলে, মাতা কি বলবেন! ... তাঁকে ত্যাগ দিয়ে ত্রিদেবী চলে এসেছিলেন, পুনরায় তাঁর মুখদর্শন করার কালে, একটি কথাও তাঁর উদ্দেশ্যে

বলেন নি। ... এখন কি বলবেন তিনি, সেই ভেবে চিন্তিত হয়ে যাচ্ছিলেন অখণ্ড। দেবী মানসী যেন আবারও সর্বাম্বার মুখ। তিনি বললেন, "অখণ্ড, আমি তোমার জ্যেষ্ঠা না! ... আমার নির্দেশ, তুমি অগ্রসর হও। দেবী চিন্তাকে তোমার উপর অধিকার স্থাপন করতে দিও না। ... অগ্রসর হও"।

অখণ্ড বিচার করলেন , "সত্যই তো বলছেন দেবী মানসী! আমার উপর তো চিন্তা অধিকার স্থাপন করছে! " এমন বিচার করে, সমস্ত চিন্তাকে ত্যাগ করে, অখণ্ড সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেবী সর্বাম্বার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ... সম্মুখে স্থিত হয়ে অখণ্ড যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। দেবী সর্বাম্বার অসম্ভব রূপ দর্শন করে , স্তম্ভিত অখণ্ড। কি নামে ডাকবেন তাঁকে! ... মা বলবেন না কন্যা! প্রেমিকা বলবেন না স্ত্রী! ... সখি বলবেন নাকি দণ্ডদায়িনী! ... এমন অগুনতি বিচার আসতে থাকে অখণ্ডের মনে। আর সেই প্রতিটি বিচার যেন তাঁকে সমানে বিগলিত করতে থাকলো, আর তা কখন যে তাঁর নেত্রকে অশ্রুপূর্ণ করে দিয়েছে, তা যেন অখণ্ড নিজেও জানতে পারলো না।

অবশেষে, নিজের অজান্তেই প্রায় অখণ্ড হৃদয়বিদারক আবাহন প্রদান করে বললেন ,"সর্বা! ... আমাকে কি ক্ষমা করা যায়না! আমাকে কি একটু স্থান দেওয়া যায়না! আমি কি সত্যকে ধারণা করার জন্য অযোগ্য! আমি কি তোমাকে স্নেহ প্রদানেও অযোগ্য! ... আমার অস্তিত্ব আমার কাছে কেন অভিশাপ লাগছে আজকে?"

মাতা সর্বাম্বা যে তাঁর এই সমস্ত কথাতে নিজের নেত্রযুগল উন্মোচিত করবেন , তা অখণ্ড ভাবতেও পারেনি। কিন্তু যখন তিনি নিজের পদ্মপাপড়ির ন্যায় নেত্রযুগল উন্মুক্ত করলেন , তখন অখণ্ড আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি নতজানু হয়ে বসে পরলেন , এবং অজরধারায় ক্রন্দন করতে থাকলেন , আর বিলাপের সুরে বলতে থাকলেন , "আমাকে অনাথ করে দিও না সর্বা! ... আমার জন্মের সত্য আমি জানিনা , তাই আমি অজন্মা, আমার অন্ত কি করে সম্ভব, তাও আমার অজানা, তাই আমি অনন্ত। ... কিন্তু সত্যিকারের অজন্মা যে তুমি সর্বা! সত্যকারের অনন্ত তো তুমি! ...

সর্বা, তোমার না আদি আছে , আর না অন্ত। কিন্তু তুমি বারেবারে জীবের হৃদয়ে জন্ম নিয়ে , সেই জীবের সাথে সাথেই বয়োবৃদ্ধি করো নিজের, তাই তোমাকে কেউ অজন্মা, অনন্তা বলেনা! ... হয়তো, আমার অভিমান সহ আবেদন যে আমি অজন্মা, আমি অমর, সেই কারণেই তোমার জন্মকে সেই দেহের জন্ম বলে দেয় সকলে, সেই জীবদেহের নাশকেই তোমার নাশ বলে দেয়। ... এমন আর কত অপরাধ করেছি , নিজের প্রশস্তিগীত গেয়ে গেয়ে , আর সেই সমস্ত প্রশস্তিগীতদ্বারা নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে করে , তার হিসাব রাখাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কিন্তু সেই সমস্ত দুরাচারের কথা স্মরণ পরছে আজ , আর যতই তা স্মরণে আসছে , ততই নিজেকে নিচ মনে হচ্ছে। ... সত্যই বোধহয় আমার ক্ষমা সম্ভবই নয়। আমি ত্রিদেব বেশে সকলের বিচার করে ফিরতাম , সেই বিচারের কাঠগড়ায় আজ যখন আমি নিজেকে স্থাপন করেছি, তখন আমার নিজের অপরাধকে ক্ষমার অযোগ্য মনে হচ্ছে"।

মাতা সর্বাম্বা হাস্যপ্রদান করে বললেন, “এমন কনো অপরাধই সম্ভব নয়, যার ক্ষমা সম্ভব নয়। ... অহংকে অসিমিত রাখার কারণেই , সেই অহংএর প্রভাবে আপনি নিজেকে এমন অজন্মা , অনন্ত, অসীম বলে গেছেন। আর আজ সেই অহংকে আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন বলেই, আপনারই সেই সমস্ত কৃত্য আপনার কাছে ক্ষমার অযোগ্য মনে হচ্ছে। এমন চিন্তার আশ্রয় নিয়ে, কল্পনার আশ্রয় নিয়ে, এবং ইচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি আরো অজস্র এমন কৃত্য করে গেছেন সর্বক্ষণ। যখন তাঁদেরকে আপনি নিজের অন্তরে লয় করে দেবেন , তখন আপনার সেই সমস্ত কৃত্যকে ক্ষমার অযোগ্য বলেই মনে হবে"।

অখণ্ড লজ্জিত হয়ে বললেন , “যখন আমি ত্রিদেব হয়ে বসে থাকতাম , তখনও আমি ত্রিকাল দর্শনের অভিমান করে করে , কেবলই কালের খাতায় তুমি কি কি নিয়তিবেশে লিখে রেখেছ , তাকেই সমস্যা করে বলতাম। আর তুমি আমার এই অভিমানকে দেখে , এমন অভিনয় করতে যেন, কি লেখা আছে তা তুমি জানোই না। ... আজ বুঝতে পারছি আমি , কত বড় মূর্খ ছিলাম আমি। যিনি সেই সমস্ত কিছু কালের নির্মাতা , তাঁর কাছেই ত্রিকালদর্শী সেজে , নিজেকে মহানায়ক রূপে স্থাপন করতাম! ... ধিক আমাকে, ধিক! ...

কিন্তু হে দেবী, তখনও আমি কনো সমাধানসূত্র স্থাপন করতে পারতাম না, এবং সেই সমাধান আপনার থেকেই গ্রহণ করতাম। আর আজও আমার অবস্থা তেমনই অসহায়। আমার কাছে সমস্যা আছে বিস্তর, যার নির্মাতা আমি স্বয়ং, কিন্তু তুমি তার প্রত্যক্ষদর্শী, তাই তুমি তা জানো আর আমার থেকে অধিক শ্রেয় ভাবে জানো। আর এও জানো তুমি যে , আমার কাছে যেমন তখনও কনো সমস্যার সমাধান থাকতো না, আজও তা নেই। ... তাই আমাকে সেই সমস্যার সমাধান প্রদান করো দেবী"।

দেবী সর্বাম্বা মৃদু হাস্যে বললেন, "বেশ, তবে কি কি সমস্যা সম্মুখে দেখতে পাচ্ছেন আপনি, তা ব্যক্ত করুন প্রথমে"।

অখণ্ড বললেন, "প্রকৃত সমস্যা হলেন, দেবী কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা। যতক্ষণ না তাঁরা আমার মধ্যে লীন হচ্ছেন , যতক্ষণ না তাঁরা আমার অধিকারে স্থপিত হচ্ছেন , ততক্ষণ আমি তাঁদের অধিকারেই স্থাপিত রয়েছি, আর আমার নিজের সামর্থ্য নেই যে আমি তাঁদের অধীনতা ত্যাগ করে, তাঁদেরকে পুনরায় নিজের অধীনে স্থাপন করবো। আর এই সমস্যার অঙ্গরূপে রয়েছে আর দুটি প্রদান সমস্যা। একটি হলেন বলদম্ভ, আবর্ত ও উপপতি, যাদের নিধন আবশ্যক, কিন্তু তা কেবলই তোমার সন্তানই করতে পারবে। ... আর অন্য সমস্যা হলো , তাঁদের তিন পুত্র, হিল্লহু, ঋপু ও ভাঞ্চ, যাদের নিধন কেবলই তুমি করতে সক্ষম"।

মাতা সর্বাম্বা মৃদুহাস্যে বললেন, "আমি মানবিয় তনুতে বিরাজ করছি, আর সেই তনুতে আমি একজন স্ত্রী। তাই সেই তনু ও স্ত্রীতনুর মর্যাদা স্থাপিত রাখার উদ্দেশ্যে , আমি নিজের সন্তানের বীর্য নিজেই সৃষ্টি অন্তত প্রত্যক্ষ ভাবে করতে পারবো না। আমার একজন মাধ্যম প্রয়জন, পুরুষ মাধ্যম, যার মাধ্যমে আমি বীর্য সৃষ্টি করে , সেই বীর্যকে ধারণ করে সন্তানের জন্ম দেব। তাই সেই মাধ্যম কারুকে হতে হবে।

বোধি আমার ভ্রাতা হয়ে আমাতে মজে আছে , তাই সে সেই মাধ্যম হতে পারবেনা। হুতাশন আমার পিতা হয়ে আমাতে মজে আছেন , তাই সেও সেই মাধ্যম হতে পারবেনা। ... পরে রইলেন, আপনি। আপনিকি সেই মাধ্যম হবেন!"

অখণ্ড ইতস্তত করে বললেন , "দেবী, অহং আমার অন্তরে লীন হতে , আমার অভিমান বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই আমি তোমার সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারবো না। এমনিই আমি তমাকে দাসী জ্ঞান করার জন্য নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিনা, তারপরে যদি আমাকে তোমার প্রতি যৌনতাপূর্ণ দৃষ্টি নিপাতিত করতে হয় , তাহলে আমি আর তোমার নেত্রে নেত্র রাখতেও সক্ষম হবো না। ... এছাড়া কি কিছু উপায় আছে দেবী! ... না কি তুমি আমাকে যৌন সঙ্গমেরই নির্দেশ দেবে!

যদি তেমনই করতে হয় , তবে কৃপা করে আমাকে নির্দেশ দাও। নির্দেশ ছাড়া যৌনসঙ্গমে তোমার সাথে লিপ্ত হওয়াকে , আমি সঠিক ভাবে দেখতে পাচ্ছিনা। দেবী যৌনসঙ্গমে দুইজন সমগোত্রীয় লিপ্ত হন, আর আমার অভিমানের নাশ হবার পর, আমি তোমার সাথে সমগোত্রীয়, সেটা কিছুতেই মানতে পারছিনা। ... তুমি আমার আরাধ্যা ছিলে , আছো আর থাকবে। তুমি আমার গুরু ছিলে , গুরু আছো আর থাকবে। গুরুর সাথে , আরাধ্যার সাথে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়া একমাত্র তাঁর নির্দেশেই সম্ভব। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে তা দুরাচার। তাই যদি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতেই হয়, তাতে আমি, তোমার এই শিষ্য কিছুতেই আপত্তি জানাতে পারিনা , যদি তা তোমার নির্দেশ হয়, আর যদি তা নির্দেশ না হয় আর যদি আমি স্বয়ং তোমার সাথে যৌনতায় লিপ্ত হতে চাই, তা চরম দুরাচার, এবং চরম ব্যবিচার। "

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন , "না দেব, যখন আপনার এই যৌনসঙ্গমের থেকে বিরত থাকার কারণ সম্মান ও প্রেম, তাকে আমি কি করে খণ্ডন করতে পারি। যদি আপনার এই যৌনসঙ্গম থেকে বিরতি নিজের অভিমানের কারণে হতো , নিজের আদর্শবাদিতার জন্য হতো , নিজের ইচ্ছাস্থাপনের উদ্দেশ্যে হতো, তাহলে আমি আপনাকে এই সঙ্গমের জন্য বাধ্য করতাম , যেমন

পূর্বেও করেছি। ... কিন্তু যখন প্রেম , সম্ভ্রম ও সম্মান এই সঙ্গমবিরোধী ভাবের কাণ্ডারি , তখন আমি যদি আপনাকে সঙ্গমের জন্য বাধ্য করি, তবে তা তো প্রেমের অপমান করা হবে।

আর আমি যেই হই , স্বয়ং নিয়তিই কেন না হই , প্রেমের ঊর্ধ্বে আমি স্বয়ংও নই। ... প্রেম আমাকে সর্বদা আদেশ দিয়েছে , আর সর্বদা আমাকে আদেশ দিতে থাকবে। আর সেই কারণেই, যেই আমাকে কেউ আদেশ দিতে সক্ষম নন , তাঁকে সামান্য ভক্তও আদেশ দেন। আসলে আদেশ তিনি দেন না , আদেশ দেয় তাঁর প্রেম। সমস্ত ভেদাভেদ মুক্ত , সমস্ত আচারবিচার মুক্ত, সমস্ত ন্যায়অন্যায় বোধমুক্ত, সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা মুক্ত, সমস্ত কল্পনামুক্ত, সমস্ত শুচিঅশুচি মুক্ত ভক্তের নির্মল পরমাত্মীয়তার প্রেম আমাকে আদেশ দেয়। আজীবন তা দিয়েছে, আর আজীবন তা দিতে থাকবে। ... তাই, আমি আপনাকে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে বলবো না। তবে আপনাকে আমার পাণিগ্রহণ করতে হবে। এবং আপনাকে আমার সাথে আজ্ঞাচক্রে ঐকান্তিক ভাবে নিবাস করতে হবে।

সেখানে আমি থাকবো ভাবস্থ, আর আপনি ধ্যনস্থ। আর আমাদের এই চার পরমাত্মীয় , দেবী মনসা, দেবী দখিনা থাকবেন আমার সেবায়িতা। আপনার দেহউষ্মাকে ধারণ করবো আমি, আর আমার দেহ উষ্মার থেকে প্রকাশিত হবে, আমাদের সন্তান। ... আর সেই সন্তানকে আমি ভাবস্থ থেকে সমানে পুষ্টি প্রদান করতে থাকবো , আর দেবী দখিনা ও মানসী তাঁদের সমানে বাহ্যিক যত্ন নেবেন। বোধি ও আমার পিতা হুতাশন দেবী মানসী ও দেবী দখিনার ফরমাইশ অনুসারে দ্রব্যাদি আনতে থাকবেন, এবং তাঁরা দুইজনে বাহ্যিক সেবা প্রদান করে , আমাদের সন্তানকে প্রকাশিত করবেন। ... যদি আপনি এই প্রস্তাবে রাজি থাকেন , তবে আমাকে এক্ষণে বিবাহ করুন, এবং আমার সাথে আজ্ঞাচক্রে প্রস্থান করুন”।

উর্জাদ্বয়

অখণ্ড করজোড়ে বললেন, "তোমার কথন আমার কাছে আদেশ দেবী। ... কিন্তু এঁদেরকে কি বলবো!"

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "আপনি এঁদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন প্রথমে। ... তাঁরা আমাকে স্পর্শ করে সুখানুভূতি করতে চান। কিন্তু আপনার সাথে একাকীত্বে এই কথা বলবো বলে, তাঁদেরকে এখানে আসতে দিই নি। আপনাকে এই বিশ্বাস করে তাঁরা প্রেরণ করেছিলেন যে আপনি তাঁদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। ... তাঁদের বিশ্বাসের মান রাখুন দেব, এবং তাঁদেরকে প্রথমে আমার কাছে নিয়ে আসুন"।

মাতার কথা অনুসারে, অখণ্ড সকলকে মাতার সম্মুখে নিয়ে আসলে, দেবী মানসী মাতার কাছে এসে, মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যেন এক বিড়ম্বনার মধ্যে পরে গেলেন। মাতার চরণবন্দনা করবেন, নাকি মাতাকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করবেন, সেই বিচার যেন তাঁকে এক অদ্ভুত অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থাপন করে দেয়। মাতা সেই দেখে, মিষ্ট হেসে, দেবী মানসীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলে, দেবী মানসী, মাতা যেমন নিজের শিশুকে বহুকাল পরে ফিরে পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে ফেলেন, তেমন ভাবেই ক্রন্দন করে উঠে বললেন, "আমাদের সকল বিড়ম্বনার উত্তর আছে তোমার কাছে সর্বা, আমি তোমার রঙে রঙিন হয়ে উঠেছি আজ, আর তা হতে পেরে আমার সমস্ত জীবন আজ ধন্য হয়ে গেছে"।

দেবী দখিনাও এবার দেবী সর্বাম্বার সম্মুখে আসলে, মাতা তাঁকে প্রণাম করতে গেলে, দেবী দখিনা তাঁর দুই স্কন্ধ নিজের দুই করে স্থাপন করে বললেন, "তোর স্থান আমাদের সকলের হৃদয়ে মা! চরণে তোর স্থান হতেই পারেনা। ... আমার হৃদয়ে নিজেকে স্থাপন করে, আমাকে পূর্ণতার ভান প্রদান কর মা!" একই ভাবে বোধি ও হুতাশনের সাথেও আলাপন সমাপ্ত করে, দেবী সর্বাম্বা সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার ও অখণ্ডের প্রথম সাখ্যাত অর্থাৎ শুভদৃষ্টি

সম্পন্ন হয়েছে এই অনাহতে। অনাহতের ওঁকারের ধ্বনিতে আমাদের শুভদৃষ্টির শুভধ্বনি হয়েছে। আর এবার আমরা মাল্যবদল ও সিঁদুরধারণ উপাচার করবো, তবে তা হবে বিশুদ্ধে। এবং অন্তে, আমরা আজ্ঞাতে স্থাপিত হয়ে আমাদের সন্তান লাভের জন্য প্রয়াস করবো। আপনারা সকলে এই তিনকর্মেই নিজের নিজের ভূমিকা পালন করবেন তো?"

দেবী দখিনা হেসে বললেন, "মহানন্দের সাথে করবো পুত্রী, কার পর কি করতে হবে কেবল আমাদের বলতে থাক তুই, আর আমরাও সেই অনুসারেই করতে থাকি সমস্ত কিছু"।

বোধি বললেন, 'কিন্তু ভগিনী সর্বা, আমাকে এটি তো বলে দাও, এই স্থান নির্বাচন কেন? কেন অনাহততেই শুভদৃষ্টি! কেন বিশুদ্ধেই বিবাহানুষ্ঠান? আর কেনই বা আজ্ঞাতে সন্তানপ্রাপ্তির প্রয়াস!"

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "ভ্রাতা বোধি, বিবাহ একটি পবিত্রবন্ধন, কারণ এঁর মাধ্যমে যিনি পুরুষ দেহ ধারণ করে আছেন তিনি উপলব্ধি করেন যে তাঁর নিজের মধ্যেই নারী রয়েছেন, এবং যিনি নারীদেহ ধারণ করে আছেন, তিনিও উপলব্ধি করেন যে তাঁরও মধ্যে পুরুষ রয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই বন্ধন যা আমাদের নারীপুরুষের ভেদাভেদ থেকে মুক্ত করে, অর্থাৎ এটি এমনই এক বন্ধন যা আমাদের কাছে মুক্তির বার্তা প্রদান করে।

বিবাহের অর্থই হলো এই নারীপুরুষ যে কেবলই মায়াসঞ্চারের যন্ত্র, সেউ গুহ্য অর্থ উদ্ধার করা। সেই অর্থকে উদ্ধার করলেই তো সেই অর্থকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করা হয়না। তাকে ধারণ করতে হয়, আর এই ধারণ করাই হলো বিবাহের ধর্ম। আর যখনই এই ধারণাকে ধারণ করা হয়, তখনই নিজের সমস্ত কামনা নিজেরই সম্মুখে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ যেই কামনাদের এতকাল আমি আমার অধিকার, আমার ইচ্ছা, বা আমার প্রয়োজন বলে ধারণা করে যাচ্ছিলাম, সেই সমস্ত কিছু যে আমার কামনা মাত্র, সেই বোধ জন্ম নেয়। কেন জন্ম নেয় তা?

কারণ সেই সমস্ত অধিকার, ইচ্ছা বা প্রয়োজন তো নারীপুরুষের ভেদাভেদের কারণেই আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আমার প্রয়োজন বলে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। আজ যখন নারীপুরুষ কেবলই

মায়াপ্রসারের যন্ত্র রূপে চিহ্নিত করে ফেলেছি আমি, এবং এও বুঝে গেছি যে নারীপুরুষ বলে বাস্তবে কিছুই নেই, বাস্তবেই কেবলই আত্ম আছে এবং সেই আত্মকে সত্যে ভূষিত করার জন্য চেতনা বা নিয়তি আছে, তখন আর এই ভেদাভেদ নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে, আর তাকে আমি ধারণও করে নিয়েছি।

তাই নারীর পুরুষের থেকে যা কিছু প্রয়োজন ছিল বলে এতকাল নারী ধারণ করেছিল, আর পুরুষ নারীর থেকে যা কিছু প্রয়োজন বলে এতকাল ধারণা করেছিল, সেই সমস্ত কিছুকে আজ সে কামনা রূপে সনাক্ত করে নিয়েছে। আর তা করে নেবার ফলে, আজ সে এই বন্ধন, অর্থাৎ কামনার বন্ধন থেকে, নারীপুরুষ ভেদভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবার প্রেরণা লাভ করেছে, আর এটিই বিবাহের উপযোগিতা ভ্রাতা।

নারীপুরুষ ভেদাভেদের প্রকৃতি অর্থ জানাই জীবনে বিবাহের ভূমিকা, সেই অর্থ জেনে সেই অর্থকে ধারণ করাই বিবাহের জীবনে ভূমিকা, সেই অর্থকে ধারণা করে কামনাকে প্রত্যক্ষ করাই বিবাহের জীবনে ভূমিকা, এবং সেই কামনাকে প্রত্যক্ষ করে তার থেকে মুক্ত হওয়াই বিবাহের জীবনে ভূমিকা। আর তাই পণ্ডিতজন বলেন, বিবাহের চারটি স্তম্ভ, ধর্ম অর্থাৎ সেই ধারণা, অর্থ অর্থাৎ বিবাহের অর্থ উপলব্ধি করা, কাম অর্থাৎ কামনাদের প্রত্যক্ষ করা, এবং মোক্ষ অর্থাৎ সেই কামনাদের থেকে মুক্ত হওয়া।

অর্থাৎ বিবাহ হলো সেই পবিত্র বন্ধন যা আমাদেরকে বন্ধন থেকে মুক্ত করে সেই আদির মধ্যে লীন হবার আবাহন করে, আর তাই যেই নারীপুরুষের বিবাহ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাঁদেরকে আদি ধ্বনি, অর্থাৎ ওঁকারের মধ্যে স্থিত রেখেই শুভদৃষ্টি করানো, অর্থাৎ ওঁকারের মাধ্যমেই সেই নারীপুরুষকে বিবাহের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে আবাহন করার একটি প্রক্রিয়া এটি। সেই ওঁকারের উৎপত্তি এই অনাহত থেকে, আর তাই ওঁকারকে অনাহত নাদ বলা হয়। আর সেই কারণেই আমাদের শুভদৃষ্টি এই অনাহততেই সম্পন্ন হলো।

অনাহতের ঊর্ধ্বতন অবস্থা হলো বিশুদ্ধ, যা সমস্ত নাদের থেকে মুক্ত। নাদ অর্থাৎ শব্দের উৎস; এবং শব্দ অর্থাৎ কথনের সূত্রপাত। কিন্তু এই কথন, এই শব্দ, এই নাদ, এঁদের ঊর্ধ্বে কি স্থিত ভ্রাতা! ... সংকল্প। সংকল্পের কনো নাদ হয়না, কনো শব্দ হয়না, কনো কথন হয়না। কথন, বা শব্দ বা নাদ যে কেবলই সংকল্পকে ব্যক্ত করার উপায়। কিন্তু সংকল্প যখন গ্রহণ করা হয়, তখন তা নাদের অতীত অবস্থাই। আর বিশুদ্ধ হলো সেই সংকল্প গ্রহণের অবস্থা। যেই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে নারীপুরুষের মধ্যে স্থাপিত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, সেই ধর্মকে ধারণ করার, অর্থকে উপলব্ধি করার, কামনাকে প্রত্যক্ষ করার, এবং মোক্ষ লাভের প্রয়াস করার সংকল্প নেবার স্থান হলো এই বিশুদ্ধ।

সেই সংকল্প কেবল নারী নেবেন না, কেবল পুরুষ নেবেন না, বরং উভয়েই সংকল্প নেবেন যে একে অপরকে তাঁদের সংকল্পে অটুট রাখবেন, আর তাই তিনটি আচার, মাল্যবদল, সিঁদুরদান, এবং আহারবদল। মাল্যবদল দ্বারা পরাপ্রকৃতির বিদ্যারূপকে সাক্ষী রেখে সংকল্প গ্রহণ হয়, সিঁদুরদান পরাপ্রকৃতির শক্তিরূপকে সাক্ষী রেখে সংকল্প গ্রহণ হয়, এবং আহার যেখানে সারাদিন উপবাস থেকে নারীপুরুষের এবং পুরুষ নারীর উপবাস ভাঙেন, তা সমৃদ্ধির অর্থাৎ পরাপ্রকৃতির শ্রীরূপকে সাক্ষী রেখে সংকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া।

আর এই সংকল্প যখন গ্রহণ করা হয়ে যায় তখন সেই সংকল্পকেই আজ্ঞা রূপে পালন করার সময় আসন্ন। আর তাই নারীপুরুষকে এবার সন্তানপ্রাপ্তির পথে চলতে হয়, যেখানে পদে পদে থাকে সংকল্প ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। কামনা সেখানে অস্ফুট ও প্রস্ফুটিত ভাবে সর্বক্ষণ যুক্ত থাকে; যৌন কামনা থেকে শুরু করে, সখপুড়নের কামনা পর্যন্ত সর্বত্র ব্যপ্ত থাকে। নারীপুরুষের বিভেদের ধারণা করা সেখানে সহজাত, তাই বিবাহের অর্থ ভুলে যাওয়াও সেখানে সহজাত, আর মোক্ষ অর্থাৎ কামনার থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াস সেখানে স্থিত হয়ে একটি বিলাসিতার ন্যায় প্রয়াস। তাই এই কর্ম আজ্ঞাচক্রের অভ্যন্তরীণে স্থিত হয়ে করতে হয়, যেখানে সংকল্পকেই আজ্ঞা রূপে পালন করতে হয়, আর যদি তা না করা যায়, তবে পতন অনিবার্য”।

হুতাশন প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু পুত্রী, যদি এই সন্তানলাভের পদ্ধতিতে এতটাই পতনের সম্ভাবনা, তবে সেই পথে যাওয়ার প্রয়োজন কি? সেই পথে না গেলেই তো হলো!”

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, “যুদ্ধ করার সময়ে অস্ত্র ধারণ করতে হয়, সংকল্প ধারণ করতে হয়, কিন্তু যদি শত্রুর সম্মুখীনই না হওয়া হয়, তবে সেই সংকল্পের লাভ কি, আর সেই যুদ্ধে জয়লাভই বা সম্ভব কি ভাবে? ... সন্তানের জন্ম দেবার প্রয়াস সেই যুদ্ধ পিতা। ... সেই সময়ে নারীপুরুষের ভেদাভেদ সপ্তমে থাকে, কামনার হাতছানি সপ্তমে থাকে, আর মোক্ষচিন্তার নাশ এবং অর্থ ভুলে যাবার আবাহন সর্বক্ষণ থাকে। তাই এই হলো সেই কাল, যেখানে বিবাহিত দম্পতি যুদ্ধে স্থাপিত হন।

যদি এই যুদ্ধে নিজেদের সংকল্পকেই স্থাপন করতে পারেন, এবং প্রতিক্ষণে তাঁদের বিবাহের অর্থকে স্মরণ রাখতে পারেন , তাকে ধারণ করতে পারেন, কামনাকে প্রত্যক্ষ করে তার নাশ করে মোক্ষ পথে চলতে পারেন, তবেই এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব, আর তখনই বিবাহ সার্থক হয়, প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ হয় অর্থাৎ কামনার থেকে মুক্তিলাভ হয়, আর যার বিবাহ সার্থক, তাঁর সন্তানও ভগবৎগুণ বিশিষ্ট হন, অর্থাৎ সেই সন্তান স্বততই সত্যকামী হন, এবং আকাঙ্ক্ষা, কামনা, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার দাসত্ব থেকে সহজাত স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই মুক্ত হতে সচেষ্ট হন।

আর যদি অর্থহীনতা, ধর্মহীনতা এবং মোক্ষপ্রয়াসহীনতার থেকে কেবলই কামনার দ্বারা যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হয়ে সন্তানপ্রাপ্তি হয়, সেই সন্তান হয় কামনার পূজারি, সেই সন্তান হয় যন্ত্রনির্ভর, এবং অন্ধবিশ্বাসী। ... এক সত্যকামী সন্তানের জন্ম দেওয়ার অর্থ হলো মানবতাকে উর্বর করে তাকে পরমার্থের পথগামি করে তোলা, আর এক কামনার পূজারিকে জন্ম দেওয়ার অর্থ হলো মানবতাকে অবলুপ্তির পথে চালিত করার মহাযজ্ঞ।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে অহং, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা তথা আবেগরা গ্রাস করে রেখে, প্রতিটি মানবদম্পতিকে এই কামনার পূজারি করে রেখে দিয়েছে। তাই দেখতেই পাচ্ছেন পিতা, প্রতিটি মানবসন্তান যান্ত্রিক হয়ে জন্ম নিচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে কামনার পূজারি হয়ে, আর তারফলে মানবযোনি

ক্রমশ অবলুপ্তির পথে চলমান। ... এর থেকে বাঁচার উপায়, বাঁচানোর উপায় একটিই, আর তা হলো সন্তানের জন্ম দেওয়া, আর সেই জন্ম দেওয়ার কালে সংকল্পের আজ্ঞা পালন করা। তাই আপনাদের সকলকে অনুগ্রহ করছি, আমাদের বিশুদ্ধে বিবাহদান করুন এবং আজ্ঞাতে আমাদের স্থাপিত করে আমাদের সন্তানকে জন্মগ্রহণ করতে দিন"।

দেবী মানসী বললেন, "সর্বা, আমি আর তোমার ভ্রাতাও যে অন্য মানবদের মতই কামনায় আক্রান্ত হয়ে যৌনতার আচ্ছাদনে স্থাপিত হয়েছি! ... এর থেকে মুক্তির উপায় কি ভগিনী?"

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "সেই কারণেই তো দিদি আমি চাই যে, আমার সন্তান যতক্ষণ না পূর্ণরূপ ধারণ করে বাকসক্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ তুমিই আমাদের সম্মুখে থেকে, সেই সন্তানের লালনপালন করো। ... এই কর্ম করার কালেই তুমি জেনে যাবে, পবিত্রতার শক্তি কতখানি, আর কামনার শক্তি কতখানি, আর তার থেকে শিক্ষা লাভ করার পরেই, তোমার সন্তানের জন্ম হবে দিদি"।

এতকথার পর, বিশুদ্ধে সকলে গমন করে সর্বাম্বা ও অখণ্ডের বিবাহ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে, মনিপুরের উর্ধ্বে আর দেবী কল্পনারা কিছুতেই যেতে পারলেন না। হিম্লহু সম্মুখে এসে বললেন, "মাতা, যেই সন্তান আমাদের পিতাদের প্রাণ হরণ করবে, আমি তার বিনাশ করে আসতে চাই, আমাকে আজ্ঞা দিন। ... আমি হিম্লহু, তাই যেখানে যেখানে লহু প্রবাহিত হতে পারে, আমি সেখানে সেখানে যাত্রা করতে সক্ষম। তাই আমাকে আদেশ দিন মাতা। আমি অনাহত কেন, আজ্ঞা পর্যন্ত যাত্রা করতে সক্ষম"।

দেবী কল্পনা হাস্যবশে তাঁর বীর পুত্র হিম্লহুকে যাত্রা করার অনুমতি প্রদান করলে, হিম্লহু মুহূর্তের মধ্যে রক্তের ধারার সাথে প্রবাহিত হয়ে অনাহততে, এবং অনাহততে কারুকে দেখতে না পেয়ে, বিশুদ্ধের দিকে যাত্রা করলেন। অনাহত থেকে বিশুদ্ধে যাত্রা করার কালে, হিম্লহুর গতি হ্রাস পায়, কারণ সেখানে রক্তের প্রবাহধারা অত্যন্ত মন্থর। ... আর যখন সেখানে গিয়েও

কারুকে দেখতে পেলেন না তিনি, তখন আজ্ঞার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। আর এই ক্ষেত্রে তাঁর গতি আরো মন্থর হয়ে যায়, তাই তাঁর আজ্ঞাতে উপস্থিত হতেও বহু দেরি হয়ে যায়।

সেই অন্তরালে, দেবী সর্বাম্বা এবং অখণ্ড আজ্ঞার মধ্যে স্থিত হন। দেবী মানসী ও দেবী দখিনা আজ্ঞার অভ্যন্তরেই নিজেদের ভূমিকা পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। আর বোধি তথা হুতাশন আজ্ঞার বাইরে অপেক্ষা করেন, এবং আজ্ঞাকে সুরক্ষা প্রদান করতে থাকেন।

মাতার ইশারায় প্রথমে অখণ্ড ধ্যানস্থ হলেন। যতই গভীর হতে থাকলো তাঁর ধ্যান, ততই তাঁর দেহের উষ্মা বৃদ্ধি হতে থাকলো, আর এক সময়ে সেই উষ্মা এতটাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো যে, সেখানে উপস্থিত দেবী মানসী, দেবী দখিনার চোখ ধাঁদিয়ে গেল। এমনকি আজ্ঞার বাইরে অপেক্ষা করা বোধি ও হুতাশনও নিজেদের নেত্রের সম্মুখে কিচ্ছু দেখতে পেলেন না। তাঁরা যখন নেত্র খুলতে পারলেন, তখন দেখলেন, অখণ্ডের উষ্মা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে, আর মাতা সর্বাম্বা তখন গহন ভাবে ভাবস্থ।

তাঁরা দেখলেন, অখণ্ডের সমস্ত প্রকাশিত উষ্মা দেবী সর্বাম্বা নিজের তনুর মধ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছেন, এবং যতই তা গ্রহণ করছেন, ততই তাঁর উষ্মা বৃদ্ধি হতে থাকছে। একটা সময় ক্রমে আসে যখন অখণ্ডের আর কনো উষ্মাই বাহ্যে অবশিষ্ট রইল না, সমস্তই সর্বাম্বা নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। এমন হবার পর কিছুক্ষণ বিরাম লাগে সমস্ত কিছুর মধ্যে, আর এই বিরামের মধ্যে অখণ্ড নিজের ধ্যানবস্থা থেকে নির্গত হয়ে যায়। মাতা সর্বাম্বা তখনও গহন ভাবে ভাবস্থ। তাঁর শ্রীমুখে একটি অসম্ভব সৌখিন হাস্যরেখা বর্তমান, যা দেখা মাত্রই সকলের মধ্যে একটি তৃপ্তির আনন্দ উপস্থিত হয়।

এমনই তাঁরা সকলে দেখছেন, এমনকি বোধি ও হুতাশনও আজ্ঞার অন্দরে প্রবেশ করে, মাতার এই রূপশোভা দেখছেন, তেমনই অবস্থায় সকলে দেখলেন, মাতা সর্বাম্বার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা জমা হতে শুরু করেছে। ... কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই স্বেদকণারা আর ললাটে সীমাবদ্ধ থাকলো না। তা মাতার সমস্ত শ্রীবদনকে বেষ্টন করে ফেলল, আর ক্রমে তা তাঁর সমস্ত তনুকেই

বেষ্টন করে ফেলে। আর তার পরবর্তীতে সকলে দেখলেন, মাতার শ্রীঅঙ্গে এক অসম্ভব সৌম্য আভা প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ক্রমশ উত্তাপ তাঁর মধ্যে অসম্ভব হয়ে ওঠে, আর তা এতটাই উত্তাপ হয়ে যায় যে তাঁর অঙ্গের বর্ণ গোলাপি থেকে রক্তিম হয়ে ওঠে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের সমস্ত কনক ও রজতের গহনা গলতে শুরু করে। অখণ্ড সেই ভয়াবহ উত্তাপ দেখে, অস্থির হয়ে উঠলে, দেবী মানসী নিজের আঁচল দ্বারা মাতাকে বাতাস করতে শুরু করলেন। আর মানসীর এমন কৃত্যে মাতার দেহের উষ্মা বাষ্পের মত সমস্ত আজ্ঞাচক্রের অন্তরে ভ্রমণ করতে শুরু করে দেয়।

ক্রমে সমস্ত আজ্ঞাচক্রই সেই প্রকাণ্ড বাষ্পে ঢেকে যেতে শুরু করলো। আর তা এতটাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠতে শুরু করলো যে, তা আজ্ঞাচক্র ছাড়িয়ে ক্রমে বিশুদ্ধ, অনাহত, এবং আরো পরে সমস্ত সুষুম্নাতেই বিস্তার পেতে শুরু করে। সেই বাষ্পের তেজ এমনই যে, তার প্রভাবে দেবী কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা সহ, তাঁদের তিনপুত্রও মূর্ছা গেলেন; হিম্লহু, ঋপু ও ভাঞ্চ শ্বাস নিতে না পেরে হাঁসফাঁস করতে শুরু করলেন, আর সেই উষ্মা ক্রমে এতটাই প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো যে তার উত্তাপে স্বয়ং ব্রহ্মসনাতনের তনুতেও তার প্রভাব ব্যক্ত হলো।

ব্রহ্মসনাতন মাতার প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদিত। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন, মাতা নিজের মধ্যের উষ্মা প্রকাশ করছেন। তাই অসহ্য পিড়া অনুভব করলেও, নিজেকে শান্ত রেখে সমস্ত কিছুকে সহ্য করতে শুরু করলেন। কিন্তু একটা সময়ে তা এমনই অসহনীয় হয়ে ওঠে তাঁর কাছে যে রাত্রে নিদ্রারত অবস্থায়, “মাতা!” বলে চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

আর সেই ব্যকুল শব্দ শ্রবণে, মাতা সর্বাম্বার ভাব দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে যায়। প্রাণপ্রিয় সন্তানের পিড়া তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি ভাবের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড শ্বাসগ্রহণ করলেন, আর সেই শ্বাসের ফলে সমস্ত প্রসারিত বাষ্প পুনরায় মাতা সর্বাম্বার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। ক্রমে তা ব্রহ্মসনাতনের সমস্ত দেহ থেকে সুষুম্নাতে প্রবেশ করে, অতঃপরে তা মূলাধার থেকে অনাহত, বিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করে মাতার সম্মুখে অবস্থান করে।

তবে মাতা সর্বাম্বা যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছিলেন প্রাণপ্রিয় সন্তান, ব্রহ্মসনাতনের আর্তনাদে, তার জন্য সেই বাষ্পও দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়ে, মাতার সম্মুখে দুই উর্জাপিণ্ডের ন্যায় অস্থির হয়ে অবস্থান করতে থাকে। এতে সকলের স্বস্তি হলে, দেবী কল্পনাদেরও সংজ্ঞা প্রত্যাবর্তন করে, আর হিল্লহু ও তাঁর ভ্রাতাদেরও স্বস্তি হয়, আর ব্রহ্মসনাতনও কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এতক্ষণ বাষ্পের কারণে কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। এবার সেই বাষ্প দুই উর্জাপিণ্ডরূপে মাতা সর্বাম্বার সম্মুখে অস্থির ভাবে ঘূর্ণন করার জন্য সকলে সকল কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন।

আর তা দেখতে পাওয়ার পর অখণ্ড যা দেখলেন, বা অন্যরাও যা দেখলেন, তা দেখে নিজেদের নেত্রকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। সকলে দেখলেন যে, এই প্রকাণ্ড উষ্মার তাপে সকলে যেমন ঘর্মাক্ত হয়ে গেছেন, দেবী মানসীরও সমান দশা। কিন্তু তাঁর এই দশা ছাড়াও যা হয়েছে, তা হলো অগ্নির তাপ সয়েছেন তিনি। তিনিই সর্বাম্বার সব থেকে নিকটে অবস্থান করছিলেন। তাই মাতার উষ্মা যার উপর সর্বাধিক ও সর্বপ্রথম আঘাত এনেছে, তিনি হলেন দেবী মানসী।

সেই উষ্মায় তাঁর সমস্ত দেহ যেন কাঁচা হলুদের মত বর্ণ ধরেছে, যেন তাঁর দেহের উপরি কোষসমূহ জ্বলে গিয়ে, তারা দেহ ত্যাগ করে বাষ্পের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও, তিন একটিবারের জন্যও একটি শব্দ করেন নি, আর একটি বারের জন্য দেবী সর্বাম্বাকে বাতাস করা বন্ধও করেননি। ... অসম্ভব প্রেম ছাড়া এমন কর্ম যে আর কিছুতেই করা সম্ভব নয়, তা কারুকে বলে দিতে হলো না।

কিন্তু এই অসম্ভব প্রেমকে দর্শন করে অখণ্ড ক্রমে একটি প্রাণপূর্ণ হাস্য প্রদান করলেন এবং নিজের অন্তরে ভাবলেন, “অদ্ভুত মাতার প্রেম। সেই প্রেম লাভ করে, নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছেন দেবী মানসী, আর ব্রহ্মসনাতনের মন এমন ভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্য, সে সম্পূর্ণ ভাবে মাতার প্রতি সমর্পিত”। অখণ্ড আবার ভাবলেন, “সর্বাম্বা মানসীর এই প্রেমকে দর্শন করতে পারলো না। দর্শন করতে পারলে, নিশ্চয়ই প্রাণপূর্ণ আলিঙ্গন প্রদান করতেন তাঁর প্রাণপ্রিয় ভগিনীকে”।

অখণ্ড প্রতিবার একটি একটি করে ধারণা করে দেবী চিন্তার প্রভাবে এসে, আর প্রতিবার অনুভব করে যে তার অনুমান কতটা মিথ্যা, কতটা অসত্য। এবারেও তার অন্যথা হলো না। মাতা নিজের ভাবস্থ অবস্থার মধ্যেও যেন দেবী মানসীর এই পিড়াকে অনুভব করছেন। আর তা অনুভব করেই যেন, এবার তিনি হিমের বর্ষণ করতে শুরু করলেন। আর সেই অদ্ভুত হিমের বর্ষণ কেবলই সেই দুই অস্থির উর্জাপুঞ্জকে সিক্ত করলো, আর সিক্ত করলো দেবী মানসীকে।

সকলেই দেখছিলেন, কিন্তু অখণ্ডের নেত্র যেন দেবী মানসীতেই আটকে গেছিল। তিনি দেখলেন, দেবী মানসী সেই শীতল হিমের স্পর্শ লাভ করে তৃপ্ত হলেন, তাঁর দেহের উষ্মা শান্ত হলো। কিন্তু তাঁর দুই নয়ন এই শান্তিলাভে অশ্রুপূর্ণ। তিনি এতটাই মাতার প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছেন যে তিনি কেবল মাতার প্রেমকেই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি সেই প্রেমদৃষ্টিতে এই দেখছেন যে, যতই ভাবস্থ হন মাতা, যতই সন্তানের জন্ম দেবার কর্মে লিপ্ত হন মাতা, তিনি সর্বক্ষণই জগন্মাতা। আর তাই তাঁর প্রতিটি সন্তানের দিকে দৃষ্টি রয়েছে। তাঁর এই সন্তান যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেছে, তার দিকেও তাঁর দৃষ্টি সজাগ!... আর এই ভাবকে অনুভব করে দেবী মানসীর দুই নেত্র অশ্রুতে পরিপূর্ণ।

অশ্রুধারার জন্য তিনি নেত্রে কিচ্ছু দেখতেও পাচ্ছেননা, কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও মাতাকে বাতাস করা বন্ধ করে নিজের নেত্রের জল মুছছেন না! ... কি অসম্ভব নিষ্ঠা! ... অন্যদিকে নিজের পুত্রীর এমন অবস্থা দেখে, মাতা কি করে শান্ত থাকতে পারেন। দেবী দখিনা তাই নিজের আঁচল দিয়ে মানসীর নেত্রজলকে পুঁছে দিলেন। ... অখণ্ড এই সমস্ত কিছুই দেখতে থাকলেন, আর ভাবতে থাকলেন, “কি অদ্ভুত পরমাত্মীয়তার উৎসবে সকল ভূত মেতে উঠেছে ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে!”

অন্যদিকে মাতার এই হিমবর্ষার পর, যেমন দেবী মানসী স্নাত হলেন, তেমনই দুই উর্জ্জাপুঞ্জও শান্ত হলেন। এবার দেবী দখিনা সেই উর্জ্জাপুঞ্জগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁদের কাছে এসে, তাঁদেরকে স্পর্শ করে বললেন, “দাদুভাই!” ... তিনি হয়তো ভুলে গেছেন যে তিনি হলেন স্বয়ং পবন, কিন্তু পবন নিজেকে পবন মানতে পারুক আর না পারুক, তাঁর গতিবিধি তো পবনের

ন্যায়ই হবে। তাই পবনের স্পর্শ লাভ করে, দুই উর্জাপুঞ্জ এবার দেবী মানসীর পাশে একটি প্রস্তরের উপর স্থাপিত হলো, আর তা হতেই, তারা দুটি বালকের রূপ ধারণ করতে শুরু করলো।

অখণ্ড মাতা সর্বাম্বার লীলা দেখতে থাকলেন আর নিজেকে সেই দৃশ্য দেখতে পাবার জন্য ধন্য ধন্য বলতে থাকলেন। তিনি দেখলেন, অগ্নিদেবকে আবাহন করালেন মাতা তাঁর মধ্যে, এবং সেই অগ্নির প্রভাবে উর্জ্জাপুঞ্জ স্থাপন করলেন। তিনি আরো দেখলেন, দেবী মানসী হলেন আকাশতত্ত্ব। সেই আকাশতত্ত্বের অন্তরে প্রেম জাগ্রত করে, তাঁকে দিয়ে বাতাস করালেন মাতা, অর্থাৎ আকাশের বুকে তিনি সন্তানকে স্থাপন করলেন। সেই উর্জাপুঞ্জকে হিম প্রদান করলেন, অর্থাৎ বরুণদেবকে দিয়ে, তৃতীয়ভুতের সঞ্চার করালেন উর্জাপুঞ্জদের।

এরপরে, দেবী দখিনা অর্থাৎ পবনদেবের অন্তরে মমতা জাগ্রত করে, তাঁকে দিয়ে স্পর্শ করালেন উর্জাপুঞ্জকে এবং এই ভাবে চতুর্থভূত প্রদান করলেন সেই উর্জাপুঞ্জদের। আর অন্তে, তাঁদের স্থাপিত করলেন প্রস্তরের উপর, অর্থাৎ দেবী ধরিত্রীর স্পর্শ প্রদান করে, সেই উর্জাপুঞ্জদের পঞ্চভূত প্রদান করলেন। সমস্ত কিছু দেখে অখণ্ড আপ্লুত হয়ে গেলেন, আর ভাবলেন, "বৃথাই আমরা নিজেদের কর্তা জ্ঞান করি, সমস্ত কিছু স্বয়ং জগজ্জননী পরাপ্রকৃতি করেন, আর আমরা ভেবে মরি, আমরাই সমস্ত কিছু করছি। ... পঞ্চভূত সকলেই নিজের নিজের ধর্ম পালন করলেন, কিন্তু তাঁরা জানতেও পারলেন না যে তাঁরা সেই ধর্ম পালন করলেন। আর সেই সমস্ত কিছু এত সহজে এই কারণে সম্ভব হলো, কারণ ব্রহ্মসনাতনের অন্তরে সমস্ত ভূত মাতার প্রতি সমর্পিত, আর তাই অহং, কল্পনা, চিন্তা বা ইচ্ছা কারুর কনো প্রভাব নেই তাঁদের উপর। কি অসম্ভব দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখার পর, কর্তাভাবের অস্তিত্ব থাকার কনো ঔচিত্যই অবশিষ্ট থাকেনা"।

এমন সমস্ত কিছু যখন অখণ্ডের চেতনা অখণ্ডকে বলতে থাকলো, তখন সকলে দেখলেন মাতার পরবর্তী লীলা। দুই উর্জাপুঞ্জ প্রস্তরে স্থাপিত হয়ে, মানবিয়রূপ ধারণ করতে থাকলে, মাতা সর্বাম্বার মধ্যে ক্রমশ পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি ক্রমশ তাঁর সৌম্য গোলাপি বর্ণময়রূপে

প্রত্যাবর্তন করতে থাকলেন। আর এই অবস্থায়, তাঁর সর্বাঙ্গে থাকা স্বেদের কণা, আর সেই কণাদের উপরে স্থাপিত তাঁর গহনাসকলের গলিত ধারা মাতা সর্বাম্বাকে অসম্ভব সুন্দরী করে তুলেছিলেন।

দিব্যতা নয়, অতিদিব্যতা যেন সর্বাম্বার সমস্ত তনুকে আবিষ্ট করে রয়েছে। আর এবার ক্রমশ সেই তনু থেকে বিবিধ সুবাস নির্গত হতে শুরু করে। প্রথমে চন্দনের সুবাস, তারপর বিভিন্ন সুগন্ধি পুষ্পের সুবাস, এবং অন্তে মিষ্টদুগ্ধের সুবাস সর্বত্র ভাসমান হতে শুরু করে। সেই সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত যোনি যেন একত্রে তৃপ্তির আর্তনাদ করলেন, আর সেই আর্তনাদের পরে, মাতার দুই শিশু ক্রন্দন করে উঠলেন। ... এই সম্পূর্ণ দিব্য অনুষ্ঠান দেখে, সকলে অতি তৃপ্ত হয়ে উঠলে, একটি ঘটনাকে কেউ প্রত্যক্ষই করতে পারলেন আর তা হলো হিম্লহুর আজ্ঞাতে আগমন।

হিম্লহু এই গুহার বাইরে স্থিত হয়ে তখন থেকে সমস্ত কিছু দেখছেন, যখন থেকে দেবী দখিনা দুই উর্জাপুঞ্জকে স্পর্শ করেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতির ভান কারুরই হয়নি, কারণ সকলেই মাতা সর্বাম্বার লীলা দেখার জন্য আতুর ছিলেন। ... দুইসন্তান জন্ম নেবার পর, সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে, দেবী দখিনা মানসীর কাছে এসে বললেন, “মানসী, এবার একটু বিশ্রাম নে মা! ... তখন থেকে বোনকে বাতাস করে যাচ্ছিস। কত কিছু সহ্য করলি এই কাজ করার কালে, এবার একটু মুখ ধুইয়ে আয়। বাইরে বাম দিকেই একটা ঝর্ণা আছে, সেখানে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আয়”।

দমনদামিনী

দেবী মানসী আজ্ঞা থেকে নির্গত হতেই, হিম্লহু দেখলেন, এই সুযোগ। আর তা ভাবা মাত্রই, নিজের থেকে একটি বিশাল সর্প প্রকাশ করে, দেবী মানসী যেই ঝর্ণার নিকটে গেছিলেন, সেখানে সেই সর্পকে স্থাপন করলেন। দেবী মানসী নিজের ভগিনীর সন্তানের জন্ম দেওয়া

নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে দেখে, তৃপ্তি ধারণ করে ঝর্ণার নিকটে গমন করলে, তাঁর অন্য কনোদিকে মন থাকেনা, কেবলই মাতা সর্বাম্বার অপার রূপপ্রকাশের ছবিই তাঁর মনে ভাসতে থাকে।

আর তাই তিনি সেই সর্পকে খেয়ালই করেননি। কিন্তু সেই বিশাল অজগর দেবী মানসীর বামচরণকে নিজের মুখের মধ্যে ধারণ করে তাঁকে ভক্ষণ করে নেবার প্রয়াস করতে থাকে। দেবী মানসী এবার সেই সর্পের দিকে তাকিয়ে, প্রকাণ্ড চিৎকার করে উঠলে, বোধি ও হুতাশন একত্রে দেবী মানসীর নিকটে গেলেন। সেই সর্পকে দেখে, তাঁরা দুইজনই সেই সর্পকে আঘাত করতে গেলে, সেই মায়াবী সর্প নিজের থেকে আরো দুটি ফণা নির্গত করে এবার বোধি ও হুতাশনের দুটি অঙ্গকে আকর্ষণ করে, তাঁদেরকেও ভক্ষণ করা শুরু করলেন।

সেই দেখে, দেবী মানসী পুনরায় চিৎকার করলে, এবার দেবী দখিনা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে যেতে থাকলেন যেখানে দেবী মানসী অবস্থান করছিলেন। অখণ্ডও বুঝলেন বিপদ এসেছে কিছু। তাই তিনিও সেইদিকে গমন করলেন। আর অখণ্ড গমন করতেই, দেবী সর্বাম্বা নিজের নেত্র খুললেন তীক্ষ্ণ ভাবে। তিনি জানেন, গুহার দ্বারেই উপস্থিত আছে হিম্লহু, যিনি শিশুদের অহিত করার মানসিকতা নিয়ে এখানে উপস্থিত। তাই, তিনি গুহার মধ্যে একটি আনাচে, দুই শিশুকে দুই বাহুতে ধারণ করে, লুকিয়ে পরলেন।

আর হিম্লহু সেই গুহাতে প্রবেশ করা মাত্রই, মাতা সর্বাম্বা দুই সন্তানকে দুই বাহুতে নিয়ে গুহা থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণ দিকে গমন করলেন। হিম্লহুও তাঁকে দর্শন করে ফেলেন পলায়ন করতে, আর তাই তিনিও দেবী সর্বাম্বার পশ্চাৎধাবন করতে থাকলেন। একদিকে মাতা সর্বাম্বা নিজের দুই ক্রোরে দুই সন্তানকে নিয়ে দ্রুতগতিতে সহস্রারের দিকে ধাবমান হলেন ও হিম্লহু তাঁর পশ্চাতে ধাবমান হলেন, আর অন্যদিকে অখণ্ড সেই চারমুখি সর্প, যা চারভূতকে ভক্ষণ করার প্রয়াস করছিলো, তার সেই স্থান যেই স্থান থেকে চারটি মস্তক বিভক্ত হয়েছে, সেখানে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

সেই মুষ্ট্যাঘাতে সর্পটি প্রাণ হারালে, সেই মুহূর্তে সর্পটি অবলুপ্ত হলো। আর তা দেখে সকলেই বুঝতে পারলেন যে এই সর্পটি একটি মায়া ছিল মাত্র, অর্থাৎ ভাবস্থ সর্বাম্বার কাছে তাঁর দুই সদ্যজাত সন্তানকে একাকী ফেলে রেখে এসেছেন তাঁরা। এমন অনুভব করে সকলে প্রাণপণে আজ্ঞার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য দ্রুত বেগে গমন করলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন, না তো সেখানে মাতা সর্বাম্বা আছেন, আর না তাঁর দুই সন্তান। সেই দৃশ্য দেখে ভয়ার্ত হয়ে গিয়ে সকলে এবার দক্ষিণ দিকে দ্রুতগামী হয়ে ধাবিত হলেন। কি হয়েছে, বা কি হতে চলেছে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের কারুর কনো ধারণা নেই। তবে তাঁরা নিশ্চিত যে, তাঁরা সকলে বাম দিকে গেছেন আর সেদিকে সর্বাম্বা যায়নি, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যান বা কেউ তাঁকে নিয়ে যান, তিনি দক্ষিণ দিকেই গেছেন। তাই সেইদিকেই তাঁরা দ্রুততার সাথে ধাবিত হলেন।

অন্যদিকে, অচেতন হবার পর যখন দেবী কল্পনা প্রত্যাবর্তন করলেন চেতনাতে, তখন তিনি ভয়ার্ত হয়ে গিয়ে, ভাঞ্চকে বলেন, "পুত্র ভাঞ্চ, হিম্লহু একাকী গমন করেছে উর্ধ্বলোকে, কিছু তো বৃহৎ ঘটনা ঘটেছে, নাহলে আমরা সকলে একত্রে মূর্ছিত হয়ে যেতাম না। তুমি যাও আর তোমার ভ্রাতার সম্বল হয়ে তার পাশে থাকো"। সেই আদেশ লাভ করে ভাঞ্চও অগ্রসর হতে হতে প্রায় আজ্ঞার নিকটে এসে গেছেন, কিন্তু তখনও তিনি হিম্লহুর সাথে সাখ্যাত করতে পারেন নি।

অন্যদিকে সর্বাম্বা হিম্লহুকে সুদীর্ঘ পথ ছোটালে, হিম্লহু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "অনেক শুনেছি তোমার কথা দেবী! ... আজ তোমার সাথে যুদ্ধ করে মনে হচ্ছে তো ভালোই লাগবে! আমাকে আমার বাকি দুই ভ্রাতা কনোদিনও এতক্ষণ নিজেদের থেকে বিরত রাখতে পারেনি দৌড় করিয়ে। দুই শিশুকে নিয়ে তুমি এমন গতি ধারণ করে ধাবন করছো যে আমি অনুধাবন করে তোমাকে স্পর্শ করতে পারছি না! বেশ বুঝতে পারছি তুমি সাধারণ কেউ নও। দুটি সন্তানকে প্রসব করার পর, এমন গতি ধারণ যে করতে পারে, সে সাধারণ হতেই পারেনা! ... তবে আর বেশিক্ষণ নয়! তোমার গতি এবার শিথিল হবেই, প্রসব বেদনার পর এত গতি তুমি সইতে পারবেনা!"

মাতা সর্বাম্বা সমস্ত কথাই শুনছিলেন, কিন্তু যতক্ষণ না নিজের সন্তানদের একটি সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে দিচ্ছিলেন, ততক্ষণ থামার চিন্তাই করছিলেন না। ... কিন্তু অন্যদিকে, অখণ্ড প্রকাণ্ড গতি ধারণ করে ধাবিত হলে, তাঁর পিছনে সকলেই ধাবিত হন। তাঁরা প্রায় হিম্লহুর কাছে এসে গেছেন; হিম্লহুকে তাঁরা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু পূর্বের তাপগ্রহণ ও এইকালে প্রকাণ্ড গতি নিয়ে ধাবিত হবার কারণে দেবী মানসীর মধ্যে এবার প্রসব বেদনার সঞ্চার হতে শুরু করে।

বোধি তথা সকলে সেই দৃশ্যদেখে কিছুটা হতবাকও হলেন, আর কিছুটা চিন্তিতও। হতবাক এই কারণে হলেন কারণ, দেবী মানসীর মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হবার কনো লক্ষণই তাঁরা খুঁজে পাননি এতক্ষণ, আর চিন্তিত হলেন এই কারণে যে এবার দেবী মানসী কি করে ধাবিত হবেন। আর যদি তিনি গতিধারণ করতে না পারেন, তবে তাঁকে একা ফেলে রেখে, তাঁরাই বা কি করে অগ্রসর হন। কিন্তু যেন মাতা বোধির অন্তরের কথা শুনতে পেলেন। আর তাই তিনি একস্থানে দাঁড়িয়ে পরলেন।

হিম্লহু হাঁপাতে হাঁপাতে অট্টহাস্য করে বললেন, ‘কি দেবী বলেছিলাম না, আর বেশিক্ষণ তুমি এমন গতি রাখতে পারবে না! দেখলে! আমি ঠিকই বলেছিলাম!”

মাতা সর্বাম্বা এক মুচকি হাস্য প্রদান করে বললেন, “কর্তা ভাব যাদের থেকে উৎপন্ন হয়, সেই দেবী কল্পনাদের কাছে তুই বড় হয়েছিস হিম্লহু। তাই তোর মধ্যে কর্তা ভাব যে প্রকাণ্ড থাকবে, সে তো জানা কথা। ... কিন্তু মূর্খ, শুনে রাখ তাহলে, আমি ক্লান্ত হয়ে দাঁড়াই নি। আমি দাঁড়িয়েছি তোর দমন করার জন্য। আরো খানিকক্ষণ তোকে দৌড় করানোর ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু তোর পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে, আমার ভগিনীর প্রসববেদনা জন্ম নিয়েছে। তাঁর এই অবস্থায় গতিধারণ উচিত নয়। ... তাই এই স্থানেই, আর এই মুহূর্তেই তোর হত্যা করবো বলে আমি স্থির করেছি”।

হিম্লহু সেই কথাতে ডুকরে ডুকরে হেসে উঠে বলল, "কিন্তু কি করে দেবী? আমাকে আঘাত করবে? করো করো, আঘাত করো! ... আঘাত করেই দেখো, কি হয়!"

মাতা সর্বাম্বা মৃদুহাস্যে, নিজের চরণকে ভূমিতে প্রবল বেগে আঘাত করলেন, আর তাতে হিম্লহু ছিটকে পশ্চাতে গমন করে, একটি প্রকাণ্ড পাথরের সাথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, নিজের মস্তক ও বাহুতে আঘাত পেলেন। মানসী, বোধিরাও মাতার এই আঘাতে টলমল হয়ে গেলেন, কিন্তু অখণ্ড দেবী মানসীকে সামলে নিলেন। হিম্লহু এই আঘাতপ্রাপ্ত হবার পর, সেই অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে, উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস করলেন।

সেই দেখে, মাতা সর্বাম্বা অধিক স্বরে অট্টহাস্য করে উঠলেন। আর মাতার এই হাস্য দেখে, হিম্লহু অভিমানে হুঙ্কার ছাড়লেন, "এই আঘাত দিয়ে আমাকে হত্যা করবে তুমি! ... তোমাকে জ্ঞানী জানতাম, অন্তত পিতারা তেমনই বলেছিলেন, কিন্তু এখন তো দেখছি, তুমি মূর্খা!"

মাতা হেসে বললেন, "মৃত্যুর এতো তারা কেন হিম্লহু! আগে তো দেখে নে তোর বরদানের দৌড়! ... কি রে! তোর লহু বইছে! তোর শক্তি বাড়ছে!"

মাতা সর্বম্বার কথাতে, চিন্তান্বিত হয়ে, হিম্লহু নিজের ক্ষতস্থানগুলিকে নিরীক্ষণ করলেন। সত্যই লহু প্রবাহিত হচ্ছেনা! ... সত্যই তাঁর বল বৃদ্ধি হচ্ছেনা!... সেই দেখে চিন্তিত হয়ে উঠে হিম্লহু একটি মায়াবী ছুরিকা ধারণ করলেন, এবং নিজেই নিজের বাহুতে আঘাত করলেন। কিন্তু পরিণাম সেই ক্ষেত্রেও একই হলো। সেই দেখে, হিম্লহু হুঙ্কার ছেড়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, "হতচ্ছাড়ি! আমার পিতারা কেউ তোর মায়ার কথা তো বলেনি!... তোর এই গুণের কথা তো আমাকে কেউ জানায়নি! তুই তো অসম্ভব ছলনাময়ী!"

মাতা সর্বাম্বা পুনরায় হেসে বললেন, "সত্যিই তো, তাঁদের তো বলা উচিত ছিল! কেন বলেন নি তাঁরা! ... বেশ তবে আমিই বলে দিচ্ছি স্বমুখে। ... আমি মহামায়া। ... সকলের সকল মায়া, আমার শক্তিকে ধারণ করেই সম্ভব হতে পারে। নে, এবার তো তুই জেনে গেলি। ... আবার বলিস না যে, তুই জানতিস না আমি মহামায়া, তাই ছেড়ে দেব তোকে! ... দিতাম ছেড়ে, কিন্তু

তুই আমার সন্তানদের আঘাত করতে প্রয়াস করেছিস, সদ্যজাতের হত্যার মানসিকতা নিয়ে এখানে এসেছিস, নিরপরাধ আমার ভগিনী, মানসীকে মায়াসর্প বেশে ভক্ষণ করার প্রয়াস করেছিস। তাই তোর কনো ক্ষমা নেই”।

হিম্লহু এবার ক্রুদ্ধ আস্ফালনে, নিজের হাতের ছুরিকা দ্বারা বারংবার নিজের দেহে আঘাত করতে থাকলো। কিন্তু একটি বিন্দুও লহু প্রবাহিত না হলে, ক্রুদ্ধ নয়নে সর্বাম্বার দিকে তাকালে, মাতা হেসে বললেন, “ওরে মূর্খ! ... তুই হিমের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছিস। ... প্রচণ্ড হিমে লহু প্রবাহিত হতে পারেনা! ... আমি মহামায়া, সেই কথা না তোর পিতারা বলেন নি, কিন্তু এও বলেন নি যে আমিই পরাপ্রকৃতি! ... এই হিমকে নির্মাণ করে, তোকে সেই হিমের গহন স্থানে নিয়ে আসার জন্যই তো তোকে এতক্ষণ দৌড় করালাম মূর্খ! ... এবার দেখা হয়ে গেছে, তাহলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যা”।

হিম্লহু ক্রুদ্ধ আস্ফালন সহ বললেন, “আমার পিতার মৃত্যু তোমার ওই দুই সন্তানের হাতে। আর তাঁদেরকে হত্যা করতে পারলে, আমার পিতারা অমর হয়ে যাবে, আর তাঁরা একবার অমর হয়ে গেলে পুনরায় আমাকে জন্ম দিয়েই দেবেন। ... তাই আমি মরতে ভয় পাইনা, কিন্তু ওই দুই সন্তানকে হত্যা না করে আমি মৃত্যুও গ্রহণ করবো না”।

এমন বলে হিম্লহু মাতার দিকে প্রকাণ্ড গতিতে ছুটে গেলে, মাতা প্রচণ্ড ক্রোধ ধারণ করে গর্জন করে উঠলেন, “জগন্মাতার ক্রোর থেকে, তাঁর সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করবি! ... এতদূর স্পর্ধা তোর!”

সেটি কেবল মাতার গর্জন ছিলনা। তার সাথে ছিল, তাঁর প্রকাণ্ড উষ্মা। সেই উষ্মাকে তাঁর ক্রোরের দুই সন্তান ধারণ করে, ক্রমশ নিজেদের দেহগঠন বৃদ্ধি করতে থাকলো, আর মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা মাতার ক্রোর থেকে নেমে পরে, বালক থেকে কিশোর, এবং কিশোর থেকে তরুণ হয়ে উঠতে শুরু করলো। একই উষ্মার কারণে, দেবী মানসীর প্রসববেদনা ছাড়াই প্রসব হয়ে

যায়, এবং তাঁর গর্ভ থেকে দুই কন্যার জন্ম হয় , এবং তাঁরাও বালিকা থেকে তরুণী হয়ে উঠলেন।

কিন্তু হিম্লহুর সেই সমস্ত কনো দিকে কনো হুঁশ নেই। যদি থাকত তাহলে সেও বুঝে যেত কার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছেন তিনি। আর সেই সমস্ত কিছু না দেখেই, তিনি মাতার নিকটে উপস্থিত হয়ে, নিজের হাতের মায়াবী তরবারি দ্বারা মাতাকে আঘাত করতে গেলেন। মাতা সর্বাম্বা ক্রুদ্ধ আস্ফালনে, একটি পদাঘাত করলেন হিম্লহুর বক্ষে, আর সেই পদাঘাত এতটাই ভয়ানক ছিল যে, হিম্লহুর দেহ প্রবল গতিতে হিমের অঞ্চলের সীমান্তে ছিটকে পরে যেতে থাকলো, আর সেই গতি এমনই অধিক ছিল যে, হিম্লহুর মুণ্ডভার সেই গতিকে আর ধারণ করতে পারলো না। তাই সেই মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, হিমের মধ্যে পরে গেল। আর মুণ্ড পতিত হবার পর, দেহ গতিজাড্য নিয়ে সামান্য দূরে গেলেও, হিমের গণ্ডি ছাড়াতে পারলো না। হিমের গাদাতেই তা পতিত হলো।

আজ্ঞাতে সেই সময়ে সবেই প্রবেশ করেছিলেন ভাঞ্চ। আর প্রবেশ করেই নিজের ভ্রাতার এমন নির্মম ও অবিশ্বাস্য হত্যা দেখে, কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে ছুটে এলেন নিজের ভ্রাতার শবদেহের নিকটে। অন্যদিকে, অখণ্ড সহ সকল সর্বাম্বার পরমাত্মীয়রা এই দৃশ্য দেখে, মাতার প্রতি অত্যন্ত তৃপ্তির হাস্য প্রদান করে মাতাকে আলিঙ্গন করতে ছুটে গেলেন। দেবী মানসী নিজের দুই কন্যাকে সম্মুখে রেখে, তাঁর ভগিনী সর্বার চরণ বন্দনা করতে বললেন পুত্রীদের।

ফুটফুটে দুই তরুণী মাতা সর্বাম্বার চরণ বন্দনা করলে, মাতাই তাঁদের একবাক্যে নামকরণ করেদিলেন, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি। সেই নামকরণ লাভ করে, সেই দুই কন্যা, তাঁদের মাতা দেবী মানসী ও তাঁদের দিদিমা দেবী দখিনা, মাতা সর্বাম্বার বক্ষস্থলে নিজেদের মস্তক রেখে, স্নেহ প্রদান ও গ্রহণ করলেন মাতার। অখণ্ড, হুতাশন, এবং বোধিও মাতা সর্বাম্বা কে তাঁর কীর্তির জন্য প্রশংসা শব্দ শ্রবণ করাচ্ছিলেন, কিন্তু এমনই অবস্থায়, সকলের অলক্ষ্যে এবং সকলের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন যারা তাঁরা হলেন অখণ্ড ও মাতা সর্বাম্বার দুই পুত্র।

তাঁদের পিতা, অখণ্ড যে সন্তানদের আলিঙ্গনসুখ এখনো লাভই করেন নি! ... তাঁদের পরমাত্মীয়রা সকলেও যে তাঁদের আলিঙ্গন সুখ লাভ করেন নি এখনও। তাই সেই আলিঙ্গন সুখ লাভ করতে সম্মুখে গমন করলে, তাঁরা দেখলেন, অখণ্ডের দুই পুত্রের দৃষ্টি মৃত হিম্লহুর দিকে নিবিষ্ট। সেই দৃষ্টির এমনই ভাষা যেন হিম্লহুকে তাঁরাই হত্যা করেছেন! ... অখণ্ড সেই নেত্রের ভাষা যেমন পড়লেন, তেমন দেবী মানসী ও অন্যান্যরাও পড়লেন, আর মাতা সর্বাম্বাও তা দেখলেন।

এই দুই সন্তানকে যেন কর্তা ভাব সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করে রেখেছে। যেই কর্মে তাঁরা অংশগ্রহণও করেনি, সেই কর্মের শ্রেয় তাঁরা নিজেকেই নিজে প্রদান করতে শুরু করে দিয়েছে। অখণ্ড তাঁদের কাছে গিয়ে বললেন, "বিচার আর বিবেকের জন্ম হয়েছে সর্বা, আমাদের সন্তানের বেশে। ... কি নাম রাখবে এঁদের!"

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "ক্ষিতীশ আর সতিশ। ... আমাদের দুই পুত্রের নাম"।

দেবী মানসী কর্তাবোধে প্লাবিত দুই অখণ্ডপুত্রের কর্তাবোধকে তাঁদের থেকে পৃথক করার জন্য বললেন, "পুত্ররা, আমি তোমাদের মাসিমা। ... আর তোমাদের কি সৌভাগ্য দেখো! তোমরা জন্ম গ্রহণ করেই তোমাদের মাতার এক অসম্ভব কৃত্যকে দেখতে পেলে!"

ক্ষিতীশ ও সতিশ ব্যঙ্গাত্মক হাস্য প্রদান করে বললেন, "সৌভাগ্য তো আপনাদের! এই অসুর আমাদের জন্মের পর এখানে এসেছিলেন, তাই এঁদের হত্যা করার বল লাভ করলেন আমাদের মাতা। আমাদের জন্ম দিয়েই তো তিনি এই বল লাভ করলেন। দেখতেই তো পেলেন আপনারা! নাকি আমাদের বালক ভেবে, আমাদের শ্রেয় না দেবার জন্য, আপনারা তা দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না!"

অখণ্ড নিজের পুত্রদের মুখে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শ্রবণ করে, হতবম্ব হয়ে গিয়ে দেবী সর্বাম্বার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন হলো এমন সর্বা! ... আমরা কি ওদের জন্ম দেবার সময়ে কনো প্রকার মল ধারণ করেছিলাম!"

দেবী সর্বাম্বা হেসে বললেন, "ঠিক যেই প্রকার মল দ্বারা বিনায়কের জন্ম হয়েছিল বলে, আপনি বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর সৃজনের মধ্যে মল স্থাপিত রয়েছে, তেমন মলের কথা বলছেন নাথ!"

অখণ্ড চিন্তিত হয়ে বললেন, "এটা হাস্যপরিহাসের সময় নয় সর্বা! আমাদের পুত্রদের মধ্যে কর্তা ভাব স্থাপিত হয়ে রয়েছে! ... এর নিরমায় কি!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "আপনি তো এর নিরাময় জানেন ভালো করেই। এঁর আগেও তো আপনি এঁর নিরাময় করেছেন, তাই না! ... কেটে দিন এঁদের মুণ্ড, আর স্থাপন করুন এঁর নতুন মস্তক!"

অখণ্ড এবার একটু বিরক্ত হয়েই অস্থির ভাবে বললেন, "সর্বা, এখানে আমাদের সম্মুখে পরিণাম এসে উপস্থিত, আর তুমি কিনা পরিহাস করছো!"

মাতা সর্বাম্বা পুনরায় হেসে বললেন, "আমার কথা আপনার কাছে পরিহাস লাগছে নাথ! ... কেন? কারণ কি এই যে, এঁদের জন্মের মধ্যে আপনার দেহউষ্মাও উপস্থিত ছিল, আর বিনায়কের জন্মের ক্ষেত্রে তা ছিলনা!"

অখণ্ড এবার বুঝতে পারলেন। পূর্বে থাকা তাঁর নিজের কর্তাভাবকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন। আর তা প্রত্যক্ষ করে এবার নরম ও লজ্জিত হয়ে বললেন, "বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার নিজের কর্তাভাবকে দেবী। বেশ দেখতে পাচ্ছি আর বুঝতে পারছি যে, এই কর্তভাবে আমি কেবল আজই বিভোর হইনি, বরাবরই বিভোর ছিলাম। ... আচ্ছা, আমার এই কর্তাভাবই কি আমাদের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "না দেব! ... না তখন আমার বা আপনার কারুর কর্তাভাব বিনায়কের উপর স্থিত ছিল, আর না আমাদের কারুর প্রভাবে এঁদের কর্তাভাব উৎপন্ন হয়েছে। ... তখনও অন্ধকের প্রভাবেই কর্তাভাবের বিস্তার হয়েছিল, যেই অন্ধককে আপনি আমার মাতৃত্বের কাছে রেখে, তাঁর কর্তাভাব দূরীকরণ করাতে পারতেন কিন্তু আপনার তো কর্তব্যের

থেকে বচন অধিক প্রিয়, তাই তখনও কর্তব্যকে ফেলে রেখে, হিরণ্যকাশ্যপকে দেওয়া বচনের মান রাখতে গেছিলেন। আর তার ফলে, কর্তাভাবের বিস্তার হতেই থাকে, যার প্রভাবে বিনায়কের মধ্যে এবং আপনার মধ্যেও কর্তাভাবের বিস্তার ঘটে, এবং পিতাপুত্রের মধ্যে যার কর্তাভাব অধিক বলবান, তাঁরই বিজয় হয়, আর আজকেও অনুরূপই ঘটেছে।

দেবী ধরিত্রী, আপনাদেরকে এই কর্তাভাবের সাথে আলাপ করানোর জন্যই কৈলাসে গেছিলেন, কিন্তু আপনারা ত্রিদেব কর্তাভাবে এতটাই চূড় যে, কর্তাভাব তো ত্যাগ করলেনই না, উপরন্তু আপনাদের সম্মুখে স্থিত আপনাদেরই পুত্র, কার্ত্তিক ও গণেশের সম্মুখে তাঁদের মাতাতুল্যা ধরিত্রীকে অপমান করে নিষ্কাসন করে দেন কৈলাস থেকে। ... যা শিখিয়েছেন তখন সন্তানদের, তাই শিখেছে তাঁরা আর তাই প্রদর্শন করছেন এখন তাঁরা”।

অখণ্ড লজ্জিত হয়ে বললেন, “ক্ষমা সম্ভব কিনা জানিনা, তবুও আমি ক্ষমাপ্রার্থী দেবী! ... সত্যই আমি তখনও কর্তাভাবেই মত্ত ছিলাম, তাই কর্তব্যের থেকে অধিক বচনকেই মর্যাদা প্রদান করেছিলাম। আমার কর্তব্য ছিল যে জগন্মাতার ক্রোরে অন্ধককে প্রদান করে, তাঁর প্রতি জগন্মাতাকে স্নেহ প্রদান করতে দেবার। যদি তা করতে দিতাম, তাহলে অন্ধকের অন্ধত্ব তখনই বিনষ্ট হয়ে যেত, আর তাঁর কারণে এতবড় যে দেবাসুর সংগ্রাম হয়েছিল, তাঁর কারণে যে বিনায়কের মধ্যে অভিমান মিশে গেছিল, আমার মধ্যে অভিমান মিশ্রিত হবার জন্য আমার হাতে পুত্রহত্যা হয়েছিল, তেমন কিচ্ছু হত না।

আর আজকেও, যখন দেবী ধরিত্রীকে অকথা ও কুকথা শ্রবণ করালাম আমি, একটিবারের জন্যও বিচার করিনি যে, আমাদের পুত্ররা সেখানেই উপস্থিত এবং দেবী ধরিত্রী তাঁদের কাছে মাতাসমান। কনো কিছু বিচার না করেই, আমি দেবী ধরিত্রীকে আমার পুত্রদের সম্মুখেই অপমান করি, আর তাই আমার সম্মুখে আমার পুত্ররা সেই একই কর্তাভাব ধারণ করে অবস্থান করছে। দেবী যা ঘটে গেছে, তাকে তো সঠিক করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখন যা ঘটছে, তাকে তো সঠিক করে দাও। ... আমাদের পুত্রদের অভিমান থেকে মুক্ত করে দাও”।

মাতা সর্বাম্বা মিষ্ট হাস্য ধারণ করে বললেন, “উপায় বলুন নাথ!”

অখণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “আমার কাছে কোথায় উপায় থাকে সর্বা! ... আমি হলাহল পান করেছি, উপায় জানা ছিল আমার সেই হলাহলের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার! ...আমি বিনায়কের মুণ্ডছেদ করেছিলাম, উপায় জানা ছিল আমার কাছে তাঁকে পুনর্জীবিত করার! ... রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভ, রম্ভা, তারকাসুরকে আমি বরদান প্রদান করেছি, তাঁদের অত্যাচার থেকে সকলকে মুক্ত করার উপায় কোথায় ছিল দেবী! ... আমার কাছে উপায় জানা কখনোই থাকে না! কেবলই অভিমান করার মত কর্তাভাব থাকে আমার কাছে। ... কৃপা করো দেবী, উদ্ধার করো আমাদের দুই পুত্রকে”।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “বেশ করতে পারি, তবে একটিই শর্তে ... আমার ক্রিয়া করার কালে, আমাকে যদি একদণ্ডের জন্যও অবিশ্বাস করা হয়, তবে সেই ক্ষণে আমি আমার দুইপুত্রের ঠিক সেই ভাবে মুণ্ডচ্ছেদ করবো, যেই ভাবে আপনি বিনায়কের ক্ষেত্রে করেছিলেন”।

অখণ্ড তথা সকল পরমাত্মীয়দের কাছে সর্বাম্বা যেন এক ভিন্ন মাতা। এই মাতা, তাঁদের পরিচিত মাতার ন্যায় দুর্বল নন, নন মমতায় কাতর। ইনি যেন পূর্ণবৈরাগী, সম্পূর্ণ ভাবে দৃঢ় নিজের কর্মসূচিতে। এবারে ইনি যেন কারুকেই মানেন না, না স্বামীকে, না সন্তানকে, আর না কারুকে। ... তিনি এবারে যেন সম্পূর্ণস্বরূপ ধারণ করে অবস্থান করছেন, এবং এক ভক্তিপ্রেম ব্যতীত কনোকিছুরই তুয়াক্কা করেন না। সাখ্যাত নিয়তি যেন তিনি, তাই অখণ্ডও প্রতিবাদ করার সাহস দেখালেন না, কারণ সেই সাহস তিনি নিজের অন্তরে সন্ধান করে লাভই করতে পারলেন না।

তবে মাতা যেন এবারে সম্পূর্ণ স্বরূপধারণ করে সাখ্যাত নিয়তি হয়েই বিরাজ করছেন, তাই স্বয়ং ত্রিদেবের সমষ্টিগতরূপ অখণ্ডকেও পরীক্ষা করে নিতে ছাড়লেননা। ভাঞ্চ নিজের ভ্রাতার শবদেহকে একত্রিত করে একটি প্রস্তরের উপর স্থাপন করে রেখে, নিজের নেত্রের জল মুছে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, “শুনেছি তুমি মাতা! শুনেছি তুমি স্বয়ং পরাপ্রকৃতি। তা হে পরাপ্রকৃতি,

আমার দমন কি করে করবে! আমি ভাণ্ড, আমার যে হত্যা সম্ভবই নয়। না ত্রিদেব, না ত্রিদেবী, কেউই আমার হত্যা করতে সক্ষম নন"।

মাতা সর্বাম্বা স্নেহের সুরে বললেন, "তোমরা অসুররা কেবলই হত্যার চিন্তা কেন করো। সমস্ত যোনির জীবদের দেখ, তাদের সকলকে কে কি অন্য কেউ হত্যা করেন বলেই দেহত্যাগ করেন তাঁরা! ... হত্যা করা ছারাও তো মৃত্যু আসতে পারে ভাণ্ড! ... একবার নিজের অসুরত্বকে ভুলে গিয়ে আমার দিকে তাকাও। আমি বলছি ভাণ্ড, তোমার যোগ্যতা আছে বলেই বলছি, আমার দিকে তাকাও একবার নিজের অসুরত্বকে ত্যাগ করে। দেখো ভালো করে, নিরীক্ষণ করে দেখো আমি কে। একবার তা দেখে নিতে পারলে, তুমি স্বয়ং বুঝে যাবে, তোমার নাশ কি করে সম্ভব"।

ভাণ্ড মাতা সর্বাম্বার কথা শুনে এক বিড়ম্বনার মধ্যে স্থাপিত হয়ে গেলেন। না তো তিনি মাতা সর্বাম্বার কথা ফেলতে পারছেন আর না গ্রহণ করতে পারছেন। মাতা কি তাঁকে বশীকরণ করার প্রয়াস করছেন! ... বিচার করে কনো উত্তর না লাভ করে, এবার তিনি সরাসরি প্রশ্নই করলেন মাতাকে, "আমার সাথে এমন সামান্য ভাবে আপনি কথা বলছেন কেন দেবী! ... আমি শত্রু আপনার, আপনার সাথে যুদ্ধ করতে তৎপর, তা আপনি জানেন না, তা তো নয়, তারপরেও আমার সাথে এমন ভাবে কথা বলছেন কেন যেন আমি আপনার শত্রুই নই!"

মাতা সর্বাম্বা মিষ্ট হেসে বললেন, "জগন্মাতা বলা হয় আমাকে। কেন জানো ভাণ্ড? কারণ আমার কনো শত্রু সম্ভবই নয়। সমস্ত বিশ্বচরাচরের সকলে আমার সন্তান। এক মা কি করে তাঁর সন্তানের শত্রু হতে পারেন! ... সন্তান নিজের মাতাকে নিজের শত্রু ভাবলেও ভাবতে পারেন ভ্রমের কারণে, কিন্তু এক মাতা নিজের সন্তানকে কি ভাবে শত্রু ভাবতেও পারেন! ... তুমি বলবে, যদি আমি শত্রুই না হই, তবে কেন আমি তাঁদের দমন করি, তাই তো!

ভাণ্ড, দেহনাশ যদি মৃত্যু হতো, আর সেই মৃত্যুতে যদি সমস্ত কিছুর নাশ সম্ভব হতো, তবে আমি কবেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করে দিতাম, কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক নিছক কল্পনা ব্যতীত

কিছুই নয়, আর সেই কল্পনা আমাকে আমার সন্তানের থেকে দূরে রাখার অছিলা ব্যতীত কিছুই নয়। ... কিন্তু মৃত্যু যে কেবল একটি অবস্থার নাশ ভাঞ্চ, একটি অবস্থান্তরের নাম মৃত্যু। একটি অবস্থা ত্যাগ করে অন্য অবস্থায় যাত্রার নাম মৃত্যু। যেই অবস্থায় পূর্বে স্থিত ছিলাম, সেই অবস্থায় স্থিত হয়ে যখন ব্রহ্মাণ্ড যে একটি কল্পনার প্রতারণা, এই ব্রহ্মাণ্ডসত্যকে উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে যায়, তখন একটি অবস্থান্তরের প্রয়োজন পরে, যাতে অন্য অবস্থাতে নিজেকে স্থাপন করে প্রয়াস করা যায় ব্রহ্মাণ্ডসত্যকে উদ্ধার করার, আর সেই অবস্থান্তর প্রক্রিয়ার নাম হলো মৃত্যু। ... তাই মৃত্যু কোথায় সত্য!

হ্যাঁ মৃত্যু এই দেহের সত্য, কিন্তু যেই দেহ স্বয়ংই অসত্য, তার সত্য কি করে প্রকৃত সত্য হতে পারে ভাঞ্চ! ... বিচার করো পুত্র, যেই কাহিনীই অসত্য, তার চরিত্র কি করে সত্য হতে পারে! ... আমি তুমি সকলে ব্রহ্মসনাতনের অন্তরে স্থিত, আর তাঁর অন্তরে যা কিছু হচ্ছে তা সত্য, আর তাই আমরাও সত্য। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের কথা যিনি জানবেন তিনি আমাদেরকে ব্রহ্মসনাতনের অন্তরের কথা বলেই জানবেন, ততক্ষণই আমরা সত্য । একমুহূর্তেও যদি ব্রহ্মসনাতনের দেহের বাইরে আমাদের কারুর সন্ধান করেন কেউ, সেই মুহূর্তে তিনি অসত্যে ভ্রমিত হয়ে যাবেন। ... তাহলে বলো পুত্র, মৃত্যু কি করে সত্য হতে পারে!”

ভাঞ্চ নিজের অজান্তেই করজোড়ে বললেন, “জানিনা কেন, কিন্তু আমার অন্তর বলছে আপনাকে মাতাই জ্ঞান করতে। তাই করজোড়ে প্রশ্ন করছি, আমাকে সত্যের সাথে সাখ্যাতকার করান। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ভ্রমিত, আমাকে সত্যের সাথে সাখ্যাতকার করিয়ে দিন মাতা”।

ভাঞ্চ এমন বলার শেষে মাতা সর্বাম্বা নিজের শূন্যকায় রূপ ধারণ করলেন। সেই শূন্য এমনই শূন্য যার কনো সীমা নেই, কনো জন্ম নেই, কনো অন্ত নেই, কনো গুণ নেই, কনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়। আর সেই শূন্যতাকে ধারণা করতে না পেরে, দেবী মানসী, দেবী দখিনা, বোধি, হুতাশন এবং চেতনা অন্তর্দৃষ্টি তথা সতিশ ক্ষিতীশের কাছে কাল স্তব্ধ হয়ে যায়। রইলেন কেবলই অখণ্ড, রইলেন ভাঞ্চ আর রইলো শূন্য। ... সেই শূন্যে স্থিত হয়ে না তো অখণ্ড নিজেকে খুঁজে পেলেন আর না ভাঞ্চ। অখণ্ড নিজেকে যে খুঁজে পাচ্ছেন না, সেই বোধও করতে

পারলেন না, এবং এক বিস্ময়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললেন। আর ভাঞ্চ ব্যকুলতা, স্নেহ ও প্রেমের সাথে বলতে থাকলেন, “মাতা, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা কেন?... আমি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছিনা! আমার তো নিজের অস্তিত্বও খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে!”

মাতা প্রকাশিতা হলেন না, যা প্রকাশিত হলো তা হলো মাতার কণ্ঠস্বর। সেই কণ্ঠস্বর বললেন, ‘কি করে খুঁজে পাবে আমাকে, কি করে খুঁজে পাবে নিজেকে, কি করে খুঁজে পাবে কারুকে! যাদের খুঁজছো তুমি, তাঁদের তো কনো কালে কনো অস্তিত্বই ছিলোনা। অস্তিত্ব কেবল আমারই ছিল, আছে আর থাকবে, আর আমি হলাম এই শূন্য, এই গহন শূন্য, এই অব্যাক্ত শূন্য। ... এই অব্যাক্ত শূন্যতাকে গ্রহণ করতে না পেরে, নিজের পৃথক অস্তিত্ব সন্ধান করার ইচ্ছা নিয়েই তো তুমি এবং সকলে নিজেদেরকে আত্ম বলে প্রকাশিত করতে শুরু করো, আর যতই তা প্রকাশিত করতে থাকো, ততই আমাকে অর্থাৎ নিজেদের স্বরূপকে হারিয়ে ফেলে, এক অলিক কল্পনাদ্বারা নিজের নিজের ব্রহ্মাণ্ডের বারবার জন্ম দাও, রক্ষা করো আর লয় করো। আর তোমাদের সম্মিলিত ব্রহ্মাণ্ড হলো এই বাহির ব্রহ্মাণ্ড, যাও কল্পনা ব্যতীত কিছুই নেই।

বিচার করে দেখো, যদি সেই ব্রহ্মাণ্ড সত্যই হতো, তাহলে কি তা তোমার নিদ্রার কালে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত! ... না যেত না, ঠিক যেমন এই শূন্যতা তখনও যায়না, আর তখনও যায়না যখন তুমি মূর্ছা লাভ করো বা মৃত্যু লাভ করো। কেন যায়না! কারণ এই শূন্যই যে একমাত্র সত্য। আর এই শূন্যই একমাত্র অস্তিত্ব। ... ভাঞ্চ, তুমি এই অন্তম সত্যকে জানার অবস্থান নিয়েই এই কাল্পনিক অবতার ধারণ করেছিলে। আর তাই তোমার হত্যা বা মৃত্যু সম্ভবই ছিলোনা। পুত্র, তোমার মৃত্যু নয়, তোমার মোক্ষলাভের সময় আসন্ন। তুমি এই শূন্যকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ, তোমার নিজের কাল্পনিক অস্তিত্বও তুমি হারিয়ে ফেলেছ। বাকি যা আছে তা হলো কেবলই নিজের কল্পনাকে ফিরে পাবার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাকে ত্যাগ করলেই, তুমি নিজের স্বরূপ, তোমার জননী, সকলের জননী, এই আমার মধ্যে চিরতরে লয় হয়ে যাবে, স্বয়ং মিথ্যা থেকে সত্য হয়ে যাবে, আর যিনিই মিথ্যা অস্তিত্ব থেকে সত্যে লীন হয়ে যান, তাঁর আর জীবনমৃত্যুর

প্রয়োজনই থাকেনা, কারণ এই জন্মমৃত্যু যে একটিই প্রয়োজনের জন্য কল্পনার পর কল্পনা, আর তা হলো নিজের মিথ্যা পরিচয় ত্যাগ করে, সত্য পরিচয়কে গ্রহণ করা"।

ভাঞ্চ-এর আর কনো কণ্ঠস্বরও শুনতে পেলেন না অখণ্ড। ক্রমে মাতার সেই শূন্যতা ত্যাগ হলো। অখণ্ডও নিজেকে ফিরে পেলেন, আর অবাক নেত্রে মাতা সর্বাম্বাকে দেখতে থাকলেন। অন্যদিকে অন্য সকলেও নিজেদেরকে কালের খাতায় ফিরে পেতে থাকলেন, আর ভাঞ্চ-এর অস্তিত্ব নেই দেখে বুঝলেন তাঁর সমাপ্তি হয়েছে মাতা সর্বাম্বার কাছে। আর হাতে ধনুশ ধারণ করা ক্ষিতীশ সতিশ নিজেদের ধনুকে তীর দেখতে না পেয়ে, আর সম্মুখে ভাঞ্চকে দেখতে না পেয়ে, নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে তাঁরাই ভাঞ্চকে হত্যা করেছেন। অখণ্ড সেই দৃশ্য দেখে অস্থির হলেও, তাঁর স্মরণ এসে যায় যে তিনি মাতার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখার বচন দিয়েছেন, তাই মাতা নিশ্চয়ই এই লীলা করলেন তাঁর পরীক্ষা করার জন্য যে তাঁর বিশ্বাস মাতার প্রতি অটুট থাকে কিনা। তাই একটি কথাও বললেন না।

ক্ষিতীশ ও সতিশ একত্রে বললেন, "দেখলেন মাতা! কেমন করে আমরা ভাঞ্চ-এর হত্যা করলাম!"... মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "ও তোমরা হত্যা করেছ! ... সেই জন্যই আর তাঁর শবদেহটাও দেখতে পেলাম না। ... আরো একটি অসুর আছে পুত্র, তাঁকে হত্যা করে দিতে পারলে, তবেই আমরা সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবো। ... তাঁর হত্যার জন্য অপেক্ষা করতে হবে তো! ... সে খুব বলশালী। তাকে হত্যা করার জন্য, বলবান হতে হবে তো!... তাই এখন চলো আমরা আমাদের নিবাসে যাই, যেখানে তোমাদের জন্ম হয়েছিল"।

সকলে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, অখণ্ড প্রস্থান করার সময়ে কেবল দেখলেন, ক্ষিতীশ ও সতিশের বাণ ভূমিতে পরে রয়েছে। নিশ্চয়ই কালের অবলুপ্তি হওয়ার কালে, তাঁদের ধনুক থেকে তাঁদের বাণ পরে যায় ভূমিতে, আর তাই তাঁরা মনে করলো যে তাঁরাই ভাঞ্চকে হত্যা করেছে। কিন্তু মাতা তাঁদের এই ভ্রম ভাঙালেন না। কেন ভাঙালেন না, তা বুঝলেন না, তবে বিশ্বাস রাখলেন যে যখন এঁদের ভ্রম এখনো ভাঙাননি মহামায়া, তখন সেই না ভাঙার পিছনেও এঁদের ও সকলের মঙ্গলই আছে নিশ্চয়।

মাতা সর্বাম্বা অখণ্ডের মনের ভাষা শ্রবণ করে, একটিও কথা না বলে, কেবলই একটি নিজমনে মুচকি হাসি দিয়ে আজ্ঞার গুহায় পুত্রদের এবং সমস্ত পরমাত্মীয়দের নিয়ে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

স্মরনাগত

দেবী মানসী সাখ্যাত ক্ষিতীশ সতিশের জন্মের জন্য প্রাণপাত করেছেন। তাই তাঁর এই দুই পুত্রের প্রতি মমতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও, অখণ্ড থেকে আরম্ভ করে বাকি সকলেরই এই দুইপুত্রের অভিমান অসহনীয় লাগতে থাকে। যেই কর্মে সামান্য যোগদানও করেনি, সেই কর্মের শ্রেয় নিজেদের কাঁধে নেবার প্রবণতা এই দুই পুত্রকে ক্রমশ অসহনীয় করে তুলতে থাকে। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, মাতা সর্বাম্বার আচরণ অত্যন্ত বিচলিত করে সকলকে। যেই কর্ম তিনি স্বয়ং করলেন, যেই কৃতিত্ব একাকী তাঁর, তাঁর থেকে সেই কৃতিত্ব কেউ তস্করি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ তাঁর যেন সেই দিকে কনো হুঁশই নেই।

ক্ষিতীশ ও সতিশ তাঁদের মাতাকে, অর্থাৎ দেবী সর্বাম্বাকে প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা মা! আমরা তো দুই শক্তিশালী অসুরকে দমন করলাম, কিন্তু সেই তৃতীয় অসুরকে হত্যা করতে আমাদের আরো বলবাণ হতে হবে কেন? একি খুব শক্তিশালী!”

এই কথা শুনে কেউ বিরক্তিতে ওষ্ঠবিকৃত করলেন, তো কেউ মাথা নত করে, বিরক্তিসুলভ নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন। কিন্তু মাতা সর্বাম্বার কাছে তাঁর পুত্রদের কথন যেন শিশুর প্রলাপ। আর একই ভাব দেবী মানসীরও। দেবী মানসী পুত্রদের এমন কথা শুনে মমতাপূর্ণ হাস্য প্রদান করলেন। তরুণী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি প্রশ্ন করলেন তাঁকে, “মা! ও মা, হিম্লহুকে তো মাসিমণি পদাঘাতে মারলেন, তাই না! ... তো দাদারা কেন বলছেন, তাঁরা হত্যা করেছেন অসুরদের! “

কণ্ঠস্বর আস্তে করে দেবী মানসীর কাছে সেই কথা দেবী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি বললে, দেবী মানসী ও দেবী সর্বাম্বা একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, যেন শিশুদের শিশুসুলভ আচরণের আনন্দ

নিচ্ছেন তাঁরা এমন হাস্যবিনিময় করলে, দেবী মানসী হেসে নিজের কন্যাদের চাপাগলায় বললেন, “ওরা এখন ছোটো তো, তাই ওদের এমন মনে হচ্ছে। তোমরাও ছোট তো এখন, তাই বুঝতে পারছ না। বড় হও, সমস্ত কিছু বুঝে যাবে”।

মাতা সর্বাম্বাও সেই কথাতে মমতাময়ীর ন্যায় হাস্যপ্রদান করে নিজের পুত্রদের বললেন, “হ্যাঁ পুত্র, এই অসুর অত্যন্ত বলশালী। যেই দুই অসুরদের তোমরা হত্যা করলে, তাঁদের বল মেলালেও, এই অসুরের বলের অর্ধেকও নয়। ... তাই ভালো করে আহার করে, ব্যাম করে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে তো তোমাদের। তোমরা না হত্যা করলে, সেই অসুররা তো মাকে, বাবাকে, মাসিকে, দিদুন দাদু সকলকে বন্দি করে নিয়ে চলে যাবে! তখন কি হবে!”

বাকিদের কাছে যেখানে এই দুই তরুণের কথা বাচাল বালকের মত শোনাচ্ছিল, সেখানে মাতা সর্বাম্বা আর দেবী মানসীর আচরণ যেন অত্যন্ত সাবলীল। যেন শিশুর মন ভোলাচ্ছেন তাঁরা! ... আর এই দৃশ্য সকলেই যখন দেখলেন, তখন একটু অবাক হলেন। আর সর্বাধিক অবাক হলেন অখণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কীর্তির প্রতি অনুতাপও জন্মালো তাঁর।

তিনি নিজেকে নিজে অন্তরে অন্তরে বললেন, “এক আমি রয়েছি, যে সমস্যা দেখলেই, সেই সমস্যাকে নিজের থেকে দূরে অপসরণ করে দেবার প্রয়াস করে হয় বচনের দোহাই দিয়ে অন্যকারুকে দান করে দেয় সেই সমস্যা, আর নয় মুণ্ডছেদন করে, সমস্যার মুখ দেখতে না হয় সেই ব্যবস্থা করার প্রয়াস করে। আর অন্যদিকে ইনি, জগন্মাতা পরে তিনি, প্রথম তিনি মাতা, স্নেহময়ী মাতা, যিনি সস্নেহে সকলকে কাছে টেনে নেন”।

পুনরায় তিনি বিচার করলেন নিজের অন্তরে, “কই আমার তো এমন ভাব জন্মায়নি ভাঞ্চ-এর প্রতি! ... সর্বা কি সুন্দর তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে, তাঁকে নিজের প্রিয়পুত্রের মত করে বুঝিয়ে, তাঁকে বিলীন করে নিল নিজের মধ্যে। কই আমি তো ক্ষিতীশ সতিশের এই কর্তাভাবের আচরণকে মেনে নিতে পারলাম না! আমার সর্বা তো কি সুন্দর তাঁদের কথাকে শিশুর প্রলাপ জ্ঞানে, নিজের কাছে টেনে নিয়ে স্নেহ প্রদান করে, সন্তানদের মাতাসর্বস্ব করে তুলছে। যেই

কাজ কারুকে বকে ঝোঁকে, শাসন করে শেখানো যায়না, সেই কাজ অতি সহজেই নিষ্কলঙ্ক ও নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদান করে করানো সম্ভব। সর্বা বোধহয় আমাকে এই চরম শিক্ষাই প্রদান করছে”।

আবার প্রশ্ন করলেন সতিশ ও ক্ষিতীশ, “আচ্ছা মাতা, আমরা বলবান হয়ে গেলে সেই অসুরের কাছে আমরা গিয়ে তাকে যুদ্ধ করতে বলে, পরাস্ত করতে পারিনা! আমাদের তাহলে তার জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?”

মাতা সর্বাম্বা হেসে উঠলেন সেই কথাতে। দেবী মানসী ক্ষিতীশের মাথায় স্নেহের হাত রেখে বললেন, “পুত্র, যতক্ষণ না সেই অসুর নিজের বলের ব্যবহার করে, নিজেকে ঈশ্বর স্থাপন করতে চাইছেন, ততক্ষণ তিনি অসুর হলেন কি করে! আগে তাঁকে অসুর হতে দাও। ... এখন সে তো কেবলই বলবান। এখনও যে সে অসুর হয়েই ওঠেনি”।

সতিশ বললেন, “কিন্তু বলবান তো সে! ... কাল যদি আরো অধিক বল একত্রিত করে আক্রমণ করে, তখন আমরা কি করবো!”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “পুত্র, সে তো তোমাদের পিতাও মহাবলবান। তুমি যেই সম্ভাবনার কথা বললে, সেই সম্ভাবনা তো তোমাদের পিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তা বোলে কি তোমরা তোমাদের পিতার হত্যা করবে?”

সতিশ উত্তরে বললেন, “আচ্ছা বুঝেছি। আজ এই দুই অসুর, দুষ্টতা করতে এসেছিল বলে, সেই দুষ্টতার অপরাধের দণ্ড দিলাম আমরা! ... অর্থাৎ কেউ যতই বলবান হোক, যদি সে দুষ্টতা না করে, তবে তাকে দণ্ড দেওয়া উচিতই নয়। তাই তো মা!”

মাতা সর্বাম্বা, তাঁর দুইপুত্রকে নিজের দুই বাহুদিয়ে নিজের তনুর নিকটে টেনে এনে হাস্যমুখে বললেন, “একদমই সঠিক পুত্র। ... চলো এবার। আমরা আমাদের নিবাসে এসে গেছি।

বামদিকের ঝর্ণা থেকে, মাসিমনি আর তাঁর দুইকন্যাকে নিয়ে গিয়ে, সকলে হাতমুখ ধুয়ে এসো দেখি। ... সকলের জন্য আহারের ব্যবস্থা করছি আমি"।

দেবী দখিনা বললেন, "তুই একা কত করবি! দাঁড়া, আমি আর মানসী হাতমুখ ধুয়ে এসে, তোর হাতে হাতে করছি"। ... দেবী চেতনা আর দেবী অন্তর্দৃষ্টিও আদুরে ভাবে বললেন, "মাসিমণি, আমরাও করবো তোমার হাতে হাতে!" ...

মাতা সর্বাম্বা হেসে, দুই কন্যার মিষ্টবদনে স্নেহের স্পর্শ প্রদান করে বললেন, "নিশ্চয়ই করবে মা। ... আগে হাতমুখ ধুয়ে এসো যাও"।

বোধি, হুতাশন আর অখণ্ড অবাক দৃষ্টিতে মাতা সর্বাম্বাকে দেখলেন আর মনে মনে বিচার করলেন, "কি অদ্ভুত ইনি! ... কখনো তিনি দেবী, কখনো তিনি অসুরদলনী। আবার সন্তানদের ক্ষেত্রে, তিনি যেন কেবলই মাতা। তখন তিনি না তো দেবী, আর না জগন্মাতা । তিনি কেবলই মাতা। ... সন্তান স্মরণ কি করে রাখবেন, তিনি জগন্মাতা, যেন তিনি নিজেই ভুলে যান যে তিনি জগন্মাতা! ... হয়তো সেই কারণেই তিনি জগন্মাতা, কারণ নিজের সমস্ত পরিচয়ের আগে তিনি নিজের মাতার পরিচয়কেই সর্বাধিক স্নেহ করেন"।

অখণ্ডের এই ভাবনা যে যথার্থ, তার পরিচয় তিনি পেলেন, যখন তিনি দেখলেন যে, সর্বাম্বা নিজের সমস্ত পরিচয় ভুলে সকলের জন্য আহার নির্মাণ করছেন। অসম্ভব নিষ্ঠা নিয়ে সেই কর্ম এমন ভাবেই করছেন যেন জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম করছেন তিনি এক্ষণে। অখণ্ড নিজের ভাবনা মিলে গেছে দেখে, কিছুটা হতবাকই হলেন। চিন্তা, ইচ্ছা, কল্পনার প্রভাব থাকতে, কি করে তাঁর ভাবনা সঠিক হতে পারলো। কিন্তু প্রতিবারের মত, তাঁর সংশয়ের উত্তর মাতা সর্বাম্বা তাঁর জননী দেবী দখনা ও তাঁর ভগিনী, দেবী মানসীর মুখ দিয়েই প্রদান করলেন।

দেবী দখিনা অখণ্ডের নিকটে এসে বললেন, "কি এত ভাবছো বাবা অখণ্ড! যেখানে আমার সর্বা বিদ্যমান সেখানে কল্পনা, ইচ্ছা বা চিন্তার প্রভাব কি থাকতে পারে!"

অখণ্ড চমকে উঠলেন কথাটি শুনে। প্রতিবার তাঁর অন্তরের প্রশ্নের উত্তর এভাবে কেন তাঁকে দেওয়া হচ্ছে! পরের মুহূর্তে চিন্তা করলেন, “কই কেন সর্বাম্বার এই কাজে এত নিষ্ঠা, তার উত্তর তো তাঁকে দেওয়া হলো না!” ... দেবী মানসী সবে গুহার অন্তরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই, অখণ্ডকে আনমনা দেখে হেসে উঠে বললেন, ‘‘চিন্তা করো না অখণ্ড। সর্বার উপর নিষ্ঠা রাখলে, কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা আমাদের ছুঁতেও পারবেনা। কিন্তু সমর্পণ সরে গেলেই, আবার তারা আমাদের গিলে নেবে”।

এই কথা বলে হেসে, যেই কলসি নিয়ে জল ভরতে গেছিলেন ঝর্ণার নিকটে, সেই কলসি সর্বাম্বার কাছে রেখে এসে পুনরায় অখণ্ডের কাছে এসে বললেন, ‘‘কি দেখছো অখণ্ড! সর্বার এই সামান্য রান্না করাতে এত নিষ্ঠা কেন, তাই দেখছো! ... তা বাছা, এই আহারই যে মাতার কাছে অস্ত্র, সন্তানদের নিজের মমতার বলে ঘায়েল করার। এর থেকে কি শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আছে! ... নিজের মাতার থেকেও অধিক শ্রেয় রান্না করলেও, মাতা যদি নিষ্ঠা সহকারে রন্ধন করেন, তবে সন্তানের মাতার হাতের তৈরি আহারই প্রিয় হয়। কেন জানো অখণ্ড! কারণ মাতার নিষ্ঠা যে তাঁর প্রস্তুত করা ব্যঞ্জনের মধ্যে মমতার মধু রূপে গুলে যায়”।

দেবী দখিনা নিকটে এসে বললেন, ‘‘কিছু বুঝলে অখণ্ড! ... যেই মাতা নিষ্ঠা সহকারে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে সন্তানকে খাওয়ান, তাঁর মমতার কাছে যে ভগবানকেও পরাস্ত হতে হয়। ... কিন্তু যখনই রান্নায় সেই নিষ্ঠা থাকেনা, থাকে বিরক্তি, থাকে সংসারের সমস্ত কাজ করার অনীহা, তখনই মমতার অভাব ঘটে, আর মমতার অভাব সব থেকে প্রথমে বোঝে সন্তান। আর বোঝা মাত্রই যান্ত্রিক হয়ে ওঠে সে, স্নেহ মমতা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে আর গুরুত্ব পেতে শুরু করে কামনা”।

অখণ্ড আর কিছু বলার স্থানই পেলেন না। নিজের অন্তরে তিনি কেবল বিচার করলেন, “সর্বা সকল সময়ে মানসী আর দখিনার মুখ দিয়েই কেন উত্তর দেয়, কেন নিজে উত্তর দেয়না আমাকে! ... উত্তর তো সমস্তই দেয়, কিন্তু কেন নিজে দেয়না! ... আমি মনে হয় ওঁর প্রতি সমর্পিত হতে পারিনি। মনের কনো একটা কোণে এখনও মনে হয়, কল্পনা, ইচ্ছা আর চিন্তা

আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে। আর সেই কারণে আমি অখণ্ড হয়েও অপবিত্রই থেকে গেছি। আর সেই অপবিত্রতার কারণেই মনে হয় সর্বা আমাকে সরাসরি উত্তর দেয়না!"

মানসী পরমাহ্ন প্রস্তুত করার জন্য, বাইরে থেকে মাতা সর্বাম্বার স্থাপিত গরুর দুগ্ধ নিয়ে এলেন। আসার সময়ে পুনরায় অখণ্ডের দিকে স্নেহের দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন, "প্রশ্ন করতে হবে তো! ... প্রশ্ন জাগার পর, যদি তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়ে আত্মমর্যাদার পর্দা ঝুলিয়ে রাখো, তবে যেমন ঠারেঠোরে প্রশ্ন, তেমন ঠারেঠোরে উত্তর"।

অখণ্ড এবার এই কথা শুনে হতাশ হয়ে গেল। এই প্রশ্নেরও উত্তর এলো, আর এটির উত্তরও সেই ঠারেঠোরে! ... কিন্তু কথাতো দেবী মানসী সঠিকই বলেছে! আমি নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো, তো জগন্মাতা কেন সম্মুখে এসে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন! ... সঠিকই করেছেন উনি। আমার সাথে এমনই হওয়া উচিত ছিল। নিজেকে কি না কি ভেবে বসে আছি আমি! ... স্বয়ং জগন্মাতার উপরেও আমি জেদ ফলাচ্ছি! কেন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং দেবেন না! ... কেন দেবেন! জিজ্ঞাসুকে নরম হতে হয়, নতজানু হতে হয়। তবেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত। আমি হতে পেরেছি নতজানু! ... নিজেকে বিশাল কিছু মনে করেই চলেছি। সঠিকই করেছে সর্বা। সে সর্বদা সঠিকই করে, নির্বোধ আমি, অহংকারে মত্ত, আত্মগরিমায় নিমগ্ন, তাই তাঁর কাজের খুঁত ধরতে যাই"।

সর্বাম্বা, দখিনা দেবী ও মানসী রন্ধন কর্মে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তরুণী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিও নিজের মাতা, মাসিমা ও দিদাকে সাহায্য করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। অন্যদিকে বোধি ও হুতাশন দুই অখণ্ডপুত্রকে তাঁদের মাতার কীর্তি শোনাচ্ছেন। আর দুই পুত্র তাঁদের মাতাকে যেন অপার স্নেহ করেন, আর তাই মনোযোগ সহকারে তাঁদের মাতার কীর্তি শুনছেন।

অখণ্ড একাকী বসে রইলেন, আর নিজের ভাবনার জগতে চলে গেলেন। ভাঞ্চ-এর ক্ষেত্রে যা তিনি দেখেছেন, তার তো এখনো তিনি কনো কুলকিনারাই করতে পারেন নি! অখণ্ড সেই দৃশ্য নিয়ে বিচার করতে গিয়ে, যেন অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হতে থাকলো। সে বিচার করতে

থাকলো, "শূন্যই সত্য! শূন্যই অস্তিত্ব, আর সমস্ত কিছু কল্পনা! সমস্ত কল্পনার উদ্দেশ্য নিজেকে নিজে ফিরে পাওয়া, যেমন ভাঞ্চ নিজেকে নিজে ফিরে পেল। যতক্ষণ না নিজেকে নিজে ফিরে পাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণই কল্পনা, ততক্ষণই চিন্তা, ততক্ষণই ইচ্ছা।

নিজের সত্যকে খুঁজে না পেলে, দেহান্তরের পর দেহান্তর, শরীরের পর শরীর, কল্পনার পর কল্পনা। কখনো এঁর সন্তান তো কখনো অন্য কারুর; কখনো ধনবান তো কখনো দরিদ্র; কখনো ক্রীড়াবিদ তো কখনো শিল্পী; কখনো এঁর স্বামী তো কখনো অন্য কারুর স্ত্রী; কল্পনার পর কল্পনা, দেহের পর দেহ; জন্মের পর জন্ম, মৃত্যুর পর মৃত্যু, অনন্ত জন্ম, অনন্ত মৃত্যু। আর যাই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাই মুক্তি। আর কল্পনা নেই, আর চিন্তা নেই, আর ইচ্ছা নেই, আর দেহের প্রয়োজন নেই।

আর সেই সত্য কি? সেই সত্য পরিচয় কি? শূন্য! শূন্য মানে তো কিছুই নেই! তার মানে কিছুই নেই, এটিই সত্য! ... আমার সর্বাবা আসলে শূন্য! ... ব্রহ্মাণ্ডর প্রকৃত পরিচয় শূন্য! ... আমার ও সবার প্রকৃত পরিচয় শূন্য! ... ভাঞ্চ তো মিশে গেল সর্বার মধ্যে, শূন্যের মধ্যে, কিন্তু আমি তো মিশলাম না! ... তারমানে কি আমি এখনো সত্যকে স্বীকার করতে পারিনি! ... না পারিনিই তো! যদি সত্যসত্যই সত্যকে স্বীকার করে থাকতাম, তাহলে তো আজ আমি চিন্তা, ইচ্ছা কল্পনার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত হতাম। আমিও শূন্যে লীন হয়ে যেতাম। কই আমি তো লীন হই নি! ...

কিন্তু আমি কে? আমি ত্রিদেব নই, কারণ যদি তা হতাম তাহলে এই অখণ্ড অবস্থায় অধিকক্ষণ স্থায়ী হতেই পারতাম না, ত্রিদেবে ত্রিখণ্ডিত হয়ে যেতাম। তাহলে আমি কে? সেই অনন্ত শূন্যের কাছে আমি এক তুচ্ছ অস্তিত্ব হয়ে ছিলাম, আর সেই অস্তিত্ব এমনই ছিল যেন আমি থেকেও নেই! ... তাহলে আমি কে? আমার সত্য কি? অবশ্যই শূন্য আমারও সত্য, যেমন তা সকলেরই সত্য। কিন্তু যতক্ষণ আমি শূন্যে লীন নই, যেমন মানসীরা হলো ভূত, তেমন আমি কে? আমার অস্তিত্বের রহস্য কি! ...

অনন্ত শূন্যে আমি তো এক তুচ্ছ অণুর মতই ছিলাম, অর্থাৎ আমি নিজে তো অনন্তও নেই, অজন্মাও নই, আর সত্যও নই। আমি যে আমি, সেই আমি একটি মিথ্যা। কিন্তু সেই মিথ্যার উৎস কি? কি করে আমার জন্ম হলো! কি আমার সীমা, কি আমার অস্তিত্বের রহস্য"।

এমন বিচার করে, অখণ্ড অপেক্ষা করলেন, এই বিশ্বাস নিয়ে যে কেউ নিশ্চয়ই তাঁর কাছে এসে তাঁকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবেন। কিন্তু এইক্ষেত্রে কেউ এলেন না। অখণ্ড তা দেখে একটু অবাকই হলেন। সর্বাম্বা সকলকে আহার পরিবেশন করলেন, এবং সকলে অতি তৃপ্তির সাথে তা আহার করলেন, বিশেষ করে সদ্যজাত ক্ষিতীশ ও সতিশ নিজেদের মায়ের হাতে প্রথম রন্ধনকে অতিযত্নের সাথে গ্রহণ করলেন, আর একই ভাব দেবী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে।

কিন্তু এখানে একটি অন্যদৃশ্য দেখলেন সকলে। সকলে এতই তৃপ্তি করে খাচ্ছেন যে কেউ খেয়ালই করেন নি সর্বাম্বার জন্য কনো আহার অবশিষ্ট নেই। কিন্তু তা খেয়াল রেখেছে এক মা আর তাঁর দুই সন্তান, অর্থাৎ মানসী আর তাঁর দুই কন্যা। সকলকে আহার করিয়া দেবী সর্বাম্বা তৃপ্ত। কিন্তু তখন তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে সর্বাম্বার জন্য কনো আহারই নেই।

দেবী মানসী তা দেখেছেন, নিজের পাতের কিছু আহার সর্বাম্বার জন্য বাঁচিয়েও রেখেছেন, কিন্তু নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদানে তিনি কুণ্ঠা বোধ করলেন। কিন্তু চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি শিশু, তাঁদের উচ্ছিষ্ট অনুচ্ছিস্টের বোধ নেই। তাঁরা শিশুমনে সর্বাম্বার কাছে নিজেদের আহারের থাল নিয়ে গিয়ে, সরলমনে বললেন, "মাসিমণি, তুমি তো কিছু আহারই করোনি। দেখো, তোমার জন্য আহার বাঁচিয়ে রেখেছি। এই নাও আহার করো"।

মাতা সর্বাম্বা সস্নেহে একটি কথাও না বলে, মিষ্ট হাস্য হেসে, নিজের মুখগহ্বর উন্মোচন করলেন, দুই তরুণীর সম্মুখে। আর দুই তরুণী তাঁদের প্রিয় মাসিমণিকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা আহার প্রদান করলেন। সকলেই একটু ইতস্তত করলেন এই দৃশ্য দেখে, আর ভাবতে থাকলেন,

স্বয়ং জগজ্জননী, যার উচ্ছিষ্ট ভোজনই হলো প্রসাদ, তাঁকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করছে এই দুই কন্যা। হয়তো শিশু বলে, মাতা কিছু মনে করছেন না।

দেবী মানসী কিন্তু এতক্ষণে নিজের কুণ্ঠা ত্যাগ করেছেন। তিনি নিজের থাল নিয়ে গিয়ে বললেন, "ক্ষমা সর্বা, ভুলে গেছিলাম, তুই জগন্মাতার আগে সকলের পরমাত্মীয়া। জগন্মাতাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করা যায়না, সেটাই ভাবছিলাম, তাই এতক্ষণ তোর জন্য খাবার বাঁচিয়ে রাখলেও, তোকে দিতে পারছিলাম না। কিন্তু দ্যাখ না, অনেক সময়ে ছোটরাও বড়দের কত কিছু শিখিয়ে দেয়। আমার কন্যারা আমাকে শিখিয়ে দিল, আর চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিল, তুই পরে জগন্মাতা, আরো পরে নিয়তি, প্রকৃতি ইত্যাদি। সেই সমস্ত কিছুর অনেক আগে, তুই আমাদের পরমাত্মীয়"।

দেবী সর্বাম্বা দেবী মানসীর কথার মধ্যে কনো কথা বললেন না, এমনকি তাঁর বক্তব্যের বিষয়েও একটি কথাও বললেন না। কেবল বললেন, "খুব খিদে পেয়েছে দিদি! ... ওরা বাচ্চা মেয়ে, কতটাই আর বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। যা ওদের সামর্থ্য ছিল, ওরা দিয়েছে। তুমি খাইয়ে দাও না! ... খিদেতে যে পেট জ্বলছে আমার!"

দেবী মানসী হেসে মাতা সর্বাম্বার মুখে নিজের আহার প্রদান করতে থাকলেন, আর পরমানন্দে ভাবতে থাকলেন, "কি অদ্ভুত ভাবে আমার কথার স্বীকৃতি দিলি তুই সর্বা, একটিও কথা সেই বিষয়ে খরচ না করে"। এমন দেবী মানসী করলে, পরের দিন থেকে, মাতা সর্বাম্বা সকলকে সমস্ত আহার করাতে থাকেন, আর সকলে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা উচ্ছিষ্ট সর্বাম্বাকে নিজের হাতে খাইয়ে দেয়, আর তাই হলো সর্বাম্বার আহার।

যেন স্নেহই সর্বস্ব কিছু, স্নেহের উর্ধ্বে যেন আর কিছুই সম্ভব নয়। এমনই সমস্ত কিছু চলতে থাকলে, অখণ্ডের কনো কিছুতেই মন থাকেনা। তাঁর অন্তরে যেন একটিই কথা বারংবার চলতে থাকে, "আমি কে? কি আমার আসল পরিচয়? আমার উৎস কি থেকে? কে আমার উৎস? আমার ব্রহ্মাণ্ডতে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি?" ... এক সময়ে, অখণ্ড আর নিজের প্রশ্নকে অনুত্তর

অবস্থায় থাকতে দেখতে পারলেন না। তাই অবশেষে, মাতা সর্বাম্বা একাকী যখন একদিন ঝর্ণার তলায় স্নান করছিলেন, তখন অখণ্ড তাঁর সম্মুখে এলেন।

সেখানে এসে অখণ্ড বললেন, "ক্ষমা করো সর্বা, এমন সময়ে আমি তোমাকে বিরক্ত করছি। কিন্তু এই একটি সময় ছাড়া, তুমি কখনোই একা থাকো না। হয় দেবী মানসী বা তাঁর কন্যারা তোমার কাছে রয়েছেন, আর নয় তোমার পুত্ররা। ... তাই অগত্যা, তোমাকে এই অর্ধনগ্ন অবস্থাতেই বিরক্ত করতে এলাম। ... যদি আমাকে একটি নির্দিষ্ট সময় প্রদান করো, তবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, তা করতে চাই"।

মাতা সর্বাম্বা হাস্যমুখে বললেন, "অন্য কনো সময়ের কি প্রয়োজন নাথ, আপনার প্রশ্নকে এতদিন পরে আপনি নিজের অন্তর থেকে বাইরে প্রকাশ করতে রাজি হয়েছেন, যুদ্ধ জয় করে সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তা এখনই সেই প্রশ্ন রাখুন। আমি এখনই আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে প্রস্তুত"।

অখণ্ড উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, "এখন, এই অবস্থায়! ... তোমার অঙ্গের বস্ত্র এখন সিক্ত এবং তা তোমাকে অত্যন্ত গভীর ভাবে রমণীয় দেখাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন করার অর্থ তো তোমাকে বিব্রত করা, তাই না!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "আপনি কি স্বামী রূপে প্রশ্ন করতে এসেছেন? যদি তাই হয়, তবে হ্যাঁ, এই অবস্থায় সেই প্রশ্ন করা এবং তাদের উত্তর দেওয়া অত্যন্তই বেমানান। ... কিন্তু যদি প্রশ্ন শিষ্যের হয়, তবে প্রশ্নের উত্তরদাতা হলেন গুরু আর একজন শিষ্যের কাছে তাঁর গুরু হলেন মাতাপিতা সমান, বা মাতাপিতারও উর্ধ্বস্থানের। ... আর মাতা যদি সন্তানের সম্মুখে অর্ধনগ্নও নন, সম্পূর্ণ নগ্নও হন, তাও তো সন্তানের কামনার উদ্বেগ হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব কি?"

অখণ্ড আর কথা বাড়ালেন না। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, তাঁর অন্তরের অভিমান তাঁকে সঙ্কোচ প্রদান করে এসেছে এতদিন আর তাই তিনি তাঁর প্রশ্নগুলিকে মাতা সর্বাম্বার সম্মুখে

করতে পারেন নি। কিন্তু আজ যখন তিনি সেই সঙ্কোচকে অপসরণ করে প্রশ্ন সম্মুখে আস্তে চাইছে, তখন তাঁর প্রশ্নের উত্তরদাতা, দেবী সর্বাম্বা, স্বয়ং তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করছেন। ... কঠিন এই পরীক্ষা। সম্মুখে যিনি অবস্থান করছেন, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বোত্তম সুন্দরী স্ত্রী, আর আমি পুরুষত্বের মোহে অন্ধ। সম্মুখে যিনি রয়েছেন, তিনি আমার পত্নী, তাঁর উপর আমার সমস্ত ভাবে রমণ অধিকার রয়েছে, আর এক্ষণে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠ রমণসজ্জায় স্থিতা, আর আমাকে তাঁর সন্তানতুল্য হয়ে, তাঁর দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করে, তাঁর কাছে আমার সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে, প্রশ্ন করতে হবে।

সত্যই সর্বা অত্যন্ত কঠিন এবার। ইনি মুখে ঘোষণাই করেন না যে তিনি পরীক্ষা নেবেন, কিন্তু সম্মুখে অযাচিত ভাবেই পরীক্ষা স্থাপন করে দেন। ... এমন বিচার করে, অখণ্ড নিজের স্নায়ুর উপর নিজের ভার স্থাপন করে, প্রশ্ন করলেন, "দেবী সর্বাম্বা, সেদিন আপনি যা ভাঞ্চকে দেখিয়েছিলেন, তারপর থেকে আমার মনে প্রকাণ্ড বিচার জন্মাচ্ছে এটি জানার জন্য যে, আমি আসলে কে? আমার উৎস কি? আমার উৎস কেন? এক্ষণে আমি কে? প্রকৃতপক্ষে আমি কে? আর আমার ব্রহ্মাণ্ডতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য কি? আমার কি কল্পনামুক্তি সম্ভব যেমন ভাঞ্চএর ক্ষেত্রে হলো।

যদি সম্ভব হয়, তবে তা কি ভাবে? দেবী আমাকে উত্তর প্রদান করুন। আমি সত্যই ব্যকুল। আর হ্যাঁ আমি লজ্জিতও। এতকাল আমি আমার অভিমানের কারণেই আমার এই প্রশ্ন করতে পারিনি। ... জানিনা ঠিক কিসের অভিমান, পুরুষত্বের অভিমান, নাকি জগন্মাতার স্বামী হবার অভিমান, না অন্য কিছু, তা আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ তা অভিমান অবশ্যই ছিল। আর আজকেও আমি সত্য অর্থে যে অভিমান ত্যাগ করে আস্তে পেরেছি প্রশ্ন করার জন্য, তাও সত্য নয়। আপনার অজানা কিছুই নেই দেবী। তাও স্বকণ্ঠে আমি স্বীকার করতে চাই যে, আমি অভিমান ত্যাগ করতে পেরেছি বলে আপনার সম্মুখে আসিনি, বরং আমার প্রশ্ন আমাকে অতিশয় ব্যকুল করে তুলছিল বলেই আমি এখানে এসেছি এবং আপনাকে প্রশ্ন করছি"।

সর্বাম্বা নিজের কেশকে ঝর্ণার জলে ধৌত করতে করতে বললেন, “তুমি কে, এই তো তোমার প্রশ্ন! কি কারণে তোমার রচনা, এবং তোমার রচনার ও অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি, এই তো তোমার সম্পূর্ণ প্রশ্নের সার! ... বেশ এবার উত্তর শোনার জন্য প্রস্তুত হও”।

অখণ্ড সত্যই প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি মাতার অনেক না বলা কথাও এই ক্ষণে বুঝে গেলেন। তিনি বুঝে গেলেন এতকাল তিনি মাতাকে “তুমি” বলে সম্বোধন করছিলেন, তাই মাতা তাঁকে “আপনি” বলে সম্বোধন করছিলেন, আর আজ যখন তিনি তাঁকে “আপনি” বললেন, তখন তিনি তাঁকে “তুমি” বললেন। অর্থাৎ শিষ্য এতকাল গুরুকে “তুমি” বলছিলেন, তাই গুরু তাঁর শিষ্যকে উচিত মার্গে নিয়ে যাবার জন্য “আপনি” বলছিলেন। আজ শিষ্য গুরুকে গুরুর সম্মান প্রদান করেছেন, তাই গুরুও শিষ্যকে আপন করে নিয়ে “তুমি” বললেন।

অন্তরে নিজের অভিমানের প্রতি ধিক্কার ও নিজেকে অভিমানের অধীনে থাকতে দেখে লজ্জিত হয়ে অখণ্ড মনোনিয়োগ করলেন দেবী সর্বাম্বার কথন শুনবেন বলে। মাতা সর্বাম্বা তাই সহাস্যবদনে, স্নান করতে করতেই বলতে থাকলেন, যেন তিনি একই সঙ্গে উত্তরও প্রদান করবেন তাঁর শিষ্যকে এবং তাঁর শিষ্যের কামনা থেকে মুক্তির পরীক্ষণও করতে থাকবেন।

তিনি বললেন, আমি হলাম শূন্য আর সেটিই আমার প্রকৃত পরিচয়, আর তোমারও তাই। কিন্তু পুরাকালে, তুমি নিজের প্রকৃত স্বরূপ, অর্থাৎ আমাকে ত্যাগ করে দাও, কারণ তুমি নিজেকে শূন্য বলে মানতে পারো নি। আর সেই থেকে, তুমি নিজের প্রকৃত পরিচয়ই খুঁজে চলেছ। সেই পরিচয়কে কি করে সন্ধান করতে হয়, তাও তুমি জানো না। তাই না চেয়েও, তুমি আমারই শরণাপন্ন হলে। কিন্তু সেই আমাকে আর তুমি আমি বলে সনাক্ত করতে পারো নি, কারণ তুমি যে শূন্যতাকে নিজের অস্তিত্বের সত্য বলে অস্বীকার করে দিয়েছ।

শূন্য হলো স্থবির, শূন্য হলো নির্গুণ, শূন্য হলো অচল, অব্যাক্ত। কিন্তু তোমার তো সেই অচলতা, সেই অব্যক্ততা, সেই নির্গুণতা বা সেই স্থবিরতা পছন্দ হয়নি। তাই তো আমার থেকে বিচ্ছিন হবার কল্পনা করে, তুমি নিজের কল্পনাতেই চলমান, গতিশীল, গুণসম্পন্ন, এবং নিজেকে

ব্যক্ত করে স্থাপনে মত্ত ছিলে। আর তাই যখন তোমার এই উন্মত্ততার দৃষ্টি দ্বারা আমকে দেখলে, তখন আমার শূন্যতাকেও তুমি দেখতে পেলে না, ঠিক যেমন গতিমান পৃথিবী থেকে গতিহীন চন্দ্রকে দেখে, কিছুতেই চন্দ্রকে গতিহীন মানতে ইচ্ছা হয়না, তোমারও তাই অবস্থা হলো।

কিন্তু তুমি তো আমাকে শূন্য করেই জানতে, অচল, স্থবির, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনন্ত, নির্গুণ বলেই চিনতে। তাই তোমার এই ভ্রমিত দৃষ্টি নিয়ে যখন আমাকে দেখলে, এবং আমাকে নিজের ভ্রমের কারণে চলমান, গুণবান, গতিশীল ও ব্যক্ত ভাবে দেখলে, তখন এটি ভুলেই গেলে যে আমিই হলাম সেই শূন্য, সেই ব্রহ্ম। আর তা ভুলে গিয়ে আমাকে তুমি প্রকৃতি রূপে ধারনা করলে। আর তা করার পরে, নিজেরই গুণদের আমার উপর স্থাপন করলে।

তোমার কল্পনাতেই তুমি গুণী, যতই বাস্তবে তুমিও নির্গুণই হও। আর সেই গুণদ্বারা তুমি আমাকে চলমান ও গুণবান কল্পনা করে করে ত্রিগুণে বিভক্ত করলে। তুমি কিছু রচনা করতে চাও, যা আমার মত অব্যাক্ত হবেনা, বরং তা হবে ব্যক্ত। আর তাই ব্যক্ত সমস্ত কিছু রচনা করার ভাব নিয়ে তুমি প্রথম গুনের রচনা করলে সত্ত্ব, যার দ্বারা তুমি রচনা করবে, আমাকে বিদ্যারূপে ধারণা করে। অতঃপরে নিজের সৃষ্টিকে রক্ষণ করার চিন্তা হলো তোমার, আর তাই নিজের দ্বিতীয়গুণ, অর্থাৎ রজগুণকে প্রস্তুত করলে, আমাকে শ্রীরূপে ধারণা করে।

আর অন্তে, যখন সেই সৃজন তোমার সত্য তোমার কাছে প্রকাশিত করলো না, তখন সেই সৃজনকে নাশ করার গুনের সন্ধান করলে তুমি, আর রচনা করলে তমগুনের, যার দ্বারা লয় করো তুমি আর সেই লয় করার জন্য তোমার প্রয়োজন ছিল শক্তি, আর তা তুমি আমাকে শক্তিবেশে ধারণা করে রচনা করলে।

অর্থাৎ তুমি অখণ্ডই ছিলে, কেবলই নিজেকে ব্যক্ত করে তোলার জন্য কল্পনা করলে, আর সেই কল্পনার চিন্তা করে, ইচ্ছা করলে নিজেকে ত্রিগুণে স্থাপিত করার। আর তাই যতক্ষণ নিজেকে তুমি সেই ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদেব রূপে চিহ্নিত করা বন্ধ করবে না, ততক্ষণ দেবী চিন্তা, কল্পনা এবং ইচ্ছা তোমার থেকে মুক্ত হবেন না। কেন হবেন না! কারণ তুমি তো তাঁদেরকে বরণই

করেছিলে, নিজেকে ত্রিদেবরূপে ধারণা করার জন্য। তাই যতক্ষণ না তুমি তোমার ত্রিদেব ধারণার নাশ করবে, ততক্ষণ কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার নাশ সম্ভবই নয়।

অখণ্ড, এই তিন দেবী অন্য কেউ নন, আমারই ছায়া এঁরা। আমি শূন্য, আর এই আমার শূন্যতাকেই বিনষ্ট করে যখন আমাকে বিদ্যারূপে স্থাপিত করে নিজের সত্ত্বগুণকে ধারণ করতে গেলে তুমি, তখন যেই ভ্রমের রচনা করো তুমি, তিনিই হলেন দেবী চিন্তা। একই ভাবে যখন তুমি আমার শূন্যতার নাশ করে, আমাকে শ্রী বেশে স্থাপিত করতে গেলে, তখন রচনা হয় আমার শ্রীবেশের ছায়া অর্থাৎ দেবী ইচ্ছা। এবং অন্তে, যখন আমার শক্তিবেশকে আমার শূন্যতার থেকে বিচ্ছিন করার প্রয়াস করলে তুমি, তা কনো ভাবেই সম্ভব নয়, তাই তুমি শক্তির ছায়া অর্থাৎ কল্পনার রচনা করলে।

অর্থাৎ এই ত্রিদেবী, কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা আমারই, যেই আমার ত্রিরূপ সম্ভবই নয়, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াস করে, তুমিই রচনা করো এঁদেরকে। তাই যতক্ষণ না তুমি নিজের ত্রিদেবরূপকে ভুলতে পারবে, যা বাস্তবে কনো ত্রিদেবই নন, ততক্ষণ তুমি ত্রিদেবীকেও ভুলতে পারবেনা, আর তাই চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনারও নাশ সম্ভব হবেনা। আর যদি এঁদের নাশ সম্ভব না করতে পারো তুমি, তাহলে ভাঞ্চএর মত তুমি কখনোই শূন্যতা লাভ করবে না, কারণ এঁদের মাধ্যম করেই তুমি নিজেকে শূন্যতা থেকে দূরে স্থিত রেখেছ।

আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, তোমার কল্পনার কারণেই আমি নিয়তি ও প্রকৃতি। আর তোমার ইচ্ছার কারণেই আমি ত্রিদেবী, এবং তোমার চিন্তার কারণেই আমি তোমার স্ত্রীরূপে স্থিতা, যতই আমি তোমার স্বরূপ অর্থাৎ আমি তোমার মাতা হই; যতই তুমি স্বরূপে আমিই অর্থাৎ আমারই সন্তান, আমারই থেকে তোমার সৃজন হোক। তাই এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে আমি সর্বদা অক্ষত থাকবো। আমার শক্তির নিকটেও আসেনা এই তিন ছায়াদেবীদের শক্তি, কিন্তু যখন তুমি এঁদের সাথে একাত্ম, তখন তোমার ও এই তিনদেবীর শক্তি মিলে আমার শক্তিকেও বশ করতে সক্ষম। আর তাই, এক না এক সময়ে, যখন তাঁদের তিনপুত্রের লয় করবে আমাদের পুত্ররা, তখন তারা সেই শক্তির প্রয়োগ করবেই এবং আমাকে নিজেদের বন্দি করতে চাইবেই, যদিও

সেই কাজ তমাকে ছাড়া তারা করার সাহসও দেখাবেনা, আর তাঁদের ছাড়া তুমি এই কাজের ধৃষ্টতাও দেখাবেনা । যদি তখনও তুমি নিজের কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার প্রতি বিশ্বাস অর্পণ করতে থাকো, তবে চিরতরে আমাকে হারিয়ে ফেলবে অখণ্ড।

এই হলো তোমার সম্যক অস্তিত্বের রহস্য। আর এক্ষণে, এই ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে তুমি কে? যখন তুমি আমাকে সত্য রূপে স্বীকার করতে পারো নি, শূন্য বলে স্বীকার করতে পারো নি, তখন তুমি নিজেকে আমার থেকে যে পৃথক করে নিয়েছিলে, তা তো নিতান্তই এক ছেলেমানুষি ছিল, কারণ যে নির্গুণ, যে অসীম, যে অব্যক্ত, যে অনন্ত, তার ভাগ কি করে সম্ভব! তাঁর তো ভাগ সম্ভবই নয়। অর্থাৎ তুমি নিজেকে আমার থেকে ভাগ করে নিতে পেরেছ কোথায়? আমার থেকে ভাগ যদি করেও নাও নিজেকে, তাহলে নিজেকে স্থাপিতই বা কোথায় করবে? আমিই যে একমাত্র সত্য, আমিই যে একমাত্র অস্তি, আমি ছাড়া যে আর কিছুর কনো কালে অস্তিত্ব না তো সম্ভব, আর না কনোদিনও তা সম্ভব হবে! তাই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন কি করে হওয়া সম্ভব অখণ্ড!

না, তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন হতে সক্ষম হওনি, কেবলই কল্পনা করে নিয়েছিলে যে আমার থেকে তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছ। আর তোমার এই কল্পনা তোমাকেও অজস্র খণ্ডে খণ্ডিত করে দেয়, আর তুমি হয়ে যাও অসংখ্য ত্রিগুণের সমষ্টি। আর এই সমস্ত ত্রিগুণের সমষ্টি, নিজেদের কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাদের নিয়ে নির্মাণ করতে থেকেছে অজস্র ব্রহ্মাণ্ড। এই প্রতিটি সমষ্টিকে একটি একটি জীব বলো তুমি, আর তুমি সেই প্রতিটি জীবরূপ কল্পনার মধ্যে স্থিত ত্রিগুণের সমষ্টি, যেই ত্রিগুণ অখণ্ড, আর তাই তুমি অখণ্ড বেশে প্রতিটি জীবের অন্তরে স্থিত হয়ে, সেই জীবের আত্ম, বা স্বয়ং।

প্রথম তুমি নিজের পরিচয় লাভ করার জন্য নিজেকে আকাশরূপে বিস্তারিত করো, সেই আকাশের বুকে নিজেরই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার প্রভাবে স্থাপিত করো অগ্নিকে, আকাশ ও অগ্নিকে একত্রিত করে, তুমি নির্মাণ করো জলকে, এবং এই তিনকে একত্রিত করে, তুমি নির্মাণ

করো প্রস্তরের অর্থাৎ মৃত্তিকার, আর সেই মৃত্তিকা হয়ে তুমি প্রথম নিজের সত্য জানার যাত্রা করো, আর সেই যাত্রা এখনো চলমান, আর তাই এই মৃত্তিকা বা প্রস্তর হলো আদি যোনি।

সেই যাত্রার কালেই, এই বাহারি ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করো তুমি। তবে তার নির্মাণ করার পর, তোমার বোধ জন্ম নেয় যে, তোমাকে এই রচনার মধ্যস্থলে প্রবেশ করে এই রচনার ভেদ উপলব্ধি করতে হবে, আর তা করতে পারলেই তুমি নিজেকে নিজে লাভ করবে, অর্থাৎ তুমি তোমার আত্মপরিচয় লাভ করবে। আর সেই ধারণা নিয়ে তুমি বৃক্ষরূপ যোনি, মৎস্য ও অন্যান্য জলজ জীবরূপ যোনি, এবং অতঃপরে উভচরযোনিসকল নির্মাণ করো, এবং অন্তে নির্মাণ করো ভূতলকে জানার জন্য ভুজঙ্গযোনি।

আকাশকে জানার জন্য কিট ও পক্ষী যোনি, ভূতলকে জানার জন্য ভুজঙ্গযোনি, জল ও ভূমিতে স্থিত থেকে জানার জন্য বৃক্ষ ও উভচর যোনি নির্মাণ করেও, তোমার মনে হলো এই যে সৃষ্টি তুমি করেছ, তাঁকেই তোমায় নিরীক্ষণ করতে হবে ব্যাপক ভাবে, তাই তৃণভোজী যোনিসকল নির্মাণ করলে, এবং সেই তৃণভোজীকে জানার জন্য মাংসাশী নির্মাণ করলে। আর তাতেও যখন সমাধান করতে পারলেনা, তখন আমার দ্বারস্থ হয়ে মানবের জন্ম দিলে, নিজের সমস্ত সৃষ্টিকে জানার উদ্দেশ্যে।

এই প্রতিটি যোনির প্রতিটি জীবের মধ্যে তুমি নিজেকে স্থাপিত করলে, নিজের সমস্ত কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকে নিয়ে, এবং তারই সাথে নিজের নির্মিত সমস্ত পঞ্চভূতদের মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জা এবং শরীর বেশে স্থাপন করে, এবং নিজেই নিজেকে অনুসন্ধান করতে থাকলে। এই ব্রহ্মসনাতনের মধ্যে যেই তুমি অনুসন্ধান করার ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তা নিয়ে সমস্ত পঞ্চভূতদের নিয়ে স্থিত, তাই হলো অখণ্ড। ব্রহ্মসনাতন আমার অবতার, তাই আমার প্রতি পূর্ণ সমর্পণের কারণে সে আমাকে ত্রিদেবী থেকে সর্বাম্বায় পরিণত করে তুলে আমার স্বরূপের দ্বারে আমাকে স্থিত রেখেছে। অপেক্ষা কেবল তোমার অখণ্ড। তুমি যদি তোমার চিন্তা, তোমার ইচ্ছা এবং তোমার কল্পনার থেকে মুক্ত করো নিজেকে এই ব্রহ্মাণ্ডে, অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে, তবে এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমি তোমার সত্যলাভ করবে, অর্থাৎ শূন্যে লীন হয়ে গিয়ে, আমিময় হয়ে যাবে।

আর যদি তা না করো, তবে আমাকে খোয়াতে হবে অখণ্ড তোমায়, কারণ তোমার কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা এক না একদিন আমাকে গ্রাস করতে আসবেই, আর সেদিনও যদি তোমাকে তাঁদের সাথে থাকতে দেখি, তবে না, ছায়া বা তুমি তো আমাকে স্পর্শও করতে পারবেনা, কিন্তু আমি সদাসদার জন্য অবলুপ্ত হবো সেদিন। ... আমিই তোমার উৎস অখণ্ড, আমিই তোমার জননী ও জনক অখণ্ড। আমিই সকল অখণ্ডের জনক ও জননী। আমিই সকলের আদিউৎস, আর তাই আমিই সকলের জনক আর সকলের জননী। ... আর আমার সন্তান যারা, তাদের প্রথম সারির সন্তান হলে তুমি অখণ্ড। হ্যাঁ, তুমিই হলে আমার প্রথম সন্তান, আমার আদি সন্তান। সমস্ত জীবের অন্তরে যেই ত্রিগুণ অর্থাৎ ত্রিদেব বর্তমান, তাঁদের সকলেই হলো আমার প্রথম সন্তান।

কেন?কারণ আমার থেকে সরাসরি তাঁরাই জন্ম গ্রহণ করেছে। বাকি, তাঁদের থেকে যা কিছু জন্মেছে, অর্থাৎ এই পৃথিবীর অর্থাৎ সম্যক ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূত, এবং তাতে স্থিত প্রতিটি জীবের ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূত, এঁরা তো সকলে তোমার থেকে জন্ম নিয়েছে। তাই তাঁদের প্রত্যক্ষ জনক ও জননী তুমি, কিন্তু যেহেতু তোমারই উৎস আমার থেকে, আর আমিই একমাত্র সত্য, তাই সকলেই আমার সন্তান"।

ঝর্ণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, নিজের সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু বারিধারাকে ধারণ করে পরাপ্রকৃতি, মাতা সর্বাম্বা অখণ্ডের উদ্দ্যেশে বললেন, "আশা করি তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর লাভ করেছ অখণ্ড, তাই তো?"

অখণ্ডের দুইনেত্র অশ্রুপূর্ণ; তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন যে মাতাকে এমন অসম্ভব সৌন্দর্যে স্থাপিত দেখে, তিনি না রমণের চিন্তায় গ্রসিত হয়ে যান, তা হয়নি। ... উপরন্তু তিনি সম্যক ভাবে মাতা সর্বাম্বাকে নিজের মাতা জ্ঞান করে করজোড়ে নতজানু হয়ে বললেন, "ক্ষমা চাইছি আমার সেই ভুলের জন্য, যার জন্য কল্পনার, ইচ্ছার আর চিন্তার জন্ম হয়েছিল অর্থাৎ ছায়াদেবীদের জন্ম হয়েছিল। নিজের মূর্খতার কারণে, স্বয়ং জগন্মাতাকে আমি প্রগলের ন্যায় দৌড় করিয়ে ফিরেছি। যিনি স্বয়ং আমার জননী, তাঁর প্রতি কামনার দৃষ্টি অর্পণ করেছি কালে কালে, তাঁকে নিজের দাসী রূপে স্থাপন করেছি কালে কালে"।

নেত্রের জলে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না অখণ্ড। তাই নেত্রের জল বাম হস্ত দ্বারা মুছে আবার বললেন তিনি, "সত্য কেবল তুমি মাতা। সত্য আমিও, কিন্তু আমি যে সত্য ত্যাগ করে কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার দ্বারা বদ্ধ। নিজের অহংএ আবদ্ধ হয়ে আমি পঞ্চভূতদ্বারা আবদ্ধ। ছায়াদেবী, অহং এবং পঞ্চভূত আমাকে প্রভু ডাকতে থাকলে, সেই অভিমানে ছায়াদেবীদের এবং অহংকে সমস্ত রিপু পাশ অর্থাৎ আবেগ বা অসুরদের জন্মদান করার অনুমতি প্রদান করেছি, এবং তাঁদের বন্ধনও গ্রহণ করেছি। ... এক ও অভিন্ন হয়েও, অজস্র যোনিতে, অজস্র জীবেতে, অজস্র মানুষে বিভক্ত হয়ে নিজেকে নিজেই তোষামোদি করেছি আবার নিজেকে নিজেই ভক্ষণ ও অত্যাচারও করেছি। নিজেকে নিজেই ভেদাভেদে স্থাপন করে তিরস্কার করেছি, নিজেকে নিজেই সম্মান দিয়েছি , অপমান করেছি, পুরস্কার দিয়েছি আবার তিরস্কারও করেছি।

কিন্তু সেই প্রতিটিক্ষেত্রে, তুমি আমায় মরণশীলতা যেন উপহার স্বরূপ প্রদান করে গেছ, এবং মৃত্যুর অন্তে আমাকে দেহের বন্ধন থেকে বারংবার উদ্ধার করেছ, যাতে আমি উপলব্ধি করি যে আমি অমর হয়েও মরণশীল, আবার মরণশীল হয়েও অমর। কিন্তু আমি তার বিচারও করিনি। যদি বিচার করতাম, তাহলে তো বেশ বুঝতে পারতাম যে আমি স্বয়ং তুমিই, সেই ব্রহ্মই, সেই শূন্যই, আর তাই অজর ও অমর, অব্যাক্ত ও অচিন্ত্য, ও বুঝতে পারতাম যে যাকে আমি অজর অমর বলছি, তা আমি নই, আমার স্বরূপ, যেখানে ছায়াদেবী, পঞ্চভূত, বিচার, বিবেক, চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ, অহং, কারুর কনো অস্তিত্বই নেই।

দেবী আমি আপনাকে খুব কথা দিতে চাইছি যে আমি কিছুতেই ছায়াদেবীদের যখন আয়নাকে গ্রাস করার প্রয়াস করবে, তাঁদের সাথে সঙ্গ দেবনা। কিন্তু যেন সাহস পাচ্ছিনা অন্তর থেকে। আমার অন্তর যেন বলছে, আমার কনো সামর্থ্যই নেই সেটা করার, যা আমি বলতে চাইছি। ... দেবী, আমাকে মার্গদর্শন প্রদান করুন, যাতে আপনাকে আমি ছায়াদেবীদের থেকে উদ্ধার করতে পারি, আর তাঁদের নাশ করে, আপনাতে লীন হয়ে যেতে পারি। যদি এমন করতে সক্ষম হই আমি আপনার কৃপায়, তাহলে আপনি ব্রহ্মসনাতনের অন্তরে স্থিত হয়ে আরো কিছু

ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের নিকটে আকর্ষণ করে, তাঁদের অন্তরের অখণ্ডকেও সেই পাঠ প্রদান করতে পারবে, যা আমাকে প্রদান করলে। আর তাহলে ক্রমশ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সত্য স্থাপিত হবে।

পুনরায় শূন্যের আরাধনা হবে; পুনরায় অহম ত্যাগের উৎসব হবে; পুনরায় পঞ্চভূতদের প্রকৃতির কাছে ও নিয়তির কাছে সমর্পণের উৎসব হবে যেমনটা এক্ষণে ব্রহ্মসনাতনের অন্তরে হচ্ছে; পুনরায় কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার দহন উৎসব হবে, এবং ব্রহ্মাণ্ডের কণায় কণায় বিদ্যমান অখণ্ড, বিদ্যমান আত্ম, নিজের মাতাকে, নিজের স্বরূপকে লাভ করার উৎসবে মুখরিত হয়ে মোক্ষের উৎসবে মেতে উঠবে। তাই কৃপা করো মা! ... কৃপা করো আমার উপর"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "এক্ষণে আমাকে এখান থেকে যেতে হবে নাথ, কারণ এদিকে দিদি আসছেন। যদি তিনি আমাকে এই রূপে দেখেন, আর আপনাকে আমার এই রূপের নিকটে দেখেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের তৃতীয় সন্তানের অপেক্ষা করা শুরু করে দেবেন!"

অখণ্ড বুঝলেন, আবার মাতা নিজের স্ত্রীবেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, আর তা বুঝে অন্তরে বিচার করলেন, 'কি নিখুঁত নাট্য দেবী! ... ধন্য হয়ে গেলাম আপনার এমন সান্নিধ্য লাভ করে। ... ধন্য হয়ে গেলাম আমি, ধন্য হয়ে গেল আমার সমস্ত ভূত, সমস্ত কিছু"।

অখণ্ডের সর্বাম্বার প্রতি ব্যবহার এই দিবসের পর থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সমর্পণ তাঁর প্রতিটি বিচারে, প্রেম তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং সর্বক্ষণ যেন সর্বাম্বার আদেশ ও নির্দেশের জন্য তিনি অপেক্ষা করেন, কিন্তু এই পরিবর্তন কি সম্যক পরিবর্তন না কি আংশিক! ... এই ভাবে প্রায় একটি বৎসর চলে গেলে, দেবী কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা বিচারপরামর্শ করলেন নিজেদের অন্তরে।

দেবী কল্পনা বললেন, "দীর্ঘকাল আমাদের পৌত্র, হিল্লহু আর ভাঞ্চএর সন্ধান পাইনি। ... সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন শান্ত শান্ত! কই কনো যুদ্ধের ঝঙ্কারও তো আমাদের কাছে পৌছাচ্ছেনা! ... কি অবস্থা আমাদের পৌত্রদের! ...তারা কুশল আছে তো!"

দেবী ইচ্ছা বললেন, “আমাদের পৌত্ররা অজেয়, তাই চিন্তার কিচ্ছু নেই!”

দেবী চিন্তা বললেন, “না চিন্তার কারণ অন্য। ... বেশ কিছু দিবস আমি অখণ্ডের সাথে কনো যোগসূত্র খুঁজেই পাচ্ছিনা! ... তার কি হলো! ... সে তো আমাদের মুখাপেক্ষী! ... অন্য ব্রহ্মাণ্ডে খবর নিয়েছি আমি বলদম্ভদের দিয়ে আর ঋপুকে দিয়ে, সেখানে সকল কল্পনা, ইচ্ছা আর চিন্তার সাথে ত্রিদেবের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রয়েছে, অর্থাৎ ত্রিদেব আমাদের ছায়াদেবীদের বশেই রয়েছেন সেখানে। কিন্তু এখানে যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে, তাই না দিদি?”

দেবী কল্পনাও চিন্তিত হয়ে বললেন, “সেই জন্যই তো হিম্লহু আর ভাঞ্চএর জন্য মনটা এতো কু গাইছে। ... একবার ঋপুকে পাঠাবো সেখানে!”

দেবী ইচ্ছা বললেন, “একাকী ঋপু! ... যদি হিম্লহু আর ভাঞ্চএর কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তো একাকী ঋপু কিচ্ছু করতে পারবে না! ... ওর সাথে আমাদের তিনপুত্রদের প্রেরণ করলেও তো হয়!”

দেবী কল্পনা বললেন, “না ইচ্ছা, পূর্বেই বলদম্ভদের অবস্থা মৃত্যুর সমান করে দিয়েছিল সর্বাম্বা। আর নয়। এবার তখনই তাঁরা সেখানে যাবে, যখন ঋপুর সাথে সর্বাম্বা যুদ্ধে রত থাকবে। সেই সময়ে গিয়ে, ওদের যে দৃষ্টি ছিল মানসীর উপর, সেই মানসীকে অপহরণ করে নিয়ে চলে আসবে। ... আর ঋপুকে নির্দেশ দাও, যাতে সে সর্বাম্বার সাথে নয়, ওর পুত্রদের যুদ্ধে আবাহন করে। যোদ্ধা তারা, তাই যুদ্ধের আবাহন তারা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। আর তাদেরকে হত্যা করে দিতে পারলে, আমাদের পুত্ররা অমর হয়ে যাবে”।

দেবী চিন্তা ও দেবী ইচ্ছা কল্পনার কথাতে সহমত পোষণ করলে, ঋপু সকলকে আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়ে, আজ্ঞার দিকে যাত্রা করলেন। আর তাঁর পিছুপিছু, যাত্রা করলেন বলদম্ভরা। সন্তানজন্ম দেবার শক্তির নাশ হয়েছে তাঁদের কিন্তু যৌনতার নেশা তাঁদের থেকে তখনও পিছু ছাড়েনি। আজ্ঞাতে পৌঁছেই তাঁদের নেত্র গেল দেবী চেতনা ও দেবী অন্তর্দৃষ্টির প্রতি। আর তাঁদের দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন তিনি ছায়াপুত্র, “এঁরা নিশ্চয়ই মানসীর কন্যা

হবে। এঁদের রূপযৌবন দেখেছ! ... এঁদেরকে অপহরণ করতে পারলে, এক নয়, দুদুটি মানসী পেয়ে যাবো"। এমন অনেক প্রলোভনের বার্তালাপ নিজেদের মধ্যে করলে, তাঁদের দৃষ্টি পরলো ক্ষিতীশ ও সতিশের প্রতি। এঁরাই তাঁদের প্রাণনাশের জন্য প্রস্তুত বাণ। এমন বিচার করে তিন ভ্রাতা বললেন, "এমন কিচ্ছু করা উচিত নয়, যার জন্য এই দুই সর্বাম্বাপুত্র আমাদের উপর ক্রোধিত হয়ে যায়। ... লুকিয়ে পরো ভ্রাতা। একবার ঋপু এই দুই ভ্রাতার নাশ করে দিতে পারলে, আর আমাদেরকে কে আটকাবে! তখন এই দুই মানসীকন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে সম্ভোগ করবো"।

ঋপু যখন এই দুই ভ্রাতার সম্মুখে পৌঁছল, তখন এঁরা দুই ভ্রাতা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ ক্রীড়া করছিল। সেই দেখে, ঋপু এঁদের উদ্দেশ্যে বলল, "আরে বালকরা, যুদ্ধযুদ্ধ ক্রীড়া কেন করো, যখন যুদ্ধ করারই অবকাশ রয়েছে তোমাদের সম্মুখে! "

ক্ষিতীশ সতিশকে থামিয়ে সম্মুখে গিয়ে বললেন, "তুমি কে?"

ঋপু ব্যঙ্গাত্মক হাস্য হেসে বললেন, "আমি! ... আমি হলাম ঋপু। আমাকে তোমরা চিনবে না, তবে আমার ভ্রাতাদের তোমরা চিনলেও চিনতে পারো। আমার দুই ভ্রাতার নাম হিম্লহু আর ভাপ্ঞ"।

সতিশ পিছন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ও তুমি এসে গেছ। তোমারই অপেক্ষা করছিলাম আমরা। আরে তোমাকে হত্যা করবো বলেই তো আমরা যুদ্ধ যুদ্ধ অনুশীলন করছিলাম। ... আমাদের মাতা বলেছেন, তুমি নাকি তোমার ভ্রাতাদের থেকেও অধিক শক্তিশালী। তাই খানিক অভ্যাস করছিলাম। মাতা আমাদের বলেছেন, যতটা সহজে আমরা তোমার ভ্রাতাদের হত্যা করেছি, ততটা সহজে তোমার হত্যা করা যাবেনা। তাই খানিক অনুশীলন করছিলাম"।

এই কথা শুনে, বলদম্ভরা ব্যথিত হয়ে উঠলেন, এবং কিছুটা উগ্রও; তাঁদের দুই সন্তানের হত্যা হয়ে গেছে!... অন্যদিকে ঋপু বিচার করতে বসে, "এমন তো কথা ছিল না। যদি সর্বাম্বা তাঁর

ভ্রাতাদের হত্যা করেছেন বলতো এই বালকরা তাও বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আমার ভ্রাতাদের মৃত্যু তো সর্বাম্বাপুত্রদের হাতে নিয়ত ছিল না!"

এমন বিচার করে, পরিহাসের ছলে ঋপু ক্ষিতীশ ও সতিশের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার দুই ভ্রাতার পরাক্রমও তো কম ছিল না। তাঁদেরকে যখন তোমরা বীরগতি প্রদান করেছ, তখন তো আমারও দেখতে ইচ্ছা করছে, তোমাদের পরাক্রম ঠিক কতটা। যুদ্ধ করো হে সর্বাম্বাপুত্র, আজ তোমরা দুইজন একত্রে এই ঋপুর সাথে যুদ্ধ করো"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ ঋপুর আগ্রহে উত্তপ্ত হয়ে উঠে, নিজেদের ধনুকের প্রত্যঞ্চা ধারণ করে, একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতে থাকলেন ঋপুর উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাঁর উপর তাঁদের কনো বাণের কনো প্রভাবই পরল না। সেই দৃশ্য দেখে, উত্তেজিত ক্ষিতীশ ও সতিশ এবার তাঁদের পরমাত্মীয়সকল অর্থাৎ ভূতদের নামে নামে যেই মহাদিব্য বাণ সঞ্চয় করে রেখেছিল নিজেদের কাছে, তা নিক্ষেপ করা শুরু করলেন। কিন্তু তাতেও ঋপুর উপর কনো প্রভাব পরলো না দেখে, এবার সতিশ তাঁর পিতার দেওয়া নারায়ণী অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

ঋপু সেই বাণকে নিজের বাম হস্তে ধারণ করে আকাশ পথে নিক্ষেপ করে দিলে, তা ব্রহ্মসনাতনকে কপর্দকশূন্য করে দেয়, কিন্তু ঋপুর কিছুই হয়না। উত্তেজিত ক্ষিতীশ এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ঋপুর প্রতি। ঋপু সেই অস্ত্রকেও নিজবাম হস্তে ধারণ করে, আকাশ পথে পরিত্যাগ করে দিলে, পুনরায় ব্রহ্মসনাতন নিজের সমস্ত কিছু ক্ষয় করে ফেললেন, কিন্তু পুনরায় ঋপু অক্ষতই থাকে।

অবশেষে, ক্ষিতীশ নিক্ষেপ করলেন ত্রিশূল এবং সতিশ নিক্ষেপ করলেন পাশুপত। ঋপু হাস্য প্রদান করে এই দুই অস্ত্রকে দুই হস্তে ধারণ করলেন আর অট্টহাস্য প্রদান করে বললেন, "বালক, আমি ঋপু, আমি কর্মের ফলকে স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করি, নাদকে নিয়ন্ত্রণ করি, আর তোমাদের কোন বাণে কতটা শক্তি থাকবে, তাও নিয়ন্ত্রণ করি। ... আমাকে কি অস্ত্র দ্বারা হত্যা করবে তোমরা! ... নেই বালক, নেই। এমন কনো অস্ত্রই নেই, যা আমার হত্যা করতে পারে।

যাও বালক, তোমাদেরকে আর একটি সুযোগ দিলাম, যাও এমন কনো শক্তিধর অস্ত্র নিয়ে এসো, যা কর্মকেই নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ যা কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তাই আমার দমন করতে পারবে। যাও নাদান বালক, এমন কনো অস্ত্র নিয়ে এসো যা নাদকে নয়, চিন্তাকেই নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ চিন্তারই প্রকাশক রূপ হলো নাদ। পারবে আনতে এমন কনো অস্ত্র, যা আমার কাছে কতটা শক্তি থাকবে, তার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে! ... না বালক, যতটা তোমার কল্পনা করার সামর্থ্য, ততটাই তোমার শক্তি, আর স্বয়ং দেবী কল্পনা আমার মহারানী। যতটা তোমার ইচ্ছা, ততটাই তোমার সমৃদ্ধি, আর স্বয়ং দেবী ইচ্ছা আমার মহারানী। যতটা তোমার চিন্তার প্রশস্তি, ততটাই তোমার নাদ নিয়ন্ত্রণে স্থিত, আর স্বয়ং দেবী চিন্তা আমার মহারানী।

তা বালক, তোমরা আমার দমন করবে কি করে? আমার এই তিন মাতাকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য কারুর আছে? না কারুর নেই। না ত্রিদেবের আছে আর না ত্রিদেবীর আছে। আরে, ত্রিদেবের কাছে তো ত্রিদেবীদের নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যও নেই। নেহাত তাঁদের পত্নী হয়ে ত্রিদেবী থাকেন, তাই ত্রিদেবের এত অভিমান, এতো দাপট। ... কিন্তু বালক, স্বয়ং ত্রিদেবীরও নেই আমার তিন মহারানী, কল্পনা, চিন্তা, আর ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাহলে এবার বলো, কি করবে তোমরা! ... কিচ্ছু করতে পারবে না। ... আর সত্য কি জানো, আমার দুই ভ্রাতাকেও তোমরা কিচ্ছুই করতে পারো নি।

স্মরণ করে দেখো, কনো বাণ কি চালিয়েছিলে আমার ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে! ... স্মরণ করো বালক, স্মরণ করো। ... আমার ভ্রাতাদের হত্যা করার বল তোমাদের বাহুতে নেই। ... হত্যা হয়েছে তাঁদের, কিন্তু তোমরা নও, তোমাদের মাতা তাঁদের হত্যা করেছিলেন। আর সেই হত্যার প্রতিকার নেবার জন্য, আমি এবার তোমাদের প্রাণ হরণ করবো। এটাই হবে সর্বাম্বাকে দেওয়া উচিত দণ্ড। বড় জগন্মাতা না সে! নিজের পুত্রদের রক্ষা করে দেখাক সে আগে"।

দক্ষিণ দিক থেকে একটি সুরেলা অথচ সুতীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঋপু তথা ক্ষিতীশ ও সতিশের কর্ণে, "নে আবাহন করেছিস যখন, তোর জগন্মাতা তোর সামনে উপস্থিত। কি করবি এবার! তোর ভ্রাতা হিল্লহুর মত আমার সাথে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করবি! ... নাকি তোর ভ্রাতা

ভাণ্ডএর মত আমার কাছে সমর্পণ করে, মুক্তি লাভ করবি। সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ দিলাম তোকে। বল কি তোর সিদ্ধান্ত”।

ঋপু গর্জন করে উঠলো, “দেবী আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। তুমি কে? ত্রিদেবীর মিলিত রূপ, তাই তো! … ত্রিদেবী কি কল্পনার, চিন্তার ও ইচ্ছার নিয়ন্ত্রক? না, আদিশক্তি কল্পনা অনুসারে শক্তি সঞ্চার করে; শ্রী ইচ্ছা অনুসারে সম্পদা প্রদান করে; আর বীণাপাণি চিন্তা অনুসারে নাদ প্রদান করে যাতে নিজের চিন্তাকে ব্যক্ত করা যায়। তাহলে তাঁদের মিলিত রূপ, আমাকে হত্যা করবে কি করে? আমি কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা দ্বারা সুরক্ষিত!”

মাতা সর্বাম্বা হাস্য প্রদান করে বললেন, “এই যে তুই আমার পুত্রদের বলছিলি! ত্রিদেবীকে ত্রিদেব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন কোথায়। নেহাত তাঁরা ত্রিদেবের অর্ধাঙ্গিনী হবার মর্যাদায় নিজেদের আবদ্ধ রাখেন, তাই ত্রিদেব তাঁদের নিয়ন্তা। তা ত্রিদেবের থেকে মুক্ত হলে, ত্রিদেবীর সামর্থ্য কি, তা কি তোর জানা আছে? … জানা নেই, তাই না! … তবে শুনে রাখ, ত্রিদেবের থেকে মুক্ত হলে, ত্রিদেবী স্বয়ং কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী।

তাঁদের ইচ্ছা অনুসারেই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার প্রবাহ হয়। ব্রহ্মসনাতন, যার ব্রহ্মাণ্ডে তুই স্থিত, আর তাই সেই ব্রহ্মাণ্ডের লয় যাতে না হয়, তাই পাশুপত ও ত্রিশূলকে তুই নিক্ষেপ না করে, তাঁদেরকে আত্মসাৎ করে নিলি, সেই ব্রহ্মাণ্ডের নাশের কল্পনা কে করতে দিল তোদের? ব্রহ্মাণ্ড যে নাশ হয়ে যেতে পারে পাশুপত ও ত্রিশূলের প্রভাবে, সেই চিন্তাই বা তুই করলি কি করে? আর ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করার ইচ্ছাই বা তুই করলি কি করে? তোর মহারানীরা তো এমন চাননি! … তাঁরা তো এই ব্রহ্মাণ্ডের নাশই কামনা করেন, তা সত্ত্বেও তুই নাশ করার কল্পনা করতে পারলি না কেন? নাশ করার চিন্তা ও ইচ্ছা করতে পারলিনা কেন?”

ঋপু নিজের ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, “তাহলে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডেই তুমি এমন কল্পনাকে, ইচ্ছাকে আর চিন্তাকে নিজের অধীনে রাখো না কেন? কেন ত্রিদেবের অধীনে স্থিত থাকো? আর যেহেতু

ত্রিদেব নিজেদের কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার অধীনে রাখেন, তাই তোমরাও এই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার অধীনে থাকো, কিন্তু কেন?"

মাতা সর্বাম্বা উত্তর দিলেন, "সমর্পণের অভাবে পুত্র ঋপু। ... ব্রহ্মসনাতন নিজের মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জা, তনু সমস্ত ভূতকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। সে নিজের সমস্ত ত্রিগুণকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। আমিই তাঁর সমস্ত কিছু। আমাকেই সে তাঁর জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করেছে। আমার সমস্ত শাসন তাঁর কাছে প্রেম, আমার করা প্রতিটি অপমান তাঁর কাছে শিক্ষালাভ, আমার দান করা প্রতিটি ব্যর্থতা, তাঁর কাছে আমার প্রেমদান। ... এই নয় যে এই সমর্পণ প্রথম কেউ করলেন।

এর পূর্বেও কেউ কেউ নিজের অন্তরের আদিশক্তির কাছে নিজের সমস্ত কল্পনাকে সমর্পণ করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজের সমস্ত চিন্তাকে সমর্পণ করেছেন। যে যে নিজের কল্পনাকে আমার কাছে সমর্পণ করেছেন, তাঁর কাছে আমার আদিশক্তিরূপ তাঁর মহাদেবের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে থেকেছে, এবং তাঁর উদ্ধার করেছে। যে যে নিজের ইচ্ছাকে আমার কাছে সমর্পণ করেছে, তাঁর অন্তরে আমার শ্রীরূপ নারায়ণের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে থেকেছে আর তাঁকে আবশ্যক সম্পদা প্রদান করেছে। আর যে যে আমার কাছে নিজের সমস্ত চিন্তাকে সমর্পণ করে দিয়েছে, তাঁর মধ্যে আমার সরস্বতী রূপ ব্রহ্মার অধীন থেকে মুক্ত হয়ে থেকে তাঁকে মার্গদর্শন করেছে।

কিন্তু ব্রহ্মসনাতন একই সঙ্গে নিজের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত ইচ্ছা ও সমস্ত চিন্তাকে আমার কাছে সমর্পণ করে দিয়ে এক নতুন নিদর্শন নির্মাণ করেছে। ... আর তার ফলস্বরূপ দেখছিস না, যেহেতু আমার ত্রিদেবীই ত্রিদেবের থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, তাই তাঁরা একত্রিত হয়ে সর্বাম্বা রূপে বিরাজ করছে, আর যেহেতু আমি সর্বাম্বা রূপ ধারণ করেছি, তাই ত্রিদেবকেও একত্রিত হয়ে অখণ্ড রূপ ধারণ করতে হয়েছে। আর কি কিছু দেখতে পাচ্ছিস? দ্যাখ ভালো করে, ত্রিদেব আমার স্বামী এখনো, কিন্তু আমি তাঁর অধীনে স্থিত নই, সে আমার অধীনেই স্থিত, কিন্তু আমার

স্বভাব নয় কারুকে আমার অধীনে স্থিত রেখে দেওয়া, তাই সে আমার অনুগত হয়ে আমার সঙ্গেই নিবাস করছে।

দেখতে কি পাচ্ছিস না ঋপু, ব্রহ্মসনাতনের সমস্ত ভূত আমার কাছে পরমাত্মীয়ের বেশে অবস্থান করছে , আর মহানন্দে আমার নির্দেশ শ্রবণ করার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে! ... দেখতে কি পাচ্ছিস না ঋপু যে, তোর মহারানীরা আজ এই ব্রহ্মাণ্ডে নিজেদের রাজ্যত্যাগ করে, দীনহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর নিজেদের অধিকার স্থাপনের জন্য একের পর এক ফন্দি করে চলেছে!"

ঋপু সমস্ত কথা শুনে চুপ করে গেলে, মাতা সর্বাম্বা বললেন, 'কিরে বললি না ঋপু, আমাকে কি বেশে পেতে চাস তুই!"

ঋপু সলাজে বললেন, "মাতা করে লাভ করার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে মা। তোমার সন্তান হয়ে থাকার জন্য যদি আমাকে আমারই আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়! ... এক উভয়সঙ্কটে স্থাপিত হয়ে গেছি আমি! ... একদিকে নিজের জনম জনমের মাতাকে লাভ করে, তাঁর চরণতলে স্থাপিত হয়ে তাঁর স্নেহলাভ করার প্রলোভন জাগছে মনে। আর অন্যদিকে, আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ভয় আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "যদি আমি তোকে কথা দিই যে, তোকে তোর আত্মীয়দের সাথে কনোদিনও যুদ্ধ করতে হবেনা!"

ঋপু লজ্জিত হয়ে বললেন, "কিন্তু এতো শর্তসাপেক্ষ প্রেম হলো মা! ... শর্ত দ্বারা কি প্রেমকে আবদ্ধ করা উচিত! ... এ তো প্রেমেরই অপমান করা, তাই না!"

মাতা সর্বাম্বা এবার ঋপুর সন্নিকটে এসে, তাঁর বদনে নিজের স্নেহস্পর্শ প্রদান করে বললেন, "মা থাকতে এত চিন্তা কেন ঋপু?"

ঋপু মাথা নিচু করে বললেন, “আমার পিতাদের তুমি তো চেন মা। ... তাঁরা কিছু না কিছু করে, সম্ভোগের চিন্তা করতে থাকে। সম্ভোগ করার সামর্থ্যও চলে গেছে তাঁদের। কিন্তু তাও তাঁদের মনে সম্ভোগের ইচ্ছা যায়নি। মা, সেই সম্ভোগ মানসিকতা তাঁরা তোমার প্রতিও দেখিয়েছে, আর দেবী মানসীর প্রতিও। কিন্তু এরপরেও যদি তাঁরা এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তোমার প্রতি, দেবী মানসীর প্রতি বা অন্য কারুর প্রতি, আমি নিজেকে কি করে সংযত করবো। ... মাতা সত্য কথা এই যে, হিম্লহুর সাথে আমার আর ভাঞ্চএর এই নিয়েই মতভেদ ছিল। হিম্লহুর কাছে তাঁরা আমাদের পিতা, তাই তাঁদের কলঙ্ককেও আমাদেরকে আমাদের পিতাদের বীর্যবান হবার প্রমাণ রূপে স্বীকার করে নিতে হবে, কিন্তু মা, এটা আমরা কিছুতেই মানতে পারিনি।

ভাঞ্চকে একবার যখন পিতা বলদম্ভ আদেশ দিতে আসেন যে, আপনাকে বন্দিনী করে এনে তাঁর সম্ভোগের পাত্র করে স্থাপন করতে, সে প্রতিবাদও করে ওঠে। সে সরাসরি বলে ওঠে, আপনাদের শত্রু হতে পারেন তিনি, কিন্তু তিনি ত্রিদেবীর সম্মিলিত রূপ, আমাদের সকলের মাতা। নিজের মাতার প্রতি এমন কুদৃষ্টি শোভা পায়না। ... আর এই কথা বলার জন্য ভাঞ্চকে কারাবাসেও নিক্ষেপ করে আমার পিতারা। তাই আমি চুপ করে গেছিলাম। কিন্তু আজ কেন আমি চুপ করে গেছিলাম, তা ভেবে নিজের কাছে নিজেরই লজ্জা হচ্ছে”।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “জানি আমি পুত্র, আর জানি বলেই, না ভাঞ্চকে আমার সাথে যুদ্ধ করতে দিয়েছি, আর না তোকে দিলাম। জানি তোরা আমাকে মাতাই মানিস, তারপরেও তোদেরকে নিজের মাতার সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য করতে চাইনি আমি”।

ঋপুর নেত্রে প্রেমাশ্রু। সে বলল, “জানো মা, দেবী মানসীকে দেখে আমার পিতাদের যে বীর্যপাত হয়, তার থেকে আমাদের জন্ম হয়। কিন্তু আমাদের জন্ম হয়, ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ের তৃণদের থেকে। তাঁদেরকেই আমার পিতাদের বীর্য ধারণ করতে হয়েছিল। আমাদের জন্মের কালে, যতক্ষণ আমাদের পিতারা আমাদের কাছে আসেন নি, ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে আমাদের মাতারা সর্বক্ষণ আপনার কথাই বলে এসেছেন। আপনার প্রেম, আপনার স্নেহের

কথাই তাঁরা বলে এসেছেন। তাই মন থেকে আপনাকে কখনোই শত্রু মানতে পারিনি। হয়তো এর পশ্চাতে ব্রহ্মসনাতনের হৃদয়ের সমর্পণের গুণই ক্রিয়া করেছে!"

মাতা হেসে বললেন, "পুত্র, তোমাকে কনো শর্ত প্রদান করতে হবেনা। আমি নিজেই তোমাকে বলছি, আমি তোমাকে কনো এমন পরিস্থিতিতে স্থাপিত করবো না, যেখানে স্থিত হয়ে, তোমাকে তোমার পরিবারের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। ... এবার কি তুমি আমার কাছে আমার সেবক হয়ে বিরাজ করতে প্রস্তুত পুত্র!"

ঋপু বললেন, "মা, সে তো আমার সর্ব কালের সৌভাগ্য হবে, যদি আমি আপনার সেবক হতে পারি"। সকলে এবার ঋপুর কাছে এসে ঋপুকে নিজেদের পরিবারে স্বাগত জানালে, ঋপু নিজের পিতাদের আচরণের কারণে দেবী মানসী ও দেবী দখিনার প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, আর ক্ষিতীশ সতিশকে খুঁজলেন, তাঁদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ক্ষিতীশ ও সতিশ কোথায় গেলেন?

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "ও কিছু নয়, সন্তান তাঁদের মাতার প্রতি রুষ্ট। ... চলো তোমরা, মাতাকে এবার তাঁর সন্তানদের মানাতে হবে তো!"

আচার্যলীলা

সকলে পিছনে থাকলে, মাতা সর্বাম্বা তাঁর রুষ্ট সন্তানদের মানাতে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। সতিশ ও ক্ষিতীশ চুপি সারে একটি পাহাড়ের ঢালে বসে নিজেদের অশ্রুজল মুছছিলেন। মাতা দুই পুত্রের মধ্যে স্থিত হয়ে উপবেশন করে, দুই পুত্রের কাঁধে হাত রাখলে, সতিশ ও ক্ষিতীশ চমকে উঠলেন প্রথমে, আর অতঃপরে মাতার আবির্ভাব ঘটেছে দেখে, সেই স্থান ত্যাগ করতে গেলেন। মাতা দুই সন্তানেরই হাত ধরে, নিজের দিকে আকর্ষণ করলে, তাঁর দুই পুত্র, তাঁদের মায়ের বাহুবলের জোরে মাতার দুই ক্রোরে এসে উপস্থাপন করেন।

মাতা শক্ত করে দুই সন্তানকে নিজের ক্রোরে বসিয়ে রেখে নরম সুরে বললেন, "মাতার প্রতি এত রুষ্ট যে, মাতার দিকে তাকাবেও না!"

ক্ষিতীশ অভিযোগের সুরে বললেন, "আপনি আমাদের বলেন নি কেন?"

মাতা হেসে বললেন, "কি বলিনি তোমাদের বাবা!"

সতিশ বললেন, "এই যে ওই দুই অসুরকে আপনিই দমন করেছেন! ... আমরা এই ভেবে অভিমান করে গেলাম যে আমরা প্রকাণ্ড শক্তিশালী, আর আপনার কৃতিত্ব আপনার থেকে নিয়ে নিলাম, আর আপনি একটি কথাও বললেন না!"

ক্ষিতীশ বললেন, "এই কারণে আমাদের প্রতি সকলে কেমন যেন বক্রদৃষ্টি রাখতো। আমরা এর রহস্য কনোদিন ভেদ করতেই পারিনি!"

মাতা হেসে বললেন, "পুত্ররা! ... মায়ের আবার আলাদা করে কনো কীর্তি হয় নাকি! ... মায়ের যা কিছু কীর্তি সমস্ত তো তাঁর সন্তানেরই কীর্তি। ... তা তোমরা আমার কীর্তি নিজের নামে রেখেছিলে, তাতে অসুবিধা কি হয়েছিল!"

সতিশ বললেন, "ছিল অসুবিধা, ও আপনি বুঝবেন না! ... আপনার তো মানসম্মানের কনো চিন্তাই নেই! আপনার কেবলই কর্ম করারই চিন্তা। সেই কর্ম করার পরে, তার শ্রেয় যে খুশী

নিয়ে চলে যাক, আপনার তো তাতে কিছু এসেই যায়না! ... তাই আপনি ওসব বুঝতে পারবেন না!”

ক্ষিতীশ অভিযোগের সুরে বললেন, “যেখানে আপনার জয়গান হওয়া উচিত ছিল, সেখানে আমাদের অভিমানের কারণে আপনার নামে কেউ মনভরে জয়ঘোষও করতে পারেনি। ... কিন্তু আপনার তো তাতে কিছু এসেই যায়না! ... কিন্তু আজ আমরা যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছিনা কারুকে। নিজের মাতার এমন অদ্ভুত কৃতিত্বকে আমরা নিজেদের নামে করে নিলাম! ... আর আজকে যখন সকলে জেনে গেল যে সেই কাজ আপনি করেছিলেন, আমরা করিনি, আমাদের অবস্থান কি রয়ে গেল সকলের কাছে!”

মাতা সর্বাম্বা এবার স্নেহের হাসি হেসে বললেন, “কারুকে কিছু বলার কেন প্রয়োজন পুত্ররা, সকলে তো সমস্তটাই নিজেদের নেত্রে দেখেছেন। তারপরেও আলাদা করে কারুকে কিছু জানানোর প্রয়োজন কিসের! আর যদি কেউ থাকেনও যিনি দেখেন নি এই সমস্ত কিছু, তাঁকেই বা আলাদা করে জানানোর কি আছে! ... হিল্লহুর অহমিকার নাশ হবার ছিল, আর ভাঞ্চকে উদ্ধার করার ছিল। তা তো হয়ে গেছে! সেই কথা কেউ জানলো বা না জানলো, তাতে কি এসে যায়! ... আর যদি জানেও বা, সেই কাজ আমি করলাম কি আমার পুত্ররা করলো, তাতেই বা কি এসে যায়!”

সতিশ ক্ষিতীশ একত্রে বলে উঠলেন, “আপনি কেন বুঝতে পারেন না! ... যেমন সন্তানের নামে জয়ধ্বনি হলে, মাতাপিতার প্রকাণ্ড আনন্দ হয়, তেমন মাতার নামে জয়ধ্বনি হলেও, সন্তানের আনন্দের সীমা থাকেনা। মাতার নামে জয়ধ্বনি সন্তানের কাছে কনো অংশে উৎসবের থেকে কম নয়। যেখানে আপনার নামে এমন উৎসবের ন্যায় জয়ধ্বনি হবার ছিল, সেখানে আমাদের কৃতিত্ব স্থাপনের প্রয়াস, সেই উৎসবকে হতেই দিলো না! ... আমাদের মা শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠা, কিন্তু সেই ঘোষণা কারুকে করতেই দিলাম না আমরা!”

ক্ষিতীশ বলতে থাকলো, "পিতার আপত্তি ছিল আমাদের কর্তাভাব নিয়ে, আমরা সেই কথার কনো গুরুত্বই দিইনি। আজ বুঝতে পারছি, আমরা কেমন ভাবে কর্তা ভাবে গ্রসিত হয়ে গেছিলাম। ... ধিক্কার দিতেও ইচ্ছা করছেনা নিজেদেরকে। ... আপনার স্নেহই আমাদের কাছে সমস্ত কিছু হয়ে রইল, আপনার বল, আপনার সামর্থ্য কিছু নয়!"

ঋপু হেসে সম্মুখে গিয়ে বললেন, "আর এটিই তো মাতা চেয়েছিলেন। আর সর্বক্ষণ এটিই চান বলেই তিনি জগন্মাতা"।

সতিশ ঋপুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কথার তাৎপর্য!"

ঋপু হেসে বললেন, "প্রথমে আমাকে ক্ষমা তো করে দিন, আপনাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, তারপর না তাৎপর্য বলছি আপনাদেরকে"।

ক্ষিতীশ বললেন, "ক্ষমা! ... না না, আমাদের তো তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যদি তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ না করতে, আমরা তো কনোদিন জানতেও পারতাম না, আমাদের মাতা কে? আমাদের কাছে আমাদের মাতা সর্বকাল স্নেহের পাত্র হয়েই থেকে যেতেন, কনোদিনও জানতে পারতাম না যে তিনি স্বয়ং নিয়তি, কনোদিনও জানতে পারতাম না যে তিনিই হলেন সাখ্যাত ভগবতী, তিনিই হলেন জগজ্জননী, তিনিই সকলের সকল প্রকার আরাধ্যা!"

ঋপু হেসে বললেন, "আর সেটিই তো তোমাদের মাতার চাওয়া। ... তিনি তো নিয়তি হয়ে পূজিতা হতে চানই না! ... তিনি তো শক্তি, বিদ্যা বা শ্রী হয়ে, বা সাখ্যাত ব্রহ্মময়ী হয়ে পূজিতা হতেও চান না। তিনি তো কেবলই সকলের অম্বা, সর্বাম্বা হয়ে স্থিতা থাকতে চান, সকলের শ্রী, সবশ্রী হয়ে বিরাজ করতেই পছন্দ করেন। ... তিনি তো চানই না যে কেউ তাঁকে ভয়ে ভক্তি করুন। তিনি তো কখনোই চান না যে তাঁকে কেউ তুষ্ট করার জন্য তাঁর আরাধনা করুক। তিনি তো সকলের স্নেহের জননী হয়ে থাকাকেই অধিক শ্রেয় রূপে পরিগণনা করেন, আর তাই হয়ে থাকেন সকলের কাছে। ... আর নিজের কর্মের শ্রেয়!

হে সর্বাম্বাপুত্ররা, মাতা তো তোমাদের মাধ্যমে এইটিই দেখালেন যে শ্রেয় পেলাম কি পেলাম না, সেই কারণে কর্ম করার কনো অর্থই হয়না। কর্ম আবশ্যক, তাই সেই কর্ম করলাম, এটিই কর্ম করার অন্তরায় হওয়া উচিত। আর তাই তো তাঁর লীলাতেই, তোমাদের অন্তরে লুক্কায়িত কর্তাভাবও যেমন বেরিয়ে এলো, তেমন তোমরা তাঁর কৃতিত্বকে নিজেদের নামে করে নিয়ে কারুকে তাঁর কৃতিত্বের জয়ঘোষ করতেই দিলেনা”।

ক্ষিতীশ বললেন, “এর অর্থ, আমাদের অন্তরে কর্তাভাব আগে থেকেই ছিল, যাকে প্রকাশিত না করলে, তার কনো কালেই নাশ হতো না। সেই কারণেই মাতা আমাদের সাথে এমন করলেন! ... আর মাতা সকলকে দেখাতে চাইছিলেন যে কর্তৃত্ব নয়, কর্ম আবশ্যক, কর্মের কারণেই কর্ম করা উচিত, অন্য কনো স্বার্থে নয়। তাই তিনি আমাদেরকে সেই শ্রেয় প্রদান করে দিয়ে, নিজের কৃতিত্বকে বিনষ্ট করে দিয়ে দেখালেন!”

দেবী মানসী হেসে বললেন, “হ্যাঁ পুত্ররা, তোমাদের মাতা ঠিক এমনই। তিনি কনো কিছু শেখাতে হলে, অন্য কারুকে দিয়ে তা শেখান না। তিনি কারুকে কিছু শেখাতে হলে, তা নিজেকে দিয়েই শেখান। আর সেই কারণেই তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ গুরু। তবে ওই যেমন ঋপু বলল, নিজে কখনোই শ্রেয় নেন না, তাই সকল শিষ্য সকল কিছু প্রকৃতির থেকে, নিয়তির থেকে শিখলেও, সেই শ্রেয় দেন অন্য কারুকে, (অখণ্ডের দিকে তাকিয়ে) ক্ষমা করো অখণ্ড, (আবার ক্ষিতীশসতিশের দিকে তাকিয়ে) ত্রিদেবকেই সাধারণত সেই শ্রেয় প্রদান করেন শিষ্য। কিন্তু প্রকৃত গুরু এক ও একমাত্র তোমাদের মাতাই। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ কনোকালে কনো গুরুর আসনে স্থিতই হননি”।

দেবী দখিনা বললেন, “আর স্নেহ! ... হ্যাঁ তিনি কেবলই স্নেহ আহার করেন। অন্য কিছু আহার তাঁর প্রয়োজনই নেই, আর তা করেনও না। দেখোনা পুত্ররা, তোমাদের মাতা নিজের জন্য আহার প্রস্তুতই করেন না। তিনি কেবলই আমাদের তাঁর প্রতি স্নেহকেই ভক্ষণ করেন, আমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। ... এই কারণেই তো তিনি জগন্মাতা, এই কারণেই তিনি সকলের মাতা, এমনকি ত্রিদেবেরও জননী তিনি”।

অখণ্ড শিক্ষা

ক্ষিতীশ ও সতিশ এবার আর কথা না বলে, তাঁদের মাতার বক্ষে নিজেদের দেহকে এলিয়ে দিলেন। ভুলেও গেলেন যে তাঁরা বড় হয়েছেন, আর তাঁদের দেহেরও ভার হয়েছে। আর কেবল তাঁরা নন, তাঁদের মাতাও সন্তানদের বক্ষে ধারণ করে পরমানন্দের তৃপ্তিরস পান করলেন। আর এই সমস্ত কিছু অখণ্ড দেখে বেশ ভালো করে বুঝলেন যে, "জগন্মাতার প্রেমের উপর বিশ্বাস না করতে পারার কারণেই, তিনি অতিতে সকল সমস্যার রচনা করেছেন, আর যদি তাঁর প্রেমকে আজও স্বীকার করতে না পারেন, তাহলে এখনো তিনি সমস্যার পর সমস্যা নির্মাণ করতেই থাকবেন, কারণ তাঁর প্রেমই সমস্ত সমস্যার নিবারণ।

একাকী তাঁর প্রেম, তাঁদের সন্তানের সমস্ত ভ্রমকে বিনষ্ট করে দিলো, যা কখনোই মুণ্ডচ্ছেদ বা অনুরূপ হিংসা ঠিক করতে পারেনা। কি অদ্ভুতই না জগন্মাতার প্রেমের সামর্থ্য। আসলে সেই প্রেমে যে কনো ঈশ্বরত্ব নেই। যেন স্বয়ং ঈশ্বরী নিজেই নিজের ঈশ্বরত্ব ভুলে যান, আর কেবলই সন্তান স্নেহ প্রদান করেন। এটিই কি এই প্রেমের বিশেষত্ব! এটিই কি প্রেমের গুহ্য রহস্য! সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে কেবলই মাতৃত্বকে ধারণ করে থাকাই কি আসল প্রেম!"

অন্যদিকে বলদম্ভরা পূর্বেই সেখান থেকে পলায়ন করেন কারণ তাঁরা এই আজ্ঞাতে সুরক্ষিত নন। তাঁরা বেশ বুঝে গেছেন যে হতে পারে সর্বাম্বাপুত্রদের হাতে তাঁদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করা আছে, কিন্তু সেই মৃত্যুর কাণ্ডারি যিনি, তিনি অন্য কেউ নন, স্বয়ং সর্বাম্বা। তাই তাঁরা মনস্থির করেন যে, তাঁরা সর্বাম্বার উদ্দেশ্যে কঠিন তপস্যা করবেন, আর সেই তপস্যার বলে সর্বাম্বাকে তুষ্ট করে অভয়দান গ্রহণ করে নেবে, আর এই ভাবে তাঁরা অমর থাকবেন।

এমন মনস্থির করে, আহার নিদ্রা ও মৈথুন অর্থাৎ ক্ষুধাত্যাগ করে, বিশ্রাম ত্যাগ করে এবং বিলাসিতা ত্যাগ করে, একাসনে স্থিত হয়ে সর্বাম্বার নাম জপতে থাকেন। প্রায় একমাস এমন হয়ে যাবার পর, দেবী কল্পনা, দেবী ইচ্ছা ও দেবী চিন্তা অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তিত হয়ে গেলেন

তাঁদের তিনপুত্রদের নিয়ে। অন্যদিকে অখণ্ডও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এই তপস্যা নিয়ে। কিন্তু সর্বাম্বার সেই দিকে কনো হুঁশ নেই।

সর্বাম্বা তাঁর পুত্রদের চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে বিবাহ দেওয়াতে প্রচেষ্টারত। মাতা হবার দরুন বা নিয়তি হবার দরুন আদেশ তিনি প্রদান করছেন না পুত্রদের, কিন্তু সমানে অনুরোধ করে যাচ্ছেন এই বিবাহ করার জন্য। আর প্রতিবার তিনি এমন বলেন, প্রতিবার তাঁর পুত্ররা বলেন, তাঁরা এই বিবাহে আপত্তি জানাচ্ছেন না, কিন্তু এখন তাঁদের কাছে প্রাথমিকতা, তাঁদের মাতাকে জানা। তাঁরা তাঁদের মাতাকে লেশমাত্রও জানেন না। তাই তাঁরা তাঁদের মাতাকে জানতে চান।

মাতা সর্বাম্বা এই কথাতে হেসে বললেন, "বেশ পুত্র, তোমরা ভ্রমণে যাও। ভ্রমণের উপরান্তে মনিপুরে স্থিত বলদম্ভ, উপপতি এবং আবর্তের সম্মুখে যাবে, এবং তাঁদেরকে যুদ্ধে আবাহন করে, দমন করবে। এই কর্ম করার কালে, তোমরা তোমাদের মাতাকে যতটা জানা তোমাদের সামর্থ্যের মধ্যে পরে, ততটা জেনেই ফেলবে। তাই এই কর্মের উপরান্তে বা মধ্যকালে তোমরা চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে বিবাহ করবে"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ সেই কথাতে সম্মতি প্রদান করলে, তাঁরা সেই যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেবার জন্য প্রস্তুত হতে গেলেন। অখণ্ড সেই সময়ে আপত্তি জানিয়ে সর্বাম্বাকে বললেন, "সর্বা, বলদম্ভরা তোমার তপস্যা করছে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ত্যাগ করে তোমার তপস্যা করছে। তুমি কে তার টের পাচ্ছনা!"

মাতা সর্বাম্বা যেন বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন কবে অখণ্ড এই কথা তুলবেন। তিনি গাম্ভীর্য ধারণ করে উত্তর দিলেন, "তপস্যা কাকে বলে? একাসনে স্থিত থেকে জপ করাকে? ... হয়তো আপনার কাছে তপস্যার ব্যাখ্যা এমনই, কারণ এই নিরন্তর জপ আপনার প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত, আর আপনার নিজের প্রতিষ্ঠা নিয়ে অত্যন্ত গভীর ভাবে মাথাব্যাথা। ... না আমার প্রতিষ্ঠা নিয়ে মাথাব্যাথা আছে, আর না একাসনে স্থিত থেকে আমার নাম জপ করাকে আমি তপস্যা বলি। ...

তাই আপনার দৃষ্টিতে বলদম্ভরা তপস্যা করছে, আমার দৃষ্টিতে তারা নিজের সাথে নিজেরাই প্রতারণা করছে”।

অখণ্ড পুনরায় বললেন, “দেবী, আপনি নিয়মে বাঁধা। আপনাকে যেতেই হবে”।

মাতা সর্বাম্বাকে এমন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কেউ দেখেননি এঁর আগে। তিনি এমনই ক্রুদ্ধ আস্ফালন করলেন যে, সম্পূর্ণ আজ্ঞাচক্র নয়, সমস্ত সুষুম্নাসহ, ব্রহ্মসনাতনের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আন্দোলিত হয়ে উঠলো। মাতার আস্ফালনে সকলে ভূপতিত হলো, একদিকে দেবী কল্পনারাও, আর আজ্ঞাতে স্বয়ং অখণ্ডও। মাতা গর্জন করে উঠলেন, “আমি কনো নিয়মে বাঁধা নই। এক ও একমাত্র প্রেমেই আমি বাঁধা, একমাত্র সমর্পণেই আমি বাঁধা। যে বা যারা যত তুচ্ছ ভাবেই হোক, নিজের সর্বস্ব আমাতে অর্পণ করে দেবে, নিজেদের ভূত, নিজেদের কল্পনা, চিন্তা, ইচ্ছা, অহং সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেবে, এক আমি তাঁর কাছেই বাঁধা, আর কনো নিয়মে আমি বাঁধা না তো কনোদিন ছিলাম আর না কনোদিনও থাকবো”।

মাতার গর্জনে অখণ্ড সহ সকলে হতচকিত হয়ে গেলে, মাতা পুনরায় বললেন, “ত্রিদেবের নিজেদের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রিয়, নিজেদের নামগান, খ্যাতি প্রসিদ্ধি, ইত্যাদিতে তাঁরা মোহগ্রস্ত। (স্বর কমিয়ে অতি গভীর স্বরে) কিন্তু না আমি ত্রিদেব, আর না আমি ত্রিদেবের অধীনে স্থিত। ... তাই ত্রিদেব নিজেদের মান, প্রতিষ্ঠা, আর নিজেদের প্রতি বিশ্বাসকে সকলের কাছে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই তুচ্ছত্যাগকে কেন্দ্র করে বিধিবিধানের রচনা করেছেন, আর তা তাঁরা মেনে চলেন। না আমি এই সমূহ নিয়মের রচনা করেছি, আর না আমি এই সমূহ নিয়ম মেনে চলি।

যে যতক্ষণ কর্ম করেন, সে ততক্ষণ আমার মার্গদর্শন লাভ করে; আর যে সেই কর্ম করার কালে নিজের ইচ্ছা, চিন্তা, অহং ও কল্পনাকে আমার কাছে অর্পণ করে কর্ম করেন, তিনিই আমার মার্গদর্শনকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, আর এই নিয়মে স্বয়ং ত্রিদেবও বাঁধা, কারণ এটিই নিয়তির নিয়ম। আর একেই আমি তপস্যা বলি। ছেড়েছে আপনার বলদম্ভ, আবর্ত, বা উপপতি নিজেদের কল্পনা, ইচ্ছা, অহং ও কল্পনা! ... তাহলে তাঁরা কোথায় তপস্যা করলেন! ... গ্রহণ

করেছেন তাঁরা সমস্ত কল্পনা, ইচ্ছা, চিন্তা, অহং ত্যাগ করে, আমার প্রদত্ত মার্গদর্শন, আর সেই মার্গদর্শন অনুসারে কর্মভার! ... তাহলে কোথায় তাঁরা তপস্যা করেছেন!

অখণ্ড, তাদের করা ব্রতাচার তোমার কাছে তপস্যা মনে হতে পারে, কিন্তু যা তোমার কাছে তপস্যা মনে হচ্ছে, তা নিয়তির কাছে তপস্যা হতে বাধ্য নয়। নিয়তির কাছে তপস্যা করেছে ঋপু আর ভাঞ্চ। আর তাই তাঁরা নিয়তির তপস্যার ফল লাভ করেছে। অন্যরাও যখন করবে, তারাও সেই সমান ফল লাভ করবে। ... কিন্তু যারা নিয়তির তপস্যা করেনি, তারা নিয়তির থেকে তপস্যাপূর্তির ফল লাভ করার অযোগ্য।

আর অবশেষ কথা, আমার জগতে কনো প্রতিষ্ঠা নেই, আর থাকলেও আমি তাকে তোয়াক্কা করিনা, কারণ সন্তানের জন্য আমি জগন্মাতা, আর সন্তান ছাড়াও আমি নিয়তি, আমিই ব্রহ্ম, আমিই সত্য সনাতন, এবং সর্বস্ব কিছু। আপনার মত আমার কনো বাসনা নেই যে সন্তান আমাকে মানুক আর না মানুক, আমাকে বিশ্বাস করুক। এমন বিশ্বাসের আমার কাছে কনো মূল্য নেই। যেই বিশ্বাস করে নিজেকে সমর্পণই করা সম্ভব নয়, নিজের ইচ্ছা, চিন্তা বা কল্পনাকে বিসর্জনই দেওয়া যায়না, সেই বিশ্বাসের থেকে আমার কাছে অবিশ্বাসই অধিক প্রিয়। তাই এই কথা আমাকে বলতে আসবেন না যে, এই জপাদিনাট্যে আমি সারা না দিলে, আমার প্রসিদ্ধির নাশ হবে, আমার প্রতি বিশ্বাসের নাশ হবে।

যদি আপনার জানা না থাকে, তাই আরো একবার বলে দিই আপনাকে, আমার প্রসিদ্ধির প্রয়োজন নেই, আমার বিশ্বাসেরও প্রয়োজন নেই, কারণ আমি স্বয়ং প্রসিদ্ধি, আমার কৃপাতেই প্রসিদ্ধি লাভ হয় সকলের। এমনকি তোমাদের ত্রিদেবেরও প্রসিদ্ধি আমারই কৃপাতে সম্ভব হয়েছে। তাই এই তুচ্ছ কথা আমাকে শ্রবণ করাবার ধৃষ্টতা করবে না এর পশ্চাতে কনোদিন। আমার প্রয়োজন প্রেম, আমার প্রয়োজন সমর্পণ। যে আমাকে যখন যখন নিজের সর্বস্ব প্রদান করবে, নিজের অহং অর্থাৎ আমিত্বকেও, নিজের চিন্তাকেও, নিজের কল্পনাকেও, আর নিজের সমস্ত ইচ্ছাকেও, আমার কাছে এক ও একমাত্র সেই তপস্বী, অন্য কেউ নয়”।

অখণ্ড নিজের ভুল বুঝতে পারলেন না ঠিক করে, তবে এটুকু বুঝে গেছেন যে তিনি অনধিকার অধিকার স্থাপন করতে গেছিলেন। নিয়তির উপর তাঁর অর্থাৎ ত্রিদেবের কারুর কনো অধিকারই নেই। যেই নিয়তির হাতের পুতুল ত্রিদেব, সেই নিয়তির উপর ত্রিদেবের সৃষ্ট নিয়ম লাগু করতে গেছিলেন তিনি। অন্য কিছু বুঝলেন না হয়তো, কিন্তু দুটি জিনিস অখণ্ড স্পষ্ট বুঝে গেলেন। প্রথমত সর্বাম্বা এবার পূর্ণরূপে স্থিতা, তাই ত্রিদেবের তাঁর উপর কনো প্রভাবই চলবে না। আর দ্বিতীয়ত এটি বুঝলেন যে জগন্মাতা কেবলই প্রেম ও সমর্পণ বোঝেন, অন্য কিছুর কনো দাম নেই তাঁর কাছে। না দাম আছে আচারের বা বিচারের, না দাম আছে জপের বা পুণ্যের, আর না দাম আছে নাম যশ প্রতিষ্ঠা বিশ্বাসের। ... একমাত্র যদি কেউ নিজেকে সার্বিক ভাবে তাঁর কাছে অর্পণ করতে পারে, তিনিই নিয়তির কাছে প্রিয়, যেমন ঋপু, অন্য সকলে তাঁর কাছে সন্তান, কিন্তু বিশেষ ভাবে কেউ প্রিয় পাত্র নন।

তাও অখণ্ড একটিবার শেষ প্রয়াস করে দেখতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, "কিন্তু সর্বা তুমি জগন্মাতা। জগন্মাতার কি কনো দায় নেই!"

সর্বাম্বা ক্রুদ্ধ আস্ফালনে এবার নিজের শ্রীমুখ অখণ্ডের দিকে ঘোরালে, অখণ্ডের যেন মনে হলো এই ক্ষণে তিনি ভস্ম হয়ে যাবেন। সর্বাম্বা উত্তরে বললেন, "দায় আছে বলেই, যে মানে আর যে মানেনা, সকলকে আমি মার্গদর্শন প্রদান করতে থাকি। ... এটিই আমার জগন্মাতা হবার দায় পালন। যে বা যারা যখন যখন নিজের ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা, অহংকে ত্যাগ করবে, সে তৎক্ষণাৎই আমার মার্গদর্শনকে দেখতে পাবেন, কারণ আমিই প্রকৃতি বেশে, কালের বেশে সকলের গুরু হয়ে স্থিতা, এবং যখন সে আমার দিকে না তাকিয়ে নিজের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখনও আমি তাঁদেরকে মার্গদর্শন করতেই থাকি।

এতো গেল আপনার ভাষায়, আমার জগন্মাতা হবার দায়, যদিও আমি এই সমস্ত কিছু দায় রূপে পালন করিনা। আমি আমার প্রতিটি সন্তানকে স্নেহ করি, আর তাই এইটি আমার প্রতিটি সন্তানকে প্রদান করা স্নেহ। ... যদি দায় বলেন, তবে আমার একটি মাত্র দায় আছে, আর তা হলো আমি স্বয়ং সত্য, আর সেই সত্য হবার দায়। আর সেই সত্য হবার দায়রূপে, যে যে

যখন যখন নিজের অনিত্য তনুতে বিরাজ করে, সেই তনুর নামযশের চিন্তা করে; যে যে যখন যখন তাঁদের কাল্পনিক তনুতে বিরাজ করে সেই তনুকে অক্ষয় করার প্রয়াস করে; সেই তনুর প্রতিষ্ঠাকে, সেই তনুর মধ্যে স্থিত অখণ্ডকে অন্য তনুতে স্থিত অখণ্ডদের উপর জোর করে স্থাপন করার প্রয়াস করে, আমি তক্ষণই সেই তনুতে স্থিত জীবকে সম্যক ভাবে পরিত্যাগ করি। আর আমার তাঁকে পরিত্যাগ করার মর্ম বোঝেন নিশ্চয়ই আপনি! আমি যাকে যেই মুহূর্তে পরিত্যাগ করি, সেই মুহূর্ত থেকে সে পিশাচ যোনিতে গত হয়, এবং তাঁর সমস্ত প্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়। ... এই দায় আমি পালন করি কারণ আমি মাতা এবং সত্য একাধারে।

মাতা হবার জন্য মার্গভ্রষ্ট সন্তানকে দণ্ড দেওয়া আমার কর্তব্য, এবং সত্য হবার কারণে, যে যে যখন যখন অসত্য অর্থাৎ নিজের তনু, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জা, ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা ও অহং নিয়ে উলমালা থাকতে থাকতে চরমে যাত্রা করে, তার প্রতি আমাকে এই দণ্ড প্রদান করতে হয়, যাতে সে সত্যে স্থিত না হতে পারলেও, সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পরে। শূন্যে স্থিত না হতে পারলেও, এমন স্থানে পতিত না হয়ে যায় সে যেখানে স্থিত হলে শূন্যের ধারণা করাও অসম্ভব হয়ে যায়, এটি দেখা আমার মা রূপে এবং সত্যরূপে দায়। এটিই আমার দায়, আর এই দায় আমাকে আমার হৃদয়ে পাথর রেখেও করতে হয়, ঠিক যেমন করে একটি মাতাকে নিজের হৃদয়ে পাথর রেখেও নিজের ভ্রষ্ট সন্তানকে শাসন করতে হয়”।

অখণ্ড আর কিছু বললেন না। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, ত্রিদেবরূপে অবস্থান করে, তিনি একাধিক গরমিল করে ফেলেছেন। তিনি নামজপকেই তপস্যা আখ্যা দিয়ে, প্রকৃতির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার শিক্ষা দিয়ে ফেলেছেন, যার ব্যবহার করে প্রায়শই মনুষ্য ভণ্ড হয়ে ওঠেন; তিনি আচারবিচার, পাপপুণ্যকে প্রাধান্য দেবার ফলে, প্রকৃত পবিত্রতা ধারণ করার অভ্যাস থেকেই মানুষকে অপসারিত করে ফেলেছেন; তিনি অযোগ্যের নামজপকেও সম্মান দিতে গিয়ে, অসুরদের নৃপতি করে রেখে দিয়েছেন জগতে, যারা কেবলই নিজের নামজপ করতে বাধ্য করেন সকলকে।

আরো অনেক কিছুই তিনি করেছেন, যার ধারণাও তিনি করতে পারছেন না এক্ষণে। তাই তিনি মাতা সর্বাম্বার উদ্দেশ্যে বললেন, "দেবী, আমার আচরণে আমি লজ্জিত। আপনিও জানেন যে আমি এখনও নিজের কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার উপর বশ্যতা স্থাপন করতে পারিনি। আর হয়তো তাই আমি এমন আচরণ করেই ফেলছি, যা আমি ত্রিদেব হয়ে প্রায়শই করে থাকি। ... কিন্তু হে মাতা, আমি আমার সমস্ত করা ভ্রান্তি আর তার পরিণামকে জানতে চাই। ...

দেবী, এই ব্রহ্মাণ্ডে, অর্থাৎ ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে সেই সমস্ত কিছু কনো প্রভাব ফেলবে না, আমি তা জানি, কারণ এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার কাছে সমর্পিত। ... কিন্তু আমি তা শিক্ষা রূপে আপনার থেকে গ্রহণ করে, ব্রহ্মসনাতনের সংস্পর্শে যেই যেই ব্রহ্মাণ্ড উপস্থিত হবে, তাদেরকে শিক্ষা দিতে চাই। তাই কৃপা করে মাতা আমাকে সেই শিক্ষা প্রদান করুন। করুণা করুন আমার উপর। আমিই আপনার প্রকৃত সন্তান, সন্তান ভুল করেছে, আপনি তাঁকে তিরস্কার করে শাসনও যেমন করলেন, তেমন তাঁকে ভ্রষ্ট হতে না দিয়ে স্নেহও প্রদান করলেন। ... এবার কৃপা করে, এই সন্তানের প্রতি করুণা করে, তাঁকে সেই শিক্ষা প্রদান করুন, যাতে সে এই ভুল আর কনোদিনও না করে। আমাকে আমার ভ্রান্তিময় কীর্তি দেখিয়ে দিন, আর তার পরিণাম দেখিয়ে আমাকে আমার ভ্রান্তির সাথে মুখোমুখি স্থিত করে দিন"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "কাছে এসো। ... (সকলের উদ্দেশ্যে) তোমরাও এসো। ... অখণ্ড, আমি এখন যা বলবো, তা একপ্রকার তোমার নিন্দাই হবে। তুমি কি চাও এঁরাও সেই কথা শুনুক?"

অখণ্ড বললেন, "হ্যাঁ মা, আমি চাই এঁরা সমস্তটা শুনুক আর জানুক। ব্রহ্মসনাতনের সংস্পর্শে যারা আসবে, তারা সরাসরি আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কোথায় করবে? তাঁরা তো এঁদের সাথেই প্রথম সম্পর্ক স্থাপন করবে, তাই এঁদেরও জানা উচিত আমি কি কি ভ্রান্তি করেছি, আর তার পরিণাম কতটা ভয়ানক হয়েছে জগতের প্রতি, সমস্ত বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “বেশ, তাই হবে। এসো, তোমরা সকলে আমার সম্মুখে বস। ... চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি, তোমরা আমার বামদিকে এসো। ক্ষিতীশ, সতিশ আর ঋপু, তোমরা আমার দক্ষিণ দিকে এসে বসো। অখণ্ড তুমি আমার ঠিক সম্মুখে বসো। দিদি, মা, তোমরা অখণ্ডের দক্ষিণ দিকে বসো। বাবা, বোধি, তোমরা অখণ্ডের বাম দিকে বসো”।

সকলে নিজের নিজের স্থানে বসলে, মাতা বলতে শুরু করলেন, “অখণ্ড, তোমার করা প্রথম ভ্রান্তি হলো পরিচয় দান। প্রাচীনকালে বৌদ্ধদের আমি শিক্ষা প্রদান করেছিলাম, ত্রিগুণের ব্যাপারে, এবং প্রকৃতির ব্যাপারে। আমি তাঁদেরকে সত্য দর্শন করিয়ে, এও বলেছিলাম যে আমি প্রকৃতি কারণ তাঁদের আত্ম ত্রিগুণ ধারণ করে আমাকে প্রকৃতি রূপে কল্পনা করেছে, বাস্তবে আমি শূন্য, আর তাই আমার কনো লিঙ্গই সম্ভব নয়। কিন্তু যখন আর্যরা বৌদ্ধদের থেকে সেই জ্ঞান তস্করি করলো, এবং নিজেদের জ্ঞানী রূপে স্থাপন করলো, তখন যখন তাঁরা ত্রিদেব ও ত্রিগুণকে বিভক্ত করে কাহানীর রচনা করছিল, তাও তাঁদেরকে বাঁধা দাও নি কেন? যদি তাঁদেরকে বাঁধা দিতে, তাহলে আজকে ত্রিগুণ আর ত্রিদেবকে মানুষ আলাদা আলদা মনে করতেন না, আর এমন বিভ্রান্তিরও রচনা হতো না।

হতে পারে, তোমরা ত্রিগুণ থেকে ত্রিদেব হয়ে উঠে, তাচ্ছিল্য থেকে পূজনীয় হয়ে উঠছিলে, তাই কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা তোমাকে বশীকরণ করে নিয়ে, তোমার মধ্যে অহং জাগ্রত করেছিল, তাই না!... তা যাই হোক, সেটি না বললে না, নিজেদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির বিচার করে, কিন্তু যখন পৃথিবীর পঞ্চভূত উপাদানকেই নিজেদের পঞ্চভূত মেনে নিচ্ছিল মনুষ্য, তখনও তাঁদেরকে কেন বাঁধা দিলে না!

যদি তখন তাঁদেরকে সত্য বলে দিতে যে, পৃথিবীই তোমার করা প্রথম কল্পনা, যেই কল্পনার আধারে তুমি একের পর এক যোনির কল্পনা করেছ, আর সেই যোনিতে নিজেকে স্থাপিত করে নিজের সত্য খুঁজতে থেকেছ, তোমার কি খুব অসম্মান হয়ে যেত! বোধহয় তাই হতো না! ... যেই ত্রিদেব সর্বজ্ঞাতা হয়ে উপনীত, তাঁরা নিজেদের প্রকৃত পরিচয়ই জানেন না, কি করে সেই

সত্যপরিচয় থেকে ত্রিদেব হলেন, তাই জানেন না, এই কথা সকলকে জানালে, মনে হয় সম্মান হানি হতো খুব। তাই তো!

কিন্তু দেখো, এই সত্য বলতে পারো নি বলে, তোমরা মনুষ্যকে সাহস করে এও বলতে পারো নি যে, পৃথিবীর পঞ্চভূতকে তাঁরা ধারণ করে রাখলে, আকাশতত্ত্ব মন হয়ে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান, জলতত্ত্ব বুদ্ধি হয়ে তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান, অগ্নিতত্ত্ব উর্জা হয়ে তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান, বায়ুতত্ত্ব প্রাণ হয়ে তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান, আর মৃত্তিকা তত্ত্ব তাঁদের তনু হয়ে বিদ্যমান। ... আর তা বলতে না পারার ফল কি হলো? মনুষ্য নিজেদের পঞ্চভূতকে করায়ত্ত না করে, পৃথিবীর পঞ্চভূতকে পরাভূত করতে চলে গেল, আর তার ফল দেখো, আজ মনুষ্য যোনি অবলুপ্তির সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এর ভবিষ্যৎ পরিণাম! ব্রহ্মসনাতনকে যতক্ষণ না মনুষ্যকুল জানছে, ততক্ষণই আমি অপেক্ষা করবো, আর তারপর আমি এঁদেরকে অবলুপ্ত করে দেব।

কিন্তু কথাটা এই যে, তুমি এমনটা করলে না কেন? সত্য সম্বন্ধে মানুষকে জানালে না কেন? নিজেদের মন বুদ্ধি থেকে যদি কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকে নির্গত করে দিতো মানুষ, তাহলে তোমার ত্রিদেবের সত্য জেনে ফেলতো! আর তা জেনে ফেললে, তোমার সম্মানীয় আসন চলে যেত? এর অর্থ কি ধরবো আমি অখণ্ড? তোমার উদ্দেশ্য রূপে কি এই প্রকাশ্য নয় যে, তুমি মনুষ্যকে মুক্ত করতেই চাওনি! আর চেয়ে এসেছিলে যাতে তাঁরা আজীবন যোনির আবর্তনে ভ্রম্যমান থেকে, তোমার ত্রিরূপের আরাধনা করে যাক!

এই কি তাঁদের কল্যাণ কামনা! ... অসত্যের মধ্যে আবর্তনরত করিয়ে রেখে, বারংবার তোমাদের নামজপ করিয়ে তপস্যা করানো, সেই তপস্যার ফলস্বরূপ নিজের প্রতিষ্ঠা করা, আর সেই নামজপ করে তোমার প্রসিদ্ধি ঘটানোর পুরস্কার রূপে, তাঁদেরকে মান, সম্মান, আর দেহসুখ প্রদান করা! ... এই তোমার কল্যাণ চিন্তা অখণ্ড! সত্যই কি একে কল্যাণ চিন্তা বলা যায়! যদি তাই হয়, তাহলে এঁর মাধ্যমে কার কল্যাণ সাধিত হয়েছে! ... অন্যদের ছেড়ে দাও, নিজের কল্যাণ সাধিত করতে পেরেছ! নিজের অস্তিত্বের কারণ খুঁজে পেয়েছ!”

অখণ্ড লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে রাখলে, মাতা আবার বলতে থাকলেন, “অখণ্ড নিজেকে নিজে বাধিত করে রেখেছিলে মনুষ্যদের মধ্যে, নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে অক্ষত রাখতে, আর তার ফল তো দেখতেই পেলে। ধার্মিক একটিও জন্ম নেয়নি এই প্রক্রিয়ায়, পূর্বেও পাষণ্ডই জন্ম নিয়েছিল, আর এখনও। এখন তো তোমার দেখানো ধর্মের নাম করেই তারকাসুরের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। যেমন তারকাসুর সমস্ত কিছুতে নিজের নাম স্থাপন করে, সমস্ত কিছুর অধিপতি রূপে নিজেকে ঘোষণা করতে সচেষ্ট ছিল, সেই মানসিকতার পুনরাবিভাব ঘটে গেছে।

আর কেবল তারকা একা নয়, তাঁর সঙ্গে তাঁর সমস্ত মন্ত্রীর দল এমনকি সেনার দলও যেন একত্রিত হয়ে গেছে, দেখেছ তুমি! সর্বত্র কেবল ভণ্ডামি আর ভণ্ডামি। আর সেই সমস্ত ভণ্ডামি তোমারই ত্রিদেবের কনো না কনো রূপকে ঘিরে হচ্ছে। হয় ত্রিদেব, নয় ত্রিদেবের কনো অবতারমূর্তিকে ঘিরেই চলছে, অথচ তুমি একটি কিছু করছও না বলছও না।

অখণ্ড, ভণ্ডামি যেকোনো কারুকে ঘিরেই হতে পারে। আমাকে ঘিরেও ভণ্ডামি হয়েছে বহুবার। আমি কিন্তু তাদের একটিরও দায় এরাই নি। যখন যখন তন্ত্রের নাম করে ভণ্ডামি হয়েছে, তখন তখন আমি অবতার নিয়েছি। কখনো মার্কণ্ড হয়েছি, তো কখনো নিমাই হয়েছি, আর তান্ত্রিকদের এই দুরাচারের থেকে জনমানবকে রক্ষা করেছি। কিন্তু যখন তোমার ত্রিদেবের কনো রূপ বা তাঁদের অবতারদের নিয়ে ভণ্ডামি হচ্ছে, তখন তুমি কেন কিছু করছো না! কেন দায় এড়িয়ে যাচ্ছ! তবে কি ধরে নিতে হবে যে সেই ভণ্ডামিতে তোমার সায় আছে!

হতেই পারে, তোমার সায় আছে তাতে, কারণ যাই হোক আর তাই হোক, নাম তো তোমারই হচ্ছে। কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি অখণ্ড, বাকি সমস্ত যোনির নির্মাণ তুমি করলেও, এই মানব যোনির নির্মাণ আমি করেছি। তাই অন্তিম দায় এই মানব যোনির একমাত্র আমার। আর তাই, আমি তোমাকে সময় দিলাম যতক্ষণ না ব্রহ্মসনাতনের ব্যাপারে জগত জেনে না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত।

সেই পরিচয় প্রদান করাও ওত সহজ নয়। যেই মানব সমাজ তোমার ত্রিদেবের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে চরম ভণ্ডামিকেই ভক্তি জ্ঞান করে বসে আছে। যেই ভণ্ডরা পূজা আচার করেই নিজেদের কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে, আর তাঁদেরকেই তুমি তপস্বী, ভক্ত বা সাধক ইত্যাদি নামে ভূষিত করো, তাঁদের পক্ষে আমাকে, অর্থাৎ পরানিয়তিকে ধারণা করা কি করে সহজ হতে পারে! ... সেই কারণে আমি একের পর, আমার ত্রিদেবীরূপকে অবতরণ করাবো, এবং তাঁদেরকে দিয়ে আমি ব্রহ্মসনাতনের পূর্ণসমর্পণের বার্তা ও বিজ্ঞান জগতে প্রসারিত করবো।

কিন্তু সেই প্রসারের মধ্যেও যদি তুমি মনুষ্যকে ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা ও অহংএর পরিচর্যা করানো থেকে প্রতিহত করতে না পারো, তাহলে আমি এই মানবযোনিকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। এবার তুমি কি করে মানবকে ইচ্ছার, কল্পনার, চিন্তার ও অহংএর তোষামোদি করা থেকে আটকাবে, সেটা তোমার ব্যাপার। তাদের সমাজে প্রলয় এনে না যুদ্ধ এনে, না কি ভাবে কি করবে, সেটা সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সমস্ত ধারণ করা উপায়তে শক্তি, শ্রী ও বিদ্যাকে স্থাপন করে, তাকে সার্থক করে দেব।

কিন্তু যেই সময়কাল বললাম, তার মধ্যেও যদি সক্ষম না হও, মানুষকে সত্যের পথে চালনা করতে, ভণ্ডামি ছেড়ে সমর্পণের পথে চালিত করতে, তাহলে আমি এই যোনির নাশ নিজ হাতে করবো, যা এখনো পর্যন্ত আমি একটিবারও করিনি। যদি তখনও দেখি যে মানুষের ইচ্ছাপূর্তি করার জন্য নামজপ করাকেই ভক্তি বলা হচ্ছে; যদি দেখি যে পঞ্চভূত অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জা ও তনুকে ছেড়ে রেখে, পৃথিবীর আকাশ, জল, মৃত্তিকা ধাতু, পবন ও গর্ভের অগ্নিকে নিয়ন্ত্রণ করে সিদ্ধি অর্জন করাকেই সাধনা বলা হচ্ছে; বা যদি দেখি যে নিজের নিজের কল্পনাকে সাকার করার প্রয়াসকেই তপস্যা বলা হচ্ছে, তাহলে আমি আর তোমাকে একদণ্ডও সময় দেবো না।

আমি স্বয়ং এই যোনির সমূলে বিনাশ করবো, আর আমার বিনাশ সম্বন্ধে তোমার ধারণা না থাকলে আর কারুর নেই। আমার বিনাশের অর্থ হলো, আর কনো প্রয়াস করে, ইতিহাসের

পাতা থেকেও তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবেনা। এবার তুমি কি ভাবে কি করবে, তা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি, ব্রহ্মসনাতনের পূর্ণসমর্পণ ও শূন্যতার অনুভবকে আমি আমার ত্রিদেবীর অবতার দ্বারা জগতে প্রসার করে দেব। কিন্তু যদি তুমি ক্রিয়া করো, তবেই মানুষ সেই পথকে গ্রহণ করবে, কারণ তুমিই সকল মানুষের ও সমস্ত জীবের আত্ম।

সেই পদ্ধতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে, তুমি সহস্রবার পূর্ণপুরুষ অবতার গ্রহণ করবে, না বারংবার প্রলয় আনবে, নাকি ভয়াবহ অগ্নি দ্বারা মনুষ্যদের নির্মিত ভণ্ড ও যান্ত্রিক সমাজকে বারংবার ভস্মীভূত করবে, তা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার। আমি কেবল অন্তিম পরিণাম তোমাকে বলে দিলাম অখণ্ড"।

মাতা নিজের কথা সমাপ্ত করলে, এক প্রশান্তি সমস্ত আজ্ঞাতে ছেয়ে গেল। সকলে যেন ভবিষ্যতের বীভৎসতার ধ্যান করতে শুরু করে দিলেন। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, ঋপু। তিনি বললেন, "মাতা, আমার জন্য কি আদেশ? আমি কি কনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে? আমি কি তোমার সৃজন, সত্যকে সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করার সামর্থ্য যুক্ত করে যেই একটিমাত্র যোনির নির্মাণ করেছিলে তুমি, সেই মনুষ্যযোনির রক্ষণের ভূমিকায় কনো ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি?"

মাতা উত্তর দিতে যাবেন, সেই সময়ে দেবী মানসী বললেন, "হ্যাঁ সর্বা, আমাদেরকেও নির্দেশ দাও, আমরাই বা কি করতে পারি, কি ভাবে মনুষ্যযোনিকে রক্ষা করতে পারি?" একে একে সকলে দেবী মানসীর কথাকে সমর্থন করলে, মাতা বললেন, "তোমরা সকলে ব্রহ্মসনাতনের কন্যার বেশে, এবং তাঁর শিষ্যাদের বেশে আমি যেই ত্রিদেবীদের অবতরণ করাবো, তাঁদের পঞ্চভূত, বিচার, বিবেক, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি হয়ে বিরাজ করবে। আর ঋপু, তুমিই হবে আমার সেই তিনটি অংশ অবতারের আত্ম, আর তা হয়ে তুমি তাঁদের কর্তব্য কি হবে, তা ব্যক্ত করবে।

পুত্র ঋপু একটি জিনিস স্মরণ রেখো, যখন যখন আমি একটি নতুন দেহ ধারণ করে অবতরণ করবো, আমি কিন্তু শূন্য স্মৃতি ও শূন্য সংস্কারকে নিয়েই জন্ম নেব। তাই সেই আমাকে আমার

লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া তোমারই কর্তব্য হবে। আর সেই কাজে, এঁরা সকলে তোমার সহায়ক হবে।

(সতিশ ও ক্ষিতীশের উদ্দেশ্যে) আর পুত্র তোমাদের জন্য এই মুহূর্তের আদেশ এই যে তোমরা আজ্ঞা থেকে বিশুদ্ধ হয়ে মনিপুরে যাত্রা করো। আশা করি, কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা ততক্ষণে বলদম্ভদের তাঁদের ভণ্ডামো মিশ্রিত তপস্যার অন্ত করে, পুনরায় তাঁদেরকে শক্তিশালী করে তুলবেন। তাই তোমাদের যুদ্ধ সহজ হবেনা। সহস্র প্রকার ছলনা, সহস্র প্রকার প্ররোচনা, সহস্র প্রকার প্রতারণার সম্মুখীন হয়ে তোমাদের হত্যা করতে হবে, ত্রিঅহং পুত্রদের। ... তাই বিশুদ্ধকে সার্বিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করো। সেখানে যত সুন্দর ভাবে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করবে, ততটাই সুন্দর ভাবে নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হবে তোমরা। আর সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে, ক্ষিতীশ তুমি চেতনাকে, আর সতিশ তুমি অন্তর্দৃষ্টিকে বিবাহ করবে"।

এই কথার সমাপ্তি করলে, ক্ষিতীশ ও সতিশ মাতাপিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করে, এবং অন্য সকলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে, বিশুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আর সেই সময়ে দেবী কল্পনা, তাঁর দুই ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে বলদম্ভদের সমূহে উপস্থিত হয়ে, তিরস্কারের সুরে বললেন, "মুর্খামি বন্ধ করো পুত্ররা। তোমরা অযথাই নিজেদের উর্জাক্ষয় করছো। এই সময়ে তোমাদের নিজেদের উর্জাকে পুনরায় সঞ্চিত করে, সর্বাম্বাপুত্রদের সম্মুখীন হবার উপযুক্ত করার কথা, কিন্তু তোমরা কি করছো! এই সমস্ত নামজপ করছো?"

বলদম্ভ বললেন, "মাতা সর্বাম্বা পুত্রদের প্রতাপের কথা আপনারা কিচ্ছু জানেন না! আমরা নিজের কানে শুনে এসেছি, ভাঞ্চ আর হিম্লহুকে তাঁরাই হত্যা করেছে। বুঝতে পারছেন, তাঁরা কি পরিমাণ শক্তিশালী!"

দেবী চিন্তা ক্রুদ্ধ হয়ে আস্ফালন করার মত করে বললেন, "মূর্খ তোমরা। সর্বাম্বা কখনোই অখণ্ডের দেওয়া বরদানের মান ভঙ্গ করবে না। তাঁর পুত্ররা এই ভ্রমে ছিলেন যে তাঁরাই ভাঞ্চ আর হিম্লহুদের হত্যা করেছেন, আর সেই ভ্রমের উদ্দেশ্য হলো তোমাদের ভ্রমিত করা, যা

তোমরা হয়ে বসে রয়েছ। তারা সহজ সরল, আর ভ্রমের মধ্যে থাকার কারণে তাঁরা অজ্ঞানীও। আর তাই তো তোমরা সহজেই তাঁদেরকে পরাস্ত করতে পারবে। এসো আমাদের সাথে, আমরা তোমাদেরকে সমস্ত ছলা কলা ও প্রতারণার কৌশলে সুশিক্ষিত করছি"।

উপপতি বললেন, "না মা, আমরা কিছুতেই ওই দুই পুত্রের থেকে নিস্তার পাবো না। আপনিই তো বললেন, সর্বাম্বা অখণ্ডের দেওয়া বরদানের কিছুতেই বিরোধিতা করবে না। ... তাহলেই ভেবে দেখুন মাতা, আমাদের নিধন অই দুই বালকই করবে। আর আমরা দেখেও এসেছি, তাঁদের কাছে হেন বাণ নেই, যা নেই। মহাশক্তিধর তাঁরা। তাই আমাদেরকে সর্বাম্বার অভয়দান লাভ করতেই হবে, নাহলে আমরা তাঁর পুত্রদের থেকে কিছুতেই নিজেদের সুরক্ষা করতে পারবো না"।

দেবী ইচ্ছা বললেন, "আর তোমাদের মনে হয় যে তোমরা এমন অনাহারে, অনিদ্রায় বসে থেকে, তাঁর নামজপ করলেই, তিনি এসে তোমাদের অভয়দান করে দেবেন যে তোমাদের তাঁর সন্তানদের থেকে কনো ভয় থাকবেনা! ... এক মাতা কখনো নিজের সন্তানকে এমন ভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে! ... মূর্খের মত চিন্তা তোমাদের!"

আবর্ত বললেন, "কিন্তু তা তো তিনি করতে বাধ্য! ত্রিদেবের নির্মাণ করা নিয়ম, মনসা যাই থাকুক, যদি নিজের প্রাণকে নাশ করার অবস্থায় নিয়ে গিয়ে নামজপ করা হয়, তবে সেই তপস্যার পূর্তিকে মান্যতা দিতেই হবে, আর বরদানও প্রদান করতেই হবে। তাই ইচ্ছা না থাকলেও, সর্বাম্বাকে তো আস্তেই হবে"।

দেবী কল্পনা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "মূর্খ তোমরা। সর্বাম্বা ত্রিদেবী নন, যে ত্রিদেবের নিয়মে তিনি নিজেকে বেঁধে রাখবেন। তিনি সর্বাম্বা। বোঝো এর অর্থ? তিনি স্বয়ং নিয়তি। ত্রিদেবের ধরাছোঁয়ারও অতীত তিনি। আর যিনি ত্রিদেবের ধরাছোঁয়ার অতীত, তিনি ত্রিদেবের নিয়মে কেন নিজেকে বেঁধে রাখবেন?"

বলদম্ভ পুনরায় বললেন, "কিন্তু আপনিই তো বললেন, অখণ্ডের দেওয়া বরদানের মান অবশ্যই সর্বাম্বা রাখবে! ... তাহলে এই নিয়মের উল্লঙ্ঘন কেন করবেন তিনি!"

দেবী কল্পনা নিজের পুত্রদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে, বিরক্তিযুক্ত গম্ভীর নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "ওটা বরদান অর্থাৎ বচন, আর এটা নিয়ম। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো পুত্র। বচনের মান রাখবেন তিনি, আর কেবল অখণ্ড বলে নয়, যদি মানসীও কনো বচন দিতেন, তারও মান রাখতেন তিনি। যদি আমিও কনো বচন দিতাম, তারও মান রাখতেন তিনি। আর সেই কারণেই তিনি জগন্মাতা। তাঁর এই স্বভাবের জন্যই তিনি জগন্মাতা, স্বয়ং অখণ্ডেরও পূজ্য, সকল ভুতের পূজ্য তিনি। এমনকি ঋপুকে আর ভাঞ্চকে কি দেখলে! অসুরকুলে জন্ম নিয়েও তাঁদের কাছে তিনিই পূজ্য।

আর নিয়ম ভিন্ন জিনিস পুত্র। নিয়ম তাঁর উপরই বর্তায়, যারা তাঁদের অধীনে স্থিত বা তাঁদের স্বয়ংএর উপর। আর নিয়তি, অর্থাৎ সর্বাম্বা তাঁদের অধীনে স্থিত নন, বরং তাঁর অধীনে স্থিত অখণ্ড। তাহলে ত্রিদেবের নিয়মে সর্বাম্বা কি করে বাঁধা থাকতে পারে! ... বেশ, নিয়মে না বাঁধা নন, কিন্তু আদর্শকে তো মান্যতা দিতেই পারেন। কিন্তু নিয়তি তোমরা যা করছো, তাকে তপস্যা বলেনই না, বরং এঁকে ভণ্ডামো বলেন"।

দেবী চিন্তা বললেন, "ত্রিদেবের আসনের সাথে একই আসনে সর্বাম্বাকে বসিও না পুত্র। আমরা কে? আমরা ত্রিদেবীরই ছায়ামূর্তি, আর তাই আমাদেরকে ছাড়া ত্রিদেব কনো ব্রহ্মাণ্ড গঠনই করতে পারেনা। আর তাই আমরা তাঁর নির্মিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে রানী বা ত্রিদেবীর আসন ছিনিয়ে নিয়ে অবস্থান করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কনো ব্রহ্মাণ্ডে, স্বয়ং নিয়তি আবির্ভূতা হননি। বুঝতে পারছো, কেন এই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন? কারণ ব্রহ্মসনাতনের সমর্পণ। পুত্র, আমরা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে মহাদেবী হয়ে বিরাজ করি, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে নিয়তির বিস্তারের জন্য এই মনিপুরে এসে লুক্কায়িত হয়ে বসে রয়েছি। কেন? ব্রহ্মসনাতনের সমর্পণের জন্য"।

উপপতি চিন্তিত হয়ে বললেন, “কি এমন সমর্পণ করেছে ব্রহ্মসনাতন যে আপনাদের এমন দশা?”

দেবী ইচ্ছা বললেন, “আমাদেরকে। ... হ্যাঁ পুত্ররা, সে তাঁর সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা স্বয়ং নিয়তির কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অহংকেও সমর্পণ করে দিয়েছে সাখ্যাত পরাপ্রকৃতির কাছে। আমি ইচ্ছা, আমি হলাম শ্রীর ছায়া। ব্যক্তি যা কিছু ইচ্ছা করে এবং অন্য ব্যক্তিদের একই বিষয়ে ইচ্ছাকে বশ করতে পারে, তাই তাঁর সম্পত্তি হয়, তাই তাঁর সামগ্রী হয়, আর আমাকেই সমর্পণ করে দেবার কারণে দেবী শ্রী সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হয়ে গেছে ব্রহ্মসনাতনের মধ্য। দেবী চিন্তা হলেন সরস্বতীর ছায়া। তাঁর সমর্পণের কারণে দেবী সরস্বতী সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হয়ে গেছেন। আর আমাদের দিদি, দেবী কল্পনা হলেন স্বয়ং আদিশক্তির ছায়া, যিনি সত্যকে ভুলিয়ে দেন। আর সেই কল্পনাকেও ত্যাগ করে দেবার কারণে, আদিশক্তিও সম্পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হয়ে গেছেন”।

দেবী চিন্তা বললেন, “আর এই সমস্ত কিছুর পরেও রয়েছেন আমাদের পতি, তোমাদের পিতা অহং। তিনি হলেন সাখ্যাত ত্রিদেবের ভ্রম। সেই ভ্রমকেও সমর্পণ করে দিয়েছে ব্রহ্মসনাতন, আর তাই ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং ত্রিদেব একত্রিত হয়ে গেছেন, ভ্রমে ভ্রমিত হবার প্রয়াস করেও তিনি ভ্রমে মত্ত হতে পারছেন না, কারণ তাঁর সমর্পণ। আর এই সম্যক সমর্পণের কারণে, ত্রিদেবী একাত্ম হয়ে গিয়ে সাখ্যাত নিয়তি বেশ ধারণ করে সর্বাম্বা হয়ে বিরাজ করছেন”।

দেবী কল্পনা বিরক্তি নিয়েই বললেন, “বুঝতে পারলে কিছু! সর্বাম্বাকে তুষ্ট করতে গেলে, তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তাকে ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ আমাদেরকেই ত্যাগ করতে হবে। আমাদের ত্যাগ করেছে বলেই ভাঞ্চ সর্বাম্বার কাছে লীন হতে পেরেছে। আমাদেরকে ত্যাগ করতে পেরেছে বলেই, ঋপু তাঁর তপস্যায় সফল হয়েছে। আর যদি তোমরা তাঁকে তুষ্ট করতে চাও, তাহলে তোমাদেরকেও ত্যাগই করতে হবে আমাদেরকে। ... আর সেই ত্যাগে লেশমাত্রও নাট্য থাকলে হবেনা। কনো ছলনা, কনো চাতুরী, কনো প্রতারণা, কনো কিছু

সর্বাত্মার দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। তাই তোমরা যেই তপস্যা করছো, তার দ্বারা সর্বাত্মাকে তুষ্ট করা অসম্ভব। এবার বুঝতে পেরেছ? এসো আমাদের সাথে, আমরা আমাদের সমস্ত কৌশল তোমাকে শিখিয়ে দেব। দেখো নিশ্চয়ই তোমরা সেই কৌশলের মাধ্যমে, নাদান ও সরল ও অজ্ঞানী সতিশ ক্ষিতীশকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। ... এসো আমাদের সাথে এসো”।

সেই কথা শুনে, বলদম্ভ, উপপতি এবং আবর্ত এবার তাঁদের মাতাদের সাথে গমন করলেন, কৌশললাভের উদ্দেশ্যে। অখণ্ড সেই দৃশ্য নিজের ত্রিনেত্র দ্বারা দেখে আচম্বিত হলেন। একদিকে তাঁর পুত্ররা সজ্জ হচ্ছেন এই ত্রিঅহংপুত্রদের হত্যা করবেন বলে, আর অন্যদিকে বলদম্ভরাও সজ্জ হচ্ছেন, তাঁর পুত্রদের দমন করবেন বলে। আগামী দিনে কি ভয়ানক সংগ্রাম হতে চলেছে, সেই বিচার করে মুহুর্মুহু কম্পমান হয়ে উঠলেন অখণ্ড।

রাজ্য গমন

ক্ষিতীশ ও সতিশ রাজ্যভ্রমণে নির্গত হয়ে যখন বিশুদ্ধে সবে প্রবেশ করবে, তখন একটি পুরুষকে দেখে তাঁরা কিছুটা হতবম্ব হয়ে গিয়ে, একটি বৃক্ষের আড়ালে নিজেদের স্থাপিত করলেন। সেই পুরুষটিকে তাঁরা দেখলেন হন্তদন্ত হয়ে একটি বৃক্ষের মাথায় উঠে বসে রইলেন। তাঁর বয়স এই ৫০ পেরিয়েছে হয়তো। দেখতে সুন্দর, ছিপছিপে দেহের গড়ন, গৌর গাত্রবর্ণ, বেশ দীর্ঘকায় দেয়বিশিষ্ট। মাথার চুলে অল্প অল্প পাক ধরেছে। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ, দূর থেকে দেখে মনে হলো দাড়িতে সামান্য পাক ধরেছে।

খানিক পরে ক্ষিতীশ সতিশ দেখলেন একটি স্ত্রী সেই বৃক্ষের নিকটে এলেন, বেশ কিছুক্ষণ সেই বৃক্ষের আশেপাশে কিছু জিনিস খুঁজলেন, শেষে যা খুঁজছিলেন, তা খুঁজে না পেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। এই স্ত্রীকে দেখলেই বোঝা যায়। যুবতী অবস্থায় তিনি বেশ সুন্দরী দেখতে

ছিলেন। চেহারার লালিমা এখনো আছে। সাদাটে গোলাপি গায়ের রঙ। মুখশ্রী খুবই সুন্দর। মাথার চুলে ইনারও হাল্কা হাল্কা পাক ধরেছে।

স্ত্রীটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে, বৃক্ষের উপরে বসে থাকা পুরুষটি নেমে এলেন। নেমে এসে, একটিবার পশ্চাতের দিকে তাকালেন, আর তারপর এক প্রকার দৌড়ে বিশুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসলেন আড্ডার দিকে। ক্ষিতীশ ও সতিশ সেই দিশাতেই ছিল। তাই তাঁরা এই পুরুষের মার্গ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে পরলেন। ...

ক্ষিতীশ ও সতিশকে দেখে, ভদ্রলোক একমুখ হাস্য প্রদর্শন করে বললেন, “আপনারা মাতা সর্বাম্বার পুত্র, ক্ষিতীশ আর সতিশ না!”

ক্ষিতীশ আর সতিশ গম্ভিইর ভাবে উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে? আপনি কি কনো তস্কর?”

সেই পুরুষ উত্তরে বললেন, “না না, তস্কর কেন হতে যাবো! ... আমি একজন সাধারণ বিভাবসুর প্রজা”।

ক্ষিতীশ প্রশ্ন করলেন, “তাহলে এমন ভাবে পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আর অই ভদ্রমহিলা আপনারই তো সন্ধান করছিলেন মনে হলো। আপনাকে তিনি খুঁজছিলেন কেন?”

ভদ্রলোক হেসে বললেন, “আচ্ছা, এই ব্যাপার। ... আর বলবেন না, উনি আমার স্ত্রী, মায়া। আমার নাম মহেশ। আর আমি তো তাঁর থেকেই পালাচ্ছি। ... আর বলেন কেন, উনার সান্নিধ্যে থাকলে, যৌবন গেল, এখন তো বার্ধক্য ধরতে বসলো আমাকে, সাধন কখন করবো? নামেও মায়া, কাজেও মায়া। সর্বক্ষণ এটা করতে বলছে, ওটা খেতে বলছে। এই ভাবে কি আর সাধন হয়! তাই পালাচ্ছি, নির্জন বাস করে, মাতা সর্বাম্বার আরাধনা করবো”।

সতিশ বললেন, “সঠিক বলেছেন, এমন মায়ার সম্মুখে থেকে সাধনা হয় নাকি! ... আমাদেরকেও আমাদের মাতা বিবাহ করতে বলেছিলেন। আমরাও তো কনো ক্রমে পালিয়ে

এসেছি। আগে সাধনা করবো, তারপর বিবাহ করতে হলো করবো, না করতে হলে তো পোয়াবারো। কিন্তু আপনি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন কোথায়!"

মহেশ বললেন, "আমাদের মহারাজা, বিভাবসু, তাঁর পত্নী মনিবালা মহারাজ যেই যেই প্রজাদের প্রতারিত করে দেন, তাঁদেরকে রাজ্যের বাইরে একটি স্থানে রেখে, সন্তানস্নেহে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করেছেন। সাধন করার আদর্শ ক্ষেত্র সেটি। কিন্তু এমনি এমনি সেখানে প্রবেশ করা যায় না। তাই মহারানীর দ্বারস্থ হতে যাচ্ছি। একবার তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ করলে, তিনি নিশ্চিতই আমাকে সেই স্থানে রেখে দেবেন, যা রাজা বিভাবসুর অজানা গোপন ডেরা, আর তাঁর প্রজারা সেই স্থানের নাম চুপিসারেই রেখেছেন মণিধাম, মহারানীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে"।

ক্ষিতীশ বললেন, "কিন্তু মহারাজ প্রজাদের নিষ্কাসন করেন কেন?"

মহেশ হেসে বললেন, "অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং জ্ঞানী আমাদের মহারাজা। তাই তিনি তাঁদেরকে নিজের রাজ্যে থাকতে দেন না তাদেরকে, যারা নিজেদের ইচ্ছার বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছেন। তাঁর রাজ্যে তাঁরাই থাকতে পারেন, যারা ইচ্ছার দমন করেছেন। ... তাই যারা যারা নিজেদের ইচ্ছাকে বশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদেরকে নিষ্কাসিত করে দেন তিনি। ... তবে মহারানী তাঁদের সুরক্ষার চিন্তা করে, রাজ্যের সীমারেখার বাইরে, একটি স্থান করে, সেখানে তাঁদেরকে রেখে দেন। আর বিদ্যাপতি বলে একজন পণ্ডিতকে নিয়ে এসে, তাঁকে দিয়ে এঁদের শিক্ষা দেন, এবং ইচ্ছার থেকে নিভৃত হবার শিক্ষা প্রদান করেন"।

সতিশ মৃদুহাস্যে বললেন, "তা বেশ তো এই রাজ্য, আর এর রাজা বা রানীও বেশ। চলুন তবে, আপনার সাথে আমরাও যাই। আমরা গিয়েও মহারানীর থেকে মণিধামে থাকার অনুমতি নিয়ে, সেখানে যাই"।

ক্ষিতীশ বললেন, "হ্যাঁ, সেখানে যাওয়াই যায়, কিন্তু এই পরিচয়ে আমরা মহারানীর কাছে যেতে পারবো না, আর মণিধামেও নয়। আমাদের নাম আর বেশভূষা পালটাতে হবে"।

সতিশ বললেন, "সঠিক বলেছ ভ্রাতা"। এই বলে, সতিশ আর ক্ষিতীশ নিজেদের বেশ পালটে এসে বললে, "আমরা জয় আর বিজয়। চেনা যাচ্ছে আমাদের মহেশ?"

মহেশ হেসে বললেন, "না! একদমই চেনা যাচ্ছেনা। এক্কেবারে এই রাজ্যের প্রজা মনে হচ্ছে। ... চলুন তাহলে আমরা মহারানীর কাছে যাই"।

এই বলে, ক্ষিতীশ, সতিশ ও মহেশ রাজা বিভাবসুর প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যেতে থাকলেন। পথে বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষও দেখতে পেলেন তাঁরা। বিচিত্র সমস্ত কিছু অনুভব করতে করতে ক্ষিতীশ ও সতিশ সমস্ত বিভাবসুর রাজ্যকে পরিদর্শন করতে করতে প্রাসাদে গেলেন।

এঁদের মধ্যে প্রথমেই যাকে দেখলেন তাঁরা, তিনি হলেন শ্যামা। ইনি এক উন্মাদিনী, অন্তত সমস্ত প্রজা তাই মনে করেন ইনার ব্যাপারে। ইনার স্বামী ইনাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। আর ইনি কেবলই তাঁর এক সখি, ললিতার সাথে নিবাস করেন। ইনি নাকি মাতা সর্বাম্বা অন্তত প্রাণ। আর ইদানীংকালে ইনি নাকি মাতা সর্বাম্বার ডাক শুনতে পান আর নিজেদের নিবাসের অঞ্চল ত্যাগ করে, একটি ছোট ফুলন্দি নদী পেরিয়ে, কারুর সাথে সাখ্যাত করতে যান। আর সেই নিয়ে তাঁদের অঞ্চলের মোড়লের ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের খুব আপত্তি।

ক্ষিতীশ ও সতিশ এই শ্যামাকে দেখে মহেশকে বললেন, "মহেশ, প্রাসাদে যাবার আগে, আমাদের এই শ্যামাকে একটু নিরীক্ষণ করে দেখার ইচ্ছা হচ্ছে। ... তাই আমরা কি এই অঞ্চলে কিছুদিন থাকতে পারি!"

মহেশ বললেন, "এই গ্রামের মোড়লের সাথে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। তাঁর কাছে গোপনে গিয়ে আপনাদের আসল পরিচয় প্রদান করতে পারলে, তিনি অবশ্যই আপত্তি করবেন না। ... তবে জয়বিজয়, আমরা একটু অন্যদিকেও দেখে আসি খানিক। হতে পারে, আরো অনেক কিছু দেখার মত থাকতে পারে আপনাদের"।

ক্ষিতীশ আর সতিশ রাজি হলে, মহেশ তাঁদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন খানিক। সেখানে গিয়ে একটি ছোট্ট কুটির দেখতে পেলেন তাঁরা। দেখে মনে হলো কনো তপস্বী থাকেন সেখানে। মহেশকে প্রশ্ন করতে, মহেশ উত্তর দিলো, "ঠিকই বলেছেন, এখানে একজন পরমা সুন্দরী তপস্বী থাকেন। ইনি হলেন ব্রহ্মচারিণী, ব্রহ্মচারণের শিক্ষা দেন ইনি। আমি ও আমার স্ত্রী এখানে দেবী অনুসুয়ার কাছে, মানে এই তপস্বিনীর কাছে অনেক বার এসেছি। আমাকে উনি চেনেন। আমিও উনার শিষ্য আসলে। আসুন, আপনারাও আসুন। আলাপ করে যাবেন"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ মহেশের সাথে সেই আশ্রমে প্রবেশ করতে দেখলেন, সেখানে তিনটি অপরূপ সুন্দরী তরুণী প্রবেশ করলেন, তাঁদের আগে আগে। মহেশের সাথে দেবী অনুসুয়ার কাছে যাবার কালে, এই তিন তরুণীর উপর ক্ষিতীশ ও সতিশের নজর বারে বারেই চলে গেল। আর তাঁরা দেখলেন যে, এই তিন তরুণীর অপরিসীম সৌন্দর্য, তাঁদের মুখমণ্ডলেই কেবল আবৃত নয়। তা তাঁদের মুখমণ্ডল ছাড়িয়ে, তাঁদের দেহগঠনেও প্রতিফলিত, আর তাতে তাঁরা এতটাই সুন্দরী হয়ে উঠেছেন যে, আশ্রমের কেবল পুরুষরাই নন, স্ত্রীদের মধ্যেও নিজেদের ব্রহ্মচারণ ত্যাগ করে ফেলার সম্ভাবনা দেখা দিলো মুহূর্তের মধ্যে। আর সেই সম্ভাবনা যে কেবলই আশ্রমের শিষ্য ও শিষ্যাদের মধ্যেই সীমিত থাকলো তাও নয়। স্বয়ং দেবী অনুসুয়ার মধ্যেও এক তরঙ্গের সঞ্চার হলো, এই তরুণীদের দেখার মুহূর্তেই।

শিউরে উঠে তিনি এই তিন কন্যাদেরকে বললেন, "কে তোমরা? আর এখানে কি চাও?"

তিন তরুণী বললেন, "আজ্ঞে, আমরা এই রাজ্যের সেনাপতির তিন কন্যা, পদ্মা, সতী ও বাণী। আমাদের বিবাহ স্থির হয়েছে একটি বছর পরে। আর তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। আপনিই বলেন, আজীবন ব্রহ্মচারী থাকার জন্য ১২ বৎসর কঠিন অধ্যাবসায় করতে হয়, আর নিজের কামনার প্রতি সংযম স্থাপন করে বিবাহ করতে হলে, ১২ মাসের অধ্যাবসায় আবশ্যক। দেবী, আপনিই আমাদের সকলকে শিখিয়েছেন যে, স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর কামনাকে সীমিত করা। তা না হলে, স্বামীর কামনা চরম স্তরে উন্নীত হয়, আর স্বামীস্ত্রী উভয়েরই পতন হয়, আর

অসংযমে স্থাপিত কামনা সদাই অসুরসন্তানের জন্ম দেয়। দেবী, আমরা আমাদের কর্তব্যে যাতে অটুট থাকতে পারি, সেই কারণে আমরা এই অধ্যাবসায়ের মধ্যে স্থাপিত থাকতে চাই”।

দেবী অনুসুয়া যেন এই তিন তরুণীকে সহজ চোখে দেখলেন না। তাঁর মনে হলো যেন, এই তিন কন্যা আশ্রমে থাকলে হয়তো এঁরা ব্রহ্মচারনের অভ্যাস করে নেবে, কিন্তু অন্য সকলের অভ্যাসের নাশ করে দেবে। তাই বললেন, “এই রাজ্যে একটি অঞ্চল আছে যেখানে রাজা বিভাবসু কেবল সন্তানকামীদেরকেই রাখেন। জানো সেই ব্যাপারে?”

তিন কন্যা সম্মতি দিলে, দেবী অনুসুয়া বললেন, “আগামী ৩ দিন তোমাদের সেই স্থানে একটি কুটিরে থাকতে হবে, যেখানে স্থিত হয়ে, তোমরা সকল সঙ্গমে লিপ্তদের দেখতে পাবে, কিন্তু তোমাদের কেউ দেখতে পাবে না। ... আমার দুই শিষ্যা, শাখা ও প্রশাখা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এই তিনদিন যদি একটিবার রমণের ইচ্ছা জাগ্রত না হওয়া অবস্থায় থাকতে পারো সেখানে, তবেই আমি তোমাদের শিষ্যা করে স্বীকার করবো”।

এমন কথার শেষে তিন তরুণীকে নিয়ে শাখা ও প্রশাখা চলে গেলে, মহেশ জয় ও বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে দেবী অনুসুয়ার সম্মুখে গেলেন। তাঁর সম্মুখে গিয়ে গোপনে জয় ও বিজয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলে, দেবী অনুসুয়া ব্যস্ত হয়ে যেতে চাইলেন এই দুই সর্বাম্বাপুত্রদের নিয়ে। তাই দেখে ক্ষিতীশ বললেন, “এমন ব্যস্ত হবেন না আপনি। তাহলে আমাদের প্রকৃত পরিচয় সকলে জেনে যাবে। ... আমাদের কেবল অনুমতি প্রদান করুন যাতে আমরা আপনার এই আশ্রমে যখন তখন যাতায়াত করতে পারি। আমরা এই তিন তরুণীকে আপনি কি করে শিক্ষাদান করেন, তা দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী”।

দেবী অনুসুয়ার কাছে সেই কথা কনো আদেশের থেকে কম নয়। তাই তিনি বিনাচিন্তায় সম্মতি প্রদান করলেন জয় ও বিজয়ের ইচ্ছায়। সেই অনুমতি গ্রহণ করে, জয় বিজয় আবার মহেশের সাথে গমন করলেন অন্যত্র। উদ্দেশ্য তাঁদের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছান।

পথে যেতে যেতে, আবার তাঁরা এক স্থানে এসে পরলেন। এটিও একটি আশ্রম। কিছু গুরুরা একত্রে এই আশ্রম নির্মাণ করে, তাতে স্থিত থাকেন এবং সকল প্রজাদের শিক্ষা দান করেন। সেখানে প্রবেশ করে, তাঁরা রাজা বিভাবসুকে দেখলেন গুরুদের সাথে কথা বলতে। তাঁরা আড়াল থেকে শুনতে থাকলেন, মহারাজ কি বলছেন।

তাঁরা শুনলেন, মহারাজ বলছেন, “হে গুরুবর, আমার পুত্র, তামসকে নিয়ে আমি বিশেষ ভাবে চিন্তিত। আমার পুত্র হয়েও তাঁর মধ্যে কামনার এত আধিক্য কি করে হতে পারলো, আমি তা জানিনা! ... তবে সমস্ত কিছু ছেড়ে, এবার সে মধুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। মধু, আপনারা জানেনই, এই রাজ্যের সর্বাধিক সুন্দরী স্ত্রী, কিন্তু সে একই সঙ্গে একজন মহাজ্ঞানীও। আমি ও মহারানী স্থির করে রেখেছিলাম, আমাদের পুত্র অলোক, যার মধ্যে নৃপতি হবার সমস্ত গুণ বর্তমান, তাঁর সাথে বিবাহ প্রদান করে, এঁদেরকে পরবর্তী রাজা ও রানী করে স্থাপিত করবো। ... কিন্তু আমার তো মনে হয়না, তামস তা হতে দেবে। আমরা মধুর সাথে অলোকের বিবাহ স্থির করার আগেই, মনে হয় তামস মধুর মধুপান করে নেবে। ... কি করা যায় গুরুবর! কি ভাবে মধুর পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়!”

গুরুবর সেই কথাতে বললেন, “একটি কাজ করা যেতে পারে রাজন। এই রাজ্যে নটিদেরকে নীচ বলেই গণ্য করা হয়। আর তোমার পুত্র তামসের নটিদের থেকে বিশেষ ভীতি আছে, কারণ তাঁকে একটি নটিই শ্রাপ দিয়েছিল যে তাঁর হত্যা হবে এক নটীর হাতে। তাই মধুকে কেননা আমরা নির্দেশ দিই, নটি হয়ে থাকার জন্য। অলোক এখনো ইচ্ছানাশের ব্রততে রত আছে। এখনো তাঁর এই ব্রত সম্পন্ন করতে একটি বছর লাগবে। এই সময়কাল মধু যদি নটি হয়ে থাকে, তবে ও সুরক্ষিত থাকবে”।

মহারাজ বসু বললেন, “নটি! ... নটিরা তো এমনিই চরিত্র হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে মধু এমন অপার সুন্দরী। যদি সেও নিজের চরিত্র হারিয়ে ফেলে?”

গুরুবর হেসে বললেন, "তাহলে বুঝতে হবে যে, মধুর সাথে অলোকের বিবাহে নিয়তির সায় নেই। মাতা সর্বাম্বার সম্মতি ছাড়া কি কনো বিবাহ হতে পারে! বিবাহ হওয়া তো পরের কথা, কনো বিবাহের সম্বন্ধতেও কি সকলে রাজি হতে পারে, তাঁর সম্মতি ছাড়া! ... তাই বাকি সমস্ত কিছু মাতা সর্বাম্বার উপর ছেড়ে দিতেই হবে রাজন। ... কিন্তু তামসের থেকে মধুকে সুরক্ষিত করে রাখার এই একটিই উপায়"।

রাজা বসু বললেন, "এই কথা কি একটি রাজার একটি প্রজাকে বলা উচিত গুরুবর, বিশেষ করে সেখানে যখন সকলেই জানে যে নটির চরিত্র নষ্ট হবেই?"

গুরুবর বললেন, "সঠিক কথা রাজন। ... আমরাই বরং সেই কথা মধুকে বলবো। তুমি এখন এসো। মধুর আগমনের সময় হয়েছে"।

রাজা বসু চলে গেলেন সেখান থেকে। সম্মুখে এলেন, মধু। সত্যই পরমাসুন্দরী তিনি। গুরুবরের সম্মুখে এসে প্রণাম করতে, গুরুবর বললেন, "মধু, তুমি জানো ভালো করেই যে তামস তোমার চরিত্র হননের জন্য সদাপ্রচেষ্টারত। আমাদের রাজনও এই নিয়ে চিন্তিত। তামস তাঁর পুত্র, তাই অপরাধ করার আগে তিনি তাঁর শাসনও করতে পারছেন না, আবার তুমি তাঁর প্রজা, এবং তোমাকে তিনি অপার স্নেহও করেন, তাই তোমার চরিত্র হনন নিজের পুত্রের হাতে হবে, এটাও তিনি চান না। ... তাই তিনি তোমাকে নটি করে একটি বছর রাখতে চান, যেই সময়কালের মধ্যে তামসের বিবাহ দিয়ে দেবেন তাঁরা। ... তোমার কি এতে কনো আপত্তি আছে!"

দেবী মধু বললেন, "না গুরুবর, আপত্তি কেন থাকবে। আমার সখীই সকলের ভাগ্যবিধাতা। যার যেমন কর্ম, যার যেমন মানসিকতা, সেই মানসিকতাকে সত্যের উদ্দ্যেশে চলমান করার জন্যই তিনি সর্বক্ষণ সকলের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। মহারাজ যখন বলেছেন, আর তাকে যখন আপনারা স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, আর সেই সমস্ত কিছুই যখন আমার হিতের চিন্তা করেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আমাকে, তখন আমার আপত্তি করার কনো স্থানই নেই। ... এখানে

আপত্তি করা মানে মহারাজের অবজ্ঞা করা নয়, আপনাদের অবজ্ঞা করা নয়, স্বয়ং আমার সখীর অপমান করা, যিনি আপনাদের মুখ দিয়ে এই নির্দেশ আমাকে প্রদান করলেন”।

দেবী মধু এবার সেখান থেকে প্রস্থান করলেন, গুরুবরের থেকে একটি পত্র নিয়ে। আর তিনি গমন করলেন একটি বৃহৎ আলয়ে, যাকে মহেশ বললেন, “এটি হলো নটিদের নিবাস স্থান। দেখছেন না, নটিদের সাথে সঙ্গমসুখ নেবেন বলে, সর্বক্ষণ ধনবানদের ভিড় লেগে রয়েছে এই গৃহের আশেপাশে!”

ক্ষিতীশ বললেন, “আপনার কি মনে হয় মহেশ, এত ধনের প্রলোভন লাভ করে, এত দেহসুখ লাভের সুযোগ লাভ করে, দেবী মধু নিজের চরিত্র সঠিক রাখতে পারবেন!”

মহেশ বললেন, “আজ পর্যন্ত কনো নটি নিজের চরিত্র সঠিক রাখতে পারলো না, মধু নটি তা পারবে! আমার তো মনে হয়না, তা পারবে”।

সতিশ বললেন, “চলুন তাহলে, আমরা এবার প্রাসাদের দিকে যাই”।

মহেশ উত্তরে হাস্যমুখে বললেন, “হ্যাঁ চলুন, আমরা সেইদিকেই যাই। ... তবে আমরা পিছন দিক থেকে প্রবেশ করবো। ... পিছনের দ্বারের প্রহরী আমার বাল্যকালের মিত্র। তার সাথে আগেভাগেই কথা বলে রেখেছি। আপনাদের আসল পরিচয়টা তাকে গোপনে বলে দিলে, আপনাদেরকেও প্রবেশ করতে দেবে সে”।

ক্ষিতীশ সতিশ মহেশের সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা দেখে বেশ আনন্দই পেলেন। তাই মহেশের সাথে প্রবেশ করলেন রাজপ্রাসাদে, তবে পিছন দিক থেকে। সেখান দিয়ে প্রবেশ করে সকলে দেখলেন, মহারাজা বসুর দুই কন্যা, একটি যুবকের সাথে আলাপ করছেন। আলাপ করছেন বললে ভুলই হয়। বলা যেতে পারে, বিরক্ত করছেন সেই যুবককে। যুবকটি খোলা বাগানের মাঝে ধ্যান করতে বসেছেন, আর দুই রাজকন্যা তরুণী, জবা ও কুসুম, কখনো তাঁর উত্তরীয় ধরে টানছেন, তো কখনো কেশ ধরে।

তবে আরো মজার জিনিস এই যে সেই সর্বাঙ্গ সুন্দর যুবক এই দুই তরুণীর কনো ক্রিয়াতে কনো প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন না, বরং এমন ভাবে মৃদু হাস্য প্রদান করছেন যেন তিনি এই দুই শিশুকন্যার শৈশবমুখর দুষ্টুমির আনন্দ গ্রহণ করছেন। মহেশ এই যুবককে দেখিয়ে বললেন, "এমন সর্বাঙ্গসুন্দর যুবক তো আমি কনোদিন দেখিনি আমাদের রাজ্যে! ... ইনি কে? রাজপ্রাসাদের কনো অতিথি!"

মহেশের কৌতূহলের উত্তর প্রায় খানিকক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলেন, যখন দুই রাজকন্যা তাঁদের নিকটে একটি ঝোপে এসে বললেন, "দ্যাখ জবা, আমাদের অতিথি, এই বৃত্তকে আমাদের একটু বাজিয়ে নিতে হবে। সে নাকি মাকে বলেছে, সে মাতা সর্বাম্বার একনিষ্ঠ ভক্ত। দেখতে হবে না, কেমন ভক্ত সে!"

সতিশ ও ক্ষিতীশ এবার বললেন, "মহেশ, আমাদের মহারানীর কাছে যেতে হবে। তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করতে হবে গোপনে, কারণ আমরাও এই বৃত্তকে দেখতে চাই, সে কত বড় ভক্ত"।

মহেশ সেই আজ্ঞা পালন করলে, সকলে মহারানীর কাছে গেলেন। মহারানী মণিবালা সত্যই অন্যরকম। সিপাহী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে মহেশ ও জয় বিজয়কে আটক করতে গেলে, তিনি বললেন, "আসতে দাও ওদের। হয়তো অনুপ্রপবেশ করেছে, কিন্তু তাঁদের মন্তব্য অসৎ নয়। মন্তব্য অসৎ হলে, তাঁরা এইভাবে ধরা পরে যাবে জেনেও, দিনের আলোতে সম্মুখে আসতো না। তোমরা যাও এখন প্রহরী। আমি না ডাকা পর্যন্ত, এখানে প্রবেশ করবে না"।

প্রহরীরা চলে গেলে, মহেশ প্রণাম করলেন মহারানীকে। ক্ষিতীশ ও সতিশ সম্মুখে গিয়ে বললেন, "মহারানী মণিবালা, আমরা দুই ভাই ক্ষিতীশ ও সতিশ, মাতা সর্বাম্বার পুত্র"।

এই কথা মুখ থেকে শোনা মাত্র, মহারানী মণিবালা সম্মুখে এসে চরণবন্দনা করতে যাবেন ক্ষিতীশ সতিশের, ক্ষিতীশ ও সতিশ বললেন, 'কি করছেন কি মহারানী! আমাদের প্রকৃত পরিচয় কেবল আপনাকেই জানালাম, আর এই কারণেই জানালাম যাতে আপনি সেই কথা

কারুকে না জানান। ... আপনি এমন আচরণ করলে তো সকলে সমস্ত কিছু জেনে যাবে! ... আমরা এখানে মহেশের সাথে নিজেদের পরিচয় গোপন করে জয় ও বিজয় হয়ে বিরাজ করছি। ... দেবী আপনার কাছে আমাদের আত্মপ্রকাশ করার একটিই কারণ, আর তা হলো আপনাদের অতিথি, বৃত্তের উপর আমরা নজর রাখতে চাই। ... আমরা বলদম্ভদের হত্যা করতে নির্গত হয়েছি। পথে আমাদের মাতার নির্দেশে এই রাজ্যতে এসেছি। আর এখানে এসে মহেশের সাথে আলাপ হতে, তাঁর সাথে ভ্রমণ করতে করতে দেখতে পাই যে এখানে কিছু বিচিত্র ভক্ত রয়েছেন আমাদের মাতার। ... সেই সমস্ত ভক্তিকে দেখার ইচ্ছা হতে, আমরা এই বেশ পরিবর্তন করে জয় বিজয় হয়ে বিরাজ করছি”।

দেবী মণিবালা বললেন, “প্রভু, আপনারা স্বয়ং এসেছেন, আর আপনাদের আদর সৎকার করবো না! ... আপনারা আমাদের রাজঅতিথি হয়ে বিরাজ করুন। বৃত্ত সামান্য একজন সন্ন্যাসী সাধক মাতার, তিনি যদি রাজঅতিথি হয়ে থাকতে পারেন, আপনারা তাঁর সন্তান হয়ে রাজঅতিথি না হয়ে এখান সেখানে গিয়ে থাকবেন!”

সতিশ নিকটে গিয়ে বললেন, “দেবী, আমরা কেবল বৃত্তকেই দেখবো না। আমরা দেখবো শ্যামাকে, দেবী অনুসুয়াকে আর দেবী মধুকে। এঁদের সকলকে একত্রে দেখতে গেলে, আমাদেরকে সর্বত্র ভ্রমণ করতে হবে। তাই দেবী, আমাদের অতিথি হয়ে থাকার অনুরোধ করবেন না। তবে আমরা অনুরোধ করছি আপনাকে যে, বৃত্ত তথা আপনার কন্যা, জবাকুসুমের অজ্ঞাতে আমরা যাতে তাঁদের কীর্তি দেখতে পাই, তাই আমাদের পিছনের দ্বার দ্বারা সমস্ত সময়ে প্রবেশ করার অনুমুতি প্রদান করুন”।

দেবী মণিবালা হেসে বললেন, “যেমন আপনাদের আজ্ঞা প্রভু। ... যেমন বললেন আপনি, তেমনই হবে। আপনারা পশ্চাতের দ্বারের নিকটে যান। আমি আলাদা করে সেইদিকে গিয়ে, প্রহরীকে যা বলার বলে আসছি”।

মহারানী প্রহরীকে যা বলার বলে দিলে, ক্ষিতীশ ও সতিশ জয় ও বিজয়ের বেশে সমস্ত স্থানে যাবার অনুমতি পেয়ে গেলেন, এবং তাই এবার তাঁরা শ্যামার অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করলেন, সেখানের মোড়লের সাথে কথা বলে সেখানে থাকবেন বলে। সেখানে গমন করে, মোড়লের কাছে গিয়ে, জয় বিজয় গোপনে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে, তাঁর কাছেই থাকলেন, এবং শ্যামার উপর নজর রাখলেন।

ভ্রমণ দর্শন

শ্যামার কীর্তিকলাপ বড়ই বিচিত্র। সে নাকি সন্ধ্যা হলেই, কারুর আহ্বান শুনতে পায়, আর তা শুনেই ফুলন্দি নদীর তীরে যায়। স্নান করে, মাথায় সুগন্ধি পুষ্প লাগিয়ে, সঙ্গে করে দুধ গরম করে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে কনো এক স্ত্রীর সাথে সাখ্যাত করে অন্ধকারের মধ্যেই। আর তারপর রাত্রি করে ফেরে। ললিতা তাঁর বাল্যসখী, পিতামাতা গত হবার পর থেকেই সে শ্যামার সাথে সাথে থাকে। তার থেকেই গ্রামের মোড়ল শ্যামার এই ফুলন্দি নদীর ধারে যাত্রা করার কথা জানে।

ক্ষিতীশ সতিশ, যারা জয় ও বিজয় হয়ে সেই স্থানে অবস্থান করছিল তখন, তারাও মোড়লের থেকেই সমস্ত কথা জানতে পারে। সেই বার্তা লাভ করে, তাঁরা ললিতার সাথে একান্তে সাখ্যাত করে। মহেশকে সঙ্গে নিয়ে ললিতার সাথে সাখ্যাত করতে গেলে, জয়বিজয়কে গোপনে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় বলতে হয়, যাতে ললিতা তাঁদের সমস্ত কথা বলেন, এবং শ্যামার রহস্য ভেদ করাতে তাঁদের সঙ্গ দেন।

সেই জন্য ক্ষিতীশ ললিতাকে বললেন, "ললিতা, আমাদের জয় বিজয় করেই এই অঞ্চলের সকলে চেনেন, কিন্তু আমাদের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে এই জেনে রেখো যে, আমরা মাতা সর্বাম্বার পুত্রদ্বয়, ক্ষিতীশ ও সতিশ। এই মহেশ আমাদের প্রকৃত রূপে দেখেন। আর আমরা এই স্থানে বেশ কিছু ভক্তকে পরীক্ষা করতে এসেছি, মাতার হয়ে। তোমার সখীও তো শুনেছি মাতা

সর্বাম্বার ভক্ত। তাই তাঁকেও পরীক্ষা করবো আমরা। তবে তোমাকে আমাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে তোমার সখীর কাছে"।

ললিতা আপ্লুত হয়ে বললেন, "আমার সখী যদি জানতে পাড়ে আপনারা প্রকৃত অর্থে কে, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। জানেন সে সর্বক্ষণ সাধুর সেবা করে ফেরে মাতার প্রতি প্রেমের কারণে"।

ক্ষিতীশ বললেন, "প্রেম করেন মাতাকে, আর সেবা করেন সাধুদের? ... এ কেমন কথা?"

ললিতা বললেন, "হ্যাঁ, ও তো বলে, সাধুতে নাকি মাতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই ও সাধুদের সেবা করে ফেরে। ... আর বলবেন না, এই সেবা যেন ওর মাথায় চেপে বসা একটি ভূত! এই সেবা করার পাগলামোর কারণে, ওর স্বামীও বিরক্ত হয়ে ওকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁর বক্তব্য এই যে, এ কেমন স্ত্রী! কামনা নেই বাসনা নেই, আছে কেবল সেবার পাগলামো! ... এঁর সাথে আমি ঘর করতে পারবো না। ... আমার সখী বড় অভাগী জানেন প্রভু! ... জন্মের আগেই বাবা হারিয়েছে, জন্মের পর থেকেই মা অসুস্থ, আর যখন ওর ১০ বছর বয়স, তখন তিনিও পরলোক গমন করেন। স্বামী জুটল, সেও ছেড়ে চলে গেল ওকে। বড় অভাগী ও"।

সতিশ বললেন, "এই যে ফুলন্দি নদীর ধারে যায়, সেও কি সেবার কারণেই!"

ললিতা বললেন, "না, ও বলে যিনি এসেছেন, তিনি নাকি মাতা সর্বাম্বা স্বয়ং, তাই তাঁর কাছে যান। মাতা আমার সখীর প্রেম, আমার সখীর সর্বস্ব। তাঁর আবাহন শুনলেই, সে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছুটে যায়, তাঁর কাছে"।

ক্ষিতীশ আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি দেখেছ তাঁকে! ... বিবরণ দিতে পারবে সেই স্ত্রীর!"

ললিতা বললেন, "আমি একবার দেখেছি, আমাবস্যার রাত্রি ছিল। আমি কিন্তু তাঁকে পুরুষ বেশে দেখেছি, স্ত্রী বেশে নয়"।

সতিশ বললেন, "তারপরেও তুমি তোমার সখীর কথাকে বিশ্বাস করলে! ... সে তো মিথ্যা বলছে সকলকে। সে তো গোপন প্রণয় সম্পর্ক চালাচ্ছে, মাতার প্রেমকে নাট্য রূপে সামনে রেখে!"

ললিতা মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আমার সখী মিথ্যা বলে না। মিথ্যা ও বলতে চাইলেও বলতে পারেনা। ... ওর জিহ্বা আটকে যায়, মিথ্যা বলতে গেলেই"।

ক্ষিতীশ উত্তরে বললেন, "ঠিক আছে, তুমি চিন্তা করো না। ... আজ আমাবস্যা নয়, পূর্ণিমা। তুমি এক কাজ করো, আজ সন্ধ্যায় যখন তোমার সখী ফুলন্দির দিকে যাত্রা করবে, তখন আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাবে। আমরা মোড়লমশাইয়ের বাড়িতে আছি। আজ আমরা বরং সকলে সচক্ষেই দেখে আসবো, কার সাথে দেখা করছে শ্যামা"।

সন্ধ্যা হতে, ললিতা মোড়ল মশাইয়ের বাড়িতে এসে জয় বিজয় নাম ধরে ক্ষিতীশ ও সতিশকে ডাকলেন। তাঁর ডাক শুনে, মহেশ, মোড়ল, ক্ষিতীশ, সতিশ ও ললিতা ফুলন্দি নদীর দিকে গেলেন। ... বেশ কিছুক্ষণ পথ দ্রুত গতিতে অতিক্রম করার পরেই তাঁরা দেখতে পেলেন, শ্যামা ফুলন্দির তীরে পৌঁছে গেছে। একটি ছোট্ট সাঁকো আছে, তা পার হলেই, নদীর ওই পাশে, তাঁর ভাষায় তাঁর প্রেয়সী, আর ললিতার ভাষায় তাঁর প্রণয়সঙ্গী অপেক্ষা করছে।

সামান্য দূরত্ব রাখার জন্য, খানিকক্ষণ সকলে অপেক্ষা করলে, তাঁরা দেখলেন যে শ্যামার যেন কনো বোধই নেই। সাঁকোতে না উঠে, সে নদীকে পায়ে হেটেই অতিক্রম করতে থাকলো। সকলে বিস্মিত হলে, ললিতা বললেন, "এমনই করে সই, এই আহ্বান, যা আমি কনোদিন শুনতে পাইনি, ও একাই শুনতে পায়, তাই শুনে ও এমন ভাবে বিভ্রান্তের মত করেই এগিয়ে যায়। যেন ওর বোধবাহ্যজ্ঞান কিচ্ছু নেই"।

পূর্ণিমার রাত্রি তাই সমস্ত কিছু দেখা যাচ্ছে। যখন সকলে দেখলো অগভীর ছোট্ট ফুলন্দি নদীকে শ্যামা পার করেছে, তখন চুপি সারে, সাঁকো পেরিয়ে সকলে সেই দিকে গেল। ... কিন্তু যা দেখলো তা এক্কেবারে ললিতার কথার সাথে মিলে গেল। যার সাথে শ্যামা দেখা করতে

এসেছে, সে একটি অসামান্য সুন্দর দেখতে পুরুষ। ক্ষিতীশ বিরক্তিসূচক মুখ করে বললেন, "ভক্ত না ছাই!... কামনার পূজারি। স্বামী চলে গেছে, তাই গোপন প্রণয় জুটিয়েছে"।

সতিশ বললেন, "আহা ভ্রাতা, কি বলছে ওরা, সেটা শুনতে দাও না!" সেই কথাতে সকলে নিস্তব্ধ হয়ে শ্যামা আর তাঁর প্রেমিকের কথাবার্তা শুনলেন।

শ্যামা বললেন, "প্রিয়া, এমন কেন করো তুমি। তোমায় কতবার বলেছি, আমাকে আহ্বান করতে হবে না তোমাকে। ... আমি স্নান করে, দুধটা গরম করে, মাথায় ফুলের মালা নিয়েই চলে আসবো তোমার কাছে। তুমি সেই আহ্বান জানাবেই! আজকে দেখো, স্নান করে অঙ্গের জলটাও মুছতে পারিনি। মালাটাও দেখো কেমন অগোছালো ভাবে পরেছি। ... দেখি তোমার মাথাটা দাও, তোমার প্রিয় ফুলগুলো দিয়ে মালা গেঁথেছি, লাগিয়ে দিই তোমার মাথায়"।

সকলে দেখলেন সেই পুরুষ পিছন দিক ঘুরে গেলেন, আর শ্যামা তাঁর মাথায় পুষ্পের মালা লাগিয়ে দিচ্ছে। সেই দেখে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে বলাবলি করলো, "এ আবার কেমন পুরুষ মানুষ যে মাথায় ফুলের মালা লাগায়!"

সতিশ সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আসতে! ... মন্তব্য আর টিপ্পনী ফিরে গিয়েও করা যাবে। এখন শোনো সকলে এঁদের বার্তালাপ"।

শ্যামার প্রেমিক এবার মৃদু হেসে বললেন, "তোমাকে এমন করে অগুছালো অবস্থায় দেখবো বলেই তো এমন সময়ে আবাহন করি। তুমি যখন পরিপাটি করে থাকো না, যখন অঙ্গের জল মোছ না, তখন যে আমার তোমাকে দেখতে বেশি ভালো লাগে। আর আরো ভালো লাগে কি জানো! ... এই যে তুমি আমাকে বকাঝকা করো, সেইটা। রোজ এসে দুধটা খেয়ে নেবার জন্য বকো, সেটা সব থেকে বেশি ভালো লাগে"।

শ্যামা লজ্জা পেয়ে বললেন, “হয়েছে। আর লজ্জা দিতে হবে না! ... এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত দুধটা খেয়ে নাও দেখি!”

“লক্ষ্মী মেয়ে” শব্দটা শুনে আবার সকলে চমকে উঠলেন। অন্যদিকে সেই প্রেমিক আবার বললেন, “আমি দুধ খাবো না! ... রোজ রোজ এই দুধ, আর ফল, আর ভালো লাগে না! ... একটু অন্য কিছু খাবো আমি!”

শ্যামা বিরক্তি আর স্নেহকে একত্রিত করে মিলিয়ে বলল, “আর কি জোটাও তুমি আমায় যে, তা আনবো তোমার জন্য! ... যা পাই, তাই খাই আর তাই তোমার জন্য আনি। ... লক্ষ্মী মা আমার, এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত খেয়ে নাও তো! ... খাবার নিয়ে এমন করতে নেই”।

সেই পুরুষ বললেন, “করলে কি হবে!”

শ্যামা মিষ্টি হেসে বললেন, “তোমার অপমান হবে। ... সমস্ত জীবের সমস্ত আহার তো স্বয়ং তুমিই, তাই না! “

পুরুষটি শ্যামার হাতের পাত্র থেকে দুগ্ধ পান করতে করতে , শ্যামার হাত ধরে নামিয়ে শ্যামার দিকে তাকিয়ে বলল, “শ্যামা, আর অনেক হয়েছে, চলো এবার আমার সাথে আমার বাসায় চলো। সারাদিনে শেষে এই সন্ধ্যায় মাত্র একটি প্রহরের জন্য তোমার সাখ্যাত পাই। এতে আমার মন ভরছে না। চলো, আমার সাথে চলো। আমার বাসায় থাকবে, আর আমি তোমাকে সর্বক্ষণ পাবো। ... তুমি চাও না বলো, আমাকে সব সময়ে পেতে!”

শ্যামা হেসে বললেন, “আর যখন সাধুদের সেবা করতে হবে! ... তখন তো সেই তোমাকে ছুটে ছুটে আসতে হবে! ... তা হয়না প্রিয়া। আমাকে এখানেই থাকতে দাও। তোমার নামে যারা নিজেদের জীবনমৃত্যু এক করে ফেলেছে, সেই সাধুদের তো তোমাকে সেবা করতেই হয়। আর তারজন্য তোমাকে এখানে ছুটে ছুটে আসতে হয়। সেই কাজটা না তোমার এই শ্যামাপ্রিয়া করলো! ... তাহলে তোমাকে সব সময়ে ছুটে ছুটে আসতে হবেনা!”

সেই প্রেমিক আবার বললেন, “এই সেবা করে তুমি কি পাও বলোতো!”

শ্যামা হেসে বলল, “আনন্দ পাই। ... তোমার পরিশ্রম কমে, তাই আনন্দ পাই। ... সর্বক্ষণ তো এদিক থেকে ওদিক ছুটছো আর অদিক থেকে এদিক। সকল সন্তানের সেবা তো তুমি নিজে হাতেই করো, যতই উপেক্ষা করুক তাঁরা তোমাকে। তা তোমার কিছু সন্তানের সেবা করে দিলে, তোমার খাটনি একটু কমে, সেই কথা মনে হলেই আনন্দ হয়”।

প্রেমিক হেসে বললেন, “বিচিত্র তোমার প্রেম শ্যামা। এত ভক্ত দেখেছি, তাঁদের অনেকেই সেবা করে। কিন্তু সকলের মনে থাকে প্রচুর প্রচুর কামনা। যদি সমস্ত অন্য কামনাকে ছেড়েও দেয়, অন্তত পুণ্য কামানোর কামনা তো পুষে রেখেই দেয় নিজের অন্তরে। ... কেবলই আমার খাটনি কমবে বলে সেবা, না শ্যামা, সত্যি বলছি, আমি এমন সেবক কনোদিন দেখিনি”। খানিক পরে আবার বললেন প্রেমিক, “আচ্ছা তুমি রোজই একটি শাড়ী পরে আস কেন? আর কনো শাড়ী নেই তোমার!”

শ্যামা তৎপর হয়ে বললেন, “আছে তো! আরো দুটো আছে ... ওটা বাড়িতে পরার। সকালে এটা ধৌত করে দিই, আর আগের দিন যেই শাড়ীটা ঘরে পরেছিলাম, সেটা ধৌত করে দিই। আর সন্ধ্যার মধ্যে এই কাপর শুকিয়ে গেলে, এটা ধারণ করে চলে আসি তোমার কাছে”।

প্রেমিক এবার একটু উঠে গিয়ে একটি পাথরের পশ্চাতে কিছু ছিল। সেটি উঠিয়ে নিয়ে এসে শ্যামার হাতে দিয়ে বললেন, “এই নাও শ্যামা। কালকে এই শাড়ীটি পরে আসবে আমার কাছে। আমি তোমার অপার রূপ দেখে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চাই”।

শ্যামা হেসে বিদ্রূপের সুরে বললেন, “জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এই শ্যামাকে বলছে, অপার রূপ নাকি আমার! ... আমার মত রূপের সই তোমার কত কত আছে বলো দেখি!”

প্রেমিক হেসে বললেন, "ওরে শ্যামা, রূপ কি কেবলই তনুর হয়! ... তোমার মত এমন কামনাশূন্য প্রেম কয়জন করে আমাকে! ... না শ্যামা, একজনও নয়, আর সেই জন্যই তো দ্যাখো, ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে"।

শ্যামা এবার বললেন, "এবার আসি প্রিয়া। ললিতা একাকী রয়েছে ঘরে। ... রাত্রি হলে, ওর আবার গা ছমছম করার রোগ আছে। সে আমার ছেলেবেলার সই প্রিয়া। যেমন তুমি আমাকে একদণ্ডের জন্যও ছেড়ে যাওনি কনোদিন, সেও আমাকে ছেড়ে একদণ্ডের জন্যও কোথাও যায়নি। ... আমাকে তাঁর কাছে এবার যেতে হবে"।

প্রেমিক চলে যাওয়া শ্যামার হাত ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে শ্যামাকে নিজের বক্ষস্থলে স্থাপন করে, নিজের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্যামার মুখকে উপর দিকে তুলে বললেন, "কাল অন্য কিছু খাবার এনো! ... আর হ্যাঁ শাড়ীটা অবশ্যই পরে এসো"। শ্যামা লজ্জা পেয়ে ছুটে চলে গেলো। সেই যুবাও শ্যামার মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, পিছন দিকে পারি দিলো। সতিশ দৌড় লাগালো সেই পুরুষের বাসাকে দেখে আসার জন্য। কিন্তু সেই পুরুষটি বনের মধ্যে এমন ভাবে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল যে সতিশ পথ হারিয়ে ফেলল। ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "পেলাম না হদিশ। ... কিন্তু ললিতা ঠিকই বলেছিল, সে স্ত্রী নয় পুরুষ, আর আমাদের মাতা নয়, শ্যামার প্রেমিক"।

ক্ষিতীশ বললেন, "কিন্তু শ্যামা কেন লক্ষ্মী মেয়ে, প্রিয়া, এই সমস্ত কিছু বলছিল! ... এমনকি ও যে পুরুষটির ব্যাখ্যাও দিচ্ছিল, সেও তো আমাদের মায়েরই ব্যাখ্যা ভ্রাতা!"

সতিশ ব্যঙ্গাত্মক হাস্য হেসে বলল, "আমাদের উপস্থিতি মনে হয়, ওরা জেনে গেছিল, আর তাই এমন নাট্য করলো, যাতে আমরা ভ্রমিত হই"।

মহেশ বললেন, "আপনারাই যদিও আমি সঠিক বলছি না বেঠিক বলছি, তার স্বীকৃতি দেবেন। ... কিন্তু আমার যেন মনে হলো শ্যামার ভাব অত্যন্ত পবিত্র। জগন্মাতার তো কনো লিঙ্গ নেই। তাই হতেও তো পারে, শ্যামা এই পুরুষের মধ্যে নিজের আরাধ্যাকেই দেখছে! ... একবার

পরখ করে দেখে নেওয়া ভালো হবেনা! মানে সিদ্ধান্ত নেবার আগে, যদি একবার দেখে নেওয়া হয়!”

সতিশ ক্ষিতীশ নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে হেসে বললেন, “বেশ, কালকেই এর পরীক্ষণ করে নেওয়া যাবে। মোড়ল মহাশয়, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। কালকে বাগানের সমস্ত ফল পেরে নিতে হবে, যাতে শ্যামার হাতে সেগুলো না লাগে। আর দ্বিতীয়তো, ললিতা, তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে। প্রথমত শ্যামার গরু, লালিকে কাল মোড়ল মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাবে, আর তার সমস্ত দুধ নিষ্কাসন করে নেবে, যাতে শ্যামা কিচ্ছু না পায়। ... আর দ্বিতীয়ত, ওকে যেই কাপড় দিলো ওর প্রেমিক, তাকে জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে দেবে, আর তাতে মোড়লমহাশয় কিছু রঙের সাথে রক্ত গুলে দেবে, সেটা লাগিয়ে দেবে।... কালকে সকালে আমরা একটা অন্য জায়গায় যাবো। সন্ধ্যায় ফিরে আসলে, বাকি কাজ আমরা নিজে হাতে করবো”।

পরের দিন প্রভাতে, জয় ও বিজয় মহেশকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে, বৃত্তকে দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন, বৃত্ত কিছু বলছেন রাজকন্যাদের। কাছে গিয়ে কান করে শুনতে চেষ্টা করলে, তাঁরা শুনতে পেলেন বৃত্ত বলছে, “সন্ন্যাস মানে নিজের অহংকে ত্যাগ করা রাজকন্যারা। আর যদি নিজের অহং ত্যাগ হয়ে যায়, তারপরে কি আর বিবাহ করা আর কি বা তা না করা। যেমন মাতা সম্মুখে আনবেন, তেমনই হবে। না আমি নিজে হতে বিবাহ করতে যাবো, আর না বিবাহের কনো পাত্রী এনে দিলে, সেই পাত্রী কেমন তার বিচার করবো”।

রাজকন্যা জবাকুসুম বললেন, “এর অর্থ, যদি কনো কুৎসিত দেখতে বা নিতান্ত খাটো বা কনো প্রতিবন্ধী এসে আপনাকে বিবাহ করতে চান, আপনি মাতার নির্দেশ মেনে তাকে বিবাহ করে নেবেন!” বৃত্ত হেসে বললেন, “সন্ন্যাস মানে তো তাই দেবী! ... সন্ন্যাস মানে, কনো অহং নেই। আর যার অহং নেই, সে কি করে কনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে! ... সম্মুখে যা আসবে, তাই ভগবতীর নির্দেশ মেনে, তাকে ধারণ করাই এক সন্ন্যাসীর কর্তব্য”।

জবাকুসুম সেই স্থান থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলে, ক্ষিতীশ আর সতিশও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। সতিশ, ক্ষিতীশ আর মহেশের উদ্দেশ্যে বললেন, "এবার বেশ মজা হবে দেখো! ... জবাকুসুম নিশ্চিতই কনো এমন কন্যাকে উপস্থিত করবেন বৃত্তের সম্মুখে, যিনি বিবাহ করার উপযোগীই নন। ... দেখে নিও আমার কথা মিলিয়ে"।

মহেশ বললেন, "প্রভু, আজ মধুনটির প্রথম নাট্য, যাবেন নাকি দেখতে! ... চলুন, এই বেলায় দেখে আসি মধুনটির নাট্য, আর তাঁকে ঘিরে কি উন্মাদনা হয় ধনবান দর্শকদের মধ্যে তাও দেখে আসা যাবে!"

ক্ষিতীশ প্রশ্ন করলেন, "নাট্য কয় ঘটিকায়!"

মহেশ উত্তরে বললেন, "এখনো এক প্রহর দেরি আছে"।

ক্ষিতীশ আবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, ওই যে তিন সেনাপতির কন্যাকে তিনদিন সঙ্গমক্ষেত্রে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন দেবী অনুসুয়া, তা তিন দিন হয়ে গেছে না!"

সতিশ বললেন, "হ্যাঁ হয়ে তো যাবার কথা। আজ তো চতুর্থ দিন। ... একবার সেদিকে যাবে নাকি! দেখবে নাকি কি করলেন দেবী অনুসুয়া!"

ক্ষিতীশ উত্তরে উত্তেজনা নিয়ে বললেন, "তা গেলে মন্দ হয়না। ... চলোই না একবার, কিছু না হলে দেবী অনুসুয়ার থেকে কিছু ব্রহ্মচারণের জ্ঞান লাভ করে তো আসা যাবে!"

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে, তাঁরা অনুসুয়ার আশ্রমে গেলে, তাঁরা দেখলেন দেবী অনুসুয়া স্নান করছেন। সেই সময়েই তাঁদের সামনে দিয়েই শাখাপ্রশাখা পদ্মা, সতী আর বাণীকে নিয়ে প্রবেশ করলেন আশ্রমে। সেই দেখে মহেশ বললেন, "একেবারে সঠিক সময়েই প্রবেশ করেছি আমরা! ... চলো গিয়ে দেখা যাক, কি হচ্ছে আশ্রমে"।

তাঁরা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, শাখাপ্রশাখা স্নানরত দেবী অনুসুয়াকে বলছেন, “মাতা, এই তিনকন্যা, তাঁদের পরীক্ষায় সফল হয়েছে। কিন্তু এঁদের রূপ আমাদেরকে আমাদের ব্রহ্মচারণ থেকে স্খলিত করে দিয়েছে”। দেবী অনুসুয়া একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা শাখাপ্রশাখাকে দেখলেন, তারপর কড়া স্বরে বললেন, “তাঁদের তিনজনকে নিয়ে আয় আমার কাছে”।

সেই তিন দেবীকে সম্মুখে এনে দাঁড় করালেন শাখাপ্রশাখা, আর সেখান থেকে চলে গেলেন। দেবী অনুসুয়া স্নান সেরে উঠে, কেবলই নিজের সিক্ত বস্ত্রকে ধারণ করেছেন। অতঃপরে, এই তিন কন্যাকে দেখে, তাঁর প্রাণ যেন তনু ত্যাগ করে দেবার উপক্রম হলো। তিন কন্যা দেবী অনুসুয়াকে এই অবস্থায় ধরতে দৌড়ে নিকটে গেলেন। দেবী অনুসুয়া তাঁদেরকে স্পর্শলাভ করে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, “এ কি করলি তোরা! আজ এই দীর্ঘ ৩০ বৎসরের ব্রহ্মচারণকে তোরা একমুহূর্তে নষ্ট করে দিলি!”

এই কথা বলার শেষে তিনি সংজ্ঞা হারালে, তিন কন্যা তাঁকে ধরে ধরে আশ্রমের কুটিরে নিয়ে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে দিলেন। সতিশ ক্ষিতীশ এই দৃশ্য দেখার পর কি করনিয় বুঝতে না পেরে, চলে গেলেন আশ্রম থেকে এবার মধুনটীর নাট্য দেখতে। মধুনটীর নাট্য দেখে, ধনবান পুরুষরা বিহ্বল এই নটিকে শয্যাসঙ্গিনী করবেন বলে। মধু নটীর সাথে একটি সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর, তাঁর নাম রুদ্রানটি। ইনি মধুনটিকে সুরক্ষিত ভাবে নাট্যের শেষে আবাসনে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর ধনবান পুরুষেরা চিৎকার করে নিলাম করার মত ধন বিলি করার প্রতিজ্ঞা করছিলেন, মধুনটিকে শয্যাসঙ্গিনী করে পাবার জন্য। সেই দেখে, সতিশ ও ক্ষিতীশ বললেন, “চলুন মহেশ, আমরাও এঁদের পশ্চাতে যাই। দেখি এই দুই সখী নটীর মধ্যে কি বার্তালাপ হচ্ছে। বার্তালাপ শুনলেই বোঝা যাবে, এঁরা নিজেদের চরিত্র নষ্ট করার জন্য কতটা উৎসুক”।

বার্তা বিভ্রান্তি

মহেশের সাথে পথে যেতে যেতে, সতিশ দেখলেন, মহেশ কেমন যেন আনমনা হয়ে রয়েছেন। সেই দেখে তিনি মহেশকে প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে মহেশ, আমাদের বলো"।

ক্ষিতীশ উত্তরে বললেন, "তেমন কিছু নয়। আমাদের আহারের সময়ে কোথা থেকে যেন আহার এসে যাচ্ছে আমাদের সামনে। আমাদের নিদ্রার সময়ে বিছানা করা থাকছে, আমাদের বস্ত্র ধারণ করার সময়ে ধৌত করা বস্ত্র উপস্থিত থাকছে, আবার আমাদের রাত্রে নিদ্রার কালে কেউ আমাদের গায়ে কম্বল চাপিয়ে যাচ্ছে। সেই নিয়ে মহেশ একটু চিন্তায় রয়েছে যে কে এই সমস্ত কিছু করছে"।

সতিশ হেসে বললেন, "অতশত ভেবে কি লাভ মহেশ। যা কিছু হচ্ছে আমাদের ভালোই তো হচ্ছে তাতে। তাহলে এত চিন্তার কি আছে!"

মহেশ কনো উত্তর না দিয়ে, একটি গভীর নিশ্বাস ছেড়ে, কেবলই মাথা নাড়লেন। সম্মুখে দুই নটি দাঁড়িয়ে বার্তালাপ করছেন, তাই সকলে নিজেদের কথাবার্তাতে বিরাম লাগালেন, এবং দুই নটীর কথাতে কর্ণপাত করলেন। রুদ্রানটি তাঁর সইকে বলছেন, "মধু, আর কতদিন এই ভাবে চলবে! ... প্রথম দিন থেকেই তোমার উপর লালসার দৃষ্টি রাখা শুরু করেছে সমস্ত ধনবানরা। ... দ্যাখো, সকল নটি এঁদের সাথে মিশে গিয়ে, কতই না ধনসামগ্রী করে নিয়েছে। আমরা যদি এমন করি, তাহলে তো আমাদের নাট্য দেখাই বন্ধ করে দেবে সকলে। তখন আমরা কি করবো?"

মধুনটি হেসে বললেন, "সই, যদি তোমার প্রলোভন লাগে, তুমি অবশ্যই যেতে পারো ধনবানদের সাথে। কিন্তু আমি যাবো না তাঁদের সাথে। যদি তার জন্য আমাকে অনাহারে মৃত্যুও লাভ করতে হয়, তাও স্বীকার্য। সই, চরিত্রই হলো এমন সম্পদ যাকে রক্ষা করা স্বয়ং একটি তপস্যা। আর তা ছাড়া, আমি তো নটি। ভেবে দ্যাখো সই, আমাদের জননীকে অন্য কনো

পেশা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়না, কেবল তাঁকে নটেশ্বরী বলা হয়। তাই সেই নটের কর্মে নিযুক্ত থাকার অর্থই হলো আমরা তাঁর সাথে যুক্ত। আমাদের জীবনযাপন সমস্ত কিছু আমাদের আরাধ্যার মানসম্মানের সাথে যুক্ত।

এমন অবস্থায় যদি আমরাই ধনের প্রতি আসক্ত হই, তবে আমাদের নটেশ্বরীর কি মান পরে থাকবে, বলতে পারো! না তো আমি ধনবানদের সাথে যাবো, আর না আমার চরিত্রকে আমি কালিমাময় করতে পারবো সই। নটি হবার আগেও আমার কাছে আমার চরিত্র ছিল তপস্যা। যেইদিন আবিষ্কার করেছি যে আমাকে তিনি সুন্দরী করে জন্ম দিয়েছেন, সেইদিনই বুঝেছিলাম, আমার চরিত্রকে ধরে রাখা আমার জন্য কঠিন হবে, আর সেইদিন থেকেই এই তপস্যাকে বরণ করেছি আমি।

আর আজ তো আমি নটি, আমার আরাধ্যাকে যেই একটিমাত্র পেষার সাথে যুক্ত করা হয়, সেই নটপেষার সাথে আমি যুক্ত হয়েছি। এই পেষায় যুক্ত হবার পর তো আর কনো ভাবেই চরিত্রে একটি দাগও লাগতে দেওয়া যাবেনা! ... সই, তুমি বললে, এমন করলে তো ধনবানরা আমার নাট্য দেখবেই না আর তাহলে আমি অনাহারে মারা যাবো। বেশ, যদি অনাহারে মরতে হয়, তাও আনন্দের সাথে স্বীকার করে নেব আমি, কিন্তু তা বলে নিজের চরিত্রকে কিছুতেই নষ্ট হতে দেবনা। আমার কারণে আমার আরাধ্যার মানকে আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারবো না!”

ক্ষিতীশ বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো এই বচন শুনে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে অস্ফুট ভাবে সে বলল, “কি বিচিত্র এই তপস্যা! ... সত্যই মাতা সঠিকই বলেন, একাসনে বসে নামজপ কি করে তপস্যা হতে পারে! ... এই যে তপস্যায় মধুনটি রত হয়েছেন, হয়তো আমাদের পিতা একে কিছুতেই তপস্যা বলবেন না, কিন্তু যা দেখলাম আমরা, এঁকে তপস্যা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ভ্রাতা!”

সতিশও অস্ফুট স্বরে বললেন, "সত্য কথা ভ্রাতা! ... চরিত্র নাশ করলেই ধন, সুখ আর সমস্ত বৈভব। কিন্তু চরিত্র নাশ করলেই আমাদের মাতার অপমান কারণ আমাদের মাতা স্বয়ং নটেশ্বরী। তাই মৃত্যুও স্বীকার্য কিন্তু চরিত্রনাশ অনস্বীকার্য। কি অদ্ভুত তপস্যা!"

এমন কথা বলছেন তাঁরা, এমন সময়ে রুদ্রানটীর উচ্চৈঃস্বর লাভ করে, সেই দিকে তাকালেন সকলে। দেখলেন সেখানে একটি বিশালাকায় পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর তাঁকে দেখা মাত্রই, মধুনটিকে পিছনে রেখে রুদ্রানটি সম্মুখে দাঁড়িয়ে পরেছেন। ... খানিক ক্ষণের মধ্যেই সতিশ আর ক্ষিতীশ বুঝেগেলেন, এই পুরুষ হলেন তামস, মহারাজ বসুর সেই দুশ্চরিত্র পুত্র।

সে-ই হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমি জানি তো তোমার মনে, তোমার এই সুন্দর তনে, কেবলই আমার নাম লেখা আছে। তাই তো তুমি ওই ধনবানদের প্রলোভনে সামান্যও বিচলিত হলেনা। এসো মধু, আমাকে তোমার দেহরস প্রদান করো। ... আমার ধৈর্যের আর পরীক্ষা নিও না। আর এখানে তোমাকে কেউ বাঁচাবারও নেই। তাই আজ যদি তুমি আমার বাসনাকে তৃপ্ত না করো, তাহলেও আমি সেই রস পান করবো, যা আমি এতকাল পান করতে চেয়েছি, আর তুমি আমাকে তা পান করতে দাও নি ।... আমি জানি সেই রস কি ভাবে ছিনিয়ে নিয়ে পান করতে হয়। তাই আমাকে আমার বল ব্যবহারে বাধ্য করো না। নিজের ইচ্ছায় সেই রস আমাকে দিয়ে দাও"।

রুদ্রানটি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "আমাদের অবলা ভাবিস না মূর্খ। পাপিষ্ঠ, আমি থাকতে তুই আমার সইয়ের কাছে কখনোই পৌছাতে পারবিনা। আমাদের মার্গ ছার দুশ্চরিত্র"।

তামস আগ্রাসী হয়ে উচ্চস্বরে অট্টহাস করে বললেন, "বেশ তো তাহলে; চেয়েছিলাম একটি সুন্দরীর রসপান করতে, আজ দুটি সুন্দরীর রসপান করবো"। এই বলে তামস রুদ্রার দিকে হাত বাড়ালে, রুদ্রার যেন নিশ্বাস প্রকাণ্ড ভাবে ফুলতে থাকে। অন্যদিকে আর সতিশ ক্ষিতীশ নিজেদের সহ্যশক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারলো না। তাঁরা নিজেদের ধনুককে আবাহন করে, তার প্রত্যাঞ্চায় একটি শর স্থাপন করে, তামসের উরুতে নিক্ষেপ করলেন। তামস ভূপতিত

হলো পিড়ায়। আর মধু আগ্রাসী রুদ্রার করকে নিজের করে স্থাপন করে শেখান থেকে পলায়ন করলেন।

এমন কাণ্ড হবার পরে, মহেশ দুই ভ্রাতাকে একপ্রকার বলের সাথেই, ফুলন্দি নদীর সম্মুখে নিয়ে আসলেন। পথে, সতিশ ও ক্ষিতীশ একাধিকবার বাঁধা দেবার প্রয়াস করলেও, মহেশের বলের যেন কনো অনুমানই ছিলোনা তাদের। কিছুতেই হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না তাঁরা। শেষে ফুলন্দির তীরে এসে, তিনজনে হাঁফ ছাড়লে, ক্ষিতীশ বললেন, "আমাদের ওখান থেকে কেন নিয়ে এলে মহেশ! আজকে ওই তামসকে মজা বুঝিয়ে দিতাম, নারীর প্রতি কুদৃষ্টি রাখার ফল কি হয়, আজ তার উপভোগ করার সময় হয়েছিল"।

মহেশ বললেন, "প্রভু, আপনারা কি আর বাকি লীলাগুলি দেখতে চান না! ... তামসের সম্মুখে গেলে তো আপনাদের প্রকৃত পরিচয় সকলেই জেনে যেত। তখন কি আর বাকি লীলা দেখতে পারতেন!"

সতিশ ক্ষিতীশ শান্ত হলো সেই কথা শুনে। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে তাঁরা ফুলন্দির সাঁকো পেরিয়ে শ্যামার গ্রামে প্রবেশ করলেন। মোড়ল আর ললিতাকে যেমন যেমন বলে গেছিলেন, তেমন তেমনই করেছে সকলে। সেই কারণে শ্যামা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে যে আজ তাঁর প্রিয়ার জন্য কি আহার নিয়ে যাবে! ... সেই সময়ে সতিশ ও ক্ষিতীশ একটুকরো গোমাংস শ্যামার দ্বারে রেখে দিলে, ললিতাকে নিয়ে শ্যামা গৃহে প্রত্যাবর্তনের কালে দেখলেন, সেই গোমাংস টুকরোকে।

সেই দেখে, শ্যামা নিজের কটিদেশের দুইপাসে নিজের কর স্থাপন করে একটি বিচিত্র প্রকার মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর বললেন, "ফল দুগ্ধ খাবেনা বলে, এক্কেবারে গোমাংস! ... কেন গো প্রিয়া, তোমার কি আবার তপস্যার প্রয়োজন পরে গেল! ... শুনেছি গোমাংস আহার না করলে তপস্যা করা যায়না। সেই কারণেই কি এই গোমাংস! ... বেশ, তাই যখন তোমার ইচ্ছা, তখন তাই হোক"।

এই বলে সেই গোমাংসকে তুলে নিয়ে ধৌত করে, রন্ধন করতে থাকলেন শ্যামা। সেই দেখে ললিতা বারংবার বলতে থাকলেন, “সই, গোমাংস রন্ধন করো না। গোমাংস কেন রন্ধন করছো!”

শ্যামা মাঝে মধ্যেই হেসে হেসে যা বললেন, তার সমষ্টি এই রূপ, “সই, গোমাংসকে সামান্য জিনিস ভেবো না ভুলেও। সাধুদের সেবা করার সময়ে জেনেছি যে, সাধনা করার আগে গোমাংস আহার করতে হয়। তাঁরা বলেন যে, আহার কেবল আমাদের পুষ্টিই দেয়না। আহার আমাদের চেতনাও প্রদান করে। গরুই একটিমাত্র জীব যা জাবড় কাটে। জাবড় কি জিনিস জানো! জ্ঞান আহরণের উচিত উপায় হলো জাবড়কাটা। জ্ঞান আহরণের সময়ে যেমন আগে সমস্ত কিছু গ্রহণ করে নিতে হয়, আর পরে তার মন্থন করে সত্য উদ্ঘাটন করতে হয়, জাবড়ও ঠিক অনুরূপ পদ্ধতি। তাই গোমাংস ভক্ষণ করলে, সেই সাধনগুণ আমাদের চিত্তে স্থাপিত হয়।

সাধুরা আমাকে একাধিক উদাহরণ দেখিয়েছেন যে যারা গোমাংস আহার করেন, তাঁরা সেই প্রকার শিল্পী হন, যারা নুতন ধারার শিল্পকলার নির্মাণ করেন, এবং তা প্রদর্শন করেন। তাই সাধককেও গোমাংস আহার করার ৭ দিবস পর থেকে সাধনার আসনে স্থিত হতে হয়, তবেই তাঁর যথার্থ জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়। ... আর এই গোমাংস! ... দেখলেই তো সই, তিনি নিজে সেই আহার আমার দ্বারে রেখে দিলেন, আর কেবল তাই নয়, সমস্ত অন্য আহারকেও আজ আচম্বিক ভাবে লুক্কায়িত করে দিলেন। এটি কিসের ইঙ্গিত সই! ... উনি এই মাংস আহার করবেন, তারই ইঙ্গিত, তাই না!”

ললিতা একটি কথাও বলতে পারলেন না এর উত্তরে। শ্যামা গোমাংস রন্ধন করে এবার স্নান করে, তাঁর প্রিয়ার দেওয়া শাড়ী ধারণ করতে গেলেন। সেই শাড়ীটি ধারণ করতে গিয়ে শ্যামা বললেন, “দেখেছ সই, প্রিয়ার রঙ্গরসিকতার ধরন! সিক্ত কাপড় দিয়েছেন, যাতে কাপড় থেকে রঙ উঠে আমার অঙ্গে লাগে। তিনি মনে হয় আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন! ... সত্যিই কি আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন নাকি আমার মাধ্যমে অন্য কারুর!

বস্ত্র ধারণ করে সম্মুখে আসলে, ললিতা বললেন, "সই এই শাড়ী ছেড়ে ফেল। এর তো স্থানে স্থানে ছেঁড়া! এমন শাড়ী কেউ পরে বাইরে যায়! ... তোমার বিভিন্ন অঙ্গকে যে এই শাড়ী প্রদর্শিত করে দিচ্ছে!"

শ্যামা হেসে বললেন, "তা বললে হয়, প্রিয়া বারবার করে বলে দিয়েছে আমি যেন আজ এই শাড়ী পরেই আসি। ... সে কি আর জানে না যে এতে ছেঁড়া আছে! ... তারপরেও যখন বলেছে, তখন নিশ্চয়ই কনো কিছু শিক্ষা দেবার আছে আমাকে বা আমাকে মাধ্যম করে অন্য কারুকে"।

শ্যামা গোমাংস ধারণ করে, অঙ্গে সেই পিতবর্ণের ছেঁড়া ও সিক্ত শাড়ী পরে যাত্রা করতে থাকলেন ফুলন্দি নদীর দিকে। শ্যামার এই বেশভূষা অঞ্চলের পুরুষদের প্রচণ্ড উত্তেজিত করতে থাকলে, তাঁরা কামনার আগুনে নিজেদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, নিজেদের পত্নীদের নিকটে। অন্যদিকে, শ্যামার এমন কীর্তিতে গ্রামের মোড়ল উগ্র হয়ে উঠে বললেন, "সমাজ, জনজীবন বলে যেন কনো কিছুর অস্তিত্বই নেই! ... যা খুশী তাই! ... দেখাচ্ছি মজা আমি!"

সতিশ হেসে মোড়লের হাত চেপে ধরে বললেন, "আপনাকে উগ্র হতে হবে না। কিছু সারমেয়দের আমরা মাদক প্রদান করে উগ্র করে দিয়ে এসেছি। শীঘ্রই শ্যামা সেই সারমেয়দের সাথে সাখ্যাত করবে। ... আর জানেন কি! শ্যামার বস্ত্রে গোরক্তও আছে। আর মাদকসেবন করা উগ্র সারমেয়রা সেই গন্ধ পাবেনা, তা তো হতেই পারেনা। তাই মজা আপনাকে দেখাতে হবেনা, কেবল মজা দেখে যান। শ্যামার মুখোশ আজ খুলে পরে যাবেই। আমাদের যতই ঈশ্বরপ্রেমের বাখান করুক সে, যেই প্রেমে সে মজে রয়েছে, তার প্রেমে এমন জোর নেই যে জীবনের ভয় চলে যাবে। ... দেখতে থাকুন কি কি হয় আগে"।

সতিশের কথা ধ্রুব সত্য প্রমাণিত হলো, আর সেই সত্য সম্বন্ধে ললিতাও জানতেন না আগে থেকে। সারমেয় জীবরা ভয়ানক উগ্রমূর্তি ধারণ করে, শ্যামার দিকে অগ্রসর হয়ে, উচ্চৈঃস্বরে প্রাণঘাতী হাঁক পারছে। সারমেয়দের এমন রক্তচক্ষু অবস্থায় বৃহৎ আকারের দন্ত বিকশিত করে,

আক্রমণাত্মক ভূমিকা দেখে, ললিতা প্রাণের ভয়ে একটি বৃক্ষে উঠে গেলেন। কিন্তু শ্যামা ভ্রু কুঞ্চিত করে একটিই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ললিতা বারংবার শ্যামাকে তাঁর বৃক্ষে উঠে পরতে বললেও, শ্যামা যেন তা শুনতেই পাচ্ছেন না। সমানে শ্যামা অবুঝ সারমেয়দের বলে চললেন, "তোদের অন্তরাত্মা যদি তোদের আমার মাস আহার করার নির্দেশ দিয়ে থাকে, বেশ তোরা আমার দেহের মাস পিছন থেকে আহার করা শুরু কর। আমি আমার গতি বাড়ালাম, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে আমার প্রিয়ার চরণে স্থাপিত হয়ে, তাঁর মুখদর্শন করে প্রাণ দিতে পারি। ... তোদেরকেও আমি বাঁধা দেব না! ... কি করে দেব? তোদেরকে যেই চেতনা এইরূপে পাঠিয়েছে, তাও তো আমার প্রিয়া স্বয়ং। আমার প্রিয়া যদি তোদের মাধ্যমে, আমার মাস আহার করতে চায়, তবে তাই সই"।

এমন বিচিত্র কথা বলে, শ্যামা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলে, সারমেয়রা শ্যামার বস্ত্রের বিভিন্ন অংশকে নিজেদের দন্তদ্বারা আকর্ষণ করে ছিঁড়ে নিলো আর শ্যামাকে প্রায় অর্ধনগ্ন করে দিলো। শ্যামার বাম ঊরুর ত্বক, দক্ষিণ নিতম্বের বেশ কিছুটা ত্বক, প্রায় সম্পূর্ণ নাভিদেশ, এবং পুরুষদের উকি মেরে দেখার ফলে, শ্যামার দক্ষিণ স্তনের নিম্নদিকের ত্বক সম্পূর্ণ ভাবে দর্শনিয় হয়ে গেল সারমেয়দের এমন আচরণের কারণে।

কিন্তু শ্যামা দাঁড়ালো না। সে অন্যদিনের মতই তাঁর এই ছেঁড়াফাটা বস্ত্র নিয়ে ফুলন্দি নদীকে অতিক্রম করা শুরু করে দিল। যখন নদীর অন্যপারে পৌঁছল শ্যামা, তখন ললিতাও গাছ থেকে নেমে গেছে, কারণ সারমেয়রা শ্যামার অঙ্গ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া বস্ত্রখণ্ড নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু তাও আজ ললিতা শ্যামার থেকে দূরে রইলনা। সারমেয়দের ভয়ে শ্যামার সাথে লেপটে রইল সে। আর সেই লেপটে থাকা অবস্থাতেই যখন শ্যামা ক্রন্দনের সুরে, "প্রিয়া" বলে সকলের দৃশ্যমান শ্যামার প্রেমিকের বক্ষে স্থাপিত হলো, তখন ললিতা কি দেখলেন, তা কারুর জানা নেই, কারণ ললিতা সম্পূর্ণ ভাবে হতবাক হয়েই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন।

অন্যদিকে, শ্যামাকে এমন অর্ধবিবস্ত্র অবস্থায় দেখে, তাঁর প্রেমিক ব্যস্ততার সাথে বলে উঠলেন, "তোমার কি হয়েছে শ্যামা! ... এমন অবস্থা তোমার কে করলে!"

শ্যামা ক্রন্দনের সুরে বললেন, "তোমার জন্য গোমাংস রন্ধন করে এনেছি। তুমি অন্যপ্রকার রন্ধন করতে বলে, গোমাংস প্রদান করলে, তাই সেটিই রন্ধন করে এনেছি"।

তাঁর প্রেমিক উচাটন হয়েই বললেন, "সে সব ভালো কথা, কিন্তু সেই কথা পরে শুনছি। ... আগে বলো তোমার এই অবস্থা কে করেছে!"

শ্যামা হেসে বললেন, "কাকে দোষ দিই প্রিয়া! ... সকলেই তো তুমি! ... সকল কর্ম তো তুমিই করো। তাই তুমি যা জ্ঞান প্রদান করেছ আমাকে, সেই নিরিখে বলতে হলে, তুমিই করেছ। ... কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, এহেন কর্ম তুমি কেন করলে! ... আমাকে এমন ভাবে দেখা তোমার সাধ ছিলো বলে, নাকি আমার পরীক্ষা নেবে বলে, নাকি তুমি আমার উপর রুষ্ট, তাই আমাকে এই ভাবে দণ্ড প্রদান করলে!"

তাঁর প্রেমিক বললেন, "দণ্ড! ... হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, দণ্ড। যারা এই কর্ম করেছে, তাঁরা অবশ্যই দণ্ডের ভাগীদার। আজ কেউ রক্ষা পাবে না আমার থেকে!" এই বলে অগ্রসর হতে গেলে, শ্যামা তাঁকে জরিয়ে ধরে বললেন, "না প্রিয়া, আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। তুমি তোমার কনো সন্তানকে কিছু দেখাচ্ছিলে, কিছু শেখাচ্ছিলে। হয়তো বিশ্বাসের পাঠ শেখাচ্ছিলে, বা হয়তো সমর্পণের পাঠ। ... ক্ষমা করো প্রিয়া, আমার আগ্রহ শোনো, তোমার ইচ্ছা ছাড়া একটি বৃক্ষের পাতাও নড়তে পারেনা । তা তোমার প্রিয়া এই শ্যামার সাথে এমন ক্রিয়া করার কথা ভাবতেও কি করে পারে, তোমার অঙ্গুলিহেলন ছাড়া! ... ওরা যা কিছু করেছে, তার জন্য ক্ষমা করে দাও প্রিয়া"।

শ্যামার প্রেমিক এবার গম্ভীর মুখ করে বললেন, "বেশ শ্যামা, এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম সকলকে, কিন্তু আগামীদিনে, তাঁরা যদি তোর ক্ষতি করার প্রয়াসও করে, আমি তাঁদের সকলকে

দণ্ড দেবই। তা তুই আমাকে আবাহন কর আর না কর। এখন আমার সাথে চল, নিজের এই বস্ত্র ত্যাগ করে, নূতন বস্ত্র ধারণ করবি চল। ... ললিতা! ... ললিতা!”

ললিতা যেন কোথায় হারিয়ে গেছিলেন। এবার ইহজগতে ফিরে এসে বললেন, “হ্যাঁ! ... ও হ্যাঁ, ... হ্যাঁ চলুন”। সতিশ ক্ষিতীশ একত্রে দ্রুতপদে পশ্চাৎধাবন করলেন, কিন্তু ফল সেই একই হলো উত্তরের বনে, আজ কেবল শ্যামার প্রেমিকই নয়, সঙ্গে শ্যামা আর ললিতাও উধাও হয়ে গেল।

মহেশ প্রশ্ন করলেন, “কি বুঝলেন প্রভু!”

সতিশ বললেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না মহেশ! ... যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম! ... কনো কিছুরই যেন মিমাংসা করতে পারলাম না! অনুসুয়াও অসুস্থ্ হয়ে গেল! ... এদিকে শ্যামার প্রেমিককে হাতে নাতে ধরতেও পারছিনা, কিন্তু শ্যামার ভাব অত্যন্ত দিব্য মনে হচ্ছে যেন। আবার মধুনটিকে নিয়েই চিন্তা হচ্ছে। ... পরে রইলো, আর দুটি ক্ষেত্র। বৃত্ত আর আপনার মণিধামে তো যাওয়াই হয়নি!”

গ্রামের মোড়ল বললেন, “আমাদের কাছে কিন্তু সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটা ঠক আর জোচ্চোর ওই শ্যামা। আমাদের গ্রামের সমস্ত পুরুষকে কামাগ্নিতে ভস্ম করে দিলো আজ! ... কোথায় পলায়ন করবে! রাত্রে তো আজ ফিরবেই! আজ ফিরুক, একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো। এই মেয়েকে গ্রামে রাখা যাবেনা। দরকারে মহারাজের দরবারে নিয়ে যাবো এই ছলনাময়ীকে”।

সতিশ ক্ষিতীশ সেই কথার প্রতিবাদ করলেন না, যেন তাঁদেরও সায় রয়েছে মোড়লমশাইএর কথাতে। সত্যই তো, শ্যামার যখন বস্ত্রের এমন অবস্থা হলো, তখন তো ওর শাড়ী পালটে ফেলা উচিত ছিল। ... আবার যদি ভক্তি আর সমর্পণের ভাব থাকে, তবে যা করেছে শ্যামা তাই উচিত ছিল। ... কিন্তু সেই ব্যক্তি তো আমাদের মা ননই, সে তো একটি পুরুষ, শ্যামার গোপন

প্রণয়! কি যে হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছেনা! ... শ্যামা ফিরলে, মোড়ল যখন ওকে চেপে ধরবে, তখন হয়তো রহস্যের উন্মোচন হবে"।

এই ভেবে, সতিশ ক্ষিতীশ দুই ভাই ও মহেশ ফিরে গেলেন মোড়লের গৃহে। রাত্রে কনো বোঝাপড়া হয়নি। তাই সকাল সকাল, পুর গ্রাম নিদ্রা ত্যাগ করার আগেই, সতিশ ক্ষিতীশ চলে গেলেন রাজপ্রাসাদে, বৃত্তের সাথে জবাকুসুম কি করে তা দেখার জন্য। পথে কেবল দেখলেন, রাত্রেই শ্যামার কুটিরকে অগ্নিদাহ করে দিয়েছে গ্রামের সকলে। ... তা দেখে, সতিশ ক্ষিতীশের হৃদয় একটিবারের জন্য ভয়ার্ত হয়ে উঠলো, যদি শ্যামা নিরপরাধ হয়! ...তাঁর প্রাণ নিয়ে নেয় নি তো উত্তেজিত গ্রামের মানুষ!

অগ্নিদগ্ধ স্থানে গিয়ে একটু এদিক সেদিক ঘেঁটে দেখলেন তাঁরা আর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, "না! কনো প্রাণীর দেহ নেই এখানে"।

সেই স্বস্তি নিয়ে চলে গেলেন তাঁরা প্রাসাদে, আর প্রাসাদে গিয়ে যেমনটা দেখতে পাবেন ভেবেছিলেন তাঁরা, তেমনই দেখলেন। জবাকুসুম একটি কুৎসিত দেখতে, একটি নেত্রে অন্ধ, অর্ধেক দাঁত বিনষ্ট, একটি হতকুচ্ছিত দেখতে মহিলাকে পাঠিয়েছেন বৃত্তের কাছে। বৃত্তের কাছে উপস্থিত হয়ে, সেই স্ত্রী বৃত্তকে বললেন, "হে মহাশয়! ... শুনেছি আপনার সাথে যা কিছু হয়, তাকে মাতা সর্বাম্বার নির্দেশ ও আদেশ বলে স্বীকার করেন, আর তা বিনা বিচারে গ্রহণ করেন I ... তো দেখুন আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। আমার এই রূপের কারণে, কেউ আমাকে বিবাহ করেনা, কিন্তু আমার পরিণয় ও স্বামীপ্রীতির খুব ইচ্ছা। কৃপা করে আমাকে আপনার স্ত্রী করে স্বীকার করে নিন!"

বৃত্ত হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই নেব। কি নাম আপনার! ... আর এমন দুর্দশা আপনার কেন হয়েছে! ... যাইহোক আপনাকে আর আপনার বেদনার কথা শোনাতে গিয়ে পুরনো বেদনাদায়ক স্মৃতির রোমন্থন করতে হবেনা। আসুন, মহারানীর কাছে যাই, তাঁর সম্মুখেই আমি

আপনাকে বিবাহের সম্মতি প্রদান করবো। ... একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার বস্ত্রটি পরিবর্তন করে আসছি"।

এই বলে বৃত্ত অন্দরে গেলেন, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিপাট করা ধুতি ও উত্তরীয় অঙ্গে ধারণ করে বাইরে এলেন। কিন্তু তার মধ্যে, বাইরে অনেক কিছুই হয়ে গেছে। ... বৃত্ত এই বিবাহে রাজি হয়ে গেলেন দেখে, জবাকুসুমের নেত্র ভরে আসে জলে। তাঁদের অন্তরে চরম বেদনা অনুভব করেন তাঁরা। তাঁদের অশ্রু দেখে, একটি দাসী মহারানীকে সেই সংবাদ দেন যে বৃত্ত তাঁর কন্যাদের ক্রন্দনে বাধ্য করেছে। মহারানী সেই কথা শুনে বাইরে আসেন, এবং সমস্ত কিছু দেখে নিজের কন্যাদের কীর্তি ভালোই বুঝে যান, এবং সেই কুৎসিত স্ত্রী, যিনি আসলে রাজপুরের একজন দাসী, তাঁকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন।

বৃত্ত বাইরে আসলে, মহারানী শাসনের সুরে তাঁর কন্যাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যা কিছু করেছ, তা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করো উনার কাছে"। ... দুই রাজকন্যা ইতস্তত করলে, মহারানী আরো কঠিন হয়ে বললেন, "কথা কানে যাচ্ছেনা! ... এক্ষণই সমস্ত কিছু স্বীকার করো ও ক্ষমা চাও"। ... দুই রাজকন্যা মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকলে, মহারানী বললেন, "বেশ করবে না তো, যা বললাম। আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, তোমরা যতক্ষণ না সমস্ত কিছু স্বীকার করে বৃত্তের কাছে ক্ষমা চাইবে, ততক্ষণ তোমাদের এই প্রাসাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ আর তোমাদের আহারও প্রদান করা হবেনা"।

জবাকুসুম এবার নতজানু হয়ে বৃত্তের সম্মুখে বসে বললেন, "ক্ষমা দেব! ... আপনার কথাতে যেই সমর্পণ দেখেছিলাম, সেই কথাতে আমাদের বিশ্বাস হয়নি। মনে হয়েছিল, এমন কি কেউ করতে পারে নাকি! সন্ন্যাসী হয়ে বিবাহ কেন করবেন! আর বিবাহ যদি করেনও, তাহলেও এমন কুৎসিত স্ত্রীকে কেন করবেন! তাই আমরা আমাদের এক দাসীকে সাজিয়ে গুঁজিয়ে নিয়ে আসি আপনার কাছে। ... আমাদের ভুল হয়ে গেছে দেব। আমাদের ক্ষমা করে দিন, কৃপা করে! "

মহারানী তাঁর দুই কন্যার নেত্রের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পেলেন, তাঁদের মনের কি ভাব। তাই বললেন, "বৃত্ত, তোমাকে এখন থেকে বেশ কিছুদিন একটি গোপন স্থানে থাকতে হবে, যেখানে স্থিত থাকলে, জবাকুসুম তোমাকে দেখতেও পারবে না। তোমার সঙ্গ লাভ করেছে তো ওরা, তাই তোমাকে বুঝতে পারেনি। এবার দাঁত না থাকলে দাঁতের মর্যাদা কি, তা ওদের বুঝতে দাও"। ... বৃত্ত মাথানত করে বললেন, "যথা আজ্ঞা মহারানী", এবং এই বলে মহারানীর সাথে অন্তঃপুরে চলে গেলেন তিনি।

ক্ষিতীশ ও সতিশও হাস্যপ্রদান করে, সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। ক্ষিতীশ বললেন, "ফেরার পথে একবার অনুসুয়ার আশ্রম আর মধুনটীর খবর নিয়ে যাই চলো"। সেই কথাতে সকলে সম্মত হয়ে, অনুসুয়ার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলেন সকলে।

মণিধামলীলা

সতিশ, ক্ষিতীশ ও মহেশ একত্রে অনুসুয়ার আশ্রমের নিকটে আসতে দেখেলেন, কনো চাঞ্চল্য নেই সেখানে। যেন কেউ নেই এই স্থানে। অন্দরে প্রবেশ করেও তারা প্রতিটি কুটিরকে পর্যবেক্ষণ করলেন, সেই কুটিরেরও পর্যবেক্ষণ করলেন যেখানে দেবী অনুসুয়াকে সঙ্গে নিয়ে তিন সেনাপতিকন্যা প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু কোথাও কারুকে দেখতে পেলেন না। যেন এই আশ্রম রাতারাতি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। একটি দিনের মধ্যে এমনভাবে এই আশ্রমকে পরিত্যাগ করা হলো কেন? এই বিষয়ে উত্তর পেলেন না কেউই, কারণ উত্তর দেবার জন্যও কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

কি যে হচ্ছে, তার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে, তাঁরা এবার নটিদের আবাসের দিকে অগ্রসর হলেন। সেই আবাসে যাবার পথে যেই বন আসে, যেখানে গতদিন তামস মধুনটিকে আক্রমণ করেছিল, সেখান দিয়ে যখন মহেশের সাথে দুই সর্বাম্বাপুত্র যাচ্ছিলেন, তখন তিনটি নটিকে আসতে দেখলেন তাঁরা আর নিজেদের মধ্যে কিছু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তালাপ করতেও দেখলেন। সেই দেখে তাঁরা ঝোপে লুকিয়ে এই নটিদের কথা শোনার প্রয়াস করলেন।

তাঁরা শুনলেন, এক নটি অন্য দুই নটিকে বলছেন, “এই শুনেছিস, কালকে নাকি রাজার ছেলে তামস মধুনটিকে আক্রমণ করেছিল। কেউ নাকি রাজার ছেলের উরুতে বাণ মেরে ঘায়েল করে দিয়েছে। ... কিন্তু তারপর থেকেই মধুনটি আর রুদ্রানটি উধাও! ... সকলে তো বলাবলি করছে, তামসই এই দুই নটিকে তুলে নিয়ে গেছে!”

অন্য নটি বললেন, ‘কি দরকার ছিলো বাবা! ... নটীর আবার চরিত্র। চরিত্র ঠিক রাখতে গেছে, নে এবার বলপূর্বক রমণ করবে, কেমন লাগে দ্যাখ। চরিত্র কি করে ধরে রাখিস, দেখবো এবার”।

আরকজন নটি হেসে বললেন, “দেখতে আর পাবি কি করে! ... কতই না আশা করেছিলাম, রাজ্যের সর্বাধিক সুন্দরী নটি হয়ে এসেছে, তাঁর রমণসুখ নিজের নেত্রে দেখবো। ... ধুস! ... সব ভেস্তে গেল। এবার সেই কথা কানে শুনেই ক্ষান্ত হতে হবে আর কি!”

ক্ষিতীশ ও সতিশ একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলাবলি করলেন, "উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল! ... মহারানীকে এই ব্যাপারে সূচনা দেওয়া আবশ্যক, চলো মহেশ"।

এই বলে তিনজনে দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করতে গেলে, বেশ কিছুদূর যাবার পথে, তাঁরা দেখলেন শ্যামার গ্রামের মোড়ল বেশ কিছু ষণ্ডামার্কা লাঠিহাতে ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে একদিকে হন্তদন্ত হয়ে যাচ্ছেন। সেই দেখে মহেশ প্রশ্ন করলেন, "ও মোড়লমশাই, এমন তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

মোড়ল সম্মুখে এসে বললেন, "আর বলেন কেন? জানেন কি হয়েছে কাল! ... শ্যামা আর ললিতা গ্রামে রাত্রে ফেরেই নি! ... আজ সকালে আমাদের গুপ্তচর খবর দিলো, তাঁরা নাকি মণিধামে লুকিয়ে রয়েছে। ... বার করছি ওদের লুকিয়ে থাকা! আজ ওই নচ্ছারির আসল চরিত্র মহারাজের সামনে নিয়ে যাবো। ... ধরে বেঁধে আনতে যাচ্ছি শ্যামাকে আমরা। আর যদি না আসতে চায়, তাহলে ওখানেই পিটিয়ে মেরে দেব ওই নচ্ছারীকে। ধরণীর বোঝা, এমন স্ত্রীদের হত্যা করাই উচিত"।

এই বলে সকলে দ্রুতবেগে ছুটে গেলে। সতিশ বললেন, "ভ্রাতা, আমাদেরও যাওয়া উচিত। এই সমস্ত কিছু আমাদের জন্যই শুরু হয়েছিল। শ্যামা নিজের কৃত্যের জন্য দণ্ড পাক, আমরাও চাই, কিন্তু পিটুনিতে হত্যা নয় তা বলে! সে তস্করি করেনি, হত্যাও করেনি। এই অনাচার আমাদেরকেই থামাতে হবে ভ্রাতা"।

ক্ষিতীশ বললেন, "হ্যাঁ, একটি অনাচারকে আটকাতে আরো একটি অনাচার করার কনো অর্থ নেই। ... চলো, মণিধামে চলো। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেই না হয় মহারানীর কাছে গিয়ে মধুনটিকে মুক্ত করা যাবে"।

অনুসুয়া মিনতি

মহেশ মণিধামের ঠিকানা জানে। সে ক্ষিতীশ ও সতিশকে তাঁর সাথে নিয়ে প্রবেশ করলো মনিধামে। বিচিত্র সেখানের মানুষজন। সকলে কর্ম করছেন বিভিন্ন রকমের, আর নিজেদের মধ্যে বলা বলি করছেন, তাঁদেরকে তাঁদের গুরু অর্থাৎ বিদ্যাপতি বলেছেন, ইচ্ছার থেকে মুক্ত হওয়াই লক্ষ্য। রাজা আমরা ইচ্ছামুক্তি হতে পারিনি বলে, আমাদের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু রাজা আমাদের পিতা। পিতা সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন, কারণ সন্তান পিতার মনের মত হতে পারেনি বলে। আমাদের এখন একটিই ইচ্ছা। আমরা আবার ইচ্ছামুক্ত হয়ে, আমাদের পিতার কাছে ফিয়ে যাবো।

ক্ষিতীশ সতিশ বেশ বুঝলেন, বিদ্যাপতি এঁদেরকে অপার স্নেহ দিয়েছে, কিন্তু নিজেদের কর্তব্যপদ থেকে অপসারিত করে নিজের কাছে রেখে দেন নি, বরং একজন আদর্শ আচার্যের ন্যায়, তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের উন্নত করছেন, যাতে তাঁরা নিজেদের কর্তব্যকে স্বীকার করে নিতে পারে। এমন দেখতে দেখতে, একস্থানে তাঁরা বৃত্তকে দেখতে পেলেন। আর দেখলেন জবাকুসুমকে। জবাকুসুম বৃত্তের চরণতলে পতিত হয়ে বলছেন, “আমাদের ক্ষমা করে দিন নাথ!”

বৃত্ত তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, “ওঠো জবাকুসুম। এমন কি কাজ করেছ তোমরা যে তোমাদের ক্ষমা করতে হবে!”

জবাকুসুম অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন, “নাথ, আমাদের পত্নী করে স্বীকার করে নিন। যখন আপনি আমাদের দাসীকে বিবাহ করতে রাজি হলেন, তখন আমরা নিজেদের অন্তরে বেদনার অনুভব করেছি, আপনাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার অনুভূতি, আর তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা তো আপনার হয়ে গেছিলাম বহুপূর্বেই, কেবলই নিজেদের অভিমান ত্যাগ করে এসে আপনাকে সেই কথা বলতে পারছিলাম না। ... আসলে আপনি সন্ন্যাসী জেনে আমরা বিবাহের

চিন্তা করতেই পারিনি, কারণ আমরা জানি সন্ন্যাসী বিবাহ করেন না। কিন্তু আপনি বিবাহ করতে রাজি হতে, আমাদের হৃদয় ক্রন্দন করে ওঠে!"

বৃত্ত হেসে বললেন, "জবাকুসুম, সন্ন্যাস মানে এমন কখনোই নয় যে কিছু করবো বা কিছু করবো না, এই ভাবের নিশ্চয় থাকে। সন্ন্যাস মানেই হলো নিজের অহং বোধ থেকে মুক্তি, নিজের কর্তা ভাব থেকে মুক্তি। নিজেকে আর কর্তা জ্ঞান না করা। এবার তোমরাই বলো, যদি কর্তাভাবেরই বিনাশ হয়ে যায়, তাহলে আর বিয়ে করবো এই ভাবই বা কি করে থাকে, আর বিয়ে করবো না এই ভাবই বা কি করে থাকে? এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যে আমাদের কর্তাভাবই আমাদেরকে দিয়ে গ্রহণ করায়। কিন্তু এক সন্ন্যাসী যে কর্তা ভাবের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, আর সেই কারণেই তো সে সম নাসি, অর্থাৎ আমার সম আমার কর্তাভাব, সেই কর্তাভাবের নাশই যে একমাত্র সন্ন্যাসীর ব্রত।

আর নিজের কর্তাভাবের নাশ হয়ে গেলে কি পরে থাকে? প্রকৃতির শাসন ও স্নেহ। প্রকৃতি এক সন্ন্যাসীকে শাসন করে বা স্নেহ করে যা দেবেন, যেই পরিচয় দেবেন, যেই বস্ত্র দেবেন, যেই আহার দেবেন, যেই ব্যক্তির সান্নিধ্য প্রদান করবেন, সমস্তই বিনাবিচারে গ্রহণ করা, এই এক সন্ন্যাসীর কর্তব্য। আর সেই প্রকৃতি শাসন করে বা স্নেহ করে যা কিছু ছিনিয়ে নেবে, তার প্রতি বিনা বিচারে মোহ ত্যাগ করা, এই তো হলো সন্ন্যাসীর ব্রত। এই ব্রত পালনের মাধ্যমেই তো এক সন্ন্যাসী উপলব্ধি করে যে প্রকৃতিই তাঁর আসল জননী, যিনি সর্বক্ষণ তাঁর খেয়াল রেখে এসেছে, এখনও রাখছে, আর চিরকাল রাখবে।

তাই জবাকুসুম, যদি এক সন্ন্যাসী নিজের কর্তাভাবকে রেখে দিয়ে, বিবাহ করবো বা বিবাহ করবোনা বলে, পশুমাস খাবোনা আর বৃক্ষমাস খাবো এই সমস্ত করে চলে, তবে তাঁর কর্তাভাবের নাশ কি করে হলো? যদি প্রকৃতি তাঁর সম্মুখে বিবাহপ্রস্তাব আনেন, তবে তাঁর কর্তব্য হলো সেই বিবাহকে প্রকৃতির নির্দেশরূপে গ্রহণ করা । যদি পত্নীতনুকে কিছুদিন পরে প্রকৃতি নিজমধ্যে লীন করে নেয়, তার কর্তব্য নির্দ্বিধায় সেই মোহ ত্যাগ করে, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া । সন্ন্যাসী মানে সংসার ত্যাগ নয় জবাকুসুম, সন্ন্যাসী মানে অহং ত্যাগ ।

যিনি নিজের অহং ত্যাগ করতে পেরেছেন, এবং নিজের কর্তাভাবের নাশ করে, নিজেকে প্রকৃতি ও সময়ের হাতের পুতুল করতে পেরেছেন, তিনি সংসারে থাকুন আর না থাকুন , গেরুয়া ধারণ করুন আর না করুন, তিনি অবশ্যই সন্ন্যাসী। আর যিনি নিজের কর্তাভাবের নাশ করেন নি, এটা করবো আর সেটা করবো না, এই করতে থাকেন, তিনি সংসার ত্যাগ করুন আর না করুন, তিনি গেরুয়া ধরুন আর না ধরুন, তিনি একজন বদ্ধজীব। আসলে জবাকুসুম, যে যত নিজেকে এটা করবো, সেটা করবোনা, এই শাসনের মধ্যে রাখার প্রয়াস করে, সে ততই বদ্ধ, কারণ এই যে এটা করবো আর সেটা করবো না যে সে বলছে, সেই কথা কে বলছে? তাঁর আত্ম?

না, সেই কথা তাঁর অহং বলছে। অর্থাৎ সে নিজের অহংএর সাথে সংসার করছে, যেখানে সে নিজে অর্থাৎ তাঁর আত্ম হলেন পত্নী, আর তাঁর অহং হলো সেই স্বামী যে নিজের স্ত্রীকে সর্বক্ষণ নিজের অধীনে স্থিত রাখতেই পছন্দ করেন। আর যে যতই নিজেকে প্রকৃতি ও সময়ের কাছে সঁপে দেয়, এবং নিজের কনো ভাবনাই রাখেন না, যা প্রকৃতি বলবে তাই করবো, যা সময় সমক্ষে নিয়ে আসবে, তাই করবো, তিনি তত অধিক মুক্ত । কেন? কারণ এই প্রকৃতি বা সময় যে স্বয়ং ব্রহ্মময়ীর শাসন আর প্রেম। তিনি সমস্ত অহংএর থেকে মুক্ত সন্ন্যাসী।

অর্থাৎ জবকুসুম, সন্ন্যাসী হয়ে ওঠো। নিজের অহংএর সাথে ঘরসংসার ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হও। যেই সংসার তুমি লাভ করেছ প্রকৃতির থেকে, সময়ের কারণে, তাকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া যায়না। সন্ন্যাস গ্রহণ করার নামে সেই সংসার ত্যাগ করার অর্থ, ঘোর সংসারী হয়ে ওঠা। হ্যাঁ, সেই সংসারে যারা নিবাস করছেন, তারা সকলেই প্রায় নিজেদের অন্তরে অসুরসাম্রাজ্য স্থাপন করে রেখেছেন, সকলেই রিপু পাশদের মজলিসে বসে থেকে, ভয়ানক আবেগরূপী অসুরদের সাথে ওঠাবসা করেন। আর সেই কারণে তাঁদের সাথে থাকার কারণে, সেই অসুররা তোমাদের মধ্যেও আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস করবে।

কিন্তু জবাকুসুম, তোমরা মহারাজের কন্যা। মহারাজকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখেছ তোমরা। কখনো কি দেখেছ মহারাজকে যে রণক্ষেত্র ছেড়ে তিনি পালিয়ে এসে ঘোষণা

করেছেন যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন? ... না, কখনোই তা দেখো নি। শত্রুর থেকে পালিয়ে শত্রুকে জয় করা যায় নাকি! ... তাই সন্ন্যাসীকেও জগন্মাতা সংসার দেন, কারণ সংসার মানেই শত্রুদের ঘনঘটা, সংসার মানেই মহা-অসুর সমস্ত আবেগদের ধুন্ধুমার, সংসার মানেই সমস্ত অসুরসেনা অর্থাৎ রিপুপাশ ও ইন্দ্রিয়দের আগ্রাসী ভাব যা সমস্ত পঞ্চভূতকে পরাভূত করে দেয়, যা অসুরসম্রাট অহংকে সিংহাসনে আঢ়ূর করে দেয়।

মন, বুদ্ধি, দেহ, উর্জা এবং প্রাণ সর্বক্ষণ এই আবেগদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকে, অসুরসম্রাজ্ঞী কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার শাসনকে স্বীকার করে নেয়। আর এই শত্রুবেষ্টিত স্থানেই তো সন্ন্যাসীকে প্রবেশ করতে হয়, এবং এই অসুরদের পরাজিত করে, মন, বুদ্ধি, দেহ, উর্জ্জা, এবং দেহকে এই সমস্ত অসুরদের কবল থেকে মুক্ত করতে হয়, এবং এঁদের দ্বারা আশ্রিত আত্মকেও এঁদের থেকে মুক্ত করতে হয় । এক মুক্ত আত্মই তো তাঁর পরমার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ করে ব্রহ্মে লীন হতে পারে।

যদি কারুর আত্ম মন, বুদ্ধি, দেহ ইত্যাদি পঞ্চভূতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সে কি ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ করতে পারে! ... তিনি সম্মুখে অবতার গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তাঁকে সনাক্ত করতে পারেনা আত্ম। আর যেই মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পঞ্চভূত আবেগ, কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার বশ, কল্পনার অঙ্গুলিহেলনে তারা আবেগে প্রবাহিত হয়, ইচ্ছায় বশীভূত হয়ে তারা ভ্রমব্রহ্মাণ্ডকে সর্বস্ব মনে করে, চিন্তায় তরান্বিত হয়ে অসীমকে সসীম মনে করে, তারাই তো আত্মকে বন্দি করে রাখে। ... আর সেই সন্ন্যাসী কি করে হয়, যে কল্পনা করে বসে রয়েছে যে বিবাহ করলে তাঁর পতন হবে, বা বিবাহ না করলে তাঁর উত্থান হবে!

সে সন্ন্যাসী কি করে হতে পারে যে নির্দিষ্ট বেশভূষা, নির্দিষ্ট আহার নির্ঘণ্ট, নির্দিষ্ট প্রথা রীতি বা রেওয়াজের পথে চলে? এই সমস্ত কিছুর নির্মাতা তো স্বয়ং অহংকার। এই সমস্তকে স্বীকার করে নেবার অর্থ তো অহংকারের বশীকরণ স্বীকার করা, এবং যুদ্ধ থেকে পলায়ন করে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাওয়া! ... তাই জবাকুসুম, সন্ন্যাসী সনাক্ত করতে শেখো প্রথমে। বেশভূষা, বিবাহ ও সংসার ত্যাগ, নিরামিষ ভোজন ইত্যাদি দ্বারা সন্ন্যাসীকে যতকাল সনাক্ত করতে

থাকবে, ততকাল নিজেকে মূর্খই করে রাখবে। সন্ন্যাসী তিনি যার কনো নির্দিষ্ট আহার নেই, কনো নির্দিষ্ট বস্ত্র নেই, কনো নির্দিষ্ট জীবনধারা নেই।

তার ক্ষুধা লাগলে, সম্মুখে যা কিছু আহার রূপে দেওয়া হয়, সে তাই গ্রহণ করে, নিরামিষ, আমিষ, উচ্ছিষ্ট, পরিত্যক্ত ইত্যাদি কনো কিছু বিচার না করেই যিনি আহার করেন, তিনিই সন্ন্যাসী। সম্মুখে যেই বস্ত্রই প্রদান করা হয়েছে, তা নোংরা হোক, ছিদ্রতা যুক্ত হোক, পরিত্যক্ত হোক, বা পরিপাট করা হোক, যেমনই হবে তাই যিনি ধারণ করেন তিনি হলেন সন্ন্যাসী। যেই অবস্থায় তাঁকে রাখা হবে, বিবাহিত বা অবিবাহিত, তাই তাঁর কাছে ঈশ্বরীর দান হবে। যদি বিবাহ করার নির্দেশ আসে, যেই পাত্রই বা যেই পাত্রীই তাঁকে প্রদান করা হবে, যিনি তাঁকেই নির্বিচারে গ্রহণ করবেন, তিনিই সন্ন্যাসী।

জবাকুসুম, যিনি নিজের জীবনে কি পেলাম, আর কি পেলাম না; কি হলে ভালো হতো, আর কি হয়ে খুব খারাপ হচ্ছে এই সমস্ত বিচার করে কর্ম করেন, তিনি কখনোই সন্ন্যাসী হতে পারেননা। কারণ? কারণ এই যে, যে পেলো বা পেলোনা, যার সাথে খারাপ হলো বা হলো না, এই বিচার করছেন তিনি, তা তিনি নন, তাঁর আত্ম নন, বরং তাঁর মিথ্যা পরিচয়, তাঁর অহং। আত্ম তো অজর, অমর, কনো কিছু তাকে আঘাত করতেই পারেনা। তাহলে সেই আত্মকে কনো পরিস্থিতি, কনো সম্পর্ক, কনো ব্যাধি, কনো আহার, কনো বস্ত্র কি ভাবে আঘাত করতে পারে! কি ভাবে কিছু দিতে বা নিতে পারে তাঁর থেকে! কি ভাবে তাঁকে ভালো বা মন্দ লাগা দিতে পারে! ...

আর যিনি এই সমস্ত আঘাতের থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি কেবল আভুসনেই সন্ন্যাসী, তিনি কেবল বচনেই সন্ন্যাসী, প্রকৃত অর্থে সন্ন্যাস ধর্মের সাথেই তিনি প্রতারণা করছেন, এবং ব্রহ্মময়ীর কাছে তিনি একজন প্রতারক সন্তান। ... জবাকুসুম, তোমাদের সন্ন্যাসীর ব্যাপারে যেই ভ্রম ছিল, সেই ভ্রম দূর করতেই আমার তোমাদের কাছে আসা। আর বিবাহ? হ্যাঁ তোমাদের বিবাহ অবশ্যই হবে, তবে আমার সাথে নয়, উচিত সময়

আসলে, সে পাত্ররা তোমাদের সম্মুখে স্বতঃই আসবেন, জগন্মাতার ইচ্ছার প্রবাহিকা, প্রকৃতি ও সময়ই তাঁদেরকে তোমার সম্মুখে নিয়ে আসবে”।

এই মহাজ্ঞান প্রদান করে, বৃত্ত জোর কদমে হাঁটা লাগালে, মোহগ্রস্ত জবাকুসুম তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে যান, কিন্তু যেমন ক্ষিতীশ সতিশ শ্যামার প্রেমিককে হারিয়ে ফেলতো বনের মধ্যে, তেমন করেই জবাকুসুম বৃত্তকে হারিয়ে ফেলে, ক্রন্দন করতে থাকলো। আর সেই সময়েই সতিশ ক্ষিতীশের দৃষ্টি গেল এক স্পষ্ট মিষ্ট কণ্ঠস্বরের দিকে। সেই স্বরকে অনুসরণ করে তাঁরা দেখলেন, সেনাপতির তিন কন্যা, পদ্মা-সতী ও বাণী অবস্থান করছেন। সেই দেখে আগ্রহী হয়ে সতিশ ক্ষিতীশ ও মহেশ সেই দিকে গেলেন, এবং বৃক্ষের আড়াল থেকে এই তিনকন্যার ভাষ্য শুনতে থাকলেন, এবং কীর্তি দেখতে থাকলেন।

তাঁরা দেখলেন, সেই তিন কন্যা সকল অনুসুয়া শিষ্যদের নিয়ে চলে এসেছেন এই মণিধামে, এমনকি তাঁদের গুরুকেও নিজেদের সঙ্গে এনে, তাঁর সেবা করছেন। আর অন্যদিকে, গুরু অর্থাৎ দেবী অনুসুয়া অসুস্থ, তাই তাঁর শিষ্য ও শিষ্যাদের ব্রহ্মচারণ শেখাচ্ছেন এই তিন কন্যাই।

তাঁরা শেখানোর সময়ে বলছেন, “ব্রহ্মচারণ অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় আচরণ। ব্রহ্ম অর্থাৎ শূন্য – মহাশূন্য। সেই শূন্য যার আদি নেই, অন্ত নেই, সীমা নেই, গুণ নেই। না তাঁকে ব্যক্ত করা যায়, আর না তাঁর চিন্তা করা যায়। আর সেই শূন্যের ন্যায় আচরণকেই বলা হয় ব্রহ্মচারণ”।

শিষ্য আর শিষ্যারা মনযোগী দেখে, তাঁরা আবার বললেন, “এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে দেহকামকে সংযমিত করতে পারলেই ব্রহ্মচারণ হয়ে গেল। ... প্রকৃত কথা এই যে, দেহকাম বিলুপ্ত হওয়া ব্রহ্মচারণের অভ্যাস নয়, ব্রহ্মচারণ অভ্যাসের ফললাভ। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচারণে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর মধ্যে দেহকামের ইচ্ছা, কল্পনা এবং চিন্তা, কিছুই থাকবে না, আর সেটিই প্রমাণ করে যে তাঁর ব্রহ্মচারণ সম্পন্ন হয়েছে”।

একটি শিষ্যা প্রশ্ন করলেন, “তাহলে আমাদের করনিয় কি? অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় আচরণের অর্থ কি?”

তিনকন্যা বলতে থাকলেন, “কি কি বস্তু তোমাদেরকে ব্রহ্মের ন্যায় আচরণ করতে দেয়না, তা আমাকে বলো একাক করে। তাহলেই কি আচরণ হওয়া উচিত স্পষ্ট হয়ে উঠবে”।

একে একে শিষ্য আর শিষ্যারা বলতে শুরু করলেন, “আমাদের রিপুগুলো, মানে কামনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এগুলো”। “আমাদের পাশ গুলো, মানে ভয়, হিংসা, লোভ, শঙ্কা এগুলো”। “এঁদের থেকে উৎপন্ন সমস্ত আবেগগুলো, যারা আমাদেরকে সর্বক্ষণ উত্তপ্ত করতে থাকে, আর আমাদের শূন্যতাকে অস্বীকার করে, আমাদেরকে সসীম, অন্তময়, গুণবান, ব্যক্ত আর চিন্তনীয় করে তোলে”। “আর এঁদেরকে ইন্ধন দেবার জন্য তো ইন্দ্রিয়রা আছেই”।

তিন কন্যা হেসে বললেন, “অর্থাৎ তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত চিন্তা, আর যেই অহং অর্থাৎ নিজের বিশেষ অস্তিত্বকে ঘিরে এই সমস্ত চিন্তা, কল্পনা, আর ইচ্ছা তোমাদেরকে আচ্ছন্ন রেখেছে। ... এঁদের থেকেই সমস্ত রিপু, ইন্দ্রিয়, পাশ, আবেগ, এঁদের সকলের জন্ম। আর এই সমস্ত কিছুর আধার হলো অহং, অর্থাৎ বিশেষত্ব। নিজেকে যে যত বিশেষ মনে করে, সে ততটাই অহংকারী, কারণ সে ততটাই নিজের অহং অর্থাৎ ভ্রমকে বেষ্টন করে অবস্থান করে।

অর্থাৎ, আমি দরিদ্র, আমি ধনবান, আমি মন্ত্রী, আমি রাজা, আমি প্রজা, আমি বৈদ্য, আমি কর্মচারী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি ভ্রাতা, আমি ভগিনী, আমি সোহিনী, আমি মোহিনী, আমি জাগরূক ব্যক্তিত্ব, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি মায়াবী, আমি করবী, আমি মুক্ত, আমি বদ্ধ – এই সমস্ত কিছুই হলো অহংকার, কারণ এই প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা ‘আমি’ কে বিশেষত্ব প্রদান করে চলেছ। আর যতই ‘আমি’ বিশেষ হয়ে উঠছে, ততই ব্রহ্মের অর্থাৎ শূন্যের আচরণ থেকে তোমরা বিমুখ হয়ে উঠছো, কারণ শূন্য তো নির্বিশেষ, শূন্য তো না ধনবান আর না দরিদ্র, শূন্য তো না মন্ত্রী, না রাজা আর না প্রজা, শূন্য তো না পিতা না মাতা আর না সন্তান। শূন্য তো সমস্ত কিছুই একত্রে, আবার একটিও নন।

তাই যখন যখন 'আমি অমুক', এমন ধারণা রাখছো। অর্থাৎ আমি ধার্মিক বা অধর্মী, আমি পাপী বা পুণ্যবান, বা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু, ততক্ষণই নিজের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব বা শূন্যত্বকে অস্বীকার করছো, আর তাঁর মত আচরণ করছো না, আর তাই ব্রহ্মচারণও করছো না। ... তখনই ব্রহ্মের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচারণের সূত্রপাত হবে, যখন তোমরা নিজেদেরকে নির্বিশেষ রূপে ধারণা করা শুরু করবে। এটা কেমন ধারণা!

আমি কেউ নই, আমি তাই যা সক্কলে। সক্কলেই সেই শূন্যের অবতার, আর আমিও তাই। সক্কলেই নিজের নিজের শূন্যত্বকে ভুলে রইছে, আমিও রইছি। সক্কলেই নিজের নিজের শূন্যত্বকে ফিরে পেতে চাইছে, আমিও চাইছি। কেউই সেই শূন্যত্বকে ফিরে পাবার পথ জানেনা, আমিও জানিনা। ...

আবার যখন উন্নত হয়ে গেলাম আর শূন্যত্বের ধারণা রাখা শুরু করলাম। তখন কি ধারণা করতে হয়। সক্কলে যেমন আমিও তেমন। যেমন জানুক আর না জানুক, মানুক আর না মানুক্ক, সক্কলেই নির্বিশেষ ভাবে সেই শূন্যেরই অবতার, আমিও তেমনই। তাও তো ভেদ একটা থেকেই যায়, তাই না! অর্থাৎ কেউ শূন্যত্ব নিয়ে চর্চা করছে না, আমি করছি। আমাদের অহং তখন ছটফট করে নিজেকে বিশেষ বলে দাবি করার। সে বলে, আমি বিশেষ, কেউ শূন্যত্বের ব্যাপারে জানেনা, কিন্তু আমি জানি।

আর যখনই এই বিশেষত্বকে ধারণ করে আমরা মনে করতে শুরু করবো, আমি জ্ঞানী, আমি যোগী, আমি সাধু, আমি ঋষি, আমি অবতার, তখনই পুনরায় ব্রহ্মচারণের নাশ হলো, কারণ আবার সেই 'আমি'ই ফিরে এলো। ... তাই তখনও নিজেকে এই পাঠ পড়াতে হয় যে, অবতার তো সকলেই, কারণ শূন্যই তো একমাত্র অস্তিত্ব, সকলে সেই শূন্যকে ধারণ করে রয়েছে বলেই তো অস্তিত্বে আছে। তাহলে আমি নিজেকে কেন অবতার বলছি আর তাঁদেরকে নয়! ... অবতার তো সকলেই। কেউ জীবকটি অবতার, অর্থাৎ নিজের নিজের ভ্রমে বদ্ধ হয়ে থাকা শূন্যের অবতার তাঁরা। আর আমি হয়তো ঈশ্বরকটি অবতার, অর্থাৎ সকলেই যে অবতার, তা বলার জন্যই ঈশ্বরের প্রেরিত দূত আমি। ...

সকলকে এটি বলার জন্য যে ভাই, তুমিও যা, আমিও তাই। আমিও যা তুমিও তাই। আমাকে দেখতে পাচ্ছ, আমি শূন্য। তুমিও তাই। নিজের ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা আর যেই অহংকে বেষ্টন করে এরা থাকে, সেই অহংকে ত্যাগ করো একবার, আমার কথার সত্যতা তোমরা অনুভব করতে পারবে। ... ভাইরা, বোনরা, আমাকে ভুলেও বিশেষ ভেবো না। আমি তাই যা তোমরাও। পার্থক্য কেবল একটিই, আর তা হলো আমি আমার সত্য জেনেছি, আর তোমরা নিজের সত্য না জেনে, নিজেকে অমুক তমুক ভেবে চলেছ।

আমার কথা শোনো, একবার নিজের ইচ্ছা, কল্পনা , চিন্তা আর অহংকে সরিয়ে দেখো। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে, যতক্ষণ তোমরা আমি অমুক, আমি তমুক ইত্যাদি ধারণা করে যাবে, ততক্ষণ অন্য কিছু হবার কামনা থাকবে বা লোভ থাকবে; যা হয়েছিলাম তার প্রতি মোহ থাকবে; যা হতে পারছিনা, আর অন্য কেউ হয়ে যাচ্ছে, তার প্রতি ঈর্ষা থাকবে, দ্বেষ থাকবে, হিংসা থাকবে; যা চাইছি তা হতে পারবো কিনা সেই নিয়ে শঙ্কা থাকবে। ... আর এই ভাবে তোমাদের অহং জাগ্রত থেকে, তোমরা অসীমের সন্তান হয়েও, সসীম হয়েই থাকবে।

তোমরা অনন্ত হয়েও, অন্তময় তোমরা, এই ভ্রমেই থেকে যাবে। তাই নিজের ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তাকে ত্যাগ করো, দেখবে তোমরাও তাই যা আমি। দেখবে তোমরাও ততটাই অবতার যতটা আমি। দেখবে তোমরাও সেই ব্রহ্মই আর আমিও। দেখবে তোমার আর আমার মধ্যে কনো ভেদই নেই। দেখবে আমিও নির্বিশেষ আর তুমিও নির্বিশেষ। ... আর যখন এমন হয় আমাদের সাথে, তখন আর দেহকাম আমাদের বিরক্ত করেনা। কেবল দেহকামই নয়, কনো কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা, অহং, আবেগ, কেউই আমাদের আর বিরক্ত করেনা, কারণ আমরা সকল কিছুর থেকে মুক্ত হয়ে গেছি।

অর্থাৎ ব্রহ্মচারণ হলো অহং-এর থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা, আর সেই আচরণকে নিজের চরিত্রে আনায়নের একটিই উপায়, আর তা হলো নিজের সমস্ত কল্পনা, সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত চিন্তাকে ত্যাগ করা। একবার তা ত্যাগ হয়ে গেলে, অহং বোধও ত্যাগ হয়ে যাবে, চমৎকারের ইচ্ছাও ত্যাগ হয়ে যাবে, আর যা পরে থাকবে তা হলো নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যিনি স্থান বিশেষে অবস্থান করেন না,

বরং এমন কনো স্থান নেই, এমন কনো পাত্র নেই, এমন কনো কাল নেই, যেখানে তিনি অবস্থান করেন না”।

দেবী অনুসুয়া যে কখন নিজের দ্বারে এসে এই তিনকন্যার কথা শুনতে শুরু করেছিলেন, কেউ সেই দিকে লক্ষ্যই করেন নি। এবার তিনি, তিনকন্যার নিকটে এসে, নেত্রপূর্ণ অশ্রু নিয়ে এসে, তাঁদের চরণে পতিত হয়ে গিয়ে ক্রন্দনের স্বরই বলতে থাকলেন, “তোমার এই কন্যা ব্রহ্মচারণের তত্ত্ব ধারনাই করতে পারিনি বলে, স্বয়ং এলে, এঁকে ধারণা প্রদানের জন্য! ... এতো করুণা তোমার! ... তুমি স্বয়ং এসেছিলে, তোমার সঙ্গ আমাকে প্রদান করে আমার সমস্ত জীবনকে ধন্য করে দেবার জন্য, আর আমি সমানে তোমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছি!

আজ যখন তোমাকে সঠিক করে চিনতে পারছি, তখন ইচ্ছা হচ্ছে যে তোমার কাছে বরদান কামনা করি যে আমাকে আরো বেশ কিছুদিন তোমার সঙ্গ প্রদান করো। জানিনা সেই সময়ে তোমাদের মাতা হয়ে থাকবো নাকি, তোমাদের কন্যা হয়ে থাকবো, কিন্তু সঙ্গ প্রদান করো। কিন্তু পরমুহূর্তে আমার জ্ঞাননেত্র আমাকে বলছে, এতকাল তো নিজেকে বিশেষ মেনে, তাঁর থেকে আলাদা থাকলি, আবার কিছুদিন তাঁর থেকে আলাদা থেকে, তাঁকেই বেদনা প্রদান করবি! ... আমি কি করি, আমাকে বলে দাও। বড়ই দ্বন্ধে পরে গেছি, তোমার সঙ্গ এই পঞ্চভূতের দেহকে দেবো নাকি তোমার কাছে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে, আজীবন তোমার সঙ্গে মিশে থাকবো। ... দুটির একটিও সুযোগ ছাড়তে চাইছে না আমার আত্ম আজ। দুটি সম্ভাবনাতেই মোহগ্রস্ত আমি আজ। এর নিরাময় কি বলে দাও আমাকে, করুণা করো আমার উপর, বলে দাও আমায়”।

তিনকন্যা এবার তাঁদের গুরুকে আঁকড়ে ধরলেন প্রবল আলিঙ্গনে। সেই দেখে ক্ষিতীশ সতিশ হেসে বললেন, “অদ্ভুত মিলন গুরুশিষ্যের! গুরু নিজের শিষ্যের মধ্যেই গুরু খুঁজে পেয়ে গেলেন। ... চলো মহেশ, এখানের থেকে যা শেখার সেই শিক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। এবার অন্যত্র চলো। ব্রহ্মচারণের চরম শিক্ষা লাভ হলো, যেমন বৃত্তের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসের চরম শিক্ষা লাভ হলো। আর এই দুই থেকে বুঝলাম যে যাহা সন্ন্যাস, তাহাই ব্রহ্মচারণ। সন্ন্যাসীকে যেই

অভ্যাস করতে হয়, তার নামই ব্রহ্মচারণ। ... এবার চলো, এখান থেকে অন্যত্র যাই। ... আমাদের শ্যামা কোথায়!"

মহেশের যেন ক্ষিতীশ সতিশকে আরো কিছু বলার ছিলো, কিন্তু তা না বলেই চলে গেলেন তাঁদেরকে নিয়ে মণিধামের অন্যদিকে।

নটি বিদ্রোহ

শ্যামার অনুসন্ধান করতে গিয়ে, এবার মহেশরা দেখা পেলেন মধুনটির। সঙ্গে রয়েছে রুদ্রানটিও। অক্ষত অবস্থায় তাঁদেরকে দেখে, বেশ স্বস্তি পেলেন ক্ষিতীশ ও সতিশ। অন্তরে অন্তরে মধুনটিকে তামস অপহরণ করে নিয়ে গেছে ভেবে, বেশ ভয় পাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই মনে করতেই ভয় এসে উপস্থিত। এই মণিধামে, তামস এসে উপস্থিত হলেন, আর তাও ঠিক মধুনটি ও রুদ্রানটির সম্মুখে।

সম্মুখে এসে বললেন, "কি মধুনটি, কি ভেবেছিলে, আমার থেকে পালিয়ে বেঁচে যাবে! ... আমি যে তোমার রস পান না করে, একপাও নড়ছি না এখান থেকে!"

ক্ষিতীশ ও সতিশ এই কথাশুনে উগ্র হয়ে উঠলেন, কিন্তু মহেশ তাঁদের দুইজনের হাত ধরে তাঁদের কর্ণকুহরের কাছে নিজের ওষ্ঠ নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনারা কিছু করলে, সকলে জেনে যাবে আপনারা কারা"।

সতিশ বললেন, "জানবে জানুক, তা বলে একটি পবিত্র স্ত্রীর চরিত্র হনন হবে, আর তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো!"

ক্ষিতীশ বললেন, "শান্ত হও ভ্রাতা। যদি একান্তই দেখি যে তামসকে প্রতিরোধ করার কেউ নেই, তখন না হয় ছদ্মবেশ ত্যাগ করতেই হবে। অবশ্যই মধুনটির কিছু হতে দেব না আমরা। তিনি অজান্তেও আমাদের গুরু। আমাদেরকে তপস্যা কি জিনিস, আর তপস্যার গভীরতা কি,

তা জানিয়েছেন। তাই তাঁর রক্ষা তো করবোই। কিন্তু তার আগে, পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তাও তো দেখা প্রয়োজন, তাই না! ... এটা তো আর নির্জন বন নয় যে, কেউ নেই মধুনটির রক্ষা করার জন্য। এখানে অনেক মানুষ উপস্থিত রয়েছেন। তাই তামসের জন্যও কাজ সহজ হবেনা। অবশ্যই ও মধুনটিকে অপহরণের প্রয়াস করবে, যদি সত্যিই করে এমন, তখন আমরা তার প্রতিকার করবো"।

ক্ষিতীশের কথা সত্য প্রমাণিত হলো, তামস এবার কনো কথাতে সময়ের অপচয় না করে, সরাসরি মধুনটির হাত ধরে, তাঁকে অপহরণের প্রয়াস করলো। কিন্তু এখানে বাঁধা সারলেন, রুদ্রানটি। ভয়ানক উগ্র হয়ে উঠেছে সে, আর উগ্র হয়ে গিয়ে সে তামসের ঊরুতে পদাঘাত করতে, তামস নতজানু হয়ে উপবেশন করতে বাধ্য হয়েছে।

তামস এবার রুদ্রানটীর এমন দুঃসাহস দেখে, ক্রুদ্ধ হয়ে আসালন করলেন, "রাজপুত্রকে প্রহার! এতো রাজবিদ্রোহের সমান। সেনা, এঁই স্ত্রীকে বন্দি করো। (ধূর্ত চালে) হ্যাঁ তবে, নিয়ে চলে যেও না, আগে এঁকে সম্ভোগ করবো, তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করো"।

তামসের অনুগত সেনা তামসের আজ্ঞার পালন করলে, দেবী রুদ্রা সত্য সত্যই রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। প্রচণ্ড প্রলয়ের ন্যায় তিনি একটি প্রজাকে ঘায়েল করে, তাঁর অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে, বাকি সমস্ত সেনার কারুর বাহুতে, তো কারুর উরুতে, মোক্ষম আঘাত প্রদান করে রক্তক্ষরণ করলেন, এবং সকল সেনাকে ঘায়েল করে দিলেন।

তামস সেই দেখে উগ্র হুঙ্কার ছাড়লে, সেনা সেই আহত অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সমস্ত হট্টগোলের কারণে, সেখানে উপস্থিত সকল প্রজা, এমনকি সেনাপতির তিন কন্যা, অনুসুয়া, সেখানে উপস্থিত মহারানী ও তাঁর সুপুত্র অলোক, এবং ছদ্মবেশে থাকা মহারাজ যিনি বিদ্যাপতিকে পরখ করতে এসেছিলেন, আর স্বয়ং বিদ্যাপতিও সেখানে এলেন।

মহারাজ নিজের ছদ্মবেশ ত্যাগ করবেন না করবেননা, এমন দোনামনা করে, ছদ্মবেশের অন্দর থেকেই বিদ্যাপতি ও তাঁর দ্বারা শিক্ষিত সমস্ত প্রজাকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, "এ তো রাজপুত্র আর তাঁর সেনা, সেই সেনাকে আক্রমণ! এতো রাজদ্রোহ! ... মহারাজকে সংবাদ পাঠাও। এই স্ত্রীকে তো কারাগারে নিক্ষেপ করা উচিত"।

এমন কথা শুনে, সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহারাজর দ্বারা নিষ্কাসিত প্রজা সম্মুখে এসে সমস্ত সেনাকে আটক করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকলেন, "আমরা তো মহারাজের নিষ্কাসিত প্রজা, তাই আমাদেরকে দণ্ড দেবার মহারাজের কনো অধিকার নেই। তাই এই সেনাকে আক্রমণের দায় আমরা নেব। আর যদি মহারাজ আমাদের দণ্ড দিতেও চান, আমরা তা মাথা পেতে নেব, কারণ তিনিই আমাদের সকলের পিতা। কিন্তু তা বলে, এই নিরপরাধ স্ত্রীকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষিত হতে দেবনা। ... ইনি মধুনটির চরিত্রের রক্ষা করেছেন। মহারাজ যদি তামস নিজের পুত্র বলে তাঁর প্রতি মোহান্ধ হয়ে, তামসকে নির্দোষ ঘোষণা করেও দেয়। আমরা তাঁর বিরোধ করবো। ... যেই পুরুষ স্ত্রীর চরিত্রকে সম্মান করেনা, সেই পুরুষ পুরুষ বলে পরিচিত হবারই অধিকারী নয়"।

মহারাজ দেখলেন, এই মোক্ষম সুযোগ বিদ্যাপতির পরীক্ষা নেবার। তাই ছদ্মবেশে থেকেই বললেন, "কেন নিজেদের মহারাজের কোপের পাত্র করছো এক অজানা স্ত্রীর চরিত্রের জন্য? এঁদেরকে মহারাজের হাতে তুলে দাও, উনি বিচার করবেন। তোমরা কি নিজেদের বিচারকের আসনে বসিয়ে ফেলেছ!"

প্রজারা বললেন, "বিচার অবশ্যই মহারাজ করবেন, কিন্তু এই সেনাকে আটকেছি আমরা সকলে, এই রুদ্রানটি একাকী নন। যদি রাজদ্রোহী ঘোষণা করতেই হয়, তবে আমাদের সকলকে রাজদ্রোহী ঘোষণা করতে হবে। ... এক স্ত্রী হয়ে অন্য এক স্ত্রীর চরিত্র রক্ষা করা যদি রাজদ্রোহ হয়, তবে আমরা সকলেই রাজদ্রোহী, কারণ আমরাও রাজার সেনাকে আটকেছি। ... মহারাজ আমাদের ইচ্ছা দমন করতে বলেছিলেন, আমরা তা পারিনি, তাই আমাদের নিষ্কাসিত করেছিলেন। আমরা হতাশ ছিলাম সেই কারণে।

আমাদের জননী, আমাদের মহারানী আমাদের হাত ছেড়ে দেন নি। তিনি আমাদেরকে সন্তানস্নেহেই আগলে রেখে, আমাদেরকে ইচ্ছাদমন করানোর জন্য মহাশয় বিদ্যাপতিকে আমাদের কাছে গুরু করে পাঠিয়েছিলেন। ইনিই আমাদের শিখিয়েছেন যে, অগ্নি উচ্চশিখা ধারণ করছেনা বলে, কাষ্ঠ প্রদান করা বন্ধ করে দিলে, আর কনোদিনই অগ্নি উচ্চতায় পৌছবে না, বরং সেই কাষ্ঠ প্রজ্বলনই বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কাষ্ঠ প্রদান করে যেতে হয়, আর অগ্নিকে প্রেরণা প্রদান করে যেতে হয় যাতে সে উচ্চশিখা ধারণ করতে পারে।

ইচ্ছামুক্তি হলো সেই উচ্চশিখার অগ্নি, আর আমরা সেই অগ্নিকে ধারণ করতে পারিনি বলে, মহারাজ আমাদেরকে কাষ্ঠ প্রদান করাই বন্ধ করে দিয়েছেন। আর আমাদেরকে রাজ্য থেকে নিষ্কাসিত করে দিয়ে, আমাদের অগ্নিকে নির্বাপণের উদ্দেশ্যে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। ... আমরা সেই জন্য মহারাজের উপর বিরক্ত ছিলাম। কিন্তু বিদ্যাপতি, আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, পিতা যদি সন্তানের উপর ক্রুদ্ধ হন, বিরক্ত হন, এর অর্থ এই নয় যে সন্তানও তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে দেবেন। তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন আমাদের ইচ্ছাদমন করতে, এবং পুনরায় মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, ঘোষণা করতে যে আমরা তাঁর যোগ্য সন্তান। ... আজ সেই সময় এসে গেছে। আজ আমাদের প্রমাণ দেবার সময় হয়ে গেছে”।

অন্যকিছু প্রজাও বলতে শুরু করলেন, “হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে। এবার আমরা মহারাজের কাছে নিজেদেরকে তাঁর যোগ্য সন্তান রূপে পরিচয় দেবই। নিজেদের রাজদ্রোহী করে স্থাপন করবো তাঁর কাছে, আর আমাদের জীবিত থাকার ইচ্ছাকে দমন করে, আমরা এই দুই পবিত্র স্ত্রীর মান রক্ষা করবো”।

মহারাজ নিজের প্রজাদের জন্য গর্ব অনুভব করতে থাকলেন, কিন্তু তিনি আরো পরীক্ষা করতে চান তাঁর প্রজাদের এবং প্রজাদের মাধ্যমে বিদ্যাপতির। তাই তিনি বললেন, “কিন্তু সেই ক্ষেত্রে, মহারানী মণিবালা আর বিদ্যাপতিও তো রাজদ্রোহই করেছে, রাজার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। তাই না!”

বিদ্যাপতিকে দেখে মনে হলো তিনি রাজামশাইকে সনাক্ত করে নিয়েছেন। তবে তিনি এও বুঝে গেছেন যে মহারাজ তাঁর প্রজাদের পরীক্ষা করছেন যে তাঁরা সত্যই ইচ্ছামুক্ত হচ্ছেন কি না। তাই চুপি সারে তিনি একটি কোণে দণ্ডায়মান রইলেন, সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ করে নিজের শিষ্য ও শিষ্যাদের উপর।

উত্তর প্রজাদের থেকেই এলো। রাজা আমাদের রাজ্যের সীমানা থেকে নিষ্কাসিত করে দিয়েছেন। আর মহারানী আমাদেরকে রাজ্যের সীমার মধ্যে প্রবেশ করাননি। পিতা আমাদের বাড়ির বাইরে বার করে দিয়েছেন আমরা অযোগ্য বলে। আর মাতা আমাদের পিতার আদেশের অবজ্ঞা করেন নি, তিনি আমাদের বাড়ির বাইরেই থাকতে দিয়েছেন। কিন্তু মাতা তিনি, তাই সন্তান কে জলে ফেলে দিতেও পারেন নি। সেই কারণে, অন্যরাজ্যের জমি ইজারা নিয়ে, সেই জমিতে তাঁর সন্তানদের রেখেছেন"।

অন্য একটি প্রজা বললেন, "আর সেই রেখে দিয়েও তিনি রাজার আদেশের বিরোধিতা করেন নি। তিনি একটিবারও বলেন নি যে আমাদের রাজা আমাদের থেকে ইচ্ছামুক্তির কামনা করে ভুল করেছেন। বরং তিনি আমাদের জন্য গুরু নিয়োগ করেছেন, যাতে আমরা আমাদের পিতার দৃষ্টিতে আবার দৃষ্টি রাখতে পারি, আবার যেন আমাদের পিতা আমাদেরকে তাঁর যোগ্য সন্তান জ্ঞানে নিকটে টেনে নেন। তাহলে মহারানী রাজদ্রোহী কি করে হলেন! "

অন্য একটি প্রজা বললেন, "সত্য কথা, রাজার নির্দেশকেই তিনি সম্মান করেছেন, তাহলে তিনি রাজদ্রোহী কি করে হলেন!"

অন্য একটি প্রজা বললেন, "আচ্ছা মহাজন, আপনি যে এতো রাজদ্রোহ রাজদ্রোহের কথা বলছেন, দেখুন আমরা তো সাধারণ প্রজা, আমরা রাজধর্মের কিই বা জানি আর বুঝি। আমাদের তো মহারাজকে নিয়ে ক্ষোভই ছিল, ইচ্ছা হয়েছিল যে আর কনোদিন আমাদের রাজার মুখও দেখবো না। কিন্তু আমাদের গুরু আমাদের রাজধর্মের শিক্ষা দিয়ে বোঝান যে, পিতার শাসনে সন্তানের মনে ব্যাথা হতেই পারে, তাবলে পিতা খলনায়ক হয়ে যান না সন্তানের কাছে।

... সেই কথা বুঝেও আমরা বুঝতে পারিনি যে সন্তান বেয়াদপি করলে, পিতা তাঁকে বকেন, শাসন করেন, কিন্তু বাড়ি থেকেই বার করে দেন! সেই কথাতেও আমাদের গুরু বলেছেন, পিতা রুষ্ট হয়েছেন এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কিন্তু মাতা তো আছেন, তিনি তো আর সন্তানকে অনাথ করে চলে যাননি!"

অন্য আরেকজন প্রজা বললেন, "বেশ সেই সমস্ত কিছু না বুঝলাম, আমাদের চারিত্রিক উন্নতিতে মহারাজ খুশী হননি। ... কিন্তু তাঁর যে এই পুত্র, তামস রয়েছেন, তাঁর চারিত্রিক উন্নতিতে রাজা খুশী তো! ... তিনি যে স্ত্রীদের অত্যাচার করেন, তাঁদের চরিত্র হনন করেন, এবং দেবী মধুর চরিত্র হননের প্রয়াস সেই দীর্ঘ ৫ বৎসর ব্যাপী প্রয়াস করছেন, তাঁর এই কর্মতে মহারাজের স্বীকৃতি আছে তো! ... আর যদি তা না থাকে, তবে তো ইনিও রাজদ্রোহই করছেন, তাই না!"

অন্য এক প্রজা বললেন, "সঠিক কথা, যদি রুদ্রানটি একটি স্ত্রীর চরিত্রকে রক্ষা করার প্রয়াস হয় রাজদ্রোহ, যদি মহারানীর সন্তানকে আগলে রেখে তাঁদেরকে পিতার দৃষ্টিতে সঠিক করে তোলা রাজদ্রোহ হয়, তবে এই রাজপুত্রের চরিত্রহীনতা কেন রাজদ্রোহ নয়! ... আমরাও রাজার পুত্র, কারণ প্রজার তো তিনি পিতাই। আর এই রাজপুত্র তামসেরও তিনি পিতা। ... এই রাজপুত্রের রাজদ্রোহ যদি রাজদ্রোহ না হয়, তবে মহারানীর কর্ম কি করে রাজদ্রোহ হয়! রুদ্রার কীর্তি কি করে রাজদ্রোহ হয়!"

আরো এক প্রজা বললেন, "আর যদি রাজপুত্রের চরিত্র সঠিক না হবার পরেও, তাঁকে রাজ্য থেকে নিষ্কাসিত না করা হয়, তবে আমাদেরকেই বা কেন করা হলো"।

আরো এক প্রজা বললেন, "না আমাদেরকে দণ্ড দিয়ে তিনি ভুল করেন নি। সত্যই আমরা ইচ্ছামুক্ত হতে পারিনি। আর আজ মহারানী আর গুরুদেব বিদ্যাপতির কৃপাতে যেইটুকু ইচ্ছামুক্ত হয়েছি, নিজের চিন্তা না করে কর্ম করতে গিয়ে, তাতে আমরা বেশ বুঝে গেছি যে ইচ্ছামুক্তি

কতটা প্রয়োজন রাজ্যের কল্যাণের জন্য। ... কিন্তু সন্তান তো যেমন আমরাও, তেমন রাজপুত্র তামসও। তাঁর ক্ষেত্রে এমন ব্যতিক্রম কেন? ... এই ব্যতিক্রম কি রাজদ্রোহ নয়!”

অন্য একজন প্রজা বললেন, “ওহে তুমি কি বলছো, সন্তান হয়ে পিতার চর্চা করা শোভা পায়না। ... তিনি আমাদের রাজা, আমাদের জনপ্রতিনিধি নন। তাই তিনি আমাদের পিতা। জনপ্রতিনিধি হলে, তিনি আমাদের দাস হতেন। আমাদের আদেশ পালন না করলে, আমরা তাঁর গর্দানও নিতে পারতাম। কিন্তু তিনি আমাদের রাজা। গুরুদেব কি শিখিয়েছেন? প্রজা যাকে নিয়োগ করেন, তিনি হলেন প্রজার দাস, আর ঈশ্বর যাকে নিয়োগ করেন, তিনি প্রজার রাজা। সন্তান হয়ে পিতার বিচার করে, প্রজা হয়ে রাজার বিচার করে, ভক্ত হয়ে ঈশ্বরের বিচার করে, কেন তুমি আমাদের গুরুদেবের অপমান করছো? তিনি কি আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন!”

অন্য এক প্রজাও একই সুরে বললেন, “সঠিক কথা ভায়া! ... স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের পালন করার জন্য তাঁকে আমাদের রাজা রূপে নিয়োগ করেছেন। তাই তাঁর বিচার করে তো স্বয়ং ঈশ্বরের নির্ণয়ের উপর প্রশ্ন চিহ্ন লাগাচ্ছ! স্বয়ং ঈশ্বরের উপর লাঞ্ছন লাগাচ্ছ!”

আরো একটি প্রজা বললেন, “আর আমাদের মহারানী! ... তিনি আমাদের মাতা! ... তাঁর পতির নিন্দা করে, তুমি কাকে ব্যাথা দিচ্ছ! যেই মাতা নিজের সর্বস্ব খুইয়ে তাঁর সন্তানদের বুকে আগলে রেখে শিক্ষিত করলেন, সেই জননীকে তুমি ব্যাথা দিচ্ছ ভায়া!”

অন্য এক মণিধাম নিবাসী বললেন, “ভায়া, এই মানুষ কথায় কথায় রাজদ্রোহ আর রাজার কাছে খবর দেওয়ার কথা বলেন। তাই নিশ্চয়ই ইনি রাজার কাছের লোক হবেন। ... ভায়া, এঁর কাছে ক্ষমা চাও। নাহলে এ যদি রাজাকে গিয়ে বলে যে আমরা রাজার নিন্দা করেছি, তবে এই দোষের ভার আমাদের শিরে নয়, স্বয়ং আমাদের গুরুদেব আর মহারানীর শিরে এসে পরবে। তাঁদের এই আত্মত্যাগ, আর এই অক্লান্ত পরিশ্রম সমস্ত মাটি হয়ে যাবে। ক্ষমা চাও ভায়া”।

অন্য আরেকজন বললেন, “কেবল ওই বা কেন? ও তো আমাদেরই একজন। এক পিতার এক সন্তান যদি ভুল করে, আর অন্য পুত্ররা যদি সকলে বলে আপনার এই পুত্র দোষী, এর অর্থ তো

এই দাঁড়ায় যে, সেই পুত্রকে পিতা অবহেলা করেছেন, আর তাই তাঁর মধ্যে সংস্কার জন্ম নেয়নি। ... তাই না! ... তাই কেবল সে-ই কেন, আমরা সকলে ক্ষমা চাই। আমরা সকলে ভুল করেছি রাজার বিচার করার প্রয়াস করে”।

আরো একজন স্ত্রী বললেন, “আর এই কথা তো সত্যও। আমরা আজ না আমাদের গুরুদেবের শিক্ষার কারণে মহারাজের বিচার করছিনা। কিন্তু আমরা প্রথমে তো তা করেছিলাম। ... তাই সেই কাজের ক্ষমা চাইতে কিসের কুণ্ঠা, যেই কাজ আমরা একদিন সত্য সত্যই করেছিলাম!”

মহারাজ নিজের প্রজাদের প্রতি আপ্লুত হয়ে উঠলেন, আর অনুভব করলেন যে তাঁর প্রজারা সত্যই তাঁর পরমাত্মীয়। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরে বিচার করলেন যে, “এরা তো ভুল কিছু বলেন নি! ... আমি আমার এক সন্তানকে নিষ্কাসিত করলাম কারণ তার চারিত্রিক উন্নতি হয়নি বলে, আর আমার অন্য ছেলেকে তো নিষ্কাসন করলাম না! তার তো চারিত্রিক উন্নতি হয়ই নি, উপরন্তু তাঁর চরিত্র পশুরও অধম হয়ে গেছে। ... আমার তো তাঁকে অনেক আগেই নিষ্কাসিত করা উচিত ছিল। দণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। এক রাজা যদি নিজের রক্তপরিচয়কে প্রাধান্য দেয়, তবে তিনি প্রজাকে কি ভাবে কর্তব্যের পাঠ পড়াবেন!”

রাজা যখন এই সমস্ত বিচার করছিলেন মনে, এবং দৃঢ়তা ধারণ করছিলেন, তামসকে কঠিন দণ্ড প্রদান করবেন বলে, তখন তামসের দিক থেকে সকলের আকর্ষণ চলে যাওয়ায়, তামস এর সুযোগ নেবার প্রয়াস করে। আর তাই সে পুনরায় মধুনটিকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে অপহরণ করার প্রয়াস করে, কিন্তু রুদ্রানটি যেন সদাসজাগ। তিনি উড়ন্ত চাকির মত ঘুরে গিয়ে, প্রবল বেগে, তামসের অপহরণের উদ্দেশ্যে প্রসারিত হস্তে কৃপাণের আঘাত করে, সেই হস্তখণ্ডকে তামসের দেহের থেকে পৃথক করে দিলেন, এবং সেই একই আঘাতে, তামসের গর্দানে তরবারির আঘাত করলে, তামসের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পরল, আর মৃত্যুর জন্য ছটফট করতে থাকে।

সেই দৃশ্য দেখে, সকলে এবার নিশ্চিত হয়ে গেল যে রুদ্রানটিকে আর রাজদ্রোহী আখ্যা থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে না, এবারে তিনি সেনাকে প্রতিঘাত নয়, স্বয়ং রাজপুত্রকেই হত্যা করে দিলেন! ... কিন্তু মহারাজ কিছু প্রতিক্রিয়া দেবেন, তার আগেই সেখানে একটি অন্যপ্রকার হুলুস্থুল লেগে গেল।

যেই লোকসমাগম হয়েছিল সেই স্থানে, তারই মধ্যে ছিলেন ফুলন্দি গ্রামের মানুষরাও, আর ছিলেন শ্যামা ও ললিতাও। গ্রামের মোড়ল ও অন্যান্য গ্রামবাসিরা শ্যামাকে আর ললিতাকে দেখতে পেয়ে, উচ্চৈঃস্বরে রব তুললেন, "ওই তো শ্যামা, ওই তো ললিতা!" এই বলে, সকলে তাঁদের পিছনে ধাওয়া করতে গেলে, শ্যামার হাতকে বলপূর্বক ধারণ করে, ললিতা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "পালা সই পালা। ... ওরা তোকে মেরে ফেলবে!" ... আর শ্যামাকে একপ্রকার বলের জোরেই টেনে নিয়ে যেতে থাকলেন।

বেশ কিছুক্ষণ শ্যামা কিছু বুঝতে না পেরে, ললিতার সাথে তালে তাল মেলালেও, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যামা শক্ত করে নিজের তনুকে আটকে ধরলে, ললিতা তাঁকে টেনে নিয়েও যেতে পারেনা। ললিতা সেই দেখে, উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকলেন, "সই চল। এঁরা এখন উত্তেজিত। এঁরা তোর বা আমার একটি কথাও শুনবে না। এখন এখান থেকে চল □□, নাহলে ওরা তোকে হত্যা করে ফেলবে"।

শ্যামা রক্ষণ

শ্যামা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে, নির্ভীকের মতন করে বললেন, "সই, হত্যা কেউ কারুকে করতে পারেনা। ... হ্যাঁ হত্যা করার প্রয়াস অবশ্যই করতে পারে অহং-এর প্রভাবে। কিন্তু তিনি জীবন নিতেও পারেন না, যিনি জীবন দেন নি। ... আমাদের জীবন দিয়েছেন আমাদের জননী, আমাদের প্রিয়া, আমাদের সর্বাম্বা। তিনিই একমাত্র আমাদের জননী। না তিনি আমাদের অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করে জননী নন। যার সন্তান ধারণ করে সকল স্ত্রী জননী হন, তিনিই হলেন

আমাদের সর্বাম্বা, আর তিনিই আমাদের জীবনদাত্রী। আর তাই তিনি ছাড়া আমাদের জীবনকে কেউ নিতে পারে না"।

শ্যামা দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে পরে পুনরায় বললেন, "যদি তাঁর ইচ্ছা হয় আমার জীবন এই ক্ষণে হনন করবেন, তবে তার মাধ্যম এঁরা হোক বা অন্য কেউ, বা স্বয়ং প্রকৃতি হোক, আমার জীবন এই ক্ষণেই আমার পঞ্চভূত দেহ ত্যাগ করবে, আর তাকে তুমি কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না সই। তাই কাকে ভয়? কিসের ভয়? আমার নিজের প্রিয়াকে আমি আজ ভয় করবো? ... যদি এই দেহে থেকে, আমার পক্ষে সত্য উদ্ঘাটন অসম্ভব হয়ে যায় আর, তবে তিনি আমার থেকে আমার এই জীবন নিয়ে যাবেনই। তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও সই। ...

যদি তোমার ভয় লাগে, তুমি আমাকে একাকী ছেড়ে দাও আর চলে যাও। আমার মাতা চলে গেছে, তুমি আমার সাথে ছিলে; আমার স্বামী চলে গেছে, তুমি আমার সঙ্গে ছিলে; আমার উপর লাঞ্ছন লাগানো হয়েছে, আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে, তুমি সঙ্গে ছিলে। তাই তুমি আজ যদি ছেড়ে যাও, আমার কনো অভিযোগ থাকবে না তোমার উপর। ... যাও ললিতা চলে যাও, আর মাতাকে মাতার কর্ম করতে দাও। আমার প্রেয়সী যা চান, তাই হবে। তার অন্যথা হবেনা"।

সতিশ আর ক্ষিতীশ শ্যামার বিশ্বাস দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন। এক প্রেমিকের উপর এতো বিশ্বাস। যদি শ্যামা ছলনাই করে থাকে এতকাল, এই নিশ্চিত মৃত্যুকে দেখেও সে একই প্রকার ছলনা করে যাবে! ... কিন্তু মোড়লদের কনো কাণ্ডজ্ঞান নেই আর। তাঁরা তাঁদের কর্তাভাবকে আহত হতে দেখেছে শ্যামার কারণে, আর তাই শ্যামার প্রাণ তারা হনন করবেই।

নিকটে এসে, তাঁরা নিজেদের লাঠির আঘাতে শ্যামার মস্তককে রক্তরঞ্জিত করে, তাকে ভূসায়িত করলো। ললিতা সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পরে বলল, "আমি থাকতে, আমার সইকে কে কেউ আঘাত করতে পারবে না। ... আগে আমাকে হত্যা করো, তারপর আমার সইকে"। ...

পুরুষরা দেহের বলে, ললিতাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলে, একটি পোড়া মাটির ডেলায় মাথা ঠুকে গিয়ে ললিতা সংজ্ঞা হারালো। সতিশ আর ক্ষিতীশ এখনো যেন শ্যামার পরীক্ষা করছে,

এমন ভাব নিয়ে বলল, "শ্যামা ডাকো তোমার প্রিয়াকে ডাকো। ... তোমার এখন সমূহ বিপদ। এখন যদি না ডাকো, আর কনো দিনও তাঁকে ডাকার সুযোগ পাবেনা"।

সতিশ ক্ষিতীশ এই কথা বলার কালে, শ্যামার তামার ন্যায় বর্ণের বেশ কিছু জায়গায় লাঠির আঘাত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, আর তার দেহ রক্তরঞ্জিত হয়ে চলেছে। এঁর মধ্যেও, শ্যামা হাস্যপ্রদান করে করজোর করে, সতিশ ক্ষিতীশের উদ্দেশ্যে বললেন, "প্রণাম হে সর্বাম্বাপুত্রগণ, আর ধন্যবাদ, আমাকে সঠিক সময়ে সঠিক বুদ্ধি প্রদান করার জন্য। ... হ্যাঁ, এবার আমার প্রিয়াকে অন্তিমবার ডাকার সময় হয়ে গেছে এই তনুতে থেকে। তাঁর কাছে আবদার করার সময় হয়ে গেছে যাতে, আমার পরের অবতারেও, তাঁকে এই অবতারের মত করেই যেন ভক্তি আর স্নেহ করতে পারি"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ একটু অবাকই হলেন তাঁদেরকে একদেখায় চিনে ফেলেছে শ্যামা, সেই জন্য। অতঃপরে তাঁরা আবার বললেন, "সেই ডাকার কথা বলছিনা শ্যামা, তোমার রক্ষণ করার জন্য তাঁকে ডাকবে না!"

শ্যামা রক্তাক্ত অবস্থায় হেসে বললেন, "প্রভু, আপনি হয়তো গ্রামের মোড়ল আর গ্রামের লোকদের দেখছেন আমাকে প্রহার করতে, কিন্তু আমি তো কেবল প্রিয়াকেই দেখতে পাচ্ছি। ... আমার প্রিয়াই তো এই ভাবে আমার জীবন নিয়ে, সকলকে দেখাতে চাইছেন যে, ঈশ্বর কেবলই স্নেহের ও প্রেমের পাত্র, ঈশ্বরের কাছে অনিত্য বস্তু কামনা করারই নয়। জীবন যে অনিত্য বস্তু, আমার প্রিয়ার কাছে যদি কিছু কামনাই করতে হয়, তবে নিজের এই অসত্য অহং ত্যাগ করে, চিরতরে তাঁতে লীন হয়ে যাবার কামনাই করবো"।

সতিশ ক্ষিতীশের বিস্ময় এবার চরমে উন্নীত হয়েছে। তাঁদের ভাবনা এখন তাঁদেরকে বলতে থাকলো, "না না, শ্যামা সাধারণ কেউ হতেই পারেনা। যদি সাধারণ কেউই হতো তাহলে এই চরম অবস্থায় নিজের ভেক খুলে দিতই। ... না না এবার কিছু করতে হবে আমাদেরকে!" অন্যদিকে শ্যামা এবার ধ্যনস্থ হয়ে গেছে, নিজেকে নিজের আরাধ্যের কাছে সঁপে দিতে শুরু

করেছে। এমন সময়ে ললিতার সংজ্ঞা ফিরে এসেছে। সংজ্ঞা ফিরে আসতে এবার সে সতিশ ও ক্ষিতীশের চরণের সম্মুখে এসে নিজের সখীর প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকলেন।

ললিতা বললেন, "প্রভু, আমার সইকে বাঁচান। ... আমি শেষ দিন স্পষ্ট মাতা সর্বাম্বাকে দেখেছি। আমরা দূর থেকে দেখতাম, তাই তাঁকে পুরুষ ভাবতাম নাকি তাঁকে পুরুষ করে দেখে ভ্রমিত হতে চেয়েছিলাম, সেই কারণে পুরুষ দেখতাম কিনা জানিনা। কিন্তু শেষদিন আমি তাঁকে দেখেছি। আর দেখার পরই আমি বুঝতে পারি যে সেই কথা কারুকে বলে বোঝানো যাবেনা। তাই সইকে নিয়ে এখানে চলে আসি। ... প্রভু আমার সইকে ওরা মেরে ফেলবে! কৃপা করুন হতভাগীর উপর। ... আপনাদের মাতার পরমদাসী সে। তাঁর প্রাণ রক্ষা করুন প্রভু কৃপা করে"।

এই কথা শুনে, সতিশ আর ক্ষিতীশের নয়ন জলে পরিপূর্ণ হলো, আর বিস্ময়ে তাঁদের সর্বাঙ্গ শিহরিত হতে থাকলো। ... কেবল মাত্র এই বিশ্বাসে যে যা কিছু হচ্ছে, তা মাতার ইচ্ছাতেই হচ্ছে, তার জন্য অঘোরে নিজের প্রাণ এই ভাবে নির্মম প্রহার সহ্য করে দেবে শ্যামা! ... না তা হতে পারেনা! ... ক্ষিতীশ উচ্চৈঃস্বর ধারণ করে বলে উঠলো, "আপনারা থামুন!"

কিন্তু কেউ ক্ষিতীশের কণ্ঠস্বর শুনতেই পেলেন না, কারণ অন্য একটি শব্দ ও কম্পনে, সকলের দশা মৃত্যু সমান হয়ে উঠলো। যেই দিক থেকে সেই বিকট শব্দ এলো, সকলের নজর সেই দিকে গেলে, রক্তাক্ত অবস্থায় স্থিত শ্যামারও ধ্যান ভঙ্গ হলো। সকলে প্রথমে কিছু দেখতে পেলেন না, কারণ চারিদিক কেবলই ধুলা ধুলা হয়ে গেছিল। কিন্তু যখন সেই ধুলার ভাব হ্রাস পেল, তখন সকলে দেখলেন, একটি প্রকাণ্ড আকারের দিগম্বরী নারী মূর্তি সকলের সম্মুখে স্থিত।

সকলে নিজেদের মস্তক উঠিয়ে সেই প্রকাণ্ড নারীমূর্তির আনন দেখার প্রয়াস করলে, মুহূর্তের মধ্যে সকলের নজর সেই দেবীর চরণে চলে যায়, কারণ শ্যামা নিজের ধ্যানভঙ্গ করা মাত্রই, সেই দেবীর চরণে পতিত হয়ে, ক্রন্দনের সুরে বলতে থাকলেন, "এই রূপ কেন ধরেছ প্রিয়া! ... এখনই এই রূপ ত্যাগ করো তুমি! ... এই রূপ ধারণ করার কালে, তোমার সমস্ত বস্ত্র, সমস্ত

অঙ্গ ঝলসে যায়! ... এই রূপ কেন ধরেছ তুমি! ... তোমার সৌম্যরূপে প্রত্যাবর্তন করো দেবী গুহ্যা!”

দেবী গুহ্যার কথা সকলে শুনেছিলেন, কিন্তু এই প্রথম তাঁকে প্রত্যক্ষ ভাবে সকলে দেখলেন। সে কি ভয়াল রূপ! সেই রূপ দেখে, সমস্ত ভুজঙ্গ ভূমিতলে লুকিয়ে গেছে, সমস্ত খগ বৃক্ষের পত্ররাজিদের আচ্ছাদনে নিজেদেরকে ঢেকে দিয়েছে। সমস্ত কিটপতঙ্গ প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি সংখ্যায় মৃত হয়ে ভূমিতে পতিত হচ্ছে! ... উপস্থিত সকলে তটস্থ হয়ে গেছে সেই রূপ দেখে। যার হাতে যা কিছু অস্ত্র ছিল, সমস্ত কিছু হাত থেকে ভূমিতে পরে গেছে। আর এই সমস্ত কিছুর সাথে যেই দৃশ্য কেউ অপেক্ষা করেনি, তা দেখে সকলে স্তম্ভিত।

সেনাপতির তিনকন্যা, পদ্মা, সতী ও বাণী, বৃত্ত, বিদ্যাপতি, তথা রুদ্রা সকলে সেই গুহ্যারূপের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। অতঃপরে, সেই রূপ স্নিগ্ধতা ধারণ করে, আকার সমান রেখেই, মাতা সর্বাম্বার রূপ ধারণ করলেন। মাতা সর্বাম্বাকে দর্শন করে, উপস্থিত সকলে নতজানু হয়েছেন। মহেশ সহ ক্ষিতীশ সতিশও নতমস্তক হয়েছেন, আর সাথে সাথে ক্ষিতীশ সতিশ বিস্মিতও হয়েছেন, তাঁদের মাতার এমন বিশালাকায় মূর্তি দর্শন করে।

মাতা এবার নিজের হাতে শ্যামার স্কন্ধ আকর্ষণ করে নতজানু অবস্থা থেকে উন্নীত করে বললেন, “হ্যাঁ আমিই তোর প্রিয়া। ... প্রমাণ দিতে এলাম যে, তুই আমার কাছেই ফুলন্দি নদীর তীরে নিত্য যেতিস। আমি তোকে আগেও বলেছিলাম, এরপরে যদি তোর পরীক্ষা নেবার প্রয়াস হয়, তবে আমি স্বয়ং এসে সকলকে দণ্ড প্রদান করবো। ... কিন্তু শ্যামা, সেই প্রতিশ্রুতি আমি কেবল তোকে দিই নি, আমি আমার সমস্ত ভক্তকে দিয়েছিলাম, আর তাই সমস্ত ভক্ত যতক্ষণ না আমার প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হলেন, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করছিলাম।

মধু আমার একনিষ্ঠ ভক্ত ও তপস্বী, যে নিজের চরিত্রকে আমার দানরূপে রক্ষণ করার তপস্যায় রত; মনিবালা আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, যে নিজের সমস্ত সঞ্চিত ধন ব্যয় করেও নিজের প্রজাদের নিজের বক্ষে আগলে রেখে প্রমাণ দিয়েছে যে মহারানী প্রকৃত অর্থে প্রজার জননী; জবাকুসুম

আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই তাঁদেরকে যতক্ষণ না সন্ন্যাসের মাহাত্ম বোঝাতে সক্ষম ছিলাম, ততক্ষণ আমি প্রকাশিত হইনি; অনুসুয়া আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, যে ব্রহ্মচারণের ধারণা না রাখলেও, তার অভ্যাসই করে গেছে আমার কাছে নিজেকে নিবেদিত করতে, আর তাই আমি তাঁকে ব্রহ্মচারণের জ্ঞান প্রদান করার পরেই প্রকাশিত হয়েছি। আর সবশেষে তুই শ্যামা, হ্যাঁ তুই আমার অত্যন্ত বিশেষ ভক্ত, যে নিজের প্রাণ প্রদান করতেও কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু বৈরাগ্য ধারণ করে থাকাই তোর তপস্যা।

আর আমার লিঙ্গ? আমার তো কনো লিঙ্গই নেই, আমার যে লিঙ্গ সম্ভবই নয়, কারণ আমি যে শূন্য, কারণ আমি যে নিরাকার, কারণ আমি যে অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য, অব্যাক্ত। যার চিন্তনই করা সম্ভব নয়, তাঁর লিঙ্গ কি ভাবে সম্ভব! যার ব্যাখ্যাই করা যায়না, তাঁর লিঙ্গ সম্ভব কি উপায়ে? তাহলে কেউ আমাকে পুরুষ আবার কেউ আমাকে স্ত্রীরূপে দেখেছে কেন? যার যেমন ভাব, সে আমাকে তেমন ভাবেই দেখেছে।

জবাকুসুম, যারা নিজেদের মধ্যে স্ত্রীতত্ত্বকে অনুসন্ধান করতেই পারছিলেন না, যারা সকল সময়ে এই ভাব মনে রেখে দিয়েছিলেন যে হয়তো তাঁরা পুরুষ হলেই ভালো হতেন, কারণ তাঁদের তো কনো পুরুষ স্ত্রী হবার মর্যাদাই দেয়না, তাঁরা আমাকে পুরুষ বেশে দেখেছে, যা দেখে, তাঁরা স্ত্রীতত্ত্বের সাথে পরিচিত হয়েছেন। সমস্ত প্রজা, এমন কি রাজা বসুও আমাকে বিদ্যাপতি অর্থাৎ পুরুষ বেশে দেখেছেন, কারণ তাঁরা পৌরুষের মদে অন্ধ ছিলেন, আর তাঁদের মধ্যের স্ত্রীরা পুরুষ মানেই অত্যাচারী, এই ধারণা নিজেদের অন্তরে ধারণ করে রেখে দিয়েছিলেন, তাই প্রকৃত পুরুষের সন্ধানেই তাঁরা আমাকে পুরুষ বেশে দেখে।

আবার যারা আমাকে সই করে পেতে চেয়েছে, যারা চেয়েছে যে আমার সাথে তাঁদের কনো ভেদই থাকবে না, সর্বক্ষণ একাত্ম হয়ে থাকবে আমার সাথে, তাঁরা আমাকে স্ত্রী বেশে লাভ করেছেন, যেমন মধু আমাকে রুদ্রারূপে তাঁর সখী করে পেয়েছে, শ্যামা তুই আর ললিতা আমাকে স্ত্রীবেশে লাভ করেছিস, আর মহারানী মণিবালা, তিনি তো স্বয়ং আমার থেকে আমার পুরুষ রূপকে কামনা করেছিলেন যাতে আমার পুরুষরূপ তাঁর কন্যাদের ও তাঁর স্বামীকে পৌরুষ

ও পুরুষের নরম হৃদয়ের সাথে আলাপ করাতে পারেন, তাই আমি তাঁর ইচ্ছাতেই বিদ্যাপতি আর বৃত্ত।

পরে রইল, ফুলন্দি গ্রামের সকলে আমাকে পুরুষ কেন দেখেছিলেন? ললিতা কেন আমাকে পুরুষ দেখতো আর কেন শেষ দিন, যখন শ্যামা তুই শতছিদ্র বস্ত্র ধারণ করে আমার কাছে এসেছিলিস, তখন সে আমাকে স্ত্রী বেশে কেন দেখলো। আর পরে রইল, কেন অনুসুয়া আমাকে কন্যাসমা বেশে দেখলো, এবং তা দেখেও সেই কেন আমাকে সনাক্ত করতে পারলো না, এবং কেনই বা আমাকে দেখা মাত্রই তাঁর যৌনতাধারণপর্বের সমাপ্তি হলো!"

দেবী অনুসুয়া ও দেবী মধু সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, করজোড়ে নতজানু হয়ে স্থিত হয়ে বললেন, "সমস্তটা বলো মা, আমরা সমস্তটা শুনতে চাই। আমাদের বিকারদের প্রত্যক্ষ করতে চাই আমরা! ... আমাদের উদ্ধারের মার্গকে সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে চাই আমরা"।

মাতা হেসে, এবার সামান্য নারীরূপে ধারণ করলেন, যাকে এবার কেবলই তাঁর ভক্তরা, যারা প্রথমসারিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে দেখতে, স্পর্শ করতে, এবং অনুভব করতে সক্ষম হন। আর সেই বেশে স্থাপিত হয়ে বললেন, "ললিতা ততক্ষণ আমাকে পুরুষ বেশেই দেখেছে, যতক্ষণ ও তোকে সন্দেহ করেছে শ্যামা। সে তোকে নিজের থেকেও অধিক বিশ্বাস করে, নিজের থেকেও অধিক স্নেহ করে, আর সেই তোকে যখন থেকে সে সন্দেহ করা শুরু করলো, তখন থেকে তোর প্রাণের সই, অর্থাৎ আমাকেও ও সনাক্ত করতে পারলো না, আর আমি তাঁর সই না হয়ে, তাঁর কাছে এক পুরুষ রূপ হয়ে স্থপিত রইলাম।

এই একই সন্দেহের কারণে, আমার পুত্রদ্বয়, ক্ষিতীশ ও সতিশ, যারা জয় ও বিজয় হয়ে এতকাল তোমাদের সকলের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও হয়। যখন আমি মাতা, তখন আমার কাছে সকলেই সমান, সকলেই সন্তান, কিন্তু ক্ষিতীশ সতিশ তাঁদের মাতাকে জানতে বিশুদ্ধে বিচরণ করেনি। তাঁরা পরানিয়তি সর্বাম্বাকে জানতে এখানে স্থিত ছিল। আর যখন সে আমার

ঈশ্বরত্বকে জানতে চাইছে, তখন তো এও স্বাভাবিক যে ঈশ্বরীর দৃষ্টি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত, শ্রেষ্ঠ তপস্বী, সত্যকামী, এবং সত্যনিষ্ঠদের দিকে অধিক স্নেহবান হবে।

হ্যাঁ এটিই সত্য, জগন্মাতার দৃষ্টিতে কেউ তাঁর অধিক প্রিয় সন্তান নয়, কেউ তাঁর কম প্রিয় সন্তান নয়; কিন্তু ঈশ্বরী সর্বাম্বার কাছে সত্যকামী, তপস্বী এবং সর্বস্ব সমর্পণ করা ভক্তই সর্বাধিক প্রিয়, আর তাঁরা এতটাই প্রিয় তাঁর কাছে যে, সে তাঁদের জন্য নিজের ঈশ্বরত্বও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আর ক্ষিতীশ সতিশ যেহেতু ঈশ্বরীকে জানতে ও চিনতে এসেছে এখানে, তাই তাঁরা নয়, শ্যামা, মণি, মধু, অনুসুয়া আর জবাকুসুমই আমার সর্বাধিক প্রিয়। আর সেই কারণে যেইমুহূর্তে তাঁরা শ্যামাকে সন্দেহ করে, সেই মুহূর্তে যেমন ললিতা আমাকে আমার সর্বাম্বারূপে দর্শন করতে পারেনি, তেমন ক্ষিতীশ সতিশও পারেনি।

যখন সেই দিন, শ্যামার করুন অবস্থা, এবং পরীক্ষার অন্তিম চরণে তাঁকে স্থাপিত হতে দেখেও, নিজের আরাধ্যের জন্য সর্বত্যাগী মহাবৈরাগী রূপে দ্যাখে, তখন ললিতা তাঁর প্রাণপ্রিয়া সখীকে আর কনো শর্তে সন্দেহ করতে নারাজ হয়ে যায়, আর তাই সে আমাকে সর্বাম্বা বেশে দেখে সেদিনকে। যে সত্যকামীকে, তপস্বীকে, প্রেমীকে, বা সমর্পিতকে যখন যখন সন্দেহ করবে, তাকে আমি তখন তখন ভ্রমিত করতে থাকবো, আর সেই ক্ষেত্রে সতিশ ক্ষিতীশ আমার পুত্র বলেও ছাড় পাবেনা, আর অখণ্ড আমার স্বামী বলেও ছাড় পাবেনা।

মধু আমার প্রিয়তম তপস্বী। সে ভীত নয় নিহত হতে, সে ভীত নয় অনাহারে প্রাণ হারাতে, কিন্তু সে ভীত তাঁর কৃত্যে যেন আমি অপমানিত না হই, সেই জন্য। নিজেকে সুন্দরী রূপে সে সনাক্ত করেছে, কিন্তু সেই রূপ দেখার পরেও এবং পরবর্তীতেও তাঁর সেই রূপের প্রতি অহংকার জন্মায় না। বরং তাঁর হৃদয় তাঁকে একটিই কথা বলে যে, এই রূপ আমার দান, তাই এই রূপের কাছে যেই যেই প্রলোভন আসবে, তাকে নস্যাৎ করে, সেই রূপকে আমার চরণে স্থাপিত রাখবে সে।

শ্যামা, তোর মতই তারও অতি পবিত্র ভাব, সে নটি হবার পর প্রলোভনের উচ্চসীমাও দেখে ফেলে, কিন্তু যেহেতু আমি নটেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ, সেহেতু ধনবানদের ডাকে সারা না দেবার জন্য মৃত্যু আসলে, তাও স্বীকার করতে রাজি হয়, কিন্তু কনো শর্তে নিজের নটিচরিত্রকে কলঙ্কিত করতে দেবে না, কারণ একটি নটীর চরিত্রনাশের অর্থ, সেই কলঙ্ক আমার উপর লাগবে, আমাকে তা কলঙ্কিত করবে। তাই আমি যেমন তোর সই হয়েছিলাম, তেমনই মধুরও সই হয়ে অবস্থান করছিলাম, এবং তামসের থেকে তাকে রক্ষা করে যেতাম।

ভাব উদ্ধার

আর অনুসুয়া! অনুসুয়ার ব্রহ্মচারণের ধারণা সঠিক ছিলনা; তাঁর ধারণা ছিল যে যৌনতা ধারণই হলো ব্রহ্মচারণ। অনুসুয়া, যৌনতা তো আমারই দান, যাতে তার ব্যবহার সকল জীব করে। এঁর ব্যবহারে, শূন্যতার অর্থাৎ সত্যের অনুভব প্রদান করি যৌনসঙ্গমের অন্তিম পলকে। এঁর মাধ্যমে আমি সেই সমস্ত আত্ম, যারা সত্যলাভ করেননি, তাঁদেরকে বারংবার দেহ প্রদান অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড রচনার সুযোগ দিই, যাতে তারা সত্যলাভ করতে সক্ষম হয়। আবার এঁর মাধ্যমে আমি প্রলোভন প্রদানও করি সাধকদের, তপস্বীদের, তথা প্রেমিকদের সঙ্গমসুখের। সেই প্রলোভনকে সংযত রেখে, তাঁরা যখন কেবলই আমার সন্তানের জন্মপদ্ধতিকে প্রসারিত করার জন্যই যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন, এবং অন্য সমস্ত সময়ে এই যৌনতাকে অপ্রয়োজনীয় প্রলোভন জ্ঞানে দূরে রেখে দেয়, সেই তো আমার পরীক্ষায় সফল হয়!

সেই যৌনতাকে জীবন থেকে কেটে ফেলে দেওয়ার চিন্তা যে আমার তপস্যা নয়, কারণ এই কর্মের মাধ্যমে যে বৈরাগ্য স্থাপন হয়না অনুসুয়া! ... বৈরাগ্য অর্থাৎ আসক্তি ও বিরক্তি, উভয়ের থেকে চিরতরে মুক্তি। আসক্তি ও বিরক্তি কার থেকে আসে? কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার থেকে আসে। তাই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকে ত্যাগ করে যিনি সত্যের কাছে অর্থাৎ আমার কাছে সমর্পণ করেন, তিনিই তো বৈরাগী, যেমন শ্যামা। শ্যামাকে দেখ অনুসুয়া, সে কনো কিছুতেই না বলেনি।

কনো ফল পায়নি, দুগ্ধ পায়নি, গোমাংস পেয়েছে, তাকেই আমার ইচ্ছারূপে গ্রহণ করেছে। কই, সে তো নিজের ইচ্ছাকে বা চিন্তাকে গুরুত্ব প্রদান করলো না! তাঁর বস্ত্র সিক্ত, রক্তের গন্ধযুক্ত যা আগেই সে জেনে গেছিল, সহস্র ছিদ্র যুক্ত, তাও যেহেতু আমি তাঁকে সেই বস্ত্র পরিধান করতে বলেছি, তখন সেইটিই তাঁর কাছে সমস্ত কিছু। সে জ্ঞানী, তাই স্পষ্ট ভাবে জানে যতটা আমি একটি মানুষে থাকি, ততটাই থাকি একটি কিট, পতঙ্গ, সারমেয়, সকল কিছুতে। তাই সারমেয়রা যখন তাঁর উপর আক্রমণ করলো, সে একটিবারের জন্যও তাঁদের থেকে ভীত হলো না, বরং সে বলল, যদি মাতা আমার এইভাবে নাশ চান তখন এটিই সঠিক। সে বলল, আমার পশ্চাৎ থেকে আমাকে আহার করা শুরু কর, যাতে আমি আমার আরাধ্যার সম্মুখে উপস্থিত হতে পারি, তোমাদের আহার সমাপ্ত হবার আগেই, এবং কেন সে আমার কাছে পৌছাতে চাইলো? না! প্রাণভিক্ষা পেতে নয়, এই কামনা করতে যাতে পরের দেহতেও তাঁর আমাতেই মন থাকে। ...

এই হলো বৈরাগ্য অনুসুয়া, যেখানে আমার কি চাই, আমার কি প্রয়োজন, আমার কি দরকার, কি হলে আমার ভালো হতো, কি হলে আমার ভালো লাগতো, এর বোধও থাকেনা অন্তরে। ... কিন্তু যদি এমন বিচার থাকে অন্তরে যে এটি হলে ভালো, আর অন্য কিছু হলে মন্দ, তাহলে যেমন তুমি করেছিলে পদ্মাদের প্রথম দেখা দেখে, তেমনই হবে। যেমন তুমি তাঁদেরকে তোমার আশ্রম থেকে বিতাড়িত করার জন্য সঙ্গমদৃশ্য দেখিয়েছিলে, তেমনই ভাব আসবে।

আর যখন যখন এমন ভাব আসবে, তখন তখন সাধকের স্খলন অনিবার্য, যেমন তোমার হয়েছিল। কিন্তু কেন অনিবার্য? বৈরাগ্যের পতন হয়েছিল, যেই মুহূর্তে তুমি নিজেকে আর নিজের শিষ্যশিষ্যাদের সুরক্ষিত করতে কর্তা হয়ে উঠে, পদ্মা, সতী আর বাণীকে সঙ্গমদৃশ্য দেখতে প্রেরণ করেছিলে। ... ব্রহ্মচারণের অর্থ হলো ইচ্ছা, কল্পনা, এবং চিন্তার থেকে চিরতরে মুক্তি, কারণ এরাই যে কর্তা ভাবের জন্ম দেয়। আর যেই মুহূর্তে কর্তা ভাবের জন্ম হয়, সেই মুহূর্তেই তো তুমি আমাকে হারিয়ে ফেলছিলে অনুসুয়া! ... খেয়াল করে দেখো! যেই ক্ষণে তুমি কর্তা হয়ে উঠে, পদ্মাদের বিতারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে, সেই মুহূর্তে আমি কোথায় ছিলাম

তোমার অন্তরে! ... তোমার মন, বুদ্ধি, দেহ, উর্জা বা প্রাণ, বা আত্ম কে স্মরণ করছিল আমাকে?

কেউ নয়। বৈরাগ্যই হলো সেই অস্ত্র, সেই মোক্ষম অস্ত্র যা এক প্রেমীকে আমাতে নিবদ্ধ করে রেখে তপস্যা করায়। যিনি বৈরাগী তিনি নিজেকে দেখতেই পান না, কেবল আমাকে দেখতে পান। যেমন শ্যামা দেখতে পায়নি কিসে তাঁর ভালো, সে কেবল দেখেছে আমি কি চাইছি তাঁর থেকে। যেমন মধু দেখতে পায়নি, কিসে তাঁর ভালো, সে কেবল আমার উপর যাতে কলঙ্ক না লাগে, সেই চিন্তায় মত্ত। যেমন মনিবালা দেখতে পায়নি, কিসে তাঁর ভালো! স্বামীর বিরুদ্ধে, সকলে বিরুদ্ধে গিয়ে, নিজের সমস্ত সঞ্চিত ধন ব্যয় করে দিয়ে, আমার কাছে সে এসেছিল, জননীর মত এসে আঁচল প্রসারিত করে, তাঁর এই প্রজা, এই সন্তানদেরকে ইচ্ছামুক্ত করে তুলে, পুনরায় তাঁদেরকে পিতার অর্থাৎ মহারাজের সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রস্তুত করার নিবেদন নিয়ে আমার কাছে।

কেন করলো সে এমন! সে তো আমার একনিষ্ঠ ভক্ত। আমার থেকে সে তো অলিক কিছুও চাইতে পারতো। কিন্তু না, তিনি যে জননী! ... তাই সন্তানকে প্রস্তুত করার চিন্তা করেছেন তিনি। ... একমাত্র বৈরাগ্য থাকলেই, এই রূপ ক্রিয়া সম্ভব অনুসুয়া। এক বৈরাগীই নিজকে ভুলে যেতে পারে, আর আমার কাছে নিজেকে সমর্পিত করে দেয়। অনুসুয়া, স্বরূপে তো সকলেই আমি। আর আমি কে? আমি তো অসীম। তাই পুত্রী, যদি তুমি থাকো তাহলে আমি কি করে থাকতে পারি! ... তোমার উপস্থিতিই তো আমাকে অসীম থেকে সসীম করে দেবে, তাই না! ... কিন্তু শ্যামার কাছে, মধুর কাছে, আর মনির কাছে, আমি অসীমই রয়ে গেছি, কারণ তাঁরা তো নিজেকে আমার মধ্যে হারিয়েই ফেলেছে; খেয়াল করে দেখো অনুসুয়া; নিজের মধ্যে আমাকে লয় করে আমাকে সসীম করেনি তাঁরা, বরং আমার মধ্যে নিজেদের লয় করে, আমার অসীমত্বকে অক্ষুণ্ন রেখে গেছে। আমাকে ছাড়া তো তাঁরা কিছু দেখতেই পায়না। সমস্ত কিছুতে আমার নির্দেশ, আমার কলঙ্ক, আর আমার আদেশকেই তারা দেখে। কিন্তু কি করে? আসলে তাঁরা যে আমাতেই নিজেদের লীন করে দিয়েছে।

মনিবালা যখন মহারানী হয়েছিল, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আজ থেকে তুমি এই সমস্ত প্রজার জননী, দেখো যেন এঁদেরকে কখনো অনাথ না হতে হয়, দেখো যেন এঁদের সাথে কনো অবিচার না হয়, দেখো যেন নিজের সমস্ত সন্তানের মধ্যে কনোদিনও যেন ভেদভাব না করো। ... মনিবালার কাছে তা আমার অনুরোধ ছিল, কিন্তু তাঁর কাছে তো আমি অসীম, তাই আমার অনুরোধও তাঁর কাছে আদেশ, আর সেই আদেশের পালন করার জন্য, সে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে নিজেকে উন্নীত করে নিয়ে গেছে। নিজের গর্ভজাত পুত্রদের সাথে প্রজার কনো ভেদ করেননি তিনি, আর তাই তো প্রজার কাছে তিনি তাঁদের প্রিয়তমা জননী।

কিন্তু তুমি আমাকে স্নেহ করেও, আমার ভক্তি করেও, কর্তাভাবকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছিলে। নিজেকে আমাতে নয়, আমাকে নিজেতে লয় করতে চেয়েছিলে নিজের কর্তা ভাবের কারণে, আর তাই আমি তোমার কাছে অসীম সর্বাম্বারূপে আসতেই পারিনি, এসেছি আমার খণ্ডিত সসীম ত্রিদেবী রূপে, আর সেই ভাবে এসে, তোমার কর্তাভাবের ছবি তোমাকেই দেখালাম, আর তা দেখা মাত্রই, তুমি তোমার যৌনসংযম হারিয়ে ফেললে, আর তোমার ভাষায় তুমি তোমার ব্রহ্মাচারণ হারিয়ে ফেললে। কিন্তু তুমি তো আমার প্রদান করা শিক্ষা শুনে আমাকে সনাক্ত করেছ। তাহলেই বলো যতদিন তোমার ধারণা অনুযায়ী তুমি ব্রহ্মচারনে সফল ছিলে, ততদিন তুমি আমাকে লাভ করলে না, আর তখন কেন তা লাভ করলে, যখন তোমার সিদ্ধান্ত অনুসারে তুমি নিজের ব্রহ্মচারণ হারিয়ে ফেলেছ?

(মৃদু হাস্য হেসে) অনুসুয়া, যৌনসংযম যে কনো তপস্যাই নয়, তা যে তপস্যার ফল। যখন তপস্যা সফল হয়ে যায়, তখন যে প্রতিটি তপস্বীর কাছেই এই যৌনসংযমের সিদ্ধি স্বভাবতই এসে যায়। ... তাই কি করছিলে, বিচার করে দেখেছ? তুমি তপস্যার ফলকে হস্তে ধারন করে রেখে, মনে করছিলে যে তোমার তপস্যা সফল হয়ে যাবে। তা কি প্রকৃতির নিয়ম পুত্রী? প্রকৃতির নিয়ম কি? এই তো যে, বীজকে স্থাপন করতে হয় ভূমিতে, অতঃপরে তার পরিচর্যার পর তা বৃক্ষ হবে, এবং তাঁকে নিজের মত বাড়তে দিলে, সে ফল দেবে। ... তাই তো হয় পুত্রী,

বীজ হলো বৈরাগ্য, পরিচর্যা হলো প্রেম, আর নিজের মত বাড়তে দেওয়া হলো সমর্পণ। এই তিনের ফলেই যে ফল লাভ হয়।

যিনি নিজের অন্তরে বৈরাগ্যকে ধারণ করে আসক্তি ও বিরক্তির থেকে মুক্ত হন, তিনিই নিজের অন্তরে আমাকে বীজ রূপে স্থাপন করেন। এরপর আমাকে নিজের অন্তরে অপার স্নেহদ্বারা পালন করেন, প্রেম করেন, এবং সমস্ত মোহ ও অহং ত্যাগ করে নিজেকে আমাতে লয় করে দেন। আর শেষে, তিনি আমাতেই সমস্ত কিছু ছেড়ে দেন। নিজের ইচ্ছা, নিজের কল্পনা, আর নিজের চিন্তার কনো গুরুত্বই থাকেনা আর তখন তাঁর কাছে। একমাত্র আমার নির্দেশই তাঁর কাছে জীবনে পথ চলার মার্গ হয়ে যায়। এই ভাবেই তো আমাকে সর্বস্ব অর্পণ করে, মোক্ষরূপী ফল লাভ করেন তিনি। তাই না! ...

অনুসুয়া, বৈরাগ্য ছাড়া আমাকে স্থাপন করাই যায়না। অনেকে হয়তো এক প্রেমিককে দেখাদেখি, তাঁকে অনুকরণ করে নিজেকে বোঝাতে পারে যে সেও প্রেম করছে, কিন্তু আমি যে হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশই করি বৈরাগ্যের দ্বারা। যদি আমি অন্তরে প্রকাশিতই না থাকি, তবে কাকে প্রেম করবে? কি করে প্রেম করবে আমাকে? সমস্তটাই তখন কেবলই অভিনয়, সমস্তটাই ভণ্ডামি। ... তাই পুত্রী, বৈরাগ্য ধারণ করার পরেই ব্যক্তির সাধনা শুরু হয়, আর সাধনা মানেই তো পরিচর্যা অর্থাৎ প্রেম। আর প্রেম কি? যতক্ষণ দুই, ততক্ষণই মোহ, প্রেম কোথায়?

প্রেম যে দুইয়ের মধ্যে হয়ই না, সম্ভবই না। যতক্ষণ না একাকার হচ্ছে, ততক্ষণ যতই তাঁকে প্রেমের নামকরণ করো, তা যে মোহ ব্যতীত কিচ্ছুই নয়। যখন সাধক আর নিজেকে দেখতে পায়না, আর বলতে লজ্জা পায় যে আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, আমি তোমাকে প্রেম করি, আর কেবল এই বলে যে প্রেম তো তুমিই করো, বিশ্বাসও তো তুমিই করো, আমার আমার করতে লাজ লাগে, তাই যে প্রেম পুত্রী, কারণ সেখানে যে আর আমি নেই। ... তাই যিনি বলছেন আমি প্রেম করি, আমি বিশ্বাস করি; যিনি বলছেন আমার বিশ্বাস ভেঙে যাবে, আমার প্রেমকে অস্বীকার করো কোন সাহসে, তিনি প্রেমী কি করে হলেন, তিনি যে তখনও মোহই করছেন, মানব বা মানবিকে মোহ না করে, আমাকে মোহ করছেন তিনি।

আর আমি, যে সমস্ত আবেগের ঊর্ধ্বে স্থিত, সে কি মোহ স্বীকার করে? না পুত্রী, আমি প্রেম স্বীকার করি, মোহ নয়। কিন্তু এক বৈরাগী ছাড়া, এই মোহ আর প্রেমের ভেদ কেই বা বুঝতে সক্ষম! ... তাই যতক্ষণ দুই ভাব, আমি আর তুমি ভাব, ততক্ষণ কেবলই মোহ। যখন সমস্ত দুই মুছে গিয়ে, কেবলই তুমি পরে থাকে, আর নিজেকে খুঁজেও পাওয়া যায়না, তখনই অহং ত্যাগ, তখনই যে আমিত্ব ত্যাগ, আর তখনই যে আমি ফল প্রদান করার জন্য প্রস্তুত।

আর ফল! ... যদি নিজের কল্পনাকে, ইচ্ছাকে আর চিন্তাকে সজাগ রাখো, আমি কি করে ফল দেব? ... চিন্তা করে আম গাছে আপেলের সার দিলে কি আর আম গাছ হয়? আমের আকৃতি যেন কাঁঠালের মত হোক, যদি এই ইচ্ছা করা হয়, তাহলে যে আমও হবেনা, আর কাঁঠালও হবেনা! আম ফলে যদি গোলাপ ফুলের সুগন্ধ কল্পনা করা হয়, তবে কি গাছে আম হবে, নাকি গোলাপ হবে? ... তবে যিনি আমাকে প্রেম করেন, যিনি আমাকে মোহ করা ত্যাগ করে আমার কাছে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে, নিজের আমিকে ত্যাগ করে দিয়ে, নিজের অহংকে ত্যাগ করে দিয়ে প্রেম করে, সে তো সমর্পণ করেই ফেলল। তাই সমর্পণের জন্য প্রয়াস করতে হয়না, এমনকি প্রেমের জন্যও প্রয়াস করতে হয়না।

সত্য এই যে, প্রয়াস জীব মনদ্বারা করতে পারে, বুদ্ধি দ্বারা করতে পারে, তনুদ্বারা করতে পারে, নিজের উর্জার বলের দ্বারা করতে পারে, কিন্তু সেই প্রয়াস দিয়ে কি আর মন নিজের কল্পনাকে ত্যাগ করতে পারে? সেই দ্বারা কি মন নিজের চিন্তাকে ত্যাগ করতে পারে? সেই দ্বারা কি বুদ্ধি নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারে? ... না একটিকেও ত্যাগ করতে পারেনা তাঁরা, কেবল পসমিত করে রাখতে পারে, যা সময় হলে আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। ... আসলে পুত্রী, কল্পনা করে কল্পনার নাশ সম্ভব নয়, ইচ্ছা করে ইচ্ছার নাশ সম্ভব নয়, চিন্তা করে চিন্তার নাশ সম্ভবই নয়। আর মন, বুদ্ধি তো কেবল এই ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনা করতেই সক্ষম, অন্য কিছু করতে তো তাঁরা সক্ষমই নয়, তবে প্রয়াস করে আমাকে প্রেম কি করে করা সম্ভব? কি করে আমার কাছে সমর্পণের প্রয়াস করা সম্ভব?

অসম্ভব তা। যা সম্ভব, তা হলো প্রয়াস করে বৈরাগ্যকে ধারণ করা। অর্থাৎ মন বুদ্ধি উর্জ্জা এই সমস্ত পঞ্চভূত একনিষ্ঠ ভাবে প্রয়াস করলে, তারা নিজের আসক্তি ও বিরক্তি অর্থাৎ নিজের সমস্ত ধারণাকে ত্যাগ করে অবস্থান করতে পারে। ... আর একবার তা করতে পারলে, আমি স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হই, আর তারপর থেকে আমিই তাঁর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করি। অর্থাৎ আমি আর তাঁকে বাহ্য প্রকৃতি হয়ে মার্গ দেখাই না। তাঁর অন্তরপ্রকৃতিও আমিই হয়ে যাই তখন থেকে, আর তাই তাঁর সাধনা, তাঁর প্রেম, তাঁর ভক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সমর্পণ, এই সমস্ত কিছুকে আমিই অঙ্কিত করে দিয়ে, তাঁকে মোক্ষরূপী মহাফল প্রদান করি।

তাই যদি করনিয় বলে কিছু থাকেই, তা হলো সকল বিরক্তি ও আসক্তির নাশ। এটিই অভ্যাস, এটিই করনিয়, বাকি সমস্ত কিছু তো আমিই করি সাধকের অন্তরে। আর সাধককে কিচ্ছুই করতে হয়না”।

সকলে এমন অমৃত কথা শ্রবণ করে, এবার যে যার নিজের স্বরূপ ধারণ করতে শুরু করলেন। ক্ষিতীশ সতিশ বিস্ফোরক নেত্রে দেখলেন, রাজা বিভাবসু তাঁদের দাদু হুতাশন হয়ে উঠলেন, দেবী মনিবালা হয়ে উঠলেন তাঁদের দিদা, দেবী দখিনা। জবা ও কুসুম তাঁদের বিশ্বস্ত চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি হয়ে উঠলে, তাঁদের প্রতি ক্ষিতীশ ও সতিশের স্নেহ উদ্বেলিত হয়, ও তাঁরা চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে গিয়ে তাঁদের সম্ভাষণ করেন। সেই দেখে মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “হয়েছে চেতনা অন্তর্দৃষ্টি, ক্ষিতীশ ও সতিশ তোমাদের উপেক্ষা করাতে তোমাদের অন্তরে যেই ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল, তা নির্বাপিত হয়েছে!”

চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি সস্নেহে ও সলাজে পাশে সরে দাঁড়ালে, এবার সতিশ ও ক্ষিতীশ দেখলেন, দেবী শ্যামা পরিণত হলেন দেবী মানসীর বেশে। দেবী অনুসুয়াকে বোধি বেশে পরিণত হতে দেখে, আর মধুনটিকে দেবী ধরিত্রী বেশে পরিবর্তিত হতে দেখে, এবার ক্ষিতীশ সতিশ সকলের সম্মুখে করজোড়ে স্থাপিত হয়ে বললেন, “এর অর্থ, আপনারা সকলে আমাদেরকে শিক্ষা প্রদানের জন্য এমন বেশ ধারণ করেছিলেন, এবং আমাদেরকে বৈরাগ্য, তপস্যা, ব্রহ্মচারণ তথা কর্তব্যপালনের মাধ্যমে প্রেমের শিক্ষা প্রদান করলেন!”

দেবী মানসী হাস্যমুখে সম্মুখে এসে বললেন, “না পুত্র, আমরা তোমাদেরকে কনো শিক্ষাই প্রদান করিনি। শিক্ষা প্রদান করেছেন তোমাদের আমাদের সকলে মাতা”।

বোধি সম্মুখে এসে বললেন, “হ্যাঁ পুত্র, কেবল তোমাদেরই শিক্ষা দিয়েছেন মাতা, তাই নয়। আমাদের অন্তরেও যা যা অসামঞ্জস্য ছিল, যার জন্য আমরা নিজেদের কর্তাভাবকে ত্যাগ করতে পারছিলাম না, সেই সমস্ত কিছুর শিক্ষা প্রদান করলেন মাতা, কারণ আমরা তো তোমাদের আগামীদিনের যুদ্ধে তোমাদের সহায়ক হতে চলেছি। তাই সেই উদ্দশ্যেই আমাদেরকে ও তোমাদেরকে এই ভাবে মাতা প্রস্তুত করলেন”।

ক্ষিতীশ বললেন, “সহায়তা! ... কি ভাবে সহায়তা করবেন আপনারা!”

বোধি বললেন, “আমরা চারজনেই হবো তোমাদের যুদ্ধরথের চার ঘটক, আর দেবী ধরিত্রী হবেন, আমাদের চার ঘটকের লাগাম। আমাদের স্বীকার করো পুত্র”।

সতিশ বললেন, “কিন্তু আমরা দুইজন, চারটি ঘটক নিয়ে আমরা কি করবো!... এ কেমন ধারার মায়া! ... এই মায়ার অর্থ কি!”

ক্ষিতীশ হেসে বললেন, “মায়ার অর্থই বিভ্রান্তি ভ্রাতা। এ আবার নতুন কি কথা। ... ঠিক আছে, মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়েই যখন এই কথা বললেন আপনারা, এর অর্থ, মাতারও আপনাদের কথনে সায় আছে। তাই আমাদের আর অস্বীকার করার কনো জায়গা নেই। চলুন আমাদের সাথে। ... (মহেশের উদ্দেশ্যে) মহেশ, চলো আমাদেরকে বিশুদ্ধের সীমান্ত পর্যন্ত ছেড়ে দাও। আমরা অনাহততে যাত্রা করে, তিন ছায়াপুত্রদের হত্যা করবো। ... তাঁরা নিশ্চয়ই নিজেদের পুরকে সুরক্ষিত রাখার চিন্তা করে, মনিপুর ছেড়ে অনাহততে এসে উপস্থিত হয়েছেন”।

এমন কথনের পর, মহেশের সাথে ক্ষিতীশ ও সতিশ পথ চলতে চলতে একটি বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আর তাঁদের পিছনে পিছনে চারভূত চারটি ঘটক হয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে

থাকলেন। আর দেবী ধরিত্রী তাঁদের সকলের গণ্ডে তাঁদের লাগাম হয়ে অবস্থান করে, তাঁদের সাথেই পথগমন করতে থাকলেন।

বনের মধ্যে কিছুদূর যেতেই সতিশ আর ক্ষিতীশ বললেন, "মহেশ তোমার ক্ষুধা লাগেনি!"

মহেশ বললেন, "হ্যাঁ তা তো লেগেছে, তবে আমার না সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করতে ভয় লাগছে!"

ক্ষিতীশ ও সতিশ বললেন, "কেন? ক্ষুধা লেগেছে, তো তাকে ব্যক্ত করতে এমন ভয়ের কি কারণ!"

উত্তরে মহেশ বললেন, "যখন যখন ক্ষুধা লাগে, কে জানিনা, আমাদের সম্মুখে এসে আহার প্রস্তুত করে দেয়। জানিনা এ কেমন ভূতুরে কাণ্ড! আমার সেই কারণে আহারের কামনা করতেও ভয় লাগছে"।

সতিশ হেসে বললেন, "আর ভয় করে লাভ নেই, ওই দেখো মহেশ, সম্মুখে আহার ইতিমধ্যেই কেউ রেখেগেছেন"।

মহেশ এবার কিছুটা ক্রোধ, কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা সংশয় নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "মায়া! ... যদি এই আহার প্রদানকারি তুমিই হও, তাহলে সম্মুখে এসো। ... আমি জানি তুমি এখানেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছ! ... কেন অনুসরণ করছো আমাকে! ... আমি জানি, এই আহারের রন্ধন তুমিই করেছ। আমি প্রতিবার অন্ন গ্রহণ করেছি, প্রতিবার তোমারই প্রস্তুত করা রন্ধনের স্বাদ পেয়েছি। ... সম্মুখে বেড়িয়ে এসো মায়া!"

এবার সতিশ ক্ষিতীশ দেখলেন, সেই প্রথমদিন যেই মহিলাকে দেখে তাঁরা বুঝেছিলেন যে, যুবতি অবস্থায় ইনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন, তিনি সম্মুখে এলেন। সেই একই সামনের কেশ পাকা, সেই একই দুধে আলতা অঙ্গের বর্ণ, সেই একই লাবণ্যময়ী মুখশ্রী। ... সম্মুখে এসে, মাথা নত করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন মহেশ ও ক্ষিতীশসতিশের থেকে।

তাঁকে দেখে, উত্তেজিত মহেশ বললেন, “আমাকে কেন অনুসরণ করছো তুমি! আমি সাধনা করতে এসেছি। আমার সঙ্গ ত্যাগ করো তুমি”।

দেবী মায়া এবার মাথা নিচু করে বললেন, “স্বামী, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। স্বামী ও আরাধ্যা যদি একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ দেন, তবে কার নির্দেশ পালন করা উচিত?”

উত্তরে মহেশ বললেন, “ঈশ্বরের”।

তাঁর স্ত্রী মায়া এবার মাথা নিচু করেই হাস্যমুখে বললেন, “নাথ, বিবাহের সময়কালেই পরমেশ্বরী যে আমাকে আপনার দেখভাল করাই আমার জীবনের কর্তব্য চিহ্নিত করে পাঠিয়েছিলন। তাঁর নির্দেশ আমি কি করে অবহেলা করি! ... তবে তা বলে, আপনার নির্দেশও অমান্য করতে পারিনা আমি। তাই দেখুন, আপনি আমার থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন, তাই আপনার সম্মুখে আসিনি আমি। কিন্তু যাকে আপনি মায়া বলেন, সেই মায়া যে ততক্ষণ আবশ্যক যতক্ষণ আপনি দেহ ধারণ করে রয়েছেন! ...

আহার না করলে, নিদ্রা না গেলে, সাধনায় মনোনিয়োগ করবেন কি করে আপনি! ... সেই কারণেই তো সর্বক্ষণ ছায়ার ন্যায় থেকে, আপনার সাধনার সাফল্য হেতু ক্রিয়া করে চলেছি আমি, আর একেই তো বোধ করি আপনি মহামায়ার মায়া বলেন, তাই না! ... মায়ার থেকে মুক্ত হতে হয়, তবে যতক্ষণ না সত্যজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ততক্ষণ সেই মায়াই যে মার্গদর্শক সত্যজ্ঞান আহরণ করার জন্য। তাই নয় কি স্বামী!”

মহেশ এবার এগিয়ে গয়ে দেবী মায়ার সম্মুখে স্থিত হয়ে, করজোড়ে বললেন, “ভুল হয়ে গেছে মায়া। আমি ভ্রান্ত ভাবেই কল্পনাকেও মায়া বলেছি, আর মহামায়ার মায়াকেও। কল্পনা যে আমার দ্বারা প্রস্তুত। তুমি সম্মুখে থেকে আমাকে আহার প্রদান করছিলে, নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিলে, অন্য সমস্ত কিছুর থেকে আমাকে মুক্ত রেখে, আমাকে সেই কর্ম করাচ্ছিলে, যার মাধ্যমে আমি জীবনের সত্যতাকে অনুভব করি। আমাকে দিয়ে বাজার করাতে তুমি। সেই স্থানে পদে পদে

সম্ভাবনা থাকে যে আমি নিজের ঈশ্বরীর প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, নিজেকে কর্তা জ্ঞান করে, দামাদামি করি।

আমাকে তুমি ধোপার থেকে কাপড় নিতে পাঠাতে। সেখানেও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে যে যা লাভ করেছি, তা নিয়ে খুশী থেকে, বস্ত্র অধিক পরিষ্কার হতে পারতো, সেই নিয়ে তর্ক করার। আর আমি এই সমস্ত তর্ক বা দামাদামি করতামও। কিন্তু আমি ভুলে গেছিলাম যে, এই দামাদামি বা খুঁতখুঁতে ভাব আমার নিজের কল্পনা, আমার নিজের নির্মিত মায়া, মহামায়ার মায়া নয়। মহামায়ার মায়ার জন্য তো তুমি আমাকে সেই সমস্ত স্থানে পাঠাতে, যেখানে যেখানে আমার কল্পনা আমাকে আমার বৈরাগ্য থেকে চ্যুত করে, আর সেইখানে মহামায়া আমাকে বারংবার পাঠিয়ে আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে নিজের কল্পনার দুস্প্রভাব দেখাচ্ছিলেন, যেই কল্পনার জন্য আমার সমস্ত পঞ্চভূত আমার আত্ম চঞ্চল হয়ে যায়।

এবার বুঝে গেছি মায়া, মহামায়ার মায়া আর আমার মায়ার মধ্যে ভেদ কি। দুটিই মায়া, কিন্তু মহামায়ার মায়ার উদ্দেশ্য আমাকে সত্যপথ দেখানো, আমাকে সত্যযাত্রা করানো, আমাকে সত্যে স্থাপিত করা। আর অন্যদিকে আমার কল্পনা থেকে জাত মায়া, আমাকে কেবলই সত্যের থেকে বিচ্যুত করে দিতে ব্যস্ত। আর তাই মহামায়ার মায়া আমাকে সেই সেই স্থানে বারংবার প্রেরণ করে, আমাকে বলেন সেই যুদ্ধ জয় করে আসতে, নিজের কল্পনার মায়াকে পরাজিত করে, নিজের আত্মকে কল্পনামুক্ত করতে। ... আর তুমি! ... তুমি তো সেই মহামায়ারই প্রকাশ। স্বামী স্ত্রীর কাছে, এবং স্ত্রী স্বামীর কাছে শ্রেষ্ঠ মহামায়ার প্রকাশ। এর পরবর্তী প্রকাশ হলেন সন্তান ও পিতামাতা।

মহামায়া যে সর্বাধিক সত্যপথে যাত্রার আহ্বান স্বামী বা স্ত্রীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। আর তাঁর আবাহন অত্যন্ত সরল, কিন্তু আমরা জটিল, আর তাই আমাদের মনে হয় তা জটিল। যেই যেই ক্ষেত্রে, আমাদের আত্ম ইচ্ছার কাছে, চিন্তার কাছে এবং কল্পনার কাছে পরাজিত হয় বারংবার, সেই সেই স্থানেই মহামায়া আমাদের বারংবার ঠেলে দেন, যাতে সেই যুদ্ধ জয় করে, আত্মকে অহং মুক্ত করে, তাঁর কাছে সমর্পণ করতে পারি। কিন্তু আমরা এতটাই জটিল যে আমরা ভেবে

বসি মহামায়া আমাদের বারংবার কল্পনা করতে বাধ্য করছেন, ইচ্ছা করাচ্ছেন আমাদের দিয়ে, চিন্তা করতে প্রেরণা দিচ্ছেন আমাদেরকে।

আমি নিজের কল্পনার কারণে, নিজের প্রতি করা নিজের মায়ার কারণে সাধনা করতে পারছিনা, আর তা স্বীকার না করে, যিনি আমাকে সাধনা করার জন্য সহায়তা করছেন, সেই তোমাকেই আমার সাধনার শত্রু ভেবে যাচ্ছি। ক্ষমা করো আমাকে"।

মায়াদেবী এবার নিজের কর দ্বারা তাঁর স্বামীর করকে চেপে ধরে বললেন, "এ কি করছেন নাথ। আপনি আমার স্বামী, অর্থাৎ আমার অন্তিম গুরু। আমি যা কিছু জেনেছি, শিখেছি, সে তো আপনার জন্যই শিখতে পেরেছি। আপনি আমার কাছে এমন করজোড় করবেন না দয়া করে"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ এবার দেবী মায়ার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "দেবী, এই কয়দিনে আমরা বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করেছি, যেমন বৈরাগ্য, যেমন ব্রহ্মচারণ, যেমন প্রেম, সমর্পণ, বিশ্বাস, ইত্যাদি, আর তা ধারণ করার কালে বুঝেছি, এই অস্ত্র যদি কনো যোদ্ধার কাছে থাকে, তাঁকে পরাস্ত করা প্রায় অসম্ভবই। কিন্তু আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রদান করলেন, মায়া রূপে। প্রতিটি মুহূর্তে মাতা আমাদের যেই মার্গ দেখিয়ে চলেছেন, তাই হলো মহামায়ার মায়া, আর এই মায়াই আমাদেরকে সত্যের দ্বারে স্থাপিত হতে দেয়। ... ধন্যবাদ দেবী। আপনি আমাদের গুরু, তাই আমাদেরকে আপনার চরণ বন্দনা করে, আশীর্বাদ লাভ করতে দিন কৃপা করে"।

এতো বলে, ক্ষিতীশ ও সতিশ ভুমুখি হয়ে, মায়া দেবীর চরণ বন্দনা করতে গেলে, চমকিত হয়ে পিছনে সরে আসেন। আর তারপরে সম্মুখে তাকিয়ে দেখলেন, সাখ্যাত তাঁদের জননী দণ্ডায়মান। দেখতে দেখতে, মহেশও ঋপুর রূপ ধারণ করলে, ক্ষিতীশ ও সতিশ আরো অধিক চমকিত হলেন। অন্যদিকে মাতা সর্বাম্বা হাস্যবেশে বললেন, "তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে সুসজ্জিত করার জন্যই এই সমস্ত লীলা। কিন্তু এখনো তোমরা শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারণই করনি পুত্ররা"।

মহেশ বললেন, “আপনারা দুইজন, অথচ চারটি অশ্ব নিয়ে কি করবেন, এই আপনাদের সংশয় ছিল। আর আমি আমার পরিবারের সাথে সাখ্যাতে যুদ্ধ করবো না, এই আমার আবদার ছিল মাতার কাছে। তাই আমি আপনাদের রথ হয়ে বিরাজ করবো। অর্থাৎ যুদ্ধে আমি অংশ নেবো, আবার নেবোও না। আর রথ হয়ে আমি চারজন ভূতকে আমার অশ্ব করে স্থাপিত রাখবো, আর দেবী ধরিত্রী হবেন এই চার অশ্বের লাগাম। ... আর হে সর্বাম্বা পুত্রদ্বয়, আমার পিতাদের থেকে একটি বিষয়ে আমি আপনাদের সচেত করে দিই। আপনারা একাকীই তাঁদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম। তাই একজনই যুদ্ধে রত হন, দুইজনে যদি যুদ্ধে রত হন, তবে তাঁরা দেবী কল্পনার সহায়তায় আপনাদেরকে দ্বন্দ্বে যুক্ত করে দেবেন মায়াবলে, আর তখন আপনারা একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবেন, আর তাঁরা মুক্ত থেকে যাবেন”।

ক্ষিতীশ বললেন, “সঠিক বলেছেন আপনি। এই রথের সারথি হবো আমি, আর আমার ভ্রাতা সতিশ হবে এই রথের রথী, কারণ তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। ... আর মাতা, আপনি যেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের কথা বললেন, আমরা তার অর্থ উপলব্ধি করেছি। আর তাঁরা হলেন দেবী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি। বেশ বুঝতে পারছি মাতা, দেবী চতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য দেবী কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার নেই, কারণ তাঁরা স্বয়ং আমাদের মাসিমণি, দেবী মানসীর সন্তান, এবং তাঁরা আপনার প্রতি সমর্পিত”।

সতিশ বললেন, “হ্যাঁ মাতা, এই কয়দিনে আমরা একটি সত্য তো বুঝেছি যে, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে, কনো মায়ারই অন্তরে থাকা গুহ্য রহস্য ভেদ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা এই বিবাহ করে, সেই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণ করেই রণক্ষেত্রে যেতে সজ্জ ও ইচ্ছুক”।

দেবী চেতনা ও দেবী অন্তর্দৃষ্টি এবার সম্মুখে এসে মাতা সর্বাম্বাকে বললেন, “মাতা, আমাদের মা, পিতা, দাদু ও দিদা, নিজেদেরকে অশ্ব করে স্থাপিত করেছেন, নাথেদের রথে। দেবী ধরিত্রী সেই অশ্বদের লাগাম হয়েছেন, মহামান্য ঋপু তাঁদের রথ হয়েছেন। কিন্তু আমরা আমাদের এই যুদ্ধে অবস্থান এখনো ব্যক্ত করিনি। ... মাতা আমরা যদি স্ত্রীবেশে আমাদের স্বামীর সাথে যাত্রা করি যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহলে সহায়তা কম, বাঁধা অধিক আসবে তাঁদের পথে, কারণ বলদম্ভরা যেই

চরিত্রের ব্যক্তি, তাঁরা আমাদেরকে কন্যা জ্ঞান করবেন না, কেবলই রমণী জ্ঞান করবেন। ... তাই মাতা, আমরা আমাদের নাথের রথের দুই চাকা হতে চাই। ... তাঁদের রথের চাকা হয়ে, তাঁদের রথকে দৃঢ়তা প্রদান করবো যেমন, তেমনই তাঁদেরকে গতিপথ দেখাতে থাকবো, যাতে তাঁরা নিজেদের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন"।

ক্ষিতীশ ও সতিশ হেসে বললেন, "এখনই এই শিক্ষা লাভ করলাম মাতার থেকে যে স্ত্রী স্বামীর কাছে শ্রেষ্ঠ মহামায়ার দান হয়ে, তাঁর মার্গ প্রশস্ত করেন। আর এখনই তার প্রমাণ পেলাম"।

মাতা সর্বাম্বা এবার অখণ্ডের স্মরণ করলে, তিনি ও অখণ্ড , তাঁদের দুইপুত্রের বিবাহদান করলেন, এবং অতঃপরে, ঋপু হলেন মহাক্ষিপ্র রথ, আর চারভূত হলেন সেই রথের চার অশ্ব; দেবী ধরিত্রী হলেন সেই অশ্বদের লাগাম, আর দেবী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি হলেন সেই রথের দুই চাকা। আর এবার পিতা অখণ্ড এবং মাতা সর্বাম্বার আশীর্বাদ গ্রহণ করে প্রথমে ক্ষিতীশ রথের সারথির আসনে স্থাপিত হলেন, আর পরে সতিশ সেই রথের রথী হয়ে সজ্জ হয়ে, অনাহততে মহাসংগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

সেই দেখে অখণ্ড বললেন, “দেবী, আমার খুব সন্দেহ আছে, এই মহাযুদ্ধে আমাদের পুত্ররা সফল হবে কিনা, সেই ব্যাপারে! ... বলদম্ভরা একাকী নেই, তাঁদের তিন মাতা তাঁদের সঙ্গে আছেন। আর তাঁদের কাছে, আমার পুত্ররা কেন, সমস্ত ভূত, এমনকি চেতনা, অন্তর্দৃষ্টিও অতি তুচ্ছ। হ্যাঁ এক ঋপু তাদের সকলকে সামলাতে সক্ষম। কিন্তু তাও কি শেষ রক্ষা হবে?”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “না নাথ, অহংএর ধূর্তস্বভাবের কাছে, আমার পুত্ররা কি করে জয়লাভ করবে একাকী? তাঁরা সফল হবে না!”

অখণ্ড সেই স্পষ্ট কথাতে হতচকিত হয়ে গিয়ে বললেন, “তাহলে দেবী! তাঁদেরকে আটকান। তাঁদেরকে তো আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম!”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “হ্যাঁ সঠিক কথা বলেছেন। মৃত্যুর মুখেই আমরা তাঁদেরকে ঠেলে দিলাম। অহংকারের সম্মুখে বিচার ও বিবেক কতক্ষণই বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে! ... অহং সাখ্যাত আপনার সমান বল ধরেন, কারণ সে আপনারই প্রতিবিম্ব। হ্যাঁ রণকৌশলে আমার পুত্ররা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ছল! ... আপনি যেমন ছলের নিকটেও যাননা, আপনার প্রতিবিম্ব সর্বদা ছলের মধ্যেই বিরাজ করে। তাঁদের ছলের উত্তর আমাদের পুত্রদের কাছে কোথায় আছে নাথ!”

অখণ্ড বিচলিত হয়ে উঠে বললেন, “কিন্তু আপনি এই কথা এতো শান্ত ভাবে কি করে বলছেন দেবী? আপনার পুত্ররা মহাযুদ্ধে গেছে। এই যুদ্ধে পরাজিত হলে, তারা জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে না, কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা ওদের কিছুতেই জীবিত ছেড়ে দেবেনা! আপনি সেই সমস্ত কথা জেনেও এমন শান্ত রয়েছেন? কেন? আর তার থেকেও বড় প্রশ্ন, কি করে?”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “এই যুদ্ধ সকলকেই অনেক অনেক শিক্ষা প্রদান করবে। আপনাকেও। আর তাই এই যুদ্ধ হওয়াটা আবশ্যক ছিল। ... আপনার পুত্রদের আপনি কনো কিছু দেননি এখনো, সময় হলে তাঁরা যখন আপনার কাছে মার্গদর্শন কামনা করবে, তা প্রদান করতে ভুলবেন না কিন্তু নাথ!”

এই বলে মাতা সর্বাম্বা অন্তর্হিত হলে, অখণ্ড বললেন, “দেবী! ... দেবী!” ... কিন্তু মাতা কনো সারা দিলেন না, আর তনি আজ্ঞাতেও ফিরলেন না। তিনি সহস্রারের দ্বারে উপস্থিত হয়ে, সেই দ্বারের সম্মুখে পদ্মাসনে স্থিতা হয়ে, ধ্যনমগ্না হলেন। ... এ যেন দেবীর এক নবলীলা। এই স্থানে উপস্থিত হবার সামর্থ্য কারুর নেই। আর তাই তিনি সেখানে এসেই উপনীত হলেন, যেন তিনি চানই না যে কেউ তাঁর কাছে সশরীরে এসে উপস্থিত হোক। কিন্তু কেন? কেন এমন চাইলেন তিনি!

অখণ্ড আবাহন

অখণ্ড একাকীই তাই দেখতে থাকলেন, তাঁর পুত্র সতিশ ও ক্ষিতীশের কীর্তিকলাপ, আর মনে মনে সংশয় ধারণ করে বসে রইলেন, সতিশ ক্ষিতীশ কি সক্ষম হবে নিজেদের উদ্দেশ্যে! ... কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছা এখনো একটিবারও নিজেদের পূর্ণ বল নিয়ে উপস্থিত হয়নি রণক্ষেত্রে। কিন্তু বলদম্ভদের সাথে তাঁরা সাখ্যাতে উপস্থিত থাকবেন। এমন অবস্থায় কি ক্ষিতীশ ও সতিশের ক্ষেত্রে বলদম্ভদের পরাজিত করা সম্ভব!

অখণ্ডের সন্দেহকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করা শুরু করলেন ক্ষিতীশ ও সতিশ। তাঁরা যখন আজ্ঞাতে উপস্থিত হলেন, তখন দেবী কল্পনারা সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘কি চাও তোমরা হে সর্বাম্বাপুত্র! ... তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে, তোমরা যুদ্ধের ইচ্ছা নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছ। তা বেশ, যুদ্ধ করতে চাইলে, করতেই পারো। তবে আমাদের মনে হয়, তোমাদেরকে একটি কথা বলে রাখা। ... হ্যাঁ পরে, এমন যেন মনে না হয় তোমাদের যে, তোমরা তো এই কথা জানতেই না, জানলে কখনই এই যুদ্ধ করতে না”।

ক্ষিতীশ সারথির আসনে স্থাপিত থেকে সুউচ্চ কণ্ঠস্বরে বললেন, ‘কি জানাতে চান দেবী, বলুন আমাদের। তবে এমন ভাববেন না যে আমরা সেই কথা শুনে এখান থেকে যুদ্ধ না করে পলায়ন করবো। আমরা বেশ ভালো করেই জানি যে আপনারা কতটা ছলনার আশ্রয়ী। তাই অবশ্যই

ছলকে আশ্রয় করেই আপনারা কিছু বলতে চান। তা আপনাদের কণ্ঠরোধ করবো না। আপনারা নির্দ্বিধায় আপনাদের কথা বলতে পারেন”।

দেবী ইচ্ছা হাস্য ও কৌতুকের স্বরে বললেন, “নাবালক ছেলে, তাই জেদ ধরেছে। ... তাও আমাদের কাজ সতর্ক করে দেওয়া, তাই বলছি শোনো সর্বাম্বাপুত্ররা। আমরা এই ত্রিদেবী তোমার পিতার থেকে অভয়দান প্রাপ্ত। আমরা তেমন ভাবেই অবস্থান করবো, যেমন তিনি অবস্থান করবেন। তাই আমাদের অবস্থান্তর করতে গিয়ে, তোমরা স্বয়ং তোমাদেরই পিতাকে এই যুদ্ধে নিমন্ত্রণ দিচ্ছ। অর্থাৎ, যুদ্ধে এমন অবস্থা উপস্থিত হতেই পারে যেখানে তোমাদেরকে তোমাদের পিতার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে, তবেই যুদ্ধে রত হও”।

ক্ষিতীশ সতিশ এই নবতত্ত্ব জেনে আচম্বিত হলেন, এবং বিচলিতও। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, ‘এঁর কারণেই কি মনিধামের সমগ্র লীলায় পিতা একটিবারও এলেন না!’ সেই দেখে তাঁদের রথের চাকা, দেবী চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, “এঁদের কথাতে বিভ্রান্ত হবেন না নাথ। আপনাদের পিতা এঁদের যখন বচন দিয়েছিলেন, তখন তিনি ত্রিদেবে বিভক্ত ছিলেন। কিন্তু আজ তিনি আর ত্রিরূপে বিভক্ত নন, অখণ্ড রূপে স্থিত। তাই তাঁর বচনের আর কনো গুরুত্ব নেই”।

তাঁদের রথ, ঋপু বললেন, “সঠিক বলেছেন প্রভু, দেবীরা। যেমন একটি দেহে বচন দেওয়া কথার স্মরণও থাকেনা পরবর্তী দেহে, তেমনই প্রভু অখণ্ডেরও স্মরণ নেই, তিনি কি বচন দিয়েছিলেন”।

দেবী ধরিত্রী, ক্ষিতীশের রথের লাগাম বললেন, ‘কিন্তু যা স্মৃতিতে নেই, তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে কতক্ষণ!... তবে হ্যাঁ, যদি তার সাথে সাথে এও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে, সেই বচন ধারণ কেবলই ছলনা ছিল, তখন সেই বচনস্মৃতির প্রত্যাবর্তন বিপরীত প্রতিক্রিয়াও প্রদান করতে পারে। তাই সেই দিকেই প্রয়াস রাখা আবশ্যক”।

সতিশ বললেন, “এই ছায়াদেবীদেরও আমরা পরাস্ত করে দেব; তাহলে তো আর কনো বচনের কনো প্রয়োজনই থাকবেনা”। সেই কথার উত্তরে দেবী ধরিত্রী বললেন, “এই কথা স্মৃতিতেও রাখবেন না প্রভু। এই ছায়াদেবীরা স্বয়ং পরানিয়তির ছায়ারূপ, তাই এঁদের নাশ একমাত্র স্বয়ং নিয়তির দ্বারাই সম্ভব, তবে হ্যাঁ এই ছায়াদেবীদের উত্থানের কারণ আপনাদের পিতা, তাই আপনাদের পিতার সম্মতি বিনা কিছুতেই মাতা এঁদের নাশ করবেন না”।

ক্ষিতীশ বললেন, “অর্থাৎ আমাদের পিতার সম্মতি আবশ্যক হবে এই কাজে। তবে তার জন্য তো আমাদের পিতাকে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু তিনি তো এই লীলাতে অংশগ্রহণ করারও ইচ্ছা রাখেন না! ... সেই ক্ষেত্রে! ...”

সতিশ জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, “সেই ক্ষেত্রে কি অনুজ! থেমে গেলে কেন, বলো!”

ক্ষিতীশ মৃদু হেসে বললেন, “সেই ক্ষেত্রে, আমাদেরকে বাধ্য করতে হবে এই ছায়াদেবীদের। এঁরা যদি দেখেন যে স্বয়ং তাঁদের পুত্ররা মৃত্যুর মুখে স্থাপিত হয়েছে, অর্থাৎ যদি অনুভব করেন যে, যাকে আশ্রয় করে, তাঁরা অবস্থান করছে, সেই অহংই বিনাশের মুখে স্থিত, তাহলে অবশ্যই তাঁরা পিতাকে আবাহন করবেন”।

সতিশ এবার অধিক চিন্তাশীল হয়ে বললেন, ‘কিন্তু অনুজ, এতে তো অধিক বিপদ। পিতা তো তখন ধর্মসংকটে স্থাপিত হয়ে যাবেন। একদিকে তাঁরই পুত্ররা, আর অন্যদিকে তিনি যাদেরকে অভয়দান করেছেন, তাঁরা! ... এমন অবস্থায় তিনি কি করবেন?”

দেবী চেতনা এবার বললেন, “নাথ, এতো চিন্তা করে, দেবী চিন্তাকে শক্তিশালী করে তোলার কনো অর্থই হয়না। প্রথমে আপনাকে যুদ্ধকে সেই স্তরে উন্নীত করে নিয়ে যেতে হবে। একবার সেই অবস্থায় যুদ্ধ উন্নীত হলে, তখন পরবর্তী করনিয় কি, তা ভাবা যাবে”।

দেবী অন্তর্দৃষ্টি বললেন, “সঠিক কথা। আর যে যতযাই নিজের বলের দম্ভ করুক না কেন, হবে তো তাই, যা নিয়তির ইচ্ছা হবে, যা নিয়তির মার্গদর্শন হবে। সকল ব্রহ্মাণ্ড নিজের নিজের

কল্পনা নিয়েই, সেই কাল্পনিক জীবন বাঁচার জন্যই দেহধারণ করে। কিন্তু নিয়তি তাঁদেরকে কাল ও প্রকৃতির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় যে, তাঁরা একাকী নিজেদের কল্পনাকে লাভ করতে পারবেন না। আর এর ফলে, তাঁরা অন্য ব্রহ্মাণুদের সাথে সংযুক্ত হতে সুরু করে। কেউই কারুরক কল্পনার কথা জানেন না। তাই সকলে ভাবেন যে তিনি তাঁর কল্পনাকে বাঁচছেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই নিয়তির অঙ্গুলিহেলনে ওঠেন বসেন, আর অহংকার করে মরেন যে, সে তাঁর নিজের জীবনের মালিক।

তাই যদি প্রভু অখণ্ড উপস্থিত হয়ে গিয়ে ধর্মসংকটে স্থাপিত হয়েও যান, তখনও তাই হবে যা নিয়তির ইচ্ছা হবে। তাই অহেতুক চিন্তা করে, সময় ক্ষয় করে কনো লাভ নেই। যুদ্ধ করুন আপনারা এখন”।

সেই কথাতে উদ্যোগী হয়ে, ক্ষিতীশ সতিশ ছায়াদেবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “আমরা প্রস্তুত দেবী। এই যুদ্ধে, আপনারাই সর্বোত্তম অভিজ্ঞ, তাই আপনারাই এই যুদ্ধের নিয়ম স্থাপন করুন, আমরা সেই নিয়মানুসারে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত”।

ছায়াদেবীরা যেন চাইছিলেনই যে, সতিশ ক্ষিতীশ, এই প্রকার আত্মবিশ্বাসে উন্নীত হয়। তাই তাঁদের সকলের হয়ে দেবী কল্পনা বললেন, “বেশ, তবে তাই হোক। শোনো তবে, প্রতিদিবস যুদ্ধ হবে দুই প্রহর ও অন্যদুই প্রহর যুদ্ধবিরাম থাকবে, আর সেই যুদ্ধবিরাম আমরাই শিঙাধ্বনি দ্বারা চিহ্নিত করবো। আর যেহেতু তোমরা দুইজনে যুদ্ধ না করে একজন যুদ্ধ করছো, তাই একজনের সাথে একজনই যুদ্ধ করবে, এই নিয়মের কনো কারণই নেই। তাই একজনের সাথে একাধিক ব্যক্তি যুদ্ধ করতেই পারে। আর তৃতীয় কথা এই যে, একটি সম্পূর্ণদিবসের যুদ্ধবিরাম তখনই হতে পারে যখন দুই পক্ষই সেই যুদ্ধবিরামকে স্বাগত জানাবে। যদি কনো একটি পক্ষ একটি দিবসের যুদ্ধবিরামকে অস্বীকার করে, তবে অপরপক্ষকেও যুদ্ধ করতেই হবে”।

ক্ষিতীশ সতিশ সেই শর্তাবলিতে সম্মত হলে, ছায়াদেবীরা রণস্থল থেকে বিদায় নিলেন, আর প্রবেশ করলেন, তাঁদেরই তিন পুত্র, বলদম্ভ, উপপতি ও আবর্ত। সতিশও বীরবিক্রমে

ক্ষিতীশের উদ্দেশ্যে আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, "রথ চালাও অনুজ। আজ ওদেরকে অনেক কিছু বলার আছে। আমাদের মাতার দিকে, মাসিমণির দিকে কুদৃষ্টি দেবার প্রতিদান দেবার আছে আজ ওদেরকে। তাই রথ চালাও, আজ আমি এঁদেরকে দেখাতে চাই যে, তাঁরা যেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল, তাঁদের কেশস্পর্শ করার যোগ্যতাও এঁদের নেই"।

ক্ষিতীশও মহাকৌশলে রথ চালিত করলে, বলদম্ভ, উপপতি ও আবর্ত নিজেদের থেকে সহস্র সহস্র সেনার নির্মাণ করলেন, আর সকলকে যুদ্ধে প্রেরণ করে, নিজেদেরকে এঁদের পিছনে আচ্ছাদিত রাখলেন। ... বিশাল সেনার ঢল দেখে, বিচলিত না হয়ে গিয়ে, মহাপরাক্রমে সতিশ একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করতেই থাকলেন। সেই বিক্রম এতটাই অনবদ্য যে, কখন তিনি নিজের তূণীর থেকে বাণ উত্তোলন করছেন, কখন তা নিজের ধনুকে স্থাপন করছেন, আর কখন তা নিক্ষেপ করছেন, তা যেন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছায়াপুত্ররা, আর অদৃশ্য ভাবে নিকটে দাঁড়িয়ে থাকা, ছায়াদেবীরাও দেখতে পেলেন না।

প্রহরে প্রহরে সহস্র সহস্র সেনার নিধন করতে থাকলেন সতিশ, যেন তিনি যুদ্ধ করছেনই না, দণ্ড প্রদান করছেন। অত্যন্ত নির্মম, অত্যন্ত ক্রুর এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথেই তিনি সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করে, সমস্ত সেনার নিধন করলেন। আর সেই ৬০ সহস্র সেনার নিধন করতে করতেই সেইদিনের যুদ্ধবিরাম ঘোষিত হলে, বলদম্ভরা ফিরে গেলেন নিজেদের শিবিরে, যা অনাহতের নিম্নসীমান্তে স্থাপন করা হয়েছিল, আর ক্ষিতীশ নিজের রথ নিয়ে গেলেন অনাহতের উত্তরতম সীমান্তে, যেখানে দুই সর্বাম্বাপুত্র নিজেদের শিবির স্থাপন করেছিলেন।

সতিশ প্রসন্ন হৃদয়ে শিবিরে প্রবেশ করলে, রথের মধ্যেই শায়িত ক্ষিতীশকে অতি অপ্রসন্ন দেখে, তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে ভ্রাতা! তুমি কি আমার যুদ্ধকৌশলে অতৃপ্ত! ... দেখো আমি সমস্ত সেনার নিধন করে এসেছি আজকে"।

ক্ষিতীশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "না ভ্রাতা, আপনার বিক্রমে, কৌশলে ও যুদ্ধনিষ্ঠার প্রতি আমার কনো অতৃপ্তিই নেই। তবে এভাবে কতদিন! ... একবার বিচার করে দেখুন, আজ যাদের হত্যা

করলেন আপনি, তাঁরা সকলেই মায়াসেনা। কালকে যখন আমরা রণক্ষেত্রে পৌছব, তখনও তো এই ছায়াপুত্ররা একই ভাবে মায়াসেনারই নির্মাণ করবে, আর আপনিও সারাদিবস তাঁদের সাথে যুদ্ধ করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে উঠবেন। ... বুঝতে পারছেন, এই ছায়াপুত্রদের রণকৌশল!... এঁরা আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে চায়। আপনি এই ভাবে নিয়মিত যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠলে, এঁরা আপনার উপর একত্রে ঝাঁপিয়ে পরবেন"।

সতিশও সেই কথাতে ভাবিত হয়ে গিয়ে বললেন, "তাহলে এই সমস্যার সমাধান কি?" ক্ষিতীশ উত্তরে বললেন, "সেটার কথাই তো আমিও ভাবছি ভ্রাতা!"

রথচাকা রূপে স্থিত, দেবী অন্তর্দৃষ্টি বললেন, "কিন্তু কেন ভাবছেন নাথ! ... আপনারা সমস্ত দিব্যাস্ত্রে ভূষিত হবার পরেও, কেন ভাবছেন এই সম্বন্ধে?... ব্যবহার করুন সেই সমস্ত দিব্যাস্ত্র, আর মুহূর্তের মধ্যে নাশ করে দিন সম্পূর্ণ মায়াসেনার। যেই কৌশলে আপনাদেরকে ক্লান্ত করতে চাইছে, ছায়াপুত্ররা, সেই একই কৌশলে, আপনারাও তাঁদের ক্লান্ত করে দিন। প্রতিবার তাঁদের মায়াসেনার নাশ হবে, প্রতিবার তাঁদের উর্জাক্ষয় হবে। তাই মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের মায়াসেনার নাশ করে দিন। ... তাঁরা যাতে একবার মায়াসেনার নির্মাণ করে, শিবিরে ফিরে গিয়ে পুনরায় মায়াপ্রসারের পুষ্টি লাভ করতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করুন আপনারা"।

সতিশ বললেন, "কিন্তু সমস্ত দিব্যাস্ত্র যদি এঁদের মায়ার নাশ করতেই লাগিয়ে দিই আমরা, তাহলে এঁদের নাশ করবো কি করে?"

দ্বিতীয় রথচাকা রূপে স্থিত, দেবী চেতনা এবার বললেন, "নাথ, আপনার এখনো মনে হয় যে পঞ্চভূতের অস্ত্র বলদম্ভদের নাশ করতে সক্ষম! ... তাই যদি হতো, তাহলে মাতা সর্বাম্বাকে দেবী গুহ্যার রূপ ধারণ করতে হলো কেন? আমাদের মাতাপিতা, দেবী মানসী ও বোধি, আমাদের দাদা ও দিদিমা, দেবী দখিনা ও হুতাশনই তো তাঁদের নাশ করে, প্রত্যাবর্তন করতেন, তাই নয় কি?"

সতিশ ও ক্ষিতীশ এবার একিসাথে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে এঁদের দমন কি অস্ত্র দ্বারা করবো আমরা!"

ঋপু এবার সম্মুখে এসে বললেন, "প্রভু, ছায়াদেবীরা প্রভু অখণ্ডের অভয়দান দ্বারা ভূষিত, কিন্তু ছায়াপুত্ররা নয়। যদিও, এঁরা ছায়াপতি, অহংএরই প্রবাহধারা। অর্থাৎ এঁদের তিনজনের মধ্য দিয়ে অহংই প্রকাশিত। তাই আমি নিশ্চিত তো নই যে, প্রভু অখণ্ডের সামর্থ্য এঁদেরকে ভেদ করতে পারবে কিনা, তবে হ্যাঁ, এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে এঁদেরকে প্রভুর সামর্থ্য বাঁধা বা আঘাত অবশ্যই করতে সক্ষম। ... তবে তার আগে, এঁদেরকে সাখ্যাতে এসে যুদ্ধ তো করতে হবে। ইদানিং তো এঁরা নিজেরা যুদ্ধই করছে না, কেবলই নিজেদের মায়াকে প্রেরণ করছেন যুদ্ধক্ষেত্রতে!"

ক্ষিতীশ সতিশ কালের ইঙ্গিতকে বুঝে, শিবিরে সেই রাত্রি বিশ্রাম নিয়ে, পরবর্তী দিন, পুনরায় মহাবিক্রমে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। যেমন তাঁরা পূর্বরাত্রিতে পর্যালোচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনই হলো। বলদম্ভরা নিজেদের মায়ার বলে পুনরায় এক শত সহস্র সেনার নির্মাণ করে, তাঁদের যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আর নিজেদের আলোচনার মত করেই, এবার সতিশ প্রাণঘাতি, অপ্রতিরোধ্য বরুনাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন।

সেই অস্ত্র প্রকাণ্ড বিক্রম দেখিয়ে সম্পূর্ণ সেনাকে প্লাবিত করে দিল প্রকাণ্ড জলধারায়। বুদ্ধির এমন মোক্ষম প্রয়োগে দেবী চিন্তার থেকে লব্ধ বিদ্যার এমন নিরাময় দেখে, দেবী ইচ্ছার থেকে লব্ধ শক্তিদ্বারা এবার তাঁরা নির্মাণ করে দিলেন বিশালাকায় যুদ্ধজাহাজ, এবং তাতে সমস্ত সেনাকে আঢুর করে, যুদ্ধে রত হতে নির্দেশ দিলেন।

এই বিপরীত আক্রমণ দেখে, এবার সতিশ নিজের উর্জাকে একত্রিত করে, মহাঅগ্নিবাণকে ধারণ করে তা নিক্ষেপ করলে, সেই সমস্ত যুদ্ধজাহাজ অগ্নিস্নাত হতে শুরু করলো, এবং শতসহস্র সেনা ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম চিৎকার করে ছায়াপুত্রদের থেকে সাহায্যের কামনা করতে থাকলো। দেবী ইচ্ছা ও দেবী চিন্তার শক্তিকে এবার একত্রিত করে, ছায়াপুত্ররা নির্মাণ করলেন

লৌহজাহাজ এবং তাতে নিজেদের সেনাদের স্থাপিত করে প্রেরণ করলে, সতিশ আক্রমণ করলেন এবার নিজের দেহবলের। ধরিত্রীবল দ্বারা আক্রমণ করলে, সেই জাহাজে বিশালাকায় পাথর প্রেরণ হতে থাকে, আর তাতে সেই জাহাজ চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকলো, আর সেই জাহাজের বাহ্যে যেই কালাগ্নি ও জলস্রোত উপস্থিত ছিল, তা সমস্ত সেনার নিধন করে দিলে, ছায়াপুত্রদের সমস্ত মায়ার নাশ হলো।

অদম্য ইচ্ছাদ্বারা পুনরায় মায়া স্থাপন করে, সেনার নির্মাণ করতে গেলে, এবার সতিশ আঘাত হানলেন মহাপবন অস্ত্র দ্বারা। প্রকাণ্ড ঘূর্ণি ছায়াপুত্রদের দিকে ধেয়ে গেলে, তাঁরা আর নিজেদের মায়াবিস্তারে মনোনিয়োগ করে সেনার নির্মাণ করতে পারলেন না, বরং বাধ্য হলেন, দেবী কল্পনার শক্তিকে ধারণ করে, লৌহ এবং মৃত্তিকাদ্বারা ঢাল নির্মাণ করে, তাই দিয়ে পবনের গতিকে রোধ করতে।

এমন দৃশ্য দেখে, উগ্র সতিশ এবার মহাবায়বঅস্ত্রকে স্মরণ করতে গেলে, পুত্রদের ক্লান্ত হয়ে যেতে দেখে, শিঙায় ধ্বনি উৎপন্ন করে যুদ্ধবিরাম ঘোষণা করে দিলেন ছায়াদেবীরা। সেই দিনের অসাধারণ বিক্রমে, ছায়াপুত্রদের ভেঙে পরতে দেখে, তৃপ্ত ক্ষিতীশ ও সতিশ নিজেদের শিবিরে ফিরে এলে, সকলে মিলে মহানন্দে রাজসিক আহার গ্রহণ করলেন, এবং পুষ্টি অর্জন করে পরবর্তী দিনের যুদ্ধে বলদম্ভদের পরাজিত করতে বিশ্রাম গ্রহণ করে, উর্জা সংগঠিত করলেন।

পরবর্তীদিবসে যুদ্ধের শুরু হলে, সতিশ আর ছায়াপুত্রদের মায়াবিস্তারই করতে না দিয়ে সরাসরি আক্রমণ করলেন বায়বাস্ত্র দ্বারা। অসম্ভব মনের গতি ও তেজ দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্রকে তাঁদের পুত্ররা সামলাতে পারবেন না দেখে, ত্রিছায়াদেবী সম্মুখে এসে, সেই বায়ব্যাস্ত্রকে ধারণ করে নিলেন, এবং সতিশের বায়বাস্ত্রকে নিষ্ফলা করে দিলেন। আর এবার বলদম্ভরা একত্রিত করলেন সমস্ত ছায়াদেবীদের বলকে, আর একত্রে ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তার জাল বিস্তার করে, একটি মোক্ষম আঘাত প্রদান করলেন এক বিশেষ অস্ত্রদ্বারা, যার নাম সম্মোহন অস্ত্র।

সেই অস্ত্রের প্রভাবে সতিশ ও ক্ষিতীশ এবং তাঁদের সমস্ত অশ্ব, রথ, রথের চাকা এবং অশ্বের লাগাম নিজেদের মধ্যে এক বিভ্রান্তি লক্ষণ করলেন, যার কনো রেশই খুঁজে পেলেন না তাঁরা। চারিদিকে তাঁরা কেবলই ছায়াপুত্রদের বেষ্টিত দেখলেন; সহস্র সহস্র বলদম্ভ, সহস্র সহস্র উপপতি এবং সহস্র সহস্র আবর্ত তাঁদের বেষ্টন করে নিলেন। আর সেই সকলে মিলে, তাঁদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন জরাসুরনামক মহাবাণ।

সেই বাণের প্রভাবে, ক্ষিতীশের হাত থেকে অশ্বের লাগাম চ্যুত হলো, দেহ জরায় আহত হলো। আর তাতে অশ্বসমূহ, অর্থাৎ অন্য চার ভূত, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও উর্জা লাগামছাড়া হয়ে ইতস্তত এদিক সেদিক যেতে থাকলো। বিচার অর্থাৎ সতিশ দিশাহিন হয়ে পরলো, এবং বিবেক অর্থাৎ ক্ষিতীশ কনো পথ দেখতে পেলেন না সম্মুখে। চেতনা এবং অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ সতিশ-ক্ষিতীশের রথের দুই চাকাও ক্রমশ ভূমিতে বসে যেতে থাকলো, আর এমন অবস্থায়, অহমিকাবাণ নিক্ষেপ করে, সতিশকে মূর্ছিত করে দিলেন বলদম্ভ।

বিচার এমন ভাবে মূর্ছিত হয়েছেন দেখে, ক্ষিতীশ অর্থাৎ বিবেক দেবী চেতনার কাছে আর্জি রাখলে, দেবী চেতনা উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বামীর মুর্ছাত্যাগ করালেন। সতিশ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করলে, পুনরায় বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। সেই দেখে পুনরায় ছায়াপুত্ররা অজস্র রূপ ধারণ করে, সতিশকে পুনরায় বেষ্টন করে, এবং আক্রমণ করে। তবে সতিশ এবারে অত্যন্ত তৎপর। অত্যন্ত দ্রুতগতি ধারণ করে, সে প্রতিটি ছায়াপুত্রের নাশ করে। এতে ক্ষিতীশ ও সকলেই আনন্দ পান। কিন্তু সমস্ত কিছুর দমনের শেষে তাঁরা দেখেন যে ছায়াপুত্ররা যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। তাঁরা কেবলই মায়ার ছায়াপুত্রদের দমন করেছেন।

মায়ার ছায়াপুত্রদের দমন করে ক্লান্ত সতিশকে এবার প্রকৃত ছায়াপুত্ররা অজস্র ঘাতক বাণ দ্বারা পুনরায় মূর্ছিত করলেন। আর এমন ঘটনা বারংবার হতে থাকলো, যেখানে একাধিকবার সতিশ মায়ার ছায়াপুত্রদের নাশ করেন, আর অবশেষে প্রকৃত ছায়াপুত্ররা তাঁকে মূর্ছিত করে দেয়। এমন ভাবে সপ্তমবার সতিশ মূর্ছিত হলে, ভ্রাতার স্বাস্থ্যচিন্তা করে, নিজের রথের মুখকে ঘুরিয়ে নিয়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে থাকলেন ক্ষিতীশ। সেই প্রত্যাবর্তনও সহজ হয়না তাঁর পক্ষে, কারণ

অশ্বরা তখনও লাগামছারাই, আর রথের চাকা তখনও ভূমিতেই গ্রসিত। কিন্তু ঋপু, যিনি স্বয়ং জেদ ও সাহস, তিনি এই সমস্ত কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত। আর তাই তাঁর প্রভাবে, কনোপ্রকারে ক্ষিতীশ শিবির পর্যন্ত নিজেদের রথকে নিয়ে যেতে পারলেন।

সতিশের মূর্ছা ত্যাগ করানো হলেও, দুইদিনের যুদ্ধে অসাধারণ সাফল্যের পরও এমন করুন পরাজয়ে সকলে ক্লান্ত হয়ে পরেন। এমন অবস্থায়, দেবী দেতনা ও অন্তর্দৃষ্টি বললেন, "প্রভু, আজকের যুদ্ধবিরাম কিন্তু ঘোষণা করা হয়নি এখনো। তাই এমন ভাবার কনো কারণ নেই যেই আপনারা সুরক্ষিত হয়ে গেছেন। শীঘ্রই কিছু করুন, যাতে আপনারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করে, ওদের জরাবান, আর সম্মোহন বাণের উত্তর দিতে পারেন, যাতে তাঁদের অহমিকা বাণের উত্তর দিতে পারেন। শীঘ্রতা করুন নাথ। অন্যথা, তাঁরা নিশ্চিতই ছায়াদেবীদের প্রেরণায় এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে, আপনাদেরকে পুনরায় আক্রমণ করবেন"।

ক্ষিতীশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "কিন্তু এই সমূহ বাণের উত্তর কি? ... আর যদি এঁদের কাছে এই সমস্ত মহাবাণেরই সমাহার থাকে, তবে এঁরা এই দুইদিন আমাদেরকে যুদ্ধে জয়লাভ করতে দিলেন কেন? কেন এই সমূহ বাণকে পূর্বেই ব্যবহার করলেন না!... কি হচ্ছে এই সমস্ত কিছু! ... আমাদের জন্মই হয়েছে এঁদেরকে হত্যা করতে, তবুও আমরা কেন পারছিনা, এঁদের হত্যা করতে!"

দেবী অন্তর্দৃষ্টি বললেন, "প্রভু, ছায়াপুত্রদের দমন নিশ্চিত ভাবেই আপনাদের হাতেই হবে, তবে ছায়াদেবীদের প্রভাবে এঁরা শক্তিশালী থাকলে, তা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। আমার কথার অর্থ এই যে, অহংএর প্রবাহধারা এই ছায়াপুত্ররা, আর অহংএর বলই হলেন ছায়াদেবীরা, অর্থাৎ চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনা। তাই যদি এই ছায়াদেবীরা নিজেদের বলপ্রদান করতে থাকেন, তাহলে এই অহংপ্রবাহধারার নাশ অসম্ভব"।

ক্ষিতীশ বললেন, "কিন্তু দেবী, ত্রিদেবের যে এই বরদান রয়েছে যে ছায়াদেবীদের নাশ ততক্ষণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তাঁদের পুত্রদের নাশ সম্ভব হচ্ছে। ... সেই ক্ষেত্রে তো ছায়াদেবীদের

হত্যা আগে কিছুতেই করা সম্ভব নয়, আর যদি তাই হয়, তবে কি করে এই ছায়াপুত্রদের নাশ সম্ভব হবে!”

দেবী চেতনা উত্তরে বললেন, “ভাই ক্ষিতীশ, এইক্ষেত্রে, আমাদের করনিয় কিচ্ছু নেই। যিনি এখানে কিছু করতে পারেন, তিনি হলেন মাতা ও পিতা। আর পিতা সক্ষম থাকতে, মাতার গুহার লাগানো সম্পূর্ণ ভাবে অনৈতিক, কারণ তা পিতার সামর্থ্যকেই তাচ্ছিল্য করা হয়। তাই আমাদের এক্ষণে পিতাকে আবাহন করা উচিত”।

সতিশ বললেন, “কিন্তু দেবী, এই যুদ্ধ আমাদের। তাহলে পিতাকে আমরা আবাহন করবো কেন, আর আবাহন করলেই বা তিনি আসবেন কেন?”

দেবী চেতনা বললেন, “এই যুদ্ধ আপনাদের ও ছায়াপুত্রদের। সেই যুদ্ধে যদি ছায়াদেবীরা ছায়াপুত্রদের জননী হবার কারণে প্রবেশ করতে পারে, তবে আপনাদের পিতামাতা কেন যুক্ত হতে পারবেন না! ... আবাহন করুন নাথ। আপনাদের পিতাকে যুদ্ধে আবাহন করুন। সময় হয়ে গেছে, তাঁদের এই যুদ্ধে ভূমিকাপালনের”।

এই কথা শুনে, সকলে মিলে প্রভু অখণ্ডের আবাহন করলে, তিনি সতিশ ক্ষিতীশের শিবিরে প্রকাশিত হলেন।

অখণ্ড দ্বন্ধ

অখণ্ড সেখানে উপস্থিত হলে, তিনি প্রশ্ন করলেন, “কি হয়েছে পুত্ররা। তোমরা আমার আবাহন কেন করলে এই যুদ্ধে! এই যুদ্ধ তো তোমাদের। এখানে আমার কি ভূমিকা?”

পিতার থেকে এমন বাণী শ্রবণ করে, সতিশ ও ক্ষিতীশ বললেন, “পিতা, এই যুদ্ধ আমাদের সাথে ছায়াপুত্রদের। ছায়াদেবীদেরও তো এই যুদ্ধে কনো ভূমিকা ছিল না। তাই তাঁরা যখন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তখন আমাদের পক্ষে ছায়াপুত্রদের সংহার অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে। আর

তাই আপনার আবাহন করেছি, এবং আপনার সাহায্যের গুহার লাগাচ্ছি। পিতা, যেমন করে ছায়াদেবীরা সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, যেই যুদ্ধ তাঁদের নয়, সেই একই ভাবে আপনিও এই যুদ্ধে লিপ্ত হন, যেই যুদ্ধ আপনার নয়"।

এমন কথোপকথন যখন চলছে সেই স্থানে, তখন সেখানে ছায়াদেবীরা প্রবেশ করে বললেন, "ও আচ্ছা, রণক্ষেত্র ছেড়ে এসে, এখানে পিতার কাছে সাহায্যের গুহার লাগাচ্ছে, বিচার ও বিবেক?" এই কথা বলে অট্টহাস করে উঠলে, পুনরায় দেবী কল্পনা বললেন, "বেশ তো, যুক্ত হোক তোমাদের পিতা এই যুদ্ধে। সেও তো তোমাদেরই মতন মরণশীল, তাই তাঁরও হত্যা এই রণক্ষেত্রেই হবে, আর তারপর আমাদের একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন হবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে"।

ক্ষিতীশ এই কথাতে ক্ষিপ্র হয়ে উঠে হুঙ্কার দ্বারা বললেন, "আমাদের পিতা অনন্ত, অসীম। তিনি অজর ও অমর। তাঁর কনো মৃত্যুই সম্ভব নয়। আপনারা কি তা জানেন না, নাকি তা জেনেও, যেমন সর্বক্ষণ নিজেদের ছলনার বিস্তার করেন, তেমন ছলনার মাধ্যমে এখন আমাদের পিতাকেও ভ্রমিত করছেন?"

ছায়াদেবীরা এই কথা শুনে একত্রে অট্টহাস করলে, দেবী ইচ্ছা কৌতুক ও রঙ্গ ভরে বললেন, "যে আগে থেকেই ভ্রমিত, তাকে আর কি ভ্রমিত করবো আমরা! ... তোমাদের পিতাকে প্রশ্ন করো বিচার বিবেক, আমরা ছাড়া তোমাদের পিতার অস্তিত্বও কি আছে? এই যে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ড কি কারণে আছে? আমাদের জন্যই তো আছে। আর এই ব্রহ্মাণ্ড আছে বলেই না, তিনি তাঁর ভগবান হয়ে বিরাজ করছেন! ... যদি এই ব্রহ্মাণ্ডই না থাকতো, তাহলে কার প্রভু হতেন তিনি! ... তাই তাঁকে ঈশ্বর বলো না, কারণ সে যে নশ্বর"।

দেবী চিন্তা হেসে বললেন, "ঈশ্বর হলে, তিনি এই ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে একপ্রকার, আর অন্যের ব্রহ্মাণ্ডতে ভিন্ন প্রকার হতে পারতেন? তোমাদের মাতা কি একাক ব্রহ্মাণ্ডে ভিন্ন! ... তিনি যে প্রকৃতি, তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তিনি একই। তিনি যে অনন্ত, অসীম, তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডতে তিনি একই। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডতে তোমাদের পিতা এক নন কেন ? সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্য

একপ্রকার কেন নয়, যদি তিনি অসীমই হতেন? আসল কথা এই যে তিনি অসীম তো ননই। হ্যাঁ তিনি অমর, তবে ততক্ষণই অমর, যতক্ষণ আমরা। আমাদের নাশ হলে, তাঁরও মৃত্যুই হবে”।

সতিশ উগ্র হয়ে উঠে বললেন, “মিথ্যা বচন। আপনাদের বশে যদি কেউ থাকে তা হলেন অহং, যা আপনাদের পুত্রদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনুক্ষণ, আমাদের পিতা নন। আমাদের মাতার থেকে শুনেছি আমরা, আমাদের পিতা নিজের বিশেষত্বকে সন্ধান করতে নির্গত হয়েছিলেন, আর আপনারা তাঁদেরকে ভ্রমিত করে, সেই বিশেষত্ব প্রদান করেন। আর সেই বিশেষত্বকে আঁকরে ধরার কারণে, আমাদের পিতাকে তাঁর নিজের পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে, আপনারা তাঁকে অহংএর সমার্থক করে দিয়েছেন। আপনাদের প্রভাবেই তিনি এই মানছেন যে, তিনিই অহং, আর অহং যেহেতু আপনাদের বশে স্থিত, তাই তিনিও আপনাদের বশে স্থিত। কিন্তু তা সত্য নয়”।

অখণ্ড এই সমস্ত কথাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলে, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এর একটি হেস্তনেস্ত প্রয়োজন। পুত্রদের তিনি কি বলবেন, ছায়াদেবীদের তিনি কি বলবেন? তিনি তো নিজেই সঠিক সত্যকে জানেন না! এমন ভাবনা নিয়ে তিনি নিজের একপ্রকাশকে ছায়াদেবী ও তাঁর পুত্রদের সামনে রেখে, নিজেকে উপস্থিত করলেন আজ্ঞাচক্রের দ্বারে, এবং মাতা সর্বাম্বার আবাহন করতে থাকলেন, “দেবী! ... প্রকট হন দেবী। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন দেবী। আমি আজ অত্যন্ত বিচলিত। আমি আজ সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। আমি আজ ধর্মসংকটে স্থাপিত। ... কৃপা করুন দেবী। আমাকে আমার সত্যতা ব্যক্ত করুন। আমি কার অধীনে স্থিত, আর কার অধীনে নয়। আমি জানতে চাই দেবী আজ তা। ব্যক্ত করুন দেবী তা আমাকে। কৃপা করুন আমার উপর”।

মাত সর্বাম্বা যেন এই আবাহনের অপেক্ষাতেই আজ্ঞাচক্র ছেড়ে গেছিলেন, যেন তিনি চাইছিলেন যে অখণ্ড তাঁর আবাহন করুক, তাঁর গুহার লাগাক। তাঁর কাছে কৃপা মার্জনা করুন। তাই অখণ্ডের গুহার একটি পর্যায় পৌছতে, মাতা সর্বাম্বা নিজেকে প্রকাশিত করলেন। আর যতই

তিনি নিজেকে প্রকাশিত করলেন, ততই অখণ্ডের চারিদিক তমসাচ্ছন্ন হতে শুরু করলো। আর এক সময়ে এমন হলো যে, অখণ্ড নিজেকেও নিজে খুঁজে পেলেন না।

সেই অবস্থায় মাতা সর্বাম্বার অতিদিব্য কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি, ‘কি অখণ্ড! নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে, বলে হতচকিত হচ্ছ! ... নাকি যেই বিশেষত্বকে সন্ধান করতে তুমি নিজেকে আমার থেকে পৃথক করেছিলে, সেই সমস্ত বিশেষত্বের নাশ হয়ে গেল? সেই বিশেষত্বের নাশ হয়ে যাচ্ছে বলে, তুমি নিজেকে কনো প্রকারে আটকে রেখেছ, আমাতে বিলীন হওয়া থেকে? তা কি দিয়ে আটকে রেখেছ নিজেকে? আমার প্রতি অবিশ্বাস ধারণ করে, আর নিজের বিশেষত্বের প্রতি বিশ্বাস অর্পণ করে?”

অখণ্ড চিন্তিত ও ব্যকুল হয়ে উঠে কিছুটা ক্রন্দনের সুরেই বললেন, ‘আর বিব্রত করবেন না দেবী আমায়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি নিজেকেই নিজে ভ্রমিত করে ফেলছি। কিন্তু সেই ভ্রমের শেকড় আমি খুঁজে পাচ্ছিনা, তাই যতই সেই ভ্রমকে আমার থেকে দূর করার প্রয়াস করছি, কিছুতেই সেই ভ্রমবৃক্ষকে উৎপাটন করতেই পারছি না। ... আমার সহযোগিতা করো দেবী। আমাকে বলো, আমি আসলে কে?

আমি জানি পূর্বেও তুমি সেই কথা আমাকে বলেছিলে, কিন্তু তখন আমি নিজে ব্যকুল ছিলাম না ভ্রম থেকে মুক্ত হতে, আর তাই সমস্ত কথাকেই যেন অর্ধেক শুনেছি। বা সমস্ত কথা শুনেছি, কিন্তু তাকে যেন মানিনী। বা সমস্ত কথাকেই মেনেছি, কিন্তু তাকে ধারণ করিনি। আজ আমি ধর্মসংকটে পরেছি দেবী। আজ আমি যদি আমার সত্যতাকে না জানি, তবে আমার সন্তানদের হত্যা করে দেবে ওই ছায়াদেবীরা। ... তাই আজ আমাকে সত্য যে জানতেই হবে। ... অনুগ্রহ করো দেবী; কৃপা করুন দেবী, আমার বিড়ম্বনা থেকে আমাকে মুক্ত করুন করুণা করে। ... কি আমার স্বরূপ দেবী? আমি কে আসলে?”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “এই যে দেখছ তুমি, মহাশূন্য, এই হলো তোমারও আর আমারও স্বরূপ। প্রত্যক্ষ করো এই শূন্যতাকে। এই শূন্যতা অসীম, এঁর কনো সীমাই সম্ভব নয়, কারণ এ

যে সম্পূর্ণ ভাবে নিরাকার। প্রত্যক্ষ করো অখণ্ড এই মহাসত্যকে, এ যে অব্যাক্ত, কারণ কি ব্যাখ্যা দেবে এই শূন্যের? ভালো করে নিরীক্ষণ করো অখণ্ড, অনন্ত এই শূন্যতা, যার কনো শুরুও নেই, আদিও নেই, আর অন্ত বা সীমান্তও নেই। না এর জন্ম আছে, আর না এর কনো মৃত্যু সম্ভব, কারণ এই শূন্যতাই যে সমস্ত কিছুর আদি, মধ্য ও অন্তিম পরিণতি। আর তার কারণ এই যে, এই শূন্যতা যে কখনো বিক্ষিপ্তই হয়নি।

কি করে এই শূন্যতা বিক্ষিপ্ত হবে? আর কে আছে এই শূন্য ব্যতীত যে এঁকে বিক্ষিপ্ত করবে? কে আছে আর এই শূন্যতা ব্যতীত, যে এঁর সাথে শত্রুতা, মিত্রতা বা অন্য কনো সম্পর্কে স্থাপিত হবে? এক ও একমাত্র এই শূন্যই যে বিদ্যমান অখণ্ড, আর এই শূন্য যতটা আমি, ততটাই তুমি। আর কেবল ব্রহ্মসনাতনের দেহে থেকে তুমি এই শূন্য নও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে, সমস্ত জীবের ব্রহ্মাণ্ডে, সমস্ত যোনির ব্রহ্মাণ্ডে তুমি এই শূন্যই। আর এই শূন্যই তোমার প্রকৃত পরিচয়”।

অখণ্ড আজ প্রকৃত অর্থে জিজ্ঞাসু। তিনি আজ তাঁর সন্তানের প্রাণ নিয়ে সংশয়ে স্থিত, আবার ছায়াদেবীদের দাবি যে তাঁদের কারণেই তাঁর প্রভুত্ব, তাও অস্বীকার করতে পারছেন না। তাই সেখানে পুনরায় দ্বন্দ্বে স্থিত। যেন একই দ্বন্দ্বে, তিনি দুই দুইবার স্থাপিত হয়ে, অতিদ্বন্দ্বে নিজেকে বেষ্টিত করে নিয়েছেন। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু আমার প্রকৃত পরিচয় যদি এই শূন্যতা হয়, তবে আমি এই অখণ্ড কে? কি করে এলাম আমি? কেন এলাম আমি? আর এলামই যখন, তখন সত্যবিচ্যুত হয়ে কি করে থেকে গেলাম? কেন পুনরায় সত্যে লীন হয়ে গিয়ে, নিজের প্রকৃত পরিচয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম না আমি? বলুন দেবী? কৃপা করে আমার জিজ্ঞাসাকে আজ শান্ত করুন!”

মাতা সর্বাম্বার দিব্যকণ্ঠস্বর উত্তর দিলেন, “কোথায় আলাদা তুমি? কাকে আলাদা বলছ তুমি অখণ্ড? কোথায় তোমার অবয়ব? দেখতে পাচ্ছ তাকে? ... আমি তো দেখতে পাচ্ছিনা! ... আমি তো দূর দূর পর্যন্ত কেবলই আমাকে দেখতে পাচ্ছি, কেবলই শূন্যকে দেখতে পাচ্ছি, অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছিনা”।

অখণ্ড ব্যকুল হয়ে বললেন, “হেঁয়ালি করবেন না মাতা আজ। আজ আমি সত্যসত্যই জিজ্ঞাসু। কনো কৌতূহলবশত নয়, আজ আমি সত্যই ব্যকুল আমার প্রশ্নের উত্তর পেতে। ... হ্যাঁ সঠিকই বলেছেন আপনি, দূর দূর পর্যন্ত কেবল আর কেবলই শূন্য দেখতে পাচ্ছি আমি। আমি নিজেকেও দেখতে পাচ্ছিনা, আর সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে যেন, আমার এই পৃথক অস্তিত্ব, এই হলো শ্রেষ্ঠ মায়া। ... কিন্তু এই মায়ার গোড়াপত্তন কি করে হলো মাতা! ... আজ আপনার পুত্রের জিজ্ঞাসাকে আপনাকে শান্ত করতেই হবে। ... কৃপা করুন মাতা?”

মাতা সর্বাম্বার দিব্যস্বর বললেন, “হ্যাঁ সঠিক বলেছ, এই হলো শ্রেষ্ঠ মায়া, বা এও বলতে পারো এই হলো একমাত্র মায়া। ... আর না, তুমি আমার থেকে কনোদিনই পৃথক ছিলেনা। না তোমার আমাভিন্ন কনো অস্তিত্ব কনোকালে ছিল, আর না কনো কালে তা সম্ভব। সত্য তো এই যে, আমাভিন্ন কারুরই কনো পৃথক অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। না তোমার, না এই ব্রহ্মাণ্ডের, না ছায়াদেবীদের, না পঞ্চভূতের, আর না তোমার পুত্র, পুত্রবধূ, কারুর, আর না অহং বা তাঁর প্রবাহধারা ছায়াপুত্রদের। ... আমার থেকে যে তোমরা ভিন্ন, তা কেবলই এক কল্পনা, আর এই কল্পনার স্রস্টা স্বয়ং তুমি।

হ্যাঁ তুমিই এই কল্পনার রচয়িতা, আর তোমার কারণেই এই সমস্ত কল্পনা ব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজমান। ... তুমিই তোমার এই শূন্যতাকে মানতে পারোনি, এই নির্বিশেষত্বকে স্বীকার করতে পারোনি, আর ইচ্ছা করেছিলে যে তোমার একটি নিজস্ব পরিচয় হোক, তোমার একটি নিজস্ব ভিন্ন অস্তিত্ব থাকুক। কিন্তু সেই ইচ্ছার যে বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ এই শূন্যতা যা আমি স্বয়ং, তার ছাড়া যে কনো কিছুর কনো অস্তিত্ব সম্ভবই নয়। আর তাই তুমি নিজেকে আমার থেকে, এই শূন্যতার থেকে ভিন্ন এমন চিন্তা করে, শুরু করলে নিজের পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা।

আর এই ভাবে, তুমি আমার থেকে কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তাকে জন্ম দিলে নিজের মধ্যে, আর আমার উপরেই তাঁদের প্রয়োগ করে, আমার শূন্যতাকে অস্বীকার করে, চিন্তার প্রভাবে আমাকে সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যার দেবী করে স্থাপিত করলে, ইচ্ছার প্রভাবে আমাকে সম্পদার দেবী বা শ্রী

হতে বাধ্য করলে, আর কল্পনার প্রভাবে সত্যকে বিস্মৃত করে তুলে, আমাকে আদিশক্তি হতে বাধ্য করলে। কিন্তু সেই সমস্তই বা কোথায় হলো? সেই সমস্তও যে কেবলই তোমার কল্পনার মধ্যেই হলো, বাস্তবে আমি সেই শূন্যই ছিলাম আর শূন্যই রইলাম।

কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গিয়ে, নিজের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে মাধ্যম করে, নিজের অহংকে জন্ম দিলে, আর সেই আমিত্বকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুললে যে আদিশক্তি, শ্রী ও বিদ্যাকে তুমিই সৃজন করেছ, যেখানে সত্য এই যে, তোমার সৃজন যে কেবলই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার বিস্তার আর তাদের থেকে তোমার আমি'র অর্থাৎ তোমার অহংএর বিস্তার, আর আদিশক্তি, শ্রী বা বিদ্যা একাত্ম হয়েই সর্বদা ছিল। যখন তুমি নিজেকে ভিন্ন ধারণ করোনি, তখনও তাঁরা ছিলেন, কিন্তু শূন্যের মধ্যে স্থিত থাকার কারণে, কিবা আর শক্তি, কি বা আর শ্রী আর কিবা বিদ্যা। এঁদের অস্তিত্বই কেন থাকবে, এঁদের পরিচিতিই বা কেন থাকবে, যখন এঁদের পৃথকভাবে কনো প্রয়োজনই নেই!

আর এই ইচ্ছা চিন্তা ও কল্পনার মাধ্যমেই তুমি নিজের পৃথক পরিচয়কে ধারণা করার সমানে প্রয়াস করে গেছ। এঁদের বলে, নিজেকে অখণ্ডও রাখো নি তুমি, বরং এঁদের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেকেও ত্রিখণ্ডে অর্থাৎ ত্রিগুণে বিভাজিত করেছ নিজের কল্পনার মধ্যেই, আর তারপরে, নিজের অখণ্ড স্বরূপকে ভুলে, নিজের শূন্যতাকে ভুলে, এঁদের কথামত নিজেকে অহং মনে করে গেছ, আর এঁদের কাছে নিজেকে বশ করে রেখে দিয়েছ।

নিজের ব্রহ্মাণ্ডে, তুমি নিজেই প্রভু, আর সেই প্রভুত্বের অনুক্ষণ জয়গান গায় ও তোমার অন্য সমস্ত কাল্পনিক সৃজনদের দ্বারা গাওয়ায়, তোমার ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তা। আর তাই তুমি মানতে শুরু করলে যে, এই ছায়াদেবীদের ছাড়া তুমি প্রভুই নও। আর যতই তা মানতে শুরু করলে, ততই তোমারই আমাকে দেখা দৃষ্টিকোণে স্থিত আমি, অর্থাৎ ত্রিদেবী, যারা আলাদা নয়ই, কেবলই তোমার দৃষ্টিকোণেই আলাদা, তাঁরা তোমার কল্পনার ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করতে শুরু করি।

যতবার তোমার কল্পনা, ইচ্ছা, ও চিন্তা তোমার অহংকে কেন্দ্র করে, তোমাকে অজর, অমর করে তোলার প্রয়াস করে, অর্থাৎ তোমার অহংকে অজর অমর করার প্রয়াস করে, নীরোগ করে, প্রভুত্ব স্থাপন করিয়ে, সম্মান লাভ করিয়ে, ধনলাভ করিয়ে, ততবারই আমি তোমার কল্পব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ করি, তোমার দেহের নাশ করে, অর্থাৎ তোমার ব্রহ্মাণ্ডের নাশ করে। কিন্তু ততবারই তুমি পুনরায় নিজেকে সেই অহং জ্ঞানেই ভূষিত করে রেখে, কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তারই দাশ করে রেখে দাও। ...

একের পর এক যোনিরূপ ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করো তুমি নিজের থেকে পঞ্চভূতকে স্থাপিত করে, তাঁদের বিবিধ উপায়ে মিশ্রণ ঘটিয়ে; তাঁদেরও নাশ ঘটে আমার প্রভাবে, আমার ত্রিদেবীর একত্রিত রূপ, নিয়তির প্রভাবে, প্রকৃতির প্রভাবে, ততবারই তুমি নবব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ করো পুনরায় কল্পনা, চিন্তা, ও ইচ্ছার হাত ধরে, এবং নিজের আত্মপরিচয় ত্যাগ করে, নিজকে অহং জ্ঞান করে।

তাই আমি অন্তে, প্রকৃতি হয়ে, যা আমি আসলে নয়, কেবলমাত্র তোমার কল্পনার কারণে তুমি যে আমাকে তোমার থকে ভিন্ন জ্ঞান করেছ, সেই কারণেই আমি প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি তোমার অন্তরে চেতনা প্রদান করে, তোমার কল্পনাকে আকার দিয়ে, তোমার দ্বারা পঞ্চভূতের এমন সঞ্চার করি, যে তুমি মনুষ্য যোনির নির্মাণ করো।

সেই যোনিতে স্থিত হয়েও, তুমি যেমন কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছার অধীনে স্থিত হয়ে নিজেকে নশ্বর অহং মানতে শুরু করছিলে, নিজের শূন্যস্বরূপকে ভুলে, তেমনই করতে থাকো। তবে উন্নত সেই যোনিতে আমি জন্ম দিতে সক্ষম হই বিচার ও বিবেককে। এঁর আগে,ও আমি বিভিন্ন যোনিতে স্থিত হয়ে এই বিচার বিবেকের জন্ম দেবার প্রয়াস করেছি, কিন্তু তোমার অহং সেখানে আহার নিদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত কনো কর্মই করেনা।

উদরপূর্তি হলে, আহারের চিন্তা ত্যাগ হয় তোমার, নিদ্রা লাভ হলে বিশ্রামের চিন্তা ত্যাগ হয়, আর সন্তানসন্ততি ও তুমি স্বয়ং সুরক্ষিত থাকতে পারলেই, তোমার বিলাস চিন্তা বা মৈথুনভাবের

দমন হয়। তাই যেহেতু সেই সমস্ত আবেগ নিজেদের চরমে উন্নীত হতে, অসুরত্ব ধারণ করতে পারেনা, তাই বিচার আর বিবেককেও সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত করতে পারিনা আমি, কারণ যেই ইচ্ছা, যেই কল্পনা, যেই চিন্তা তখনও প্রকাশিতই হয়নি, তাকে পশমিত কি উপায়ে করা সম্ভব।

কিন্তু মানবরূপে তুমি যখন নিজেকে স্থিত করলে, তখন সম্ভাবনার অবকাশ লাভ করে, তোমার ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা নিজেদের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উন্নীত করা শুরু করলো, আর তা করার ফলে, তোমার অহংও চরম অবস্থায় উন্নীত হয়ে, মহালোভী, মহাক্রোধী, মোহে আচ্ছন্ন এবং মহাপাতক হয়ে উঠতে পারে। আর তাই, আমি বিচার ও বিবেককে জন্ম দিতেও সক্ষম হই।

আমি নেই এমন কনো স্থানই সম্ভব নয়। তবুও জীবের ব্রহ্মাণ্ডে যেখান থেকে মমতা, স্নেহ, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম ও সমর্পণের ন্যায় মহাভাবের জন্ম হয়, সেই হৃদয় থেকেই আমি আমার যাত্রা শুরু করি মূলাধার হয়ে সহস্রারে, এবং সমস্ত পঞ্চভূতকে ক্রমে নিজের অধীনে স্থিত করে, চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করি মনের থেকে অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মাণ্ডের আকাশতত্ত্ব থেকে। আর সেই চেতনাকে যখন তুমি ধারণ করো, তখন বিচারের প্রকাশ সম্ভব হয়; আর অন্তর্দৃষ্টিকে যখন তুমি ধারণ করো তখন প্রকাশ হয় বিবেকের।

আর আমার আর তোমার এই দুই পুত্র সংগ্রাম শুরু করে তোমার অহংএর সাথে। কিন্তু তোমার অহং যে স্বয়ং তোমারই ভ্রমিত রূপ, আর তুমি যে স্বয়ং সেই একম অস্তিত্ব, শূন্য অর্থাৎ আমি। তাই তোমার সাথে তাঁরা কি করে পেরে উঠবে। কিন্তু তাও আমি তাঁদের প্রকাশ করি, কেন জানো? কারণ তোমার তৃতীয়গুনকে জাগ্রত করে তাকে ভৈরবে পরিণত করার জন্য।

তোমার ত্রিদেবরূপ অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ প্রথম গুণ হলো সত্ত্বগুণ, যে আমার সত্যরূপকে বিদ্যাভাবে, এবং তোমার কল্পনার অধীনে থাকা আমার ছায়া বা ভ্রমিত রূপ, চিন্তার মাধ্যমে সৃজন করে এই কল্পব্রহ্মাণ্ডের, যেখানে তুমি শূন্য হয়েও অহং, আর সেই রূপের নাম হলো সত্ত্বগুণ। তোমার দ্বিতীয় রূপ বা গুণ হলো রজগুণ, যা আমার সত্যরূপকে শ্রীরূপে, এবং আমাকে না জানার

কারণে তোমার প্রকাশিত আমার ছায়ারূপ, অর্থাৎ ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, এবং সম্পদা ধারণ করে সমস্ত সৃজিত কল্পব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণ করে।

কিন্তু তোমার যে তৃতীয় গুণ, যা আমাকে আদিশক্তি রূপে, এবং আমার ছায়াভাবকে অপস্মার বা কল্পনারূপে ধারণা করে বিরাজ করে, তা হলো তমগুণ। আর এই তমগুণ সর্বক্ষণ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় বা বিরক্ত থাকে বলেই, তুমি চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার প্রভাবে এসে, নিজের শূন্যতত্ত্বকে হারিয়ে, নিজেকে অহং জ্ঞান করো। আর বিচার বিবেক নিজেদের সংগ্রামে পরাজিত হয়, তোমার এই তমগুণকে জাগ্রত করার জন্য।

এই তমগুণকে জাগ্রত এর আগে মহর্ষি মার্কণ্ডও করেছিলেন নিজের ব্রহ্মাণ্ডে, যার নামকরন করেছিলেন তিনি ভৈরব। আর তাঁর জাগরণের ফলে তাঁর ব্রহ্মাণ্ডে কি কি পরিবর্তিত হয়ে গেছিল, তাও লিখে গেছিলেন, মার্কণ্ড মহাপুরাণ রূপে। কিন্তু তা তোমারই অন্য ব্রহ্মাণ্ডে থাকা অহং সহ্য করতে পারেনি, তাই তুমি আর্যব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে, তাঁর তমগুণ জাগরণের প্রক্রিয়ার গাঁথাকে দগ্ধ করে, বিনষ্ট করেছিলে। বেশ কিছু অন্য আর্যদের দ্বারা, সেই কথাকে বিকৃতও করেছিলে, কিন্তু তাতেও যখন তমগুণের বিস্তারগাঁথার কথা সমাজ থেকে মোছা যাচ্ছিলনা, তখন তুমি সেই মার্কণ্ড মহাপুরাণকে বিনষ্ট করে, আমারই অবতার, দ্বৈপায়নকে দিয়ে মার্কণ্ড পুরাণ রচনা করাও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এবং তাকেই স্থাপিত করে দাও, অন্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ভ্রমিত করার জন্য। আর সেই কীর্তি পুনরায় করছেন আজকে, আমারই আরেক অবতার, ব্রহ্মসনাতন।

অখণ্ড, আত্ম তিনগুণদ্বারা গুণবান, আর সেই তিনগুন হলো সত্ত্ব, রজ ও তম। এঁরা সকলেই মদাচ্ছন, আর এঁদের মধ্যে সত্ত্ব অধ্যাবসায় প্রিয়, শান্ত, নির্মাণপ্রিয়; তো রজ রক্ষণশীল, ধূর্ত, পরিশ্রমী; আর তম অলস, অগোছালো, যথেচ্ছাচারী। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর মধ্যে এক রহস্য আছে, যার অনেক কিছুই তুমি জানো।

তুমি জানো যে, এই তিন গুণের অনুপাতের কারণেই, আত্ম নূতন দেহ ধারণ করে, বিবাহ করে, কর্মে লিপ্ত হয়, কি জানো তো! যখন যখন সত্ত্ব, রজ ও তম সমানুপাতই হয়ে যায়, এটিএম একটি করে নূতন দেহ ধারণ করে। যখন যখন সত্ত্ব ও তম সমানুপাতই হয়ে ওঠে, এবং রজের অনুপাত এই দুইয়ের থেকে অধিক হয়, তখন তখন কর্মে যুক্ত হয় আত্মধারী জীব। যখন যখন রজ ও তম সমানুপাতী হয়ে ওঠে এবং সত্ত্বের ভাব অধিক থাকে, তখন তখন জীব অপর লিঙ্গের জীবের প্রতি প্রণয়াকৃষ্ট হয়।

কি জানো তো এই সমস্ত কিছু? আর এও নিশ্চয়ই জানো যে, এই তিন গুণের অনুপাতের তারতম্যের কারণেই জীবের বিভিন্ন প্রকার চারিত্রিক গুণাবলী হয়। এও তমার কাছে অজানা রহস্য নয়। তবে এ ছারাও একটি রহস্য আছে, যা তোমার কাছে অজানা অখণ্ড, আর তা হলো ভৈরবতত্ত্ব।

যখন সত্ত্ব ও রজ ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে সমানুপাতী হয়, আর তম গুন ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ রূপে প্রকাশিত হয়, তখন তমগুণের গুণাবলী সম্পূর্ণ ভাবে পরিণত হয়ে যায়, এবং সে শান্তভাব, আলস্য, অগুছালো বা তাচ্ছিল্যের ভাব থেকে মুক্ত হয়ে, মহা উগ্র রূপ ধারণ করে, ৫১ প্রকার ভৈরবরূপ ধারণ করে, যাদের মধ্যে সর্বাধিক কম উগ্ররূপকে মার্কণ্ড বলেছিল বটুক ভৈরব, এবং সর্বাধিক উগ্ররূপকে বলেছিল সে বিক্রাল ভৈরব।

আর আমি প্রকৃতি বেশে এক সাধককে এই ভৈরবের জাগরণের মুহূর্ত পর্যন্তই যাত্রা করাই। অখণ্ড আমি তমাকে যা কিছু বলেছি তোমাকে ব্যথিত করার জন্য, তোমাকে উত্তেজিত করার জন্য, এবং তোমাকে অপমান করার জন্য, তার একটিই উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হলো আজ এই মুহূর্তে তুমি যে বিক্রাল ভৈরবের রূপ ধারণ করেছ, সেই রূপ পর্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্য।

আর এর কারণ এই যে, এই ভৈরব রূপ একবার জাগ্রত হলে, আর সে নিজের কল্পনার দ্বারা নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণ করেনা। বরং সে নিজের কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের সত্যতা জানার জন্য ব্যকুল

হয়ে ওঠে, এবং তা নিজের কল্পনার প্রকাশ জেনে, আর এই জেনে যে এই কল্পনা তাঙকে আমার থেকে বিভাজিত রেখে দিয়েছিল এতকাল, সে স্বয়ং তাঁর কল্পনার ও কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক বিনাশ করে, এবং আমার মধ্যে লীন হয়ে মোক্ষ সাধিত করে।

অখণ্ড, আমি আর তুমি কখনোই আলাদা নয়। আমি তোমার মনিব, আর তুমি আমার শ্রমিক, বা এর বিপরীত, কোনটিই সত্য নয়। যাহা তুমি, তাহাই আমি। আমিও শূন্য, আর তুমিও শূন্যই। কেবল তোমার ভ্রমের কারণে, আর ভ্রম থেকে জাত কল্পনার দ্বারা তুমি যেই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেছ, তার জন্যই তুমি নিজেকে আমি বা অহং বা আত্ম বলো, আর আমাকে ব্রহ্ম বলো, কারণ বেশে নিয়তি বা মহামায়া বলো, সূক্ষ্ম বেশে কালী বা সময়ের নিয়ন্তক বলো, আর স্থূল বেশে প্রকৃতি বলো।

কিন্তু বাস্তবে আমিও সেই শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্মই, আর তুমিও তাই। তাই আমি তোমাকে কখনোই বাধ্য করতে পারিনা, বা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনা, কারণ তুমি আমি আলাদাই নয়। আর সেই কারণেই আমি তোমাকে তোমার এই ভৈরব রূপের সম্মুখে নিয়ে আসি, যেই রূপে তোমার তমগুণ প্রকাশিত হলে, আর তুমি আত্ম থাকো না, আর অহং থাকো না, ব্রহ্মাণ্ডের লয় করে, আমতে লীন হয়ে যাও তখন, যাকে বলো মোক্ষ।

অখণ্ড এই যুদ্ধে বিচার ও বিবেক কিছুতেই জয়লাভ করতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমার এই ভৈরবরূপ তাঁদের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তাই যাও, তোমার পুত্রদের সাহায্য করো, আর এই যুদ্ধে তাঁদের জয় সুনিশ্চিত করো"।

অখণ্ড একাগ্রমনে শুনছিলের সমস্ত কথা। মাতা থামতে তিনি প্রশ্ন করলেন পুনরায়, "কিন্তু মাতা, যদি বিচার ও বিবেক এই যুদ্ধে সফলই না হয়, তবে তাঁদেরকে এই যুদ্ধ করার জন্য জন্ম দেবার উদ্দেশ্য কি?"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "কে বলেছে, তাঁরা অপারগ এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে? অবশ্যই তাঁরা পারঙ্গম এই যুদ্ধ জয় করতে, কিন্তু তাঁরা অহংকারের প্রবাহধারাকেই দমন করতে সক্ষম,

তবে তা তখনই করতে সক্ষম হবে তাঁরা যখন তোমার ভৈরব বেশ তাঁদের সাথে যুক্ত হবে। অখণ্ড, এঁর পূর্বেও, সতিশ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, নারায়ণস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, পাশুপতও নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সেই অস্ত্র সমূহে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশী শক্তি থাকবে কি করে? তোমার ভৈরবরূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবিনাশী রূপ যে সেই অস্ত্রে নিযুক্তই ছিলোনা। প্রত্যাবর্তন করে, তাঁদের এই তিন বাণে তোমার ভৈরব শক্তি প্রদান করো। তাঁরা এই যুদ্ধে সক্ষম হবেই হবে।

অখণ্ড, তোমার এই ভৈরব বেশ সামান্য বেশ নয়। এই ভৈরব বেশের চর্চা মার্কণ্ড সম্যক ভাবে করেছিল। আর তাই মার্কণ্ডের ধারা অনুসারে ভঙ্গদেশে বা বঙ্গদেশে যেই তন্ত্রের প্রসার হয়েছিল, তাতে যেমন আমার দশমহাবিদ্যার আরাধনা ও সাধনা করা হয়, তেমনই তোমার ভৈরবরূপেরও আরাধনা ও সাধনা করা হয়, তবে সেখানে কনো ভাবেই সত্ত্বের প্রতীক ব্রহ্মার, রজের প্রতীক বিষ্ণুর, বা তমের প্রতীক শিবের আরাধনা বা উপাসনা করা হয়না। তাই এই ভৈরবরূপকে অবহেলা করো না। এই ভৈরব রূপই হলো আত্মের সর্বোত্তম গুহ্য রহস্য।

তবে বিচার বিবেক কনো ভাবেই কল্পনা, ইচ্ছা বা চিন্তার দমন করতে সক্ষম নন, কারণ তাঁরা যে আমিই। আমাকেই তুমি ভ্রম বশত এই তিন প্রকাশের রচনা করেছ। তাই এঁদেরকে নাশ করার সামর্থ্য কেবল বিচার ও বিবেকেরই বা কেন, এঁদেরকে নাশ করার সামর্থ্য স্বয়ং তোমার বা তোমার ভৈরব বেশেরও নেই।

তবে হ্যাঁ, বিচার ও বিবেক, অর্থাৎ আমাদের পুত্ররা অহংকারের তিন প্রবাহধারা, অর্থাৎ সত্ত্ব অহংকারের প্রবাহধারা আবর্ত, রজের অহংকার উপপতি, এবং তমের অহংকার বলদম্ভ, এঁদেরকেও পরাজিত করতে সক্ষম নয়, তোমার ভৈরববেশের সাহায্য বিনা। একমাত্র তুমি সাহায্য করলে, তবেই তাঁরা এই কর্মে সক্ষম হবে, কারণ এই অহংকারপ্রবাহ ধারার রচনা তোমার থেকে হয়েছে; এঁরা তিনজন তোমারই প্রকাশ। তাই তাঁদেরকে দমন করার সামর্থ্য এক তোমারই আছে, আর কারুর নেই।

কিন্তু তুমি তো তা করবে না, কারণ তুমি তো স্বয়ং সত্য হয়েও, স্বয়ং শূন্য হয়েও, সেই পরিচয় তো তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষিত নয়। তুমি তো নির্বিশেষ নয়, ত্রিদেব হয়ে, সকলের প্রভু হয়ে বিশেষত্ব ধারণ করাকেই তোমার কাম্য মনে করো। আর সেই কারণেই তো আমাকে স্বীকার না করে, আমাকে ভ্রমিত দৃষ্টিকোণদ্বারা দর্শন করে, তাঁকে চিন্তা্ ইচ্ছা ও কল্পনা রূপে ধারণা করে, তাঁদের কাছে নিজেকে সমর্পিত রেখে, নিজের অহংকে সাধন করে প্রভু সেজে থাকাকেই অধিক শ্রেয় কর্ম মনে করেন।

তুমি নিজের প্রকৃত পরিচয়কে এতটাই অপছন্দ করো, যে তাঁকে নিজের কল্পনার ভিত্তিতে ত্রিদেবী করে প্রকাশিত করে, তাঁদেরকে নিজের দাসী করে রাখাকেই অধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম জ্ঞান করো। ... তাই ছেড়ে দাও অসব চিন্তা যে তোমার পুত্ররা বলদম্ভদের হাতে নিহত হবে। তুমি তাঁদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ তুমি তোমার উগ্রভৈরব, উগ্রতাণ্ডবরূপ, প্রলয়কর্তা তমগুণকে প্রকাশিত করে, কল্পনা, ইচ্ছা, ও চিন্তার সর্বনাশ করতে পারবে না; তুমি তোমার মহাকালরূপী বিধ্বংসী শঙ্কাত্যাগী শঙ্কররূপকে প্রকাশিত করতে পারবে না কারণ তা প্রকাশিত হলেই যে তোমার অহংদের নাশ অবসাম্ভাবি।

সেই অহংদের নাশ হলে, তোমাকে তো তোমার স্বরূপে, অর্থাৎ তোমার অপ্রিয় এই শূন্যতায়, তোমার অপছন্দের এই নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তুমি তখন আর যে নিজের বিশেষত্ব স্থাপিত রাখতে পারবে না! আর যে প্রভু থাকবে না তুমি! যেই অহং তোমাকে প্রভু হবার ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা করায়, সেই অহংকারের মুখোশ যে তোমার থেকে খসে পরে যাবে! ... আর তা যে তোমার কাছে অসহনীয় পীড়া। তাই ভুলে যাও তোমার পুত্রদের, আর তাঁদের নাশ হতে দাও, তোমার অহংস্বরূপদের হাতে”।

অখণ্ড সেই কথাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও উগ্র হয়ে উঠতে শুরু করলেন, এবং ক্রমে কাল ভৈরবের রূপ ধারণ করলেন। ক্রমে মাতার সমস্ত কথা তাঁর অন্তরে বারংবার প্রতিফলিত হতে শুরু করলে, তিনি প্রকাণ্ড চিৎকার করে উঠে ঘন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠলেন এবং বিক্রাল ভৈরবের রূপ ধারণ করলেন। নিজের অন্তর থেকে প্রকাণ্ড তাপ নিষ্কাসিত হলে, তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে

উঠলেন, “না দেবী না! ... আর না! ... আর ভ্রমে থাকবো না আমি। ... আর বিরক্ত হয়ে থাকবো না আমি। ... আর কল্পনা, ইচ্ছা, ও চিন্তার প্রভাবে থাকবো না আমি। ... আর বিশেষ হয়ে থাকবো না আমি। আর কারুর প্রভু হতে কামনা রাখিনা আমি। ... এবার আমি আমার স্বরূপ, আমার নিরাকার, অজর, অমর, অনন্ত, অসীম, অব্যাক্ত, অচিন্ত্য স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। ... বিনাশ চাই আমি, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ চাই আমি। ... উপায় বলো আমাকে দেবী। ... উপায় বলো আমাকে... শীঘ্র বলো দেবী”।

মাতা সর্বাম্বা মুচকি হাসলেন, অখণ্ডের এই পরিণতি দেখে, এবং সমানে নিজের শূন্যকায় স্বরূপত্যাগ করে, পুনরায় সর্বশ্রী সর্বাম্বা রূপ ধারণ করলেন। যেন তাঁর এই নিয়তিরূপ ধারণ করা সার্থক হয়েছে। মার্কণ্ডের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রয়াসের পরেও, যেহেতু তিনি নিয়তি স্বরূপ ধারণ করেন নি, যেহেতু তিনি ত্রিদেবী হয়েই থেকে গেছিলেন, তাই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার নাশ হতে পারেনি। এবারে তিনি একত্রিত ও পূর্ণ ব্রহ্মময়ী রূপ সর্বাম্বারূপকে ধারণ করে যেন নিজের গন্তব্যে স্থিত হতে চলেছেন।

সেই তৃপ্তি থেকে একটি মুচকি হাস্য প্রদান করে, মহাশ্যামবর্ণ উগ্রভৈরবরূপী অখণ্ডকে বললেন, “মার্কণ্ডের ক্ষেত্রেও তুমি ত্রিপুরারি হয়েছিলে, কিন্তু তা করতে গিয়ে, ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার নাশ করতে পারোনি তুমি, কারণ তুমি স্বয়ং তোমার অহংকারের সাথে যুদ্ধে রত হয়ে গেছিলে। এবার তোমাকে সেই কর্মই করতে হবে। তাই যাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাও, আর নিজের মোক্ষম তিন অস্ত্রকে বিচার ও বিবেকের হাতে প্রদান করে এসো, আর ইচ্ছা, কল্পনা এবং চিন্তাকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করে, তাদেরকে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো, আর এই সমস্ত কর্ম নিজের উগ্রতাকে নিজের অন্তরেই সীমাবদ্ধ রেখে, বাহ্যে ধূর্ততার সাথে করবে। অতঃপরে কি করনিয়, তুমি স্থান কাল পাত্র বিশেষেই জেনে যাবে। যাও, যদি সত্যিই নিজের পুত্রদের রক্ষা করতে চাও, তবে যাও। নিজের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করো?”

ছায়াভ্রম

ভয়াল অখণ্ড এবার তাঁর নিজের উগ্র বেশে উপস্থিত হলেন যুদ্ধশিবিরে স্থিত অখণ্ডের মধ্যে, এবং তাঁকে ধারণ করে অখণ্ড সেই সমস্ত কিছু কথা জানলেন, যা তাঁর ভৈরব রূপ মাতা সর্বাম্বার থেকে জেনে এসেছেন। তা জানার পর, উগ্র হয়ে উঠলেন অখণ্ড। কিন্তু মাতা সর্বাম্বা আবার তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, "শান্ত হও অখণ্ড। নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে হলে, তোমাকে শান্ত হতেই হবে। ... প্রথম ছায়াদেবীদের সেখান থেকে প্রস্থান করে, তাঁর পুত্রদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বলো, আর প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমার পুত্ররা সঠিক সময়ে যুদ্ধে অবতরণ করবে আবার। অতঃপরে, তোমার পুত্রদের জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করো। আর শেষে ছায়াদেবীদের আমার কাছে নিয়ে এসো"।

অখণ্ড সেই কথাতে শান্ত হয়ে ছায়াদেবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "দেবী! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আমার পুত্রদেরকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করছি। আপনারা নিশ্চিন্তে আপনাদের পুত্রদের কাছে যাত্রা করে, তাঁদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলুন"।

ছায়াদেবীরা অখণ্ডকে নিজেদের সমর্থনে লাভ করেছেন, এই ধারণা রেখে মুচকি হেসে, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে, অখণ্ড এবার নিজের পুত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, "পুত্ররা তোমাদেরকে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে, আর বলদম্ভদের পরাজিত করতে হবে। তাঁদের পরাজিত করাই তোমাদের পরমার্থ। তাই নিজেদের পরমার্থকে সিদ্ধ করো পুত্র"।

সতিশ বললেন, "পিতা আমাদের বেশ কিছু দ্বন্ধ আছে। আগে আমাদের সেই দ্বন্ধ দূর করুন। পরে না হয় যুদ্ধ যাবো আমরা। ... পিতা আমাদের প্রথম দ্বন্ধ এই যে, যদি আমাদেরকে পরাস্ত করার সামর্থ্যই ধরে ছায়াপুত্ররা, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই পরাস্ত করলেন না কেন? কেন আমাদেরকে দুইদিন যুদ্ধে জয়লাভ করতে দিলেন? ... আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যদি আমাদেরকে তাঁরা পরাস্তই করতে পারে, তবে আমাদের পরমার্থ কি করে তাঁদের দমন করা

হতে পারে? অর্থাৎ আমরা যদি তাঁদের পরাস্তই না করতে পারি, তাহলে আমরা কি করে আমাদের পরমার্থ লাভ করতে পারবো?”

অখণ্ড পুত্রস্নেহে হাস্য প্রদান করে বললেন, “পুত্র, অহংকারের বিস্তার হলেন এই ছায়াপুত্ররা, আর অহংকারের কর্মধারাই এইরূপ। তা প্রথমে তোমাকে দেখাবে যে তুমি তাঁদেরকে পরাজিত করে দিচ্ছ। এই দেখিয়ে তোমার মধ্যে সে নিজের অর্থাৎ অহংকারের বীজরোপণ করবে। আর একবার যখন তোমাদের মধ্যে অহংকারের বীজ বৃক্ষরূপ ধারণ করে নেয়, অহংকার তখন তোমাদের নয়, সে নিজেকেই নিজে হত্যা করে। অর্থাৎ তোমাদের তাঁরা পরাজিত করেনি, তোমাদের অন্তরে তাঁরা যেই এই দুইদিন পরাজিত হয়ে অহংকারের বৃক্ষরোপণ করেছিলেন, সেই বৃক্ষেরই নাশ করেন, আর তোমাদেরকেও সে অহংকারই মনে করিয়ে, তোমাদের ধারণা প্রদান করছে যে তোমরা পরাজিত হয়েছ।

এই হলো অহংকারের কর্মপ্রক্রিয়া। অহংকার প্রথমে নিজেকে বিকৃতরূপে বিস্তৃত করে দেয় সম্মুখে স্থিত শত্রুর মধ্যে। তা করার ফলে, তোমরা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলে, নিজেকেও সেই অহংকারই ধারণা করো, কারণ অহংকার তোমাদের গ্রাস করে ফেলেছে। আর অতঃপরে তোমাদের অন্তরে নিজেরই নাশ করে, তাঁরা তোমাদেরকে প্রমাণ দেয় যে তাঁরা তোমাদের পরাস্ত করেছে। ... এই কীর্তির প্রভাব যে তোমাদের উপরেই কেবল পরেছে, তা নয়। এই কীর্তিতে স্বয়ং আমিও আক্রান্ত। আমি স্বয়ং সত্য হওয়া সত্ত্বেও, আমার অন্তরে এঁরা আমাকে বিজয়ী করতে করতে, আমার অন্তরে নিজেদেরকে স্থাপন করেছে, এবং সেই বীজ অহংকারকে বৃক্ষে পরিণত করে দিয়ে, আজকে আমাকেই স্বয়ং অহং করে তুলেছে। আর এই ভাবে তারা আমার দ্বারা সৃজিত হওয়া সত্ত্বেও আমাকেই শাসন করছে।

তাঁরা স্বয়ং প্রকাশিত হয়না শত্রু অর্থাৎ বিচার ও বিবেকের সম্মুখে। বরং তাঁরা নিজেদের অসংখ্য মায়ারূপকে সাধকের বিচার ও বিবেকের সম্মুখে রাখেন। সাধকের বিচার ও বিবেক সেই মায়া অহংকারকে দমন করে, অত্যন্ত আনন্দিত হন। আর যেই সময়ে যুদ্ধ করতে করতে

পরিশ্রান্ত ও যুদ্ধে সফল হয়ে আনন্দিত হয়ে ওঠে বিচার ও বিবেক, তখন অহংকার তাঁদের ঘাতক আঘাত দ্বারা মূর্ছিত করে যুদ্ধ জয় করে নেয়।

আর পুত্র, তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, তোমরা এঁদের নাশ অবশ্যই করবে, কিন্তু ততক্ষণ করতে পারবেনা, যতক্ষণ এঁরা ছায়াদেবীদের বলে বলিয়ান। যখন এঁরা ছায়াদেবীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন আমার সহায়তাতেই, অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একত্রিত চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনাদ্বারাই এঁদের হত্যা করত সক্ষম হবে তোমরা। তাই আমি তোমাদেরকে আমার তিন মোক্ষম অস্ত্র যা আগেই তোমাদের প্রেরণ করেছিলাম, সেই ব্রহ্মাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র এবং পাশুপতে আমি স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করছি, যাতে তাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা স্থাপিত করছি। এবার এঁরা নিজেদের প্রকৃত সামর্থ্যতে উন্নত হবে। আর তবেই তোমরা এঁদের বিনাশ করতে সক্ষম হবে, কারণ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার মধ্যে এই ছায়াপুত্রদের ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তাও সমাহিত হয়ে যাবে, আর তাই তাঁদের মায়া, তাঁদের সামর্থ্য অত্যন্ত লঘু পতিত হবে”।

ক্ষিতীশ বললেন, “কিন্তু ছায়াদেবীরা যে স্বয়ং তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন, আর তাঁদেরকে যে স্বয়ং আপনিই সেই কর্মে প্রেরণ করলেন! এবার আমরা তাঁদের উপর জয়লাভ কি করে করবো? ... আর যদি বলেন, ছায়াদেবীদের নাশ হয়ে যাবে, তবে আপনি যে এঁদেরকে অভয়দান দিয়ে রেখেছেন যে, যতক্ষণ না ছায়াপুত্রদের নাশ হচ্ছে, ততক্ষণ ছায়াদেবীদেরও নাশ সম্ভব হবেনা, তার কি হবে?”

অখণ্ড হেসে বললেন, “সঠিক বলেছ পুত্র। আমি তাঁদেরকে তাঁদের পুত্রদের পাশে স্থিত থাকার প্রেরণা প্রদান করেছি, কারণ আমি তোমাদের অন্তরে যেই প্রশ্ন, যা এতক্ষণ করলে আমাকে, তাদের উত্তর প্রদান করতে চেয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি তাঁদেরকে ছায়াপুত্রদের পাশে, তাঁদের বল হয়ে স্থিত থাকার জন্য প্রেরণ করিনি, বরং আমি তাঁদেরকে এই স্থান থেকে অপসারিত করলাম, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার জন্য।

আর হ্যাঁ, যেই বরদান আমি তাঁদেরকে প্রদান করেছি, তারও যাতে সম্মান অক্ষত থাকে, সেই মন্ত্রণা তোমাদের মাতা স্বয়ং আমাকে দিয়েছেন। আমি এখন ছায়াদেবীদের সম্মুখে গিয়ে, তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করবো, এবং তাঁদেরকে তোমাদের মাতার সম্মুখে নিয়ে যাবো, যেখানে তাঁরা তোমাদের মাতাকে বন্দিনী করার অভিলাষে যাত্রা করবেন। একবার তাঁরা সেই স্থানে যাত্রা করলে, তাঁদের প্রভাব থেকে তাঁদের পুত্ররা মুক্ত হয়ে যাবে। সেই সময়ে তোমরা তাঁদের নাশ করবে, এই তিন অস্ত্র, যা আমি তোমাদের প্রদান করলাম এখন, তা দিয়ে। আর এঁদের নাশ হবার পরেই ছায়াদেবীদের নাশ হবে। তাই এঁদের হত্যা করে, শীঘ্রই আমাদের নিবাসে, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থাপিত হও।

আর হ্যাঁ, আমি এবার এই শিবির থেকে নির্গত হয়ে ছায়াদেবীদের কাছে যাচ্ছি, তাঁদের ভ্রমিত করে নিজের সঙ্গে তাঁদেরকে নিয়ে আজ্ঞাচক্রে যাত্রা করার জন্য। তোমরা আমার গমনের কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্গত হবে। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছ দেখেই, তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়ে, আমার সাথে গমন করবেন। তাই সামান্য বিলম্ব করে, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করো"।

এতবলে অখণ্ড শিবির ত্যাগ করে, ছায়াদেবীদের সম্মুখে গেলেন। সেখানে পৌছতেই, ছায়াদেবীরা অখণ্ডের পশ্চাতের দিকে তাকালেন। সেই দেখে অখণ্ড হেসে বললেন, "আসছে, বিচার বিবেক শীঘ্রই আসছে রণক্ষেত্রে। তবে এবার তাঁরা এলে, তাঁদেরকে প্রতিরোধ করা আপনাদের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে যাবে দেবীরা। ... তবে তার নিরমায় করাও আপনাদের হাতেই আছে, অন্তত যতক্ষণ আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি, ততক্ষণ তো তা অবশ্যই আপনাদের হাতে রয়েছে"।

দেবী কল্পনা ব্যকুল হয়ে বললেন, "কেন প্রভু, এমন কি করতে চলেছে, আপনার পুত্ররা যার কারণে তাঁদের জয় সুনিশ্চিত হতে চলেছে! ... আমরা থাকতে আপনার পুত্ররা কিছুতেই আপনার প্রভুত্বের নাশ করতে পারবেনা। আপনিও তো জানেন প্রভু, আমাদের কারণেই আপনার প্রভুত্ব, তাই না!"

অখণ্ড নিজের অন্তরে ক্রোধ ধারণ করলেও, মুখে মিষ্ট হাস্য প্রদান করে বললেন, "সঠিক কথা দেবীরা। তবে দেবী সর্বাম্বা যখন আমার পুত্রদের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে, তখন আমি ও আপনারা একত্রিত হয়েও, আপনার পুত্রদের রক্ষা করতে পারবো না। ... আর যেহেতু আপনারা আপনাদের পুত্রদের সহায়তা প্রদান করেছেন, তাই আমার পুত্ররাও তাঁদের মাতার হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন, যিনি তাঁদের পক্ষ হয়ে এই যুদ্ধে অবতরণ করতে চলেছেন"।

এই কথা শুনেই ছায়াদেবীরা ভয়ার্ত হয়ে উঠে, নিজেদের সম্মুখে একটি আচ্ছাদন ধারণ করলেন, যার মাধ্যমে অপরদিকের সমস্ত কিছু তাঁরা দেখতে পাবেন, কিন্তু সম্মুখের ব্যক্তি তাঁদেরকে দেখতে পেলেও, তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারবেন না। অখণ্ড সেই দেখে, কিছুটা আচম্বিতই হলেন এবং মাতা সর্বাম্বাকে অন্তরে অন্তরে প্রশ্ন করলেন, "এ কি নতুন লীলা ছায়াদেবীদের, হে দেবী?"

মাতা সর্বাম্বা হাস্যবশে আজ্ঞাতে নিজের আসনে স্থিত থেকেই বললেন, "ছায়া কখনো কায়ার সম্মুখীন হতে পারেনা অখণ্ড। যদি তা হয় কখনো, তাহলে সেইমুহূর্তেই ছায়া ভস্মীভূত হয়ে যায়। আমি হলাম সত্য অর্থাৎ কায়া, আর তোমার ভ্রমের কারণে সৃষ্ট আমার ছায়া হলেন এই ছায়াদেবীরা, তাই আমার উপস্থিতির সংবাদ লাভ করা মাত্রই, তাঁরা এই আচ্ছাদন ধারণ করে নিয়েছেন, নিজেদের আমার থেকে সুরক্ষিত রাখতে"।

অখণ্ড সেই উত্তর শুনে মুচকি হেসে ছায়াদেবিদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তাহলে দেখলেন তো দেবীরা, তাঁর নাম শুনেই আপনারা নিজেদের আবরণ ধারণ করে নিলেন। তিনি সম্মুখে আসলে, আপনাদের কি হাল হবে?"

ছায়াদেবীরা সেই কথাতে হাস্য প্রদান করে বললেন, "প্রভু আপনি আমাদের সাথে থাকতে, আমাদের কিসের চিন্তা। ... তিনি আমাদের কায়া, তো আপনিও তো সেই কায়ারই প্রকাশ, অর্থাৎ সেই কায়ারই দর্পণচিত্র আপনি। আপনি আর আমরা মিলে, সর্বাম্বাকে বন্দি করে

ফেলবো। আমরা কল্পনার, ইচ্ছার আর চিন্তার বিস্তার করবো আপনার মধ্যে, আর আপনি সেই সমস্ত কল্পনা, চিন্তা ও ইচ্ছাকে ধারণ করে, তাঁকে আপনার দাসী করে নেবেন।

প্রভু এই কর্ম তো আমরা পূর্বেও করিয়েছি আপনাকে দিয়ে, তাই না!... আপনি যখন ত্রিদেবরূপে স্থিত ছিলেন, তখন এই একই ভাবে তো আপনার দাসী করে দিয়েছিলাম ত্রিদেবীদের। আপনারই কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার দ্বারা, তাঁরা আপনাদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবার না তিনি ত্রিদেবী নন, একাকী নিয়তি অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী। আপনিও তো এবারে ত্রিদেব নন, একাকী অখণ্ড। তাই আমরা আবারও সেই কর্মে সফল হবো"।

অখণ্ড হেসে বললেন, "এসেছে স্মরণে দেবীরা। ... অসাধারণ আপনারা। মার্গ কিভাবে নিশ্চয় করতে হয়, তা আপনাদের থেকেই শিখতে হয়। কিন্তু দেবীরা, আপনাদের এই মন্ত্রণাকে সফল করতে হলে, আপনাদেরকে তো তাঁর সম্মুখে যেতে হবে, তাই না! ... আর আপনারা তো জানেনই, একবার তিনি রণচণ্ডীরূপ ধারণ করলে, সে আমাকেও নিজের চরণে পতিত হতে বাধ্য করে দেয়, অর্থাৎ আমার আর বশে থাকেন না তিনি। ... তাই যদি আপনারা তাঁর এখানে, এই রণক্ষেত্রে আগমনের অপেক্ষা করেন, তা কি অত্যন্ত অধিক ভাবে বিলম্ব করা হয়ে যাবেনা!"

দেবী ইচ্ছা বললেন, "সঠিক নাথ। তাঁর এখানে আগমনের পূর্বেই আমরা তাঁর কাছে গিয়ে, তাঁকে আপনার দাসীতে পরিণত করে দেব। মাতার সাহায্য না পেলে, পুত্ররাও আমার পুত্রদের হাতে নিহত হবে, আর স্বয়ং নিয়তি আপনার দাসী হয়ে যাবে, যা এর আগে কনোদিনও সম্ভব হয়নি। ... চলুন নাথ, আমাদেরকে দেবীর কাছে নিয়ে চলুন। আর আমরা আমাদের লীলা দেখানো শুরু করি"।

দেবী চিন্তা নিজের পুত্রদের বললেন, "আমরা চলে যাবার পরেও যদি, এই দুই সর্বাম্বাপুত্র শিবির থেকে নির্গত না হয়, তবে এঁদের শিবিরে গিয়ে হত্যা করবে, বুঝেছ পুত্র!"

আবর্ত বললেন, "কিন্তু মাতা, আপনারা এখান থেকে আজ্ঞাতে পৌঁছাবার পূর্বেই যদি দেবী সর্বাম্বা নিজের পুত্রদের বল হয়ে এসে যান, তখন কি হবে! ... তখন তো আপনাদের মন্ত্রণাও সম্পন্ন হবেনা, আর আমাদেরও মৃত্যু নিশ্চিত ভাবে সম্ভব হয়ে যাবে!"

দেবী কল্পনা বললেন, "সঠিক কথা। ... যাও তবে, আমরা এখানে বর্তমান থাকা অবস্থাতেই তোমরা তাঁদের শিবিরে প্রবেশ করে, তাঁদের হত্যা করো"।

ছায়াপুত্ররা মহাআক্রোশে রণসাজে সজ্জ হয়ে, ক্ষিতীশ ও সতিশের শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে গেলে, সকলে দেখলেন, তাঁদের রথে সতিশ ও ক্ষিতীশ রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। একই ভাবে সতিশ ধনুর্বাণ ধারণ করে রথে আরোহী, আর ক্ষিতীশ লাগাম হাতে চারঅশ্বযুক্ত রথের সারথি। সেই দেখে, বলদম্ভ হেসে বললেন, "আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন মাতা। ... আপনারা যতক্ষণে প্রত্যাবর্তন করবেন, ততক্ষণে, আমরা এঁদের বিনাশলীলা সম্পন্ন করছি। ... আপনারা প্রত্যাবর্তন করলে, এঁদের শবদেহ আপনাদেরকে উপহার স্বরূপ প্রদান করবো"।

ছায়াদেবীরা মিষ্টহাস্য প্রদান করে, অখণ্ডের সঙ্গে আজ্ঞাচক্রে প্রস্থান করলেন। দ্রুততার সাথে অখণ্ড যাত্রা করলে, যখন তাঁরা আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করলেন, তখন দেখলেন দেবী সর্বাম্বা ব্যস্ত হয়ে প্রস্থান করছেন কোথাও। সেই দেখে দেবী কল্পনা পর্দার আড়ালে নিজেকে স্থাপিত করে, ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বললেন, 'কি দেবী সর্বাম্বা! ... কোথায় প্রস্থান করছেন! আমাদেরকে দেখে আপনি খুশী হননি! ... নাকি নিজের পুত্রদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য যাত্রা করছেন!"

মাতা সর্বাম্বা হাস্যপ্রদান করে বললেন, "হ্যাঁ সঠিকই ধরেছেন, আমি আমার পুত্রদের সহায়তা করতেই যাত্রা করছিলাম, কিন্তু যাদের থেকে সুরক্ষিত করতে যাচ্ছিলাম, তাঁদেরকেই সম্মুখে দেখে, কিছুটা নিশ্চিন্তও হলাম, আর আনন্দিতও হলাম। আপনাদের এখানে দেখে, অন্তত এই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আমার পুত্রদের আর আমার প্রয়োজন পরবে না"।

সেই কথাতে দেবী চিন্তা হেসে বললেন, "আপনাকেও এখানে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি যদি এখানে না থাকতেন, তবে আমার পুত্রদের প্রাণ নিয়ে আমাদের চিন্তার আর শেষ থাকতো না"।

মাতা সর্বাম্বা পুনরায় হাস্যপ্রদান করে, ছায়াদেবীদের সন্নিকটে আসতে আসতে বললেন, "বলেন কি, স্বয়ং দেবী চিন্তা নাকি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন! কি হবে এই ব্রহ্মাণ্ডের! ... অখণ্ড, কি হবে তোমার সাধের ব্রহ্মাণ্ডের! ... সে তো রসাতলে চলে যাবে এবার! বোঝাও দেবী চিন্তাকে। তাঁদের প্রভু তুমি। তুমি যদি না বোঝাও, তাহলে কে আর বোঝাবে তাঁদেরকে বলো? বোঝাও যে তাঁরা যেন চিন্তা করা না বন্ধ করেন, ইচ্ছা করা না বন্ধ করেন, বা কল্পনা বন্ধ না করে দেন, নাহলে ব্রহ্মাণ্ডের কি হবে!"

দেবী কল্পনা হাস্যবশে বললেন, "চিন্তা তো আপনার এবার করা প্রয়োজন দেবী। এই অখণ্ড আপনার পতি। তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর বিরোধিতা করা কি এক পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে উচিত হচ্ছে! ... জগন্মাতা আপনি। তিনিই যদি নিজের পতিব্রতা ধর্ম ত্যাগ করেন, তবে জগতের সমস্ত স্ত্রীদের কি অবস্থা হবে, ভেবে দেখেছেন!"

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "আমার থেকেও আপনারা আশা করেন যে আমি আপনাদের নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা করবো! ... বাহ! আপনাদের কল্পনা শক্তির বিস্তার হয়েছে, মানতেই হবে। ... যেই সর্বাম্বার এই ব্রহ্মাণ্ডের কনো প্রয়োজনই নেই, এই ব্রহ্মাণ্ড যার কাছে ততটাই মিথ্যা, যতটা আপনারা, সে নাকি এবার সমস্ত কিছু ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা করতে বসবে!... হাসালে কল্পনা, সত্যই হাসালে। ... আর কি বললে? পতিব্রতা সতী! সতীদের তালিকায় আমার নাম কবে নেওয়া হয়েছে কল্পনা! ... আর তা হবেই বা কি করে?

যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের হর্তাকর্তাবিধাতার আসনে তোমরা স্থিত, সেখানে স্থিত হয়ে আমার গুণকীর্তন হবে, এটাও কি সম্ভব! ... প্রকৃতিকে যদি মান্যতা প্রদান করা হয়, তাহলে অহং যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে উঠবে! তোমাদের মত পতিব্রতা সতীদের থেকে তাঁদের স্বামীর মানহনন কি চিন্তাও করা

যায়! ... কি দেবী চিন্তা, আপনি চিন্তা করতে পারেন তা! ... আপনাদের ব্যখ্যা অনুসারে তো, স্বামীকে অসৎ পথে চালনা করানোই সতীর ধর্ম, স্বামীর প্রতি মোহগ্রস্ত থাকাই হলো সতীর ধর্ম, স্বামী পাতক হয়ে গেলেও, তাঁকে সঙ্গ দেওয়াই হলো সতীর ধর্ম। তাই না!

আরে আমিও না! এই প্রশ্ন করে তোমাদের বিব্রত করার কিই বা অর্থ! তোমরা তো প্রমাণ দিয়েই রেখেছ সমস্ত কিছুর। তাই না কল্পনা! ... তোমাদের প্রমাণই তো তুলসী, বৃন্দা, এঁরা ... তাই না! ... তোমাদের প্রমাণই তো মন্দাদরি, কি ঠিক বলছি তো! ... সীতাকে যবে থেকে বাল্মীকি সতী বলেছেন, তবে থেকে তোমরা আঞ্চলিক রামায়ণ স্থাপন করে করে, সীতাকে তুচ্ছ করে দিলে। দ্বৈপায়ন যেইমুহূর্ত থেকে দ্রৌপদীকে সতী বলেছেন, অমনি দ্রৌপদীকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণ করে দিলে তোমরা! ... কি তাই তো! ...

তাহলে এবার তোমরাই বলো, আমি কি করে সতী হতে পারি! ... আমি স্বামীকে ত্যাগ দিয়ে সমুদ্রমন্থন করতে বাধ্য করেছি; আমি স্বামীকে বিরক্তি ত্যাগ করে বৈরাগী হতে বাধ্য করেছি; স্বামী সন্তানের গলা কেটেছে, তাই স্বামীর উপর জোর খাটিয়ে সন্তানকে পুনর্জীবিত করেছি; স্বামী যাতে কুম্ভকর্ণকে ইন্দ্রাসনের বরদান না দিতে পারে, তাই তাঁকে দিয়ে নিদ্রাসন বলিয়েছি। আমি কি করে সতী হতে পারি বলোতো। ... না, আমি আর কি বলবো? তোমরাই বলো। আমি কি ভাবে সতী?

আরে ছাড়ো আমার অতীতের কথা। এই এখনের কথাই ধরো না, যখন তোমাদের পুত্ররা আমার তপস্যা করছিল, আমার স্বামী তো আমাকে কতবার বললেন, তোমাদের পুত্রদের কাছে গিয়ে, তাঁদেরকে বরদানে ভূষিত করার কথা। আরে আমি কি আর সতী স্ত্রী যে, স্বামীর সমস্ত আদেশের পালন করবো! ... আমি তো স্বামীর বিরোধ করে, তাঁদের কাছে যাইও নি, আর বরদানও দিইনি। ... এবার বলো, আমি কি করে সতী হতে পারি?

আর এই দেখো না, এই যে আমি এই সমস্ত কথা বললাম তোমাদেরকে, এই কথাকে শিখণ্ডী করে, সমস্ত স্ত্রী ব্রহ্মাণ্ডে, তোমরাই প্রচার করে ফিরবে, মাতা সর্বাম্বা তাঁর স্বামীর অবজ্ঞা

করেছেন, তাই সমস্ত স্ত্রীরই উচিত ও কর্তব্য হলো স্বামীর আদেশের অবহেলা করা। কি তাই না! ... করবে তো নিশ্চয়ই এই কর্ম। নিজে মুখে বললে, শুনতে ভালো লাগতো। ... কি করবো বলো, আমি যে সত্য! আর সত্য বলে, কারুর কনো কল্পনা, কনো ইচ্ছা বা কনো চিন্তাকেই মান্যতা দিই না। তা সে যতই মাথা ঠুকুক, যতই আমাকে গালমন্দ করুক, আর যতই আমার নাম করে নিজের ব্রহ্মাণ্ড নাশ করে দেবার জেদ দেখাক।

যে নিজের ইচ্ছা, কল্পনা ও চিন্তার থেকে মুক্ত, আমি স্বেচ্ছায় তাঁর দাসী, আর অন্য সমস্ত কারুর কাছে, আমি বিনাশী, তা আমার স্বামী হলে, তাঁর ক্ষেত্রেও। জানো না তোমরা! আরে মিছে বলো না, জানো তো তোমরা। জানোনা, ধূমাবতীর কথা! ... ওই সেই মার্কণ্ডের কথা, যা তোমরা বিনষ্ট করে দিতে চেয়ে, মার্কণ্ড মহাপুরাণকে জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, আর দ্বৈপায়নকে জোর করে তন্ত্রের বিজ্ঞান মুছে, কেবলই তন্ত্রের আচারের সমাহার রূপে মার্কণ্ড পুরাণ লিখিয়েছিলে। ... মনে পরেছে! ... এবার মনে পরে গেছে না! ... (হাস্য প্রদান করে) ... তাই কি করে আশা করো ছায়া, যে আমি তোমাদের বিধান অনুসারে সতীর ন্যায় আচরণ করবো! ...

কেন বুঝেও বোঝোনা বলোতো! ... আমি যে নিয়তি! আমি যে তোমাদের কারুর বিধানে আবদ্ধ নই। না তোমাদের, না তোমার পুত্রদের, না তোমার স্বামীর, আর না আমার স্বামীর। ... কি করি বলো তো! ... এই এখনো দেখো না, আমার স্বামী তোমাদেরকে একটি অভয়দান করে এখানে এনেছেন। কিন্তু আমি যে সতীস্ত্রী নই। তাই তো আমি আমার স্বামীর দেওয়া অভয়কে মানবোই না! ... (হাস্য প্রদান করে) আমি যে তাঁর সম্যক ভাবে উল্লঙ্ঘন করে, তোমাদের ভস্ম করে দেব!... এরপরেও তোমরা আমাকে সতীস্ত্রী বলতে পারবে! ... কি করে বলবে বলো তো!

আর কি হবে সতী হয়ে, তাই না! ... একদম ঠিক বলেছ! ... তোমাদের বিধানে যারা সতীস্ত্রী, অর্থাৎ যারা স্বামীর প্রতি মোহগ্রস্ত, আমি তো তাঁদের রক্ষক নই। তাহলে তাঁদেরই বা আর সতী সেজে লাভ কি! ... আমি তো কেবল ও কেবল তাঁর রক্ষা করি, যে তোমাদের তিনজনের থেকে মুক্ত, অর্থাৎ! ... এই ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনা থেকে মুক্ত। বাকি সকলেই আমার সন্তানরূপে আমার মার্গদরশনের পাত্র, কিন্তু কেউ আমার স্নেহের পাত্র নয়।

যদিও, দুর্ভাগ্য দেখ ছায়া! ... যারা আমার এই সন্তানদের মার্গদর্শনকেই অনুভব করে নেয়, তাঁরা সেটিকেই আমার স্নেহ বলতে শুরু করে! ... সত্যই আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই। তোমরা হও না! ... কি? হওতো? ... আমিও খুব অবাক হই জানো! যাদেরকে আমি স্নেহ করা শুরুই করলাম না, কেবলই তাঁদের প্রতি সন্তানের কর্তব্যপালন করি, তাঁরা আমার সেই কর্তব্যপালনকেই আমার স্নেহদান বলে আখ্যা দেয়! ...

জানো তখন সব থেকে অধিক খারাপ লাগে তোমাদের জন্য। কি অক্লান্ত পরিশ্রমটাই না করো, এঁদেরকে বশে রাখতে, এঁদেরকে অহংকারে ডুবিয়ে রাখতে। তারপরেও, একটিবারের জন্য তাঁদের অহংকারের পর্দা সরলো কি সরলোনা, তাঁরা আমার জয়গান গাইতে শুরু করে দেয়। ... জানো তখন খুব ইচ্ছা করে, একবার তাঁদের কাছে যাই আর বলি, "পুত্র, এই তিন ছায়াদেবী তোমাদেরকে নিজেদের কাছে বন্দি রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। এঁদেরকে সেই পরিশ্রমকে এমন অবহেলা করো না। এঁরা বড্ড ব্যাথা অনুভব করবে"। ... কিন্তু পরক্ষণে ভাবি, না, বড় আশা করে এঁরা আমাকে মা ডেকেছে। এঁদের আশাটা ভেঙে দিলে, ওরা বড় ব্যাথা পাবে, তাই ইচ্ছা থাকলেও, তোমাদের হয়ে তরফদারি করতে পারিনা! ... খুব খারাপ লাগে জানো তো!

যাইহোক, তোমরা ভস্ম হতে প্রস্তুত তো! ... এই যে অখণ্ড, এঁদেরকে বলে কয়ে এনেছ তো এখানে! বলেছ নাকি না বলেই নিয়ে চলে এসেছ! ... আচ্ছা দেখেছ! ... এটার জন্য কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না! আমি কিন্তু অখণ্ডকে ভোলা করিনি। ... কি জানো তো ওর একটা সব থেকে খারাপ গুণ হলো, যেই মুহূর্তে ওর তৃতীয় গুণ, মানে তমগুণ জেগে ভৈরব হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে ও ভোলা হয়ে যায়। ... আগে এমন ছিল না জানো, এই তোমরা এতো ভোলা ভোলা বলেছ না ওকে, ওর মধ্যে এই চারিত্রিক গুণটা বেশ জমে উঠেছে। ...

তো যাই হোক, সে যখন বলেনি, তখন আমিই তোমাদের বলে দিই। তোমাদেরকে এখানে আনাই হয়েছে, তোমাদেরকে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভস্ম করে দেবার জন্য। তারপর এই ব্রহ্মাণ্ডের থেকে প্রেরণা লাভ করে, অন্য ব্রহ্মাণ্ডতেও তোমাদের এই ভাবেই ভস্ম করা হবে, সেটা আলাদা

ব্যাপার, আর সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে, তবে এই ব্রহ্মাণ্ড, মানে ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে, এই ক্ষণে তোমাদেরকে ভস্ম করে দেওয়া হবে”।

অখণ্ড এতক্ষণ দেবী সর্বাম্বার অসম্ভব রসবোধের প্রসার দেখছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর পুত্রদের সময়ও দিচ্ছিলেন যাতে তাঁরা ছায়াপুত্রদের হত্যা করতে পারেন। কিন্তু এখনও সেই হত্যালীলা সমাপন হয়নি, তাই অখণ্ডও এবার সেই রসিকতায় অংশগ্রহণ করে বললেন, “দেবী, এখনো যে ছায়াপুত্রদের নাশ হয়নি”।

দেবী সর্বাম্বা সেই কৌতুকবাক্যে সায় দিয়ে বললেন, “ওহ! দেখেছ কাণ্ড। এই যে অখণ্ডের মধ্যে তমগুণ জাগ্রত হতে, ওর মধ্যে ভোলা জাগ্রত হয়ে যায়, এর দুষ্প্রভাব আমার মধ্যেও এসে গেছে, হাজার হোক, প্রিয়তম তো আমার, তাই এইটুকু প্রভাব তো আসবেই, কি বলো ছায়া! ... তিনি তো আবার তোমাদেরকে অভয়দান দিয়ে রেখেছে যে, তোমার পুত্রদের মৃত্যুদাতাদের না দেখা পর্যন্ত, তোমাদেরও নাশ হবেনা। ... তা কি করি বলো? তোমাদের যে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ...

কি অপেক্ষা করবে নাকি, আমাকে বাধ্য করবে আমার স্বামীর অভয়দান ভঙ্গ করতে! ... তোমরা বলো... আরে কি বলো না তোমরা! ... মৃত্যুর আগে, অন্তিম ইচ্ছার মান রাখতে হয়, কি দেবী ইচ্ছা, তাই তো শিখিয়েছ না তুমি! তা, তোমরাই বলো, কি করা উচিত! ... আচ্ছা ছাড়ো, তোমাদের এমন বিড়ম্বনার মধ্যে দেখলে, আমার খারাপই লাগছে। আর কতক্ষণই বা রয়েছ তোমরা এই ব্রহ্মাণ্ডে! ... এই শেষমুহূর্তে এমন বিড়ম্বনা একটি বেশি বেশি রসিকতা হয়ে যাচ্ছে। ... তা এই অপেক্ষা যাতে বিরক্তির কারণ না হয়, তারজন্য আমার কাছে একটি উপায় আছে। ... আমরা বরং সকলে মিলে ততক্ষণ, তোমার পুত্রদের কি ভাবে হত্যা হচ্ছে, সেটা দেখি।

কি ছায়াদেবীরা, সেটাই ভালো না! যেই অহংকারকে সামনে রেখে দিয়ে, সাধককে মানতে বাধ্য করো যে সেই অহংকারই হলো তাঁদের প্রকৃত শত্রু, আর তোমরা স্বয়ং তাঁদের অন্তরালে থেকে

সাধককে ভ্রমিত করে রেখে দাও, সেই অহংকারের নাশকে প্রাণভরে দেখতে পারবে, সেটাই কি ভালো না!”

দেবী কল্পনা ছলনা করে বললেন, “দেবী, এই সব আপনি কি বলছেন? আমরা তো আপনারই রূপ? আপনার রূপ হয়ে, সাখ্যাত জগন্মাতার রূপপ্রকাশ হয়ে, আমরা কি করে সাধকের শত্রু হতে পারি!”

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, “আমি ত্রিদেবী নই ছায়াদেবীরা! আমি স্বয়ং নিয়তি। ... আমি প্রকৃতির প্রকাশ নই, স্বয়ং পরাপ্রকৃতি। ... আমি কনো দেবী নই, কনো ভক্ত স্ত্রী নই, স্বামীর অনুগামী নয়, আমি স্বয়ং ব্রহ্মময়ী। ... ছল করতে করতে এমন দশা হয়েছে তোমাদের যে, স্বয়ং সত্যকেই ছলতে শুরু করে দিয়েছ! ... হ্যাঁ, এটা সঠিক যে তোমরা আমারই প্রকাশ, কিন্তু তোমাদের প্রকাশ আমি করিনি, করেছে নিজের স্বরূপে ভ্রমিত এই অখণ্ড।

আমাকে না জেনে, না চিনে, আমার সম্বন্ধে অজ্ঞাত থেকে, অখণ্ড, যাকে তোমরাই আত্ম বা আত্মা নাম দিয়েছ, সে তোমাদের রচনা করেছে। আমাকে যতটা ভ্রম দ্বারা সনাক্ত করেছে সে, ততটাই আমার বিভ্রান্ত প্রকাশ তোমরা। সে না ভ্রমিত, তাকে তোমরা যা বোঝাও, সে তাই বুঝে নেয়। কিন্তু সেই একই কথা আমাকেও বোঝাবে? ... আমি কি জানিনা যে, চিন্তা তুমি অখণ্ডের ধারনা করা সরস্বতীর ছায়া! আর ছায়া হয়ে ভ্রমিত অখণ্ডকে বশ করে নিয়ে তুমি তাঁকে বুঝিয়েছ যে তুমিই সমস্ত বিদ্যার, সমস্ত কলার, সমস্ত জ্ঞানের উৎস? যতটা তোমাকে আশ্রয় করবে অখণ্ড, ততটাই বিদ্যা, জ্ঞান বা কলাকে আয়ত্ত করতে পারবে?

এই ভেদ তুমি সমস্ত সাধকের মধ্যে স্থাপিত রাখতে পারো, যেখানে অখণ্ড ত্রিদেবে বিভক্ত, আর আমি নিয়তি, অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী বেশে আবির্ভূতা নই। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে, আমি সর্বাম্বা। এখানে আমি নিয়তি, ব্রহ্মময়ী, পূর্ণ রূপে পরাপ্রকৃতি, কনো ত্রিদেবী নই। তাই এখানে তোমাদের এই সত্য কি লুকিয়ে থাকতে পারে? এখানে স্থিত হয়ে যে অখণ্ডও জেনে

গেছে যে, চিন্তার বলে কনো বিদ্যা, কনো জ্ঞান, কনো কলা অর্জন করা যায়না। তাদের অর্জন করা যায় আমার কাছে সমর্পিত হবার ফলে, ও চিন্তামুক্ত হলেই।

একই ভাবে অখণ্ড এও স্পষ্ট ভাবেই জানে এখানে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে, ইচ্ছা হলো আমার শ্রীরূপের ছায়া। আর যতই ইচ্ছা দাবি করুক যে যাকিছু সম্পদ এই ব্রহ্মাণ্ড অর্জন করেছে, তা সেই ইচ্ছার ভিত্তিতেই লাভ করেছে, এই ব্রহ্মাণ্ডের আত্ম, অর্থাৎ অখণ্ড স্পষ্ট ভাবে জানে যে, ইচ্ছা সম্পদের না রচনা করে, আর সম্পদ অর্জন করায়। সে জানে যে কেবল যেই সম্পদ সে নিয়তির লিখনে লাভ করেছে, তার উপর ইচ্ছা নিজের অধিকার স্থাপন করে বলে যে সেই সম্পদ ইচ্ছার বলে সে লাভ করেছে। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডে অন্তত ছল করে কনো লাভ নেই।

আর কল্পনা, অখণ্ড এও স্পষ্ট ভাবেই জানে যে, কল্পনার কনো শক্তি নেই। কল্পনার বলে সে কনো শক্তি অর্জন করেনি, কনো কালেই করেনি, আর কেউ কনোদিনও করেও না। সে জানে যে কল্পনা আমার আদিশক্তি রূপের ছায়া, আর সে কেবল দাবি করে ফেরে যে, যাকিছু শক্তি ব্যক্তির কাছে আছে বা আসে, তা কল্পনার মাধ্যমেই সে লাভ করেছে বা করবে। ... এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি বিরাজিতা। তাই এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমমুক্ত, আর এখানে স্থিত আত্ম, বা অখণ্ডও সমস্ত ভ্রমের থেকে মুক্ত। আর তাই তাঁকে এখানে স্থিত হয়ে ভ্রমিত করা অসম্ভব যে, নিয়তি তোমাদের তিন ছায়ার মাধ্যমে ক্রিয়া করেন। ... আর শুনে রাখো ছায়াদেবীরা। একবার আমি যখন তোমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে নাশ করবো, তখন ক্রমে ক্রমে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তোমাদের নাশ হওয়া শুরু হয়ে যাবে।

ছায়া, তোমরা তো আর্য ব্রাহ্মণদের বশ করে, এই কথারই প্রচার করেছিলে না যে, অহংকারই হলো আসল শত্রু, আর তাকেই নাশ করতে হয়। কি ভুল বলছি? এটাই দেখিয়েছিলে না তাঁদেরকে বশ করে যে, অহংকারের থেকে জাত মায়াসেনা, অর্থাৎ রিপু, পাশ, ইন্দ্রিয়দের দমন করাই হলো প্রকৃত যুদ্ধ। আর এই ভাবে তাঁদেরকে বশ করে রেখে, নিজেদেরকে সুরক্ষিত করে রেখে দিয়েছিলে।

আমি তো অবতার নিয়েইছি ব্রহ্মসনাতনের ব্রহ্মাণ্ডে, তোমার এই মিথ্যাচারকে বিনষ্ট করবো বলে। এখানেও তুমি একই প্রয়াস করেছিলে, নিজেদের বিনাশের আগে, তোমরা তোমাদের পুত্রদের মৃত্যু হবে এই বরদান কামনা করে রেখে, অহংকারের ত্রিধারার নিরিখে নিজেদের সুরক্ষিত করে রাখার প্রয়াস তো এখানেও করেছিলে। কিন্তু তাতে ফল লাভ হলো না দেখো। আমি তোমাদেরকেই প্রকৃত শত্রু করে চিহ্নিত করেই দিলাম। আর তাই অহংকারের বিনাশ যে এক অতি তুচ্ছ ব্যাপার প্রমাণ করে কেবলই বিচার আর বিবেককেই সেই কাজে নিযুক্ত করে দিলাম।

আর তোমরা অহংকারকে শত্রুর আসনে স্থিত করে, নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেনা। ব্রহ্মসনাতনের সাখ্যাতে যে যে আসবে, তাঁরা তাঁরা জেনে যাবে যে আসল শত্রু তোমরা, আর তাই তাঁরাও নিজেদের অন্তরে ত্রিদেবী নয়, আমাকে ধারণ করবে, ত্রিদেবকে নয়, অখণ্ডকে ধারণ করবে। আর এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, ব্রহ্মসনাতন তো নিজের এই মহাযুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত। খুব বেশি হলে সে এই যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে, কর্তার অন্তকথা, বা কৃতান্ত রচনা করে যাবে, আর তোমরা সেই কৃতান্তকে প্রবাহিত হতেই দেবেনা, আর এই ভাবে যেই বিনাশ লীলার শুরু হয়েছে, তা অচিরেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

তোমাদের জ্ঞানের জন্য বলে রাখি তাহলে, ব্রহ্মসনাতনের পরেও আমি তিন তিনবার অবতরণ করবো, আর এই তিন অবতারে আমি ত্রিদেবী রূপে বিরাজ করবো, সেই সেই সাধকের অন্তরে। প্রথমে আমি সরস্বতী হয়ে জন্ম নেব স্বয়ং ব্রহ্মসনাতনের কন্যা হয়ে। অতঃপরে আমি সরস্বতীর সন্তান হয়ে জন্ম নেব শ্রীরূপে, আর শেষে তাঁর সন্তান হয়ে আদিশক্তি রূপে জন্ম নেব। আর এই তিন জন্মে, আমি ব্রহ্মসনাতনের কৃতান্ত কথাকে সর্বত্র প্রসারিত করবো। আর কনো সাধক অহংকারের সাথে যুদ্ধে রত হবেনা। সকলে এবার তোমাদের নাশ করবে। আর তোমাদের সাজানো পুত্তলিকা, অহংকারকে কেউ শত্রু মানবে না, এবার তোমরাই হবে সাধকের শত্রু। ...

আগে আগে বলে রাখলাম, চেষ্টা করে দেখতে পারো, আমার এই পূর্ণঅবতার, ব্রহ্মসনাতনকে তো আটকাতে পারলেনা। চেষ্টা করে দ্যাখো, আমার তিন অংশঅবতারকে আটকাতে পারো কিনা। ... স্মরণ রেখো, আমি স্বয়ং তাঁদেরকে সুরক্ষা প্রদান করবো। তাই এবারে তোমাদেরকে স্বয়ং আমার সাথেই যুদ্ধে রত হতে হবে। যদি তা না হও, তাহলে তুমি আমার তিন অংশঅবতারকেও আটকাতে পারবেনা, ঠিক যেমন ব্রহ্মসনাতনকেও পারলেনা। যাই হোক, সেই সমস্ত তো পরের কথা। এখন নিজের সাজানো পুত্তলিকার বিনাশলীলা প্রত্যক্ষ করে আনন্দ নাও"। এই বলে, মাতা সর্বাম্বা সকলের সম্মুখে অনাহতের রণক্ষেত্রের দৃশ্য উন্মোচন করলেন, আর তাতে সকলে দেখতে থাকলেন, সতিশ ও ক্ষিতীশের কীর্তি।

স্বরূপগমন

সকলে দেখলেন, মহাবিক্রমে প্রবল গতিতে ত্রিছায়াপুত্রের সাথে একাকী যুদ্ধ করছেন সতিশ। এতটাই গতি তাঁর যে, ত্রিছায়াপুত্র পরস্পর বাণ নিক্ষেপ করেন, আর সতিশ সেই সমস্ত বাণকে একাকী খণ্ডন করে দিয়ে, নিজের বাণ দ্বারা ছায়াপুত্রদের অঙ্গকে আহত করতে থাকেন। প্রচণ্ড গতি ও বেগ সতিশের, আর সেই বেগগতির সামনে যেন ত্রিছায়াপুত্র সম্পূর্ণ ভাবে বেগতিক।

তাঁদের গতিধারার হ্রাস হতে থাকে, আর সতিশের গতির যেন উত্থান হতেই থাকে। আর ক্ষিতীশ তাঁর ভ্রাতার এই প্রবল আক্রমণ যাতে অধিক ঘাতক সিদ্ধ হয়, তাই অসম্মানয় কৌশলে রথকে একবার বাম থেকে দখিন দিকে নিয়ে আসে, আর আবার দক্ষিণ থেকে বামদিকে নিয়ে আসে। আর সেই গতিও এতটাই অধিক যে, ত্রিছায়াপুত্র নির্ধারণই করতে পারেন না যে সতিশকে আক্রমণ করতে হলে ঠিক কোন স্থানে বাণ নিক্ষেপ করবেন।

এই অসামান্য যুদ্ধকৌশল পরিদর্শনের পর, সতিশ একসময়ে ত্রিছায়াপুত্রকেই নিরস্ত্র করে দিলেন। আর সেই সময়ে, নিজের ধনুশে প্রকাণ্ড শব্দকরে ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ করলেন। উপপতি সেই দেখে, নিজের মোক্ষম চিন্তাবাণকে ধারণ করলেন, এবং সতিশের উদ্দেশ্যে তা নিক্ষেপ

করলেন। কিন্তু সতিশের ভৈরব শক্তিযুক্ত প্রকাণ্ড শক্তিধর ব্রহ্মস্ত্র মুহূর্তের মধ্যে সেই চিন্তাবাণকে নিজের মধ্যে ধারণ করে নিয়ে উপপতির দিকে ধেয়ে গিয়ে, প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের চাপে, উপপতিকে সমানে পিষতে শুরু করে। প্রথমে তাঁর রথচূর্ণ হলো, অতঃপরে, তাঁর নিজের তনুকে সেই চাপ পিষ্ট করতে শুরু করে দিলে, আবর্ত নিজের ধনুশে মাহাত্মকাঙ্ক্ষা বাণ স্থাপন করলেন।

সতিশ তা দেখে, নারায়ণাস্ত্র স্থাপন করে তা নিক্ষেপ করলেন আবর্তের উদ্দেশ্যে। সেই বাণ, তাঁর মহাত্মকাঙ্ক্ষা বাণকে নিজের উদরে স্থাপন করে নিয়ে, এতো অধিক আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করলেন আবর্তের সম্মুখে যে, উপপতিকে সেই সমস্ত ইচ্ছাদের থেকে নিজের প্রাণকে বাঁচাতে পলায়ন করতে হলো।

একদিকে উপপতিকে ব্রহ্মাস্ত্রের কারণে প্রকাণ্ড চিন্তার প্রাচুর্যতার চাপ সইতে দেখে, আর অন্যদিকে আবর্তকে অসংখ্য ইচ্ছার থেকে পলায়ন করতে দেখে, ভীত ও একই সঙ্গে উগ্র বলদম্ভ মহাকল্পবাণ স্থাপন করলেন নিজের ধনুশে। সতিশ তা দেখে, সরাসরি পাশুপত স্থাপন করলেন নিজের ধনুকে, এবং নিক্ষেপ করলেন বলদম্ভের উদ্দেশ্যে। সতিশের গতির সাথে বলদম্ভ কি করেই বা নিজের গতিকে মেলাবেন! ...

বলদম্ভ কেবলই নিজের বাণকে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু ততক্ষণে সতিশের বাণ তাঁর সম্মুখে এসে, তাঁর মহাকল্পবাণ গতি লাভ করার পূর্বেই, তাকে গ্রাস করে, সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের কল্পনাকে একত্রে উগ্রে দিতে থাকলেন সতিশের নিক্ষেপ করা পাশুপত, আর সেই সমস্ত কল্পনাতে বলদম্ভ নিজের মতিকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর মস্তকের সমস্ত শিরা উপশিরা বিস্ফোটিত হতে শুরু করল সেই সমস্ত কল্পনার জেরে। আর সেই প্রকাণ্ড কল্পনার চাপ এক সময়ে তাঁর মস্তকের সমস্ত শিরাকে ছিন্নভিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, বলদম্ভের প্রাণ হরণ করে নিলো।

ভ্রাতা বলদম্ভকে মৃত দেখে, আবর্ত নিজের গতিবৃদ্ধি করে পলায়ন করতে থাকলেন নারায়ণাস্ত্র থেকে। কিন্তু পাশুপত যেমন সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের কল্পনার একত্রিত প্রকাশ, তেমন নারায়ণাস্ত্র যে সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের সমস্ত ইচ্ছার প্রকাশ। এই ইচ্ছার পরিমাণও কম নয়,

আর সেই ইচ্ছাদের প্রতি বিভিন্ন জীবদের মোহও কম নয়। তাই সমস্ত ইচ্ছারা নিজেদের থেকে আর অণুইচ্ছা নির্মাণ করে করে, সহস্র লক্ষ কোটি ইচ্ছা হয়ে গিয়ে, সেই প্রতিটি ইচ্ছা একটি একটি বাণ হয়ে গিয়ে, আবর্তের সর্বাঙ্গকে বিধে দিলেন নারায়ণাস্ত্র, আর আবর্ত প্রকাণ্ড বেদনায় চিৎকার করতে করতে শবে পরিণত হলো।

উপপতির অবস্থা এমনই ছিল যে তাঁর পক্ষে তাঁর ভ্রাতাদের মৃত্যু দেখার সৌভাগ্যও হলো না। ব্রহ্মাস্ত সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের নির্মিত ব্রহ্মাণ্ডদের চিন্তা। সেই চিন্তার ভার একত্রিত হয়ে, এতটাই প্রকাণ্ড যে, উপপতি এতক্ষণে অনাহতের গভীর তলদেশে শায়িত হয়েছে। এই করতে করতে যখন অনাহতের অন্তিম তলে উপপতির শব শায়িত রইল, তখন অনাহত থেকে ওঁকারের নিনাদ শোনা গেল।

আর সেই শুনে হাস্য বেশে, মাতা সর্বাম্বা বললেন, ‘কি বুঝলে ছায়া! সুষুম্নার সমস্ত তত্ত্বকে কি অনুভব করতে পারলে? বলদম্ভের নাশ হয় আজ্ঞার শক্তিতে। আর আজ্ঞার শক্তি কি? সমস্ত কল্পনার বিনাশ। জীব যখন নিজের সমস্ত কল্পনার থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখনই তাঁর আজ্ঞাচক্র জাগ্রত হয়, আর জানো এই বিনাশে কি জাগ্রত হয়? কি করেই বা জানবে? ... জেনে নাও তাহলে। প্রেম জাগ্রত হয়, যা হলো যথার্থ শক্তি, কনো কল্পশক্তি নয় তা। যথার্থ শক্তি। কেন যথার্থ শক্তি? কারণ প্রেম মানেই দুইয়ের নাশ। প্রেম মানেই একাকার। সত্যের সাথে একাকার হওয়াই হলো প্রেম। আমার সাথে একাকার হওয়াই প্রেম। আর যেহেতু আমি যথার্থ, তাই আমার সাথে একাকার হওয়াই হলো যথার্থ শক্তি।

আবর্তের নাশ হলো বিশুদ্ধের সমৃদ্ধিতে। আর বিশুদ্ধের সমৃদ্ধি কি? সমস্ত ইচ্ছার নাশ। ইচ্ছার কারণেই কাল্পনিক সম্পদার বিস্তার হয়েছিল, আর তাই ইচ্ছার নাশ হতে, সমস্ত কাল্পনিক সম্পদের বিস্তার সমাপ্ত হলো, আর প্রকাশিত হলো যথার্থ সম্পদের। জানো কি সেই যথার্থ সম্পদ? পবিত্রতা, হ্যাঁ পবিত্রতাই হলো একমাত্র যথার্থ সম্পদ, যা কনো মায়া নয়, যা সম্যক ভাবে যথার্থ সম্পদ। কেন যথার্থ সম্পদ তা? কারণ পবিত্রতার কনো বিনাশ নেই, বাকি সমস্ত সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় ব্রহ্মাণ্ড লয় হবার সাথে সাথে অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর সাথে সাথে। ... কিন্তু

পবিত্রতা মানেই আমি, পবিত্রতা মানেই শূন্যতা, কারণ শূন্য মানেই তাই যেখানে কনো বিশেষত্ব নেই, যেখানে কেবলই নির্বিশেষ ভাব। অর্থাৎ কনো প্রতিযোগিতা নেই, কনো সম্মান নেই, কনো শত্রু-মিত্র কেউ নেই, কনো আকাঙ্ক্ষা নেই, কনো কিচ্ছু নেই। আর এই মহাশূন্যতাই হলো ধ্যান, আর এই ধ্যানই হলো পবিত্রতা।

আর উপপতির নাশ হলো অনাহতের জ্ঞানের চাপে। চিন্তার পশ্চাতে থাকে জ্ঞান। যার যেমন চিন্তা, তাঁর তেমন জ্ঞান। আর শ্রেষ্ঠ চিন্তা কি? শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি? শ্রেষ্ঠ চিন্তা হলো ব্রহ্মের জ্ঞান, অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞান, অর্থাৎ আমার জ্ঞান ধারণ করা, আর সেই জ্ঞান লাভ হওয়ার প্রমাণই হলো অনাহত নাদ, অর্থাৎ ওঁকারের বিস্তার। অর্থাৎ যার যখন ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হয়, তাঁর অনয়াহত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্বতঃই ওঁকারের বিস্তার করে, না কল্পনা, তোমার পরামর্শ অনুসারে মুখে ওঁ জপ করে নয়, স্বতঃই এই ওঁকার অন্তরে গুঞ্জন হয়, আর সর্বক্ষণ হতেই থাকে, যেমন এখনও শুনতে পাচ্ছ। ...আর তা কখন হয়? যখন সমস্ত চিন্তার নাশ হয়, আর সমস্ত ভ্রমের নাশ হয়।

তাই কি বুঝলে, প্রথমে কল্পনার নাশ হয়, অতঃপরে ইচ্ছার, আর শেষে সমস্ত চিন্তার নাশ হলে, অহংকারের বিনাশ হয়, আর অখণ্ড তোমাদের অধীন থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে, মোক্ষলাভ করে। ... এবার অখণ্ডের মোক্ষ লাভের সময় হয়ে গেছে, তাই তোমাদের প্রবাহধারাদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, তোমাদেরও বিনাশ নিশ্চিত”।

অখণ্ড বললেন, “অপেক্ষা করুন দেবী! ... আমি যে আমার পুত্রদের কথা দিয়েছি, এই দৃশ্য সকলে দেখবে। তাঁরা ছায়াপুত্রদের নাশ করে এলো বলে। তাই একটু অপেক্ষা করে যান। ... এই দৃশ্য নিজেই যে এক মহাবিজ্ঞান। তাই এই মহাবিজ্ঞানের দৃশ্য দেখা থেকে আপনার সন্তানদের বঞ্চিত করবেন না কৃপা করে”।

সতিশ ও ক্ষিতীশ সেখানে নিজেদের রথ সহ তীব্রবেগে উপস্থিত হলে, ছায়াদেবীরা অখণ্ডকে তিরস্কার করার সুরে বললেন, “তোমার কি মতিভ্রষ্ট হয়ে গেছে অখণ্ড! ... আমাদের জন্য তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু! আমাদের নাশ হয়ে গেলে, তোমার কি হবে?”

অখণ্ড হেসে বললেন, "আমার কি হবে, সেটা ভাবার জন্য, আমার আরাধ্যা, মাতা সর্বাম্বা আছেন। আমি তাঁর প্রতি সমর্পিত, আর তিনি হলেন একমাত্র সত্য, তাই আমার চিন্তা ত্যাগ করে, এখন নিজেদের চিন্তা করুন দেবীরা"। এই কথা বলার সাথে সাথে, অখণ্ড সতিশকে আদেশ দিলেন, "পুত্র, সামান্য বাণ নিক্ষেপ করে, ছায়াদেবীদের এই পর্দার নাশ করো। শীঘ্র করো"।

ছায়াদেবীরা সেই কথা শুনে, পলায়নের প্রয়াস করলেন, কিন্তু সতিশের ক্ষিপ্রতার সম্মুখে তাঁদেরও বেগগতি আজ বেগতিক। তাঁরা পশ্চাৎমুখিও হতে পারেন নি, সতিশ নিজের বাণের মাধ্যমে, যেই পর্দা ধারণ করে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন ছায়াদেবীরা, সেই পর্দার নাশ করলেন।

আর তা করা মাত্রই, ছায়াদেবীদের অঙ্গে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। প্রকাণ্ড আর্তনাদের সাথে সাথে ছায়াদেবীরা চিৎকার করতে শুরু করলেন, "রক্ষা... আহ! ... রক্ষা... কেউ আমাদের রক্ষা করুন! ... কেউ..."আর শব্দ উচ্চারণ সম্পন্ন হবার আগেই, তাঁরা ভস্মে পরিণত হয়ে গেলে, সেই ভস্মপিণ্ডতে দেবী দখিনা বাতাস প্রদান করলেন, আর তা মুহূর্তের মধ্যে মাতা সর্বাম্বাকে ভস্মবিভূষিত করে, তাঁকে অপরূপা করে তুলল।

আর সেই দেখে, সতিশ ও ক্ষিতীশ আনন্দিত হয়ে বললেন, "যার ছায়া মাত্র তোমরা, তোমাদের এতোই স্পর্ধা যে তোমরা তাঁকেই বন্দিনী করতে এসেছিলে। হ্যাঁ তোমরা তাঁকে বন্দিনী করেছ আজ। তাঁকে ভস্মবিভূষিত করে আজ তোমরা তাঁকে তোমাদের ইতিহাসগাঁথার মধ্যে তাঁকে বন্দি করেছ, যেই ইতিহাস কথাতে, তোমাদের নাশ হলো, আর তাঁর হলো ভস্মাভিষেক"।

এবার ঋপু সম্মুখে এসে বললেন, "মাতা, আপনি আমাকে আপনার পরবর্তী তিন অবতারের আত্ম হয়ে বিরাজ করতে বলেছেন। তখন প্রভু অখণ্ড ভ্রমিত ছিলেন। কিন্তু আর তিনি ভ্রমিত নেই। তাই তিনি থাকতে আমি যদি আপনার সেই অবতারদের আত্ম হই, তা তাঁর অপমান করা হবে। ... তাই মাতা আমাকে আদেশ দিন যাতে, আমি তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাই। ...

তাহলে আপনার বচনেরও মান থাকবে যে আমিই হবো আপনার পরবর্তী তিন অংশঅবতারের আত্ম, আর তাঁদের আত্মতেও আমি সাহস, ধৈর্য এবং জেদ হয়ে অবস্থান করে, তাঁদের ভ্রমউন্মোচন সহজ হয়ে যাবে"।

মাতা সেই কথাতে সম্মত হলে, ঋপু প্রভু অখণ্ডের মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। এবার সমস্ত পঞ্চভূত সম্মুখে এসে বললেন, "মাতা, এবার আমাদের প্রভুতে লীন হবার সময় আসন্ন"। আর অখণ্ড সম্মুখে এসে বললেন, "আর আমার আপনাতে দেবী"।

মাতা সর্বাম্বা হেসে বললেন, "এখনই নয় অখণ্ড। এখনই নয় ভূতরা। এখন তোমরা আমার সাথেই সংসারে আবদ্ধ থাকবে। হ্যাঁ আমরা সকলে আনন্দের হাট স্থাপন করবো এই আজ্ঞাতেই। তবে আমার থেকেই আমার প্রথম বিদ্যারূপী অংশঅবতার জগতে প্রকাশিত হবার সাথে সাথে, আমি তাঁকে যখন ভ্রমমুক্ত করার পথে চালনা করবো, তখন আমরা সকলে বিশুদ্ধে স্থাপিত হয়ে, তাঁকে অমৃত কথা শ্রবণ করাবো। তাই এখনই তোমরা আমার মধ্যে লীন হবেনা। ... অখণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মসনাতন নামেই প্রসিদ্ধ হবে, আর আমি হবো তাঁর হৃদয় থেকে জাগ্রতা তাঁর আরাধ্যা, মাতা সর্বাম্বা"।

পিতার মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে, ব্রহ্মসনাতন পুত্রী, দেবী দিব্যশ্রী হরষের সাথে বলে উঠলেন, "পিতা, আমি বেশ বুঝে গেছি, আপনিই সেই অবতার, যার সমস্ত জগত অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তাঁরা আপনার সম্বন্ধে কতটাই বা জানে যে, আপনাকে সনাক্ত করতে পারবেন! তাই আপনি সাখ্যাত তাঁদের মধ্যে বিরাজ করলেও, তাঁরা আপনাকে সনাক্তও করতে পারেন নি। ... পিতা, আপনার কন্যা হয়ে জন্ম লাভ করে, আমি ধন্য হয়ে গেছি। আর সেই ধন্যবাদ আমি ব্যক্ত করতে চাই আপনার আরাধনা করে। আমাকে কৃপা করে আপনার আরাধনা করার অনুমতি প্রদান করুন"।

প্রভু ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "সমস্ত ছয় কাণ্ড কৃতান্ত শ্রবণের পর যদি তোমার এই বোধ জন্ম নেয়, তাহলে তুমি কৃতান্তকে বুঝতেই করতে পারো নি পুত্রী। যথার্থও তা। আসলে কৃতান্ত

বোঝার বিষয়ই নয়, তা যে অনুভবের বিষয়। আর সেই অনুভবশক্তির প্রকাশ তোমার মধ্যে না হলে, কি করেই বা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, কৃতান্তকে অনুভব করতে পারবে! তাই পুত্রী, যেই সমস্ত গ্রন্থ জ্ঞানকে নিজেদের অন্তরে ধারণ করে থাকে, তাঁদেরকে আগে পাঠ করো। তা পাঠ করে, এই প্রকৃতিকে গুরু রূপে স্বীকার করো। অতঃপরেই কৃতান্তের ভাবকে অবুভব করতে সক্ষম হবে তুমি।

পুত্রী, যেই অবতারের কথা বললে, সেই অবতার আমি কিনা জানিনা, তবে আমি এটুকু জানি যে, সেই অবতার যদি আমি হই, তবে তোমরা সকলেই সেই অবতার। এমন বলার কারণ এই যে, যেই মাতা সর্বাম্বাকে ধারণ করে রয়েছি বলে, তুমি আমাকে অবতার মানছো, সেই মাতা সর্বাম্বা তো তোমাদের সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠাত্রী! তাই যদি আমি অবতার হই, তোমরা কেন অবতার নয়? আর যদি তোমার তর্ক এই যে, তাঁকে ধারণ করলেই তো আর কেউ ব্রহ্মসনাতন হয়ে যায়না! ... তাহলেও তোমার ধারণা ভ্রান্ত পুত্রী।

যে যে, যখন যখন, মাতা সর্বাম্বা অর্থাৎ পরানিয়তিকে হৃদয়ে ধারণ করে, যেমন করে সন্তান মাতার বক্ষে নিজের সর্বস্ব চিন্তা ত্যাগ করে শান্তিতে নিদ্রা যায়, তেমন করেই নিজের সর্বস্ব চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনা থেকে মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মময়ী পরানিয়তি মাতা সর্বাম্বার কাছে সমর্পিত হবেন, তিনিই ব্রহ্মসনাতন। তাহলে আমাকেই সেই অবতার বলার কারণ কি পুত্রী! ... কেন সেই সকল ব্রহ্মসনাতন, যারা আগামীদিনে মাতা সর্বাম্বার কাছে সমর্পিত হবেন, তাঁরা অবতার নন! ...

পুত্রী, এখনো তুমি মূলতত্ত্বকে অনুধাবনই করতে পারলে না। তত্ত্ব বিশেষত্বতে নয়। আমি অবতার, তিনি অবতার, এই ভাব কখনোই আমাদের সত্যে স্থাপিত হতে দেবেনা। এই ভাব আমাদেরকে কখনোই মাতা সর্বাম্বার কাছে আমাদের নিয়েই যাবেনা। এই ভাব আমাদেরকে একটি পঞ্চভূতের তনু, ব্রহ্মসনাতন পর্যন্ত এসেই থেকে যাবে। আর পুত্রী, যে ব্রহ্মসনাতনের সর্বাম্বাকে ধারণ করবে না, সে ব্রহ্মসনাতনকে কি ভাবে ধারণ করবে?

পুত্রী, যে সীতারামকে ধারণ করবে না, সে বাল্মীকিকে কি ভাবে ধারণ করবে? যে কৃষ্ণকৃষ্ণাকে ধারণ করবে না, সে বেদব্যাসকে কি ভাবে ধারণ করবে? যে হরপার্বতীকে ধারণ করবে না, সে মার্কণ্ডকে কি ভাবে ধারণ করবে? ... কিন্তু এবারে আর ত্রিদেবীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সীতারামের, প্রয়োজন নেই কৃষ্ণেকৃষ্ণার, কারণ এবারে তিনি আর শক্তি বা বিদ্যা, বা শ্রী বেশে আলাদা করে স্থিতা নন, আর না তিনি শক্তিধর শিব, বিদ্যাধর রাম, আর শ্রীধর কৃষ্ণরূপে আলাদা করে স্থিত। তিনি এবারে সমস্ত কিছুর একাকার করা রূপ, পরানিয়তি সর্বাত্মা বেশে স্থিতা।

তিনি তাই একাধারেই শক্তি ও শক্তিধর, বিদ্যা ও বিধ্যাধর, শ্রী ও শ্রীধর। ... আর তাই, তাঁকে ধারণ করাই অবতারতত্ত্ব। স্বরূপে সকলেই তোমরা যেই অখণ্ড আত্ম, সেই সকল অখণ্ড আত্মের স্বরূপ যিনি, তিনিই সর্বাত্মা। অর্থাৎ অবতার তিনিও যিনি নিজেকে ব্রহ্ম বলে জানেন নি, অবতার তিনিও যিনি নিজেকে মাতা সর্বাত্মার কাছে সমর্পিত করেননি, কারণ সমর্পিত হন বা না হন, তিনি তো মাতা সর্বাত্মারই সন্তান, নিজের ব্রহ্মস্বরূপ কে জানুন আর না জানুন, চিনুন আর না চিনুন, দেখুন আর না দেখুন, স্বরূপে তো তিনি সেই ব্রহ্মই, আর সেই ব্রহ্মকে ভুলে থাকা অখণ্ড আত্মই।

তাই তাকে তোমার অবতার বলে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠা হচ্ছে, এই তো? তোমার কথা এই যে যিনি নিজের সত্যভ্রষ্ট আত্মই মানতে পারেননি, যিনি এখনো নিজেকে অহংপিণ্ড, অর্থাৎ নিজের দেহের নামকেই নিজের পরিচয় বলে ধারণা রাখেন, তিনি কি করে অবতার হতে পারেন? এই তো?

পুত্রী, এই দ্যাখো গ্রীষ্মের রোদ্দুর জানলা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে। একবার সেই রোদ্দুর ভূমির যেই স্থানে পরেছে, সেই স্থানকে গিয়ে দেখো। সূর্যকে কি দেখতে পাচ্ছ! ... পাচ্ছনা তো? কিন্তু একবার সেই রোদ্দুর স্থাপিত ভূমিতে চরণ রেখে দেখ। কি হচ্ছে? চরণে প্রকাণ্ড তাপ লাগছে, তাই তো?

তাহলেই বলো, রোদ্দুর নিজেকে সূর্যের অবতার বলে না মেনে, তা ভুলে আছে, আর তাই তাঁর মধ্যে সূর্যকে দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু সে ভুলে আছে বলে কি, তাঁর মধ্যে থেকে উষ্ণতা বিনষ্ট হয়েছে পুত্রী? না তো? একই ভাবে পুত্রী, যিনি নিজের অহংকারে মেতে আছেন, আর আমি অমুকের সন্তান, অমুক বংশের সন্তান, অমুক পেশায় যুক্ত, অমুক পদের অধিকারী, অমুক পুরস্কারপ্রাপ্ত, অমুক প্রতিষ্ঠাধারি, বা আমি ধনবান, আমি দরিদ্র, আমি দুখিনী, আমি পীড়িত, আমি পিতা, মাতা, বা ইত্যাদি ইত্যাদিতে মজে রয়েছেন, তাঁর অন্তরে কি আত্ম নেই? তাঁর অন্তরের আত্ম কি অখণ্ড থেকে খণ্ডিত হয়ে গেছে? হতে পারে তিনি সেই আত্মকে ভুলে রয়েছেন, কিন্তু তাই বলে কি সেই আত্ম নেই?

ধরে নাও এবার কিছু সাধু রয়েছেন, যারা নিজেকে আত্ম বলে তো মেনে নিয়েছেন, কিন্তু সেই আত্ম যে ব্রহ্মের ভ্রমিত রূপ হয়ে, শক্তিকে ধারণ করে শক্তিমান, শ্রীকে ধারণ করে শ্রীমান, বিদ্যাকে ধারণ করে বিদ্যাধর হয়ে রয়েছেন, এবং সেই সমস্ত শক্তি, সমস্ত শ্রী ও সমস্ত বিদ্যার উৎস, পরানিয়তি, পরাপ্রকৃতিকে এখনও জানতে পারেননি, তাই শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা করে ফিরছে, তাঁদের আত্ম কি স্বরূপে ব্রহ্ম না হয়ে অন্য কিছু? ... নয়তো? ... তাহলে তাঁদেরকে অবতার কেন বলছ না!

পুত্রী, যতক্ষণ উনি বিশেষ, তিনি বিশেষ, ইনি অবতার, তিনি অবতার, এই করে যাবে, ততক্ষণ মাতা সর্বাত্মার সাখ্যাত লাভ করবে না। তিনি জননী, আর যতক্ষণ তিনি জননী, ততক্ষণ তাঁর কাছে সমস্ত সন্তানই সমান। তাই যতক্ষণ না তাঁর সমস্ত সন্তানকে তিনিই বলে সনাক্ত করতে পারবে, তাঁরই অবতার বলে সনাক্ত করতে না পারবে, তিনি তোমার কাছে জননী হয়ে কিছুতেই বিরাজ করবেন না। তিনি তোমার কাছে ঈশ্বরী হয়েই বিরাজ করবেন। আর ঈশ্বরী, তুমি কৃতান্ত থেকেই জেনেছ, না আত্মকে, না বিচারকে, না বিবেককে, কারুকেই প্রাধান্য দেন না, ঈশ্বরী কেবল সমর্পিত প্রাণকেই স্নেহ করেন, আর সেই স্নেহ এতটাই যে, তাঁর জন্য তিনি নিজের ঈশ্বরত্বও ত্যাগ করে, সামান্য সখী, সামান্য গুরু, বা সামান্য কন্যা হয়ে বিরাজ করেন।

পুত্রী, এক মাতার কাছে সেই সন্তানই শ্রেষ্ঠ প্রিয়, যিনি তাঁর অন্যসন্তানদেরও তাঁরই সন্তান জ্ঞানে তাঁর প্রিয় হবেন, সেই ধারণা রাখেন। তাই যদি তুমি এমন ধারণা রাখো যে তাঁর কাছে কনো সন্তান তাঁর প্রিয়, কারণ সে অবতার বা সাধু বা ইত্যাদি, আর অন্য সন্তানরা তুচ্ছ, কারণ তাঁরা অবতারাদি নন, তাহলে তিনি তোমাকে সন্তানস্নেহে কখনোই বক্ষে ধারণ করবেন না। যখন অমার কাছে তাঁর সমস্ত সন্তান, অর্থাৎ সমস্ত জীবই তাঁর সন্তান, তাঁর অবতার হয়ে যাবে, তখন স্বতঃই তুমি তাঁর প্রিয় হয়ে উঠবে, কারণ তুমি তাঁর মাতৃত্বকে স্নেহ করলে, আর তিনি ঈশ্বরী হবার আগে, কেবল মাতা। তাঁর কাছে মাতা হওয়া অধিক আনন্দের, ঈশ্বরী হওয়া নয়।

তাই পুত্রী, কেন তাঁর সন্তানদের মধ্যে ভেদাভেদ উৎপন্ন করছো, ইনি অবতার, তিনি অবতার নন, এই বলে? সকলেই অবতার, কারণ যতই নিজ নিজ অহংকার নিয়ে সকলে বসে থাকুন, সকলেই নিজেদের অন্তরে তাঁরই ভ্রান্ত রূপ, অর্থাৎ অখণ্ড আত্ম, বা আধুনিক ভাষায় আত্মাকে ধারণ করে বসে আছেন, অর্থাৎ সকলেই তিনি, সকলেই স্বরূপে তিনিই। তাই কেন একজনকে অবতার বলা, আর অন্যজনদের নয়? পুত্রী, কেবল মানুষই কেন, এই যে জানালায় একটি সুন্দর বুলবুলি বসে রয়েছে, আর পাশের বাড়ির পাঁচিলে একটি বিশ্রী দেখতে কাক বসে রয়েছে, সকলেই তো তাঁরই অবতার। যতটা তুমি প্রিয় তাঁর কাছে, ততটাই প্রিয় সেই কাকটিও ও সেই বুলবুলিটিও, আর এই যে ভূমি দিয়ে যাচ্ছে, সেই পিপীলিকাটিও।

কিন্তু পুত্রী, তোমার সেই বোধ এখনো জন্ম নেয় নি। চিন্তার কিছু নেই পুত্রী। তুমি বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করো। জানি তার থেকে সার লাভ করবে না, তাও পাঠ করো। তোমার পাঠ সমাপ্ত হলে, অতঃপরে, তুমি সত্যকে উপলব্ধি না করলেও, সত্যকে উপলব্ধি করার মত অবস্থাতে উন্নত হয়ে যাবে। তখন আমি তোমাকে কৃতান্তের মূলতত্ত্ব, অর্থাৎ কৃতান্ত মহাসুত্র প্রদান করে, তোমায় কৃতান্তিক হবার পথে দ্বিতীয় চরণে উন্নীত করবো”।

উদ্ধারলীলা

পিতার নির্দেশে বিভিন্ন গ্রন্থপাঠের শেষে একদিন দিব্যশ্রী পিতার কাছে এসে বললেন, “পিতা, আমি একটি ব্যপারে জানতে ইচ্ছুক। আর তা এই যে, আপনি যেই কৃতান্ত কথা বলেছেন আমাকে, অর্থাৎ যেখানে আত্ম একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন, এবং পরানিয়তির কাছে সমর্পণ করছেন, এটিই কি সকলের লক্ষ্য! বোঝাতে পারলাম না আমার প্রশ্ন আপনাকে। আমার প্রশ্ন এই যে, এই প্রয়াস কি সকলেই করতে পারেন? এটি কি সকলের কাছে সহজ লোভ্য!”

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, “না, এই পথ কেবলই সাধকের জন্য। সাধক তাঁর অন্তিম অবস্থায় এসে এই পথে চলতে সক্ষম হন, যদি তিনি তাঁর বিভ্রান্তিকে ত্যাগ করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি সমাজে প্রচলিত অহংকারের আরাধনার থেকে নিজেকে অপসারিত করতে সক্ষম হন, তবেই এক সাধক এই পথে চলতে পারেন, তবে হ্যাঁ, তুমি যেই প্রথম কথা আমাকে বললে এখন, অর্থাৎ এটিই সকলের লক্ষ্য কিনা! তার উত্তর হ্যাঁ, এটিই সকলের পরমলক্ষ্য”।

দিব্যশ্রী চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে এই অবস্থায় উন্নীত হবার আগে কি কি করেন ব্যক্তি! ... কর্ম তো কেউই করেন না, তা তো কৃতান্ত থেকেই জেনেছি আমি। সেখানে থেকে এও জেনেছি যে কেবলই কর্ম করার চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনাই হলো কর্ম। ... আর এও জেনেছি যে এই চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার নাশ হতে হয়। এও জেনেছি কৃতান্ত থেকে যে তাদের নাশ স্বয়ং নিয়তির সাখ্যাতকারেই সম্ভব। কিন্তু তারা সর্বক্ষণ নিয়তির থেকে অর্থাৎ যথার্থের থেকে নিজেদের আচ্ছাদিত করে রেখে দেয়। তাহলে উপায় কি?

ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনা সর্বদা আত্মকে তিনখণ্ডে অর্থাৎ ত্রিগুণে বিভক্ত করে রেখে দেয়, আর এই তিনগুণে বিভক্ত থাকা অবস্থায় আত্ম সর্বদাই অহংকারে আবদ্ধ হয়ে থাকে, আর তাই ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনাকে নিয়তির সম্মুখে আন্তেই পারেনা। কৃতান্ত থেকে এও জেনেছি যে যখন আত্ম ত্রিগুণ থেকে একত্রিত হয়ে গিয়ে অখণ্ড হয়ে ওঠে, তখনই নিজের অহংকারের পর্দার অপসারণ করে, চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনাকে নিয়তির সম্মুখে নিয়ে আসতে পারে।

কিন্তু পিতা, এ তো অন্তিম যুদ্ধ, কিন্তু এই যুদ্ধ করার অবস্থায় আত্ম তো পৌছাতেই পারেনা। নিয়তি কি করেন তাঁকে এই অবস্থায় উন্নীত করে তোলার জন্য?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “নিয়তি কি করবে পুত্রী? নিয়তি কি করেছেন এতকাল পর্যন্ত, তা শুনে নাও, আর শুনে নাও তাঁর সকলের কাছে আজকে কি আর্জি। তাহলেই বুঝতে পারবে নিয়তির অবস্থা কি? আমি তাহলে নিয়তির কথাকে নিয়তির পত্র রূপে তোমার সম্মুখে প্রকাশ করছি। শ্রবণ করো তা প্রথমে।”

জগদম্বার চিঠি

আমার সমস্ত প্রিয় সন্তানেরা,

আমাকে তোমরা চেন না চেননা ঠিক জানিনা। তাই নিজের পরিচয় দিয়েই এই পত্র লিখন শুরু করলাম। আমি প্রকৃতি। না না, যেই পাহাড় নদী সাগর গাছপালার প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি নই আমি। আমি প্রকৃতি; প্রকৃত, সেই প্রকৃতি। যদি আমি প্রকৃতি, আর বাহ্য এই প্রকৃতিকে মিলিয়ে ফেল, সেইক্ষেত্রে আমাকে যথার্থ বলতে পারো। এই নামেও আমাকে অনেকেই ডাকে। হ্যাঁ সেই যথার্থ আমি, যা আত্ম, পরমাত্ম, সমস্ত কিছুর পারে স্থিতা, যাকে তোমরা বলো ব্রহ্ম, সে-ই আমি।

আমি কি করি? আমি কিছুই করিনা, আমি যে নিষ্ক্রিয়, সম্পূর্ণ শূন্য আমি। তবে আমিই একমাত্র অস্তিত্ব। আমি সমসত্ত্ব, তাই আমার কনো অণুও সম্ভব নয়। তবু আমার এই শূন্যতা, এই নিষ্ক্রিয়তা, এই নির্বিশেষতাকে মানতে না পেরে, আমারই কিছু অণু, যার অণু না হয়েও নিজেরা নিজেদের কল্পনা করে নিয়েই অণু, তাঁরা বিশেষত্বের সন্ধান করতে থাকলো, সক্রিয় হতে চেষ্টা করলো, আর শূন্যতা ত্যাগ করে, এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত সংখ্যার নির্মাণ করতে থাকলো।

বাঁধা দিইনি কেন? কি করে দেব বাঁধা! আমি যে নিষ্ক্রিয়! কাকে দেবো বাঁধা? তাঁরা যে ভ্রম বশতই তাঁরা, আসলে তাঁরা যে আমিই। আর সেই তাঁরা বিশেষত্বের সন্ধানে, আমার মধ্যে যা সম্ভবই না, তাই নির্মাণ করতে থাকলো। জানো তাকে কি বলে তাঁরা? তাঁরা এঁকে বলে অণু,

আমার অণ্ড, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড। আমি তাও দেখতে থাকলাম, নিরপেক্ষ দর্শক যে আমি, তাই সমস্ত কিছুই দেখতে থাকলাম।

দেখলাম নিজেদের বিশেষ হবার ইচ্ছা নিয়ে, শূন্যতা ত্যাগের চিন্তা নিয়ে, আর সক্রিয়তা ধারণের কল্পনা করে, আমার দিকে তাকালো তাঁরা, আর আমাকে তাঁদের নিজেদের চিন্তার সাথে বিদ্যা করে যুক্ত করে নিলো, যতটা চিন্তা ততটা বিদ্যা। আমার দিকে তাকিয়ে, আমার সাথে নিজেদের ইচ্ছাকে যুক্ত করলো, আর সম্পদের নির্মাণ করলো, যতটা ইচ্ছা ততটা সম্পদ। আর আমার দিকে তাকিয়ে, নিজেদের কল্পনাকে স্থাপন করলো আর শক্তির সঞ্চার করলো, যতটা কল্পনা ততটাই শক্তি।

আরো দেখলাম, আমার থেকে এই তিন প্রকাশকে বিভক্ত করলেও, কিছুতেই এঁদেরকে আলাদা করতে পারেনা তাঁরা, আর মনে করতে থাকে যে এঁদের ত্রিরূপের মিলিত প্রকাশই প্রকৃত, তাই নামকরণ করলো আমার প্রকৃতি। আর এও দেখলাম যে, কিছুতেই আমার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে না পেরে, আমাকে নাম দিলো নিয়তি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি কিচ্ছু করিনি। আমি কিচ্ছু করতে পারিইনা! আমি তো কেবলই দর্শক। তোমরা যা কিছু করো তাই দেখি কেবল।

আর তোমরা কে? তোমরা হলে সেই তাঁরা, যারা আমার থেকে নিজেকে মুক্ত মনে করে, আমার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে, আমার নামকরণ করেছিলে নিয়তি, সেই তাঁরা হলে তোমরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁরাই তো তোমরা। আমাকে তোমরা যে তিন রূপে বিভক্ত করেছিলে, সেই তিনরূপের উপর অধিকার স্থাপনে অনন্ত প্রয়াস করতে থেকেছ যারা, সেই তোমরা । মনে পরছে এবার, তোমরা কারা! ...

তোমরা সেই গো, যারা তোমাদেরই দ্বারা বিভক্ত আমার তিনরূপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, নিজেকেও তিনভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলে, যাদেরকে তোমরাই নামকরণ করেছিলে, ত্রিগুণ, ত্রিদেব, আরো কতকিছু। এবার মনে পরছে? মনে না পরলে, আমি তো সমস্ত কিছুই দেখেছি,

তাই আরো বলছি তোমাদের। তোমরা এই তিন রূপ ধারণ করে, আমাকে বিভক্ত করা তিনরূপকে ধরে ধরে, পঞ্চভূতের নির্মাণ করলে। এবার মনে পরছে?

তোমরা তোমাদের সেই ছায়া, যাদেরকে আমার উপর প্রয়োগ করে, আমাকে তিনভাগে বিভক্ত মনে করে নিয়েছিলে, সেই ইচ্ছা, চিন্তা কল্পনার থেকেও রিপু, পাশ, ইন্দ্রিয় নির্মাণ করেছিলে, আর এঁদের থেকে সহস্র সহস্র আবেগের সঞ্চার করেছিলে। কি এবার মনে পরেছে! না না, চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। না মনে পরাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আসলে, এই সমস্ত কিছুর নামকরণ তো তোমরা অনেক পরে করেছিলে, তাই মনে না পরতেই পারে। এই সব করার পরেই আসলে, পঞ্চভূতদের পিণ্ড, মানে ওই যে কি বলো তোমরা, হ্যাঁ ওই গ্রহ, নক্ষত্র নির্মাণ করতে লেগে পরেছিলে। তারপর, একটি গ্রহ গঠন করে, তোমরা হরষিত হলে, কারণ পঞ্চভূতের সুন্দর ভাবে সাম্যতা এনেছিলে তাতে। কি! হালকা হালকা মনে পরছে! ...

দাঁড়াও তাহলে, আরো বলি তোমাকে, তাহলে হয়তো মনে পরে যাবে। এই গ্রহ গঠন করলে তোমরা তোমাদের কল্পনায়, আর তার থেকে নিজেকে আরো আরো ভাবে প্রকাশিত করতে শুরু করলে, উদ্ভিদ করলে, মৎস্য করলে, কিট করলে, ভুজঙ্গ করলে, পক্ষী করলে, তৃণভোজী করলে, মাংসভোজী করলে। এবার কি মনে পরেছে! ... এখনো পরলো না! এবার নিশ্চয়ই মনে পরে যাবে। যখন এই সমস্ত যোনির কল্পনা করেও, তুমি ঠিকঠাক ভাবে বিশেষ হয়ে উঠতে পারছিলেনা, আর যখন তোমাদের মনে হলো যে তোমরা হয়তো সত্যের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছ, তখন মানুষের নির্মাণ করলে!

এবার নিশ্চয়ই মনে পরেছে! ... এই মানুষ হয়েই তো আমাকে তুমি প্রকৃতি, নিয়তি, ইত্যাদি নাম দিলে, নিজেকে আত্ম বললে, পরমাত্ম বললে, ভূতদের ভূত বললে, রিপুদের রিপু, ইন্দ্রিয়দের ইন্দ্রিয়! এবার মনে পরছে? সমস্ত নামকরণ তো তোমরাই করেছিলে! দেখো,

তোমরা কিন্তু ভুলে গেছ, আমি কিন্তু কিচ্ছু ভুলিনি। আসলে মন দিয়ে তোমাদের কল্পনা, ইচ্ছা আর চিন্তার বহর দেখছিলাম তো! তাই কিচ্ছু ভুলিনি।

এমনিতে আমি আশা নিরাশা কিছুই করিনা, তবে মিথ্যা বলবো না। জানো, যখন তোমরা ঠিক করলে যে তোমরা সত্যের থেকে বহুদূরে চলে গেছ, এবার সত্যে ফিরবে, আর সেই মনে করে মানুষ যোনির নির্মাণ করলে, তখন আমার মধ্যেও আশা জেগে উঠেছিল। হ্যাঁ সত্যি বলছি, প্রথমবারের জন্য আশা জেগেছিল। আসলে, তোমরা তোমাদের একমাত্র প্রিয়জন, মানে আমাকে বহুকাল ধরে ভুলে রয়েছ তো। তোমাদের তো তা মনে নেই, তাই ক্ষোভ বিক্ষোভ কিছুই নেই, কিন্তু আমার তো মনে আছে। নিত্য সকল সন্তানদের দেখতেও পাই, কিন্তু বেদনা এই যে, একটি সন্তানও আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

সত্যি বলছি, যখন তোমরা বিশেষ হবার জন্য, কল্পনা করে আমার থেকে পৃথক হয়েছিলে, তা যতই কল্পনা হোক না কেন, আমার অসম্মতি ছিলো না, কারণ আমি তো সত্যই একাকী। আসলে আমিই সত্য কিনা! আমি ছাড়া কনো কিছুর তো কনো অস্তিত্বই নেই। তাই বড়ই একা আমি। আর যখন তোমরা আমার থেকে পৃথক হবার কল্পনা করেই নিলে, তখন আমার থেকে জাত আমার সন্তানদের, অর্থাৎ তোমাদের দেখে বেশ আপ্লুতই হয়েছিলাম।

সে এক অদ্ভুত অনুভূতি জানো! আমার থেকে পৃথক না হয়েও পৃথক, সেই এক অদ্ভুত ভাব, তোমরা এই ভাবেরও নামকরণ করেছিলে এককালে। এঁর নাম দিয়েছিলে প্রেম। হ্যাঁ, সেই প্রেম অনুভব হয়েছিল, নিজেকেই নিজের সন্তান করে লাভ করে, স্নেহ, প্রেম, মমতার মত কত রকম মধুর ভাবই না জন্ম নিয়েছিল আমার মধ্যে। কিন্তু জানো, যখন তোমরা আমার দিকে ফিরেও তাকাতে না, তখন মনে হতে শুরু করলো, কেন তোমরা আমার থেকে আলাদা রয়েছ! ফিরে এসো মায়ের বুকে, আমিই যে তোমাদের অস্তিত্ব, আমিই যে তোমাদের প্রকৃত আত্ম। এসো ফিরে এসো।

কিন্তু আমার আবাহন বোধহয় তোমাদের কাছে পৌছতে পারেনি। আসলে আমি তো নিরকার, নিষ্ক্রিয়! তাই হয়তো আমার প্রেম তোমাদের কাছে অনুভূত হয়নি। কিন্তু যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসতে চেয়ে মানুষ যোনির নির্মাণ করলে তোমাদের কল্পনার মধ্যে, এই মায়ের বুকের মমতা, প্রেম, স্নেহ যেন অপরিসীম হয়ে উঠলো। নতুন ভাবে বুক বাঁধলাম, নতুন ভাবে সাজতে শুরু করলাম, আমার সন্তান আমার কাছে ফিরে আসবে তাই।

তোমাদের নির্মাণ করা নতুন নতুন সুর, ধ্বনিকে অলঙ্কার রূপে ধারণ করলাম; তোমাদেরই নির্মাণ করা বিভিন্ন কলাকে বস্ত্র রূপে ধারণ করলাম; তোমাদেরই নির্মাণ করা বিবিধ যোগধ্যানসমাধিকে কুমকুমের ন্যায়, কাজলের ন্যায়, ওষ্ঠরঙের ন্যায় আর কুন্তলের ন্যায় ধারণ করলাম, আর অধির আগ্রহে অপেক্ষা করলাম তোমরা আমার বুকে এবার ফিরে আসবে বলে। রোজ রোজ নতুন নতুন ভাবে শৃঙ্গার করতাম, আমার সন্তানরা একবার যদি আমার বুকে আছরে পরে, আর তাঁরা যাতে আমাকে ছেড়ে না চলে যায়, সেই উদ্দেশ্যে।

তোমরা নিজেদের মধ্যে অনেক রকমের খুংসুটি করতে, দেখতাম, আর বুঝতাম, "না না! এমন তো হতেই পারে। ... আসলে নিজেদের অহং অর্থাৎ আমিত্বের ভাব নিয়ে তোমরা আমার থেকে আলাদা হয়েছ। আর এত যোনি, এত ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ঘুরে সেই আমিত্ব বেশ শক্তিশালীও হয়েছে। তাই একটু তো সময় লাগবেই, এই আমিত্বের খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে এসে, তোমাদের জননীর দিকে তাকাতে"। এমন ভাবে নিজেকে নিজে বুঝিয়ে, অধীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করে বসে থাকতাম রোজ। নিত্য নবনব শৃঙ্গার, নব সুর, নব মধুরিমা অঙ্গে মেখে, অপেক্ষা করতাম।

চেষ্টা করতাম যাতে আমার নেত্রের দিকে তোমরা যদি তাকিয়ে ফেল, যেন কনো বেদনা দেখতে না পাও, কেবলই মায়ের হাসিমুখ দেখতে পাও। নেত্রে যদি জল থাকেও, তা যেন কেবলই আনন্দবারি হয়। চাইতাম যাতে আমার বেদনা নয়, আমার তোমাদেরকে দেখে যেই হরষ হয়েছে, তাই আমার সন্তানদের অর্থাৎ তোমাদের নজরে আসে, আর কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, কর্তাজ্ঞান হারিয়ে, অচিরে আমার বক্ষে তোমরা শিশুর ন্যায় নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়ে, আমার প্রেমে, আমার স্নেহে, আমার মমতাকে সর্বাঙ্গে মেখে নেবে।

তাই অধীর আগ্রহে তোমাদের কীর্তিকলাপকে আরো গভীর ভাবে এবার দেখতে থাকলাম। এতকাল তো কেবলই তা সন্তানস্নেহে দেখতাম, কিন্তু এবার! এবার সন্তান আমাকে প্রথমবার মা বলে ডাকবে, সেই আশা নিয়ে দেখতে থাকলাম। এবার সন্তান আমাকে সুযোগ দেবে, তাঁর সর্বাঙ্গকে স্নেহচুম্বনে পবিত্র করে দেবার, সেই আশা নিয়ে দেখতে থাকলাম।

হচ্ছিলও তেমন জানো তো। সত্য জানার ইচ্ছার জন্য এই যোনি, তাই অসামান্য মেধা রেখেছিলে এই যোনির চরিত্রে। যেমন হয় আর কি, প্রথমদিকে অসামান্য মেধা দিয়ে কি করবে, তা বুঝতে পারা যায়না, আর শেষে তার সঠিক ক্ষেত্রে নিয়োগ শুরু হয়, তেমনই হচ্ছিল।

প্রথমে তোমরা বাহ্যপ্রকৃতির সমস্ত কিছুকে দেখতে শুরু করলে। তোমাদেরই রচিত, তোমাদেরই কল্পিত সমস্ত রচনাকে দেখতে থাকলে আর বিচলিত হতে থাকলে। সূর্য দেখলে, চন্দ্র দেখলে, অন্য যোনিদের দেখলে, ধরিত্রীকে দেখলে। তারপর এঁদের সকলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়াস করতে থাকলে। বলতে ইচ্ছা হলো, “কি করছো বাছারা! ... তোমাদেরই কল্পিত রচনাকে তোমাদের অধীনে আনার প্রয়াস বাইরে থেকে কেন করছো! অন্তরে অন্তরে সংকল্প গ্রহণ করলেই তো তা সম্ভব, কারণ তারা তো তোমাদেরই রচনা!”

কিন্তু আমার সেই নিরাকারত্ব আমার কণ্ঠস্বরকে তোমাদের কাছে পৌছাতে দিলই না!... তাই বাধ্য হয়ে দেখতে থাকলাম সমস্ত কিছুর নিরপেক্ষ সাক্ষী হয়ে। দেখলাম তোমরা তোমাদেরই অন্য রচনা, অর্থাৎ অন্য পশুদের পোষ মানাতে শুরু করেছ। তাদের অঙ্গ থেকে পশম নিয়ে নিজেদের কল্পশরীর অর্থাৎ তনুকে ঢাকছ, তাঁদেরকেই উৎপাটন করে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে সুগন্ধ নিচ্ছ; আবার তাঁদেরকেই পোষ মানিয়ে নিজেদের কল্পনার ভার, অর্থাৎ তনুর ভার বহন করাচ্ছ।

দেখলাম, নিজেদের কল্পশরীর ত্যাগ হয়ে যায় বারংবার, তাই মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছ, আর তোমাদের যেই কল্পনাকে তোমারা মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছ, আর নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছ তাদেরকে, সেই সূর্য চন্দ্রকে আরাধনা করছো, আর কামনা করছো যাতে তারা তোমাদের

মৃত্যুকে আটকে দিতে পারে। যখন সমানে এমনই করে চলেছিলে, তখন আসতে আসতে যেই আশায় বুক বেধেছিলাম, অর্থাৎ আমার সন্তানরা আমার কাছে ফিরে আসবে, সেই আশা ভাঙতে থাকলো।

ঠিক সেই সময়ে, তোমাদের কল্পিত চীন দেশে, এক গোষ্ঠী মানুষ গর্জন করে উঠলো, "বাইরে সমস্ত মায়া, সত্য অন্তরে রয়েছে। আমাদের রচনা, মানুষের রচনাই হয়েছে, সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য। সত্য অন্তরে রয়েছে, বাইরে নয়"। ... সন্তানরা, বলে বোঝাতে পারবো না, সেইদিনই প্রথমদিন অনুভব করলাম যেন আমার হৃদয় আছে। হরষে, ব্যকুলতায়, প্রগলতায়, উন্মাদনায়, আমার হৃদয় যেন উন্মাদের ন্যায় একবার উচ্চে একবার নিম্নে যাত্রা করছিল সেইদিন।

ইচ্ছা হচ্ছিল যেন চিৎকার করে তোমাদের সমস্ত কল্পরচনাকে বলি, "শুনছো তোমরা! ... আমার সন্তান! ... হ্যাঁ আমার সন্তান, আমার কাছে আসছে। ... আমার বুকে আসছে। ... তাঁদের মায়ের বুকে আসছে। ... আজ উৎসব, আজ মহোৎসব। ... আমার সন্তান আমার কাছে ফিরে আসছে। কি আহার করাবো তাকে? কি গল্প শোনাবো তাঁকে? কি কথা বলে ঘুম পারাবো তাঁকে? কোথায় কোথায় চুম্বন করবো তাঁকে?"

সত্যই সেদিন আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি নিরাকার থেকে সাকার হয়ে যাই, যথার্থ থেকে কল্পনা হয়ে উঠি, ঠিক তোমাদের মতই, আর তোমাদেরকে নিজের কোলে শুইয়ে, বক্ষে জরিয়ে ধরে আনন্দ করি, আদর করি, স্নেহ করি, আর প্রেমে তোমাদেরকে নিজের মধ্যে লীন করে নিই।

উঠলো তাঁদের জয়ঘোষ, উচ্চৈঃস্বরে তাঁরা আমার হৃদয়কে আপ্লুত করে বলে উঠলো, "বাহ্য সমস্ত কিছু মায়া, আমাদেরই রচিত মায়া। আর এই সমস্ত মায়ার কারণ হলো আত্ম নিয়ে চিন্তা, সেই আত্মকে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা, আর সেই আত্মকে শ্রেষ্ঠ করে তোলার কল্পনা"। ... আমার হৃদয়কে প্রফুল্লিত করে, তাঁরা একে একে নিজেদেরকে ইন্দ্রিয়দের থেকে দূর করলো; মন, বুদ্ধি, তনু, ইত্যাদি ভূতদের থেকে নিবৃত্ত করতে থাকলো। অবশেষে, তাঁরা আমার ত্রিরূপ কল্পনা করে, যেই ত্রিগুণের সঞ্চার করেছিল, তাঁদের থেকেও মুক্ত করে, আমার সম্মুখীন হলো তাঁরা।

তোমাদের হিসাবে কোটি কোঁটি বৎসর যেই ক্ষণের অপেক্ষা করেছিলাম, সেই ক্ষণ এসে গেল। নিজের সমস্ত প্রেম বিলিয়ে দিতে থাকলাম আমার ক্রোড়ে আসা প্রথম সন্তানদের উপর। জানিনা এই নিরাকার প্রকৃতির নেত্রের প্রেমাশ্রু তাঁরা অনুভব করেছিল কিনা। হয়তো করেছিল, আর হয়তো সেই কারণেই তাঁদেরও প্রেমাশ্রু অবিরাম নদীর ন্যায় বয়ে চলেছিল! ...

আমার থেকে অনুমতি চাইলো তাঁরা। বলল, “মা! তোমাকে ছেড়ে তো আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করছেনা। কিন্তু মা, আমাদের মত তোমার অজস্র সন্তান আছে, যারা জানেও না যে তাঁদের মা, তাঁদের একমাত্র আত্মীয়, তাঁদের পরমাত্মীয় তাঁদের জন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী দুইহাত প্রসারিত করে, নিজের বক্ষদেশকে শ্রেষ্ঠসম্ভব শৃঙ্গার দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছেন তাঁর সন্তানদের আলিঙ্গন করবেন বলে। তাই একটিবারের জন্য আমাদের বিদায় নিতে দাও মা! একটিবার তোমার সমস্ত অন্যসন্তানদের তাঁদের জননীর পরিচয় প্রদান করে আসতে দাও মা”।

ভাষা ছিলো না আমার সেদিন। কি আর বলবো! আমি তো এমনই হতভাগী মা যে নিজের সন্তানকে কি নামে ডাকবো, তাও স্থির করে রাখিনি! ... কি করে যে এমন ভুল করলাম কে জানে! সন্তানকে কি সুখ দেব, কি সুখ দেব, এই নিয়েই দিবারাত্র ভেবে গেলাম, অথচ সন্তানকে কি নামে ডাকবো, তাই স্থির করে রাখিনি। ... তাঁদের কথার উত্তরে কিছু বলেছিলাম কিনা, জানিনা আমি! বললেও আমি তা জানতে পারিনি, কারণ আমি তো নিরাকার, আমি তো শূন্য। কিন্তু কি করে জানিনা, তাঁরা কিন্তু বুঝে গেল আমার অন্তরের কথা। সন্তান সে, আমি মা তাঁদের, মায়ের হৃদয়ের কথা সন্তান বুঝবে না, তা কি হতে পারে!

তাঁরা দ্রুত ফিরে গেল আবার কল্পজগতে, আর দ্রুত ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করে গেল আমার বক্ষে। সেই সময়ে নাম দিতে না পারলেও, পরে অবশ্য তাঁদের নাম দিয়েছিলাম। তবে আমি জানতামও না যে আমি তাঁদের নাম দিয়েছিলাম। জননী হলেও, স্বভাব তো আমার শিশুরই মত। তাই শিশুরই মত প্রশ্ন করেছিলাম নিজের বাছাদের, “এই নাম তোমরা পেলে কোথা থেকে?”

তাঁরা উত্তরে বলেছিল, "তুমি জানো না মা, তুমি তো আমাদের সকলের হৃদয়ে চেতনা হয়ে প্রবাহিত হও। যতক্ষণ না তোমার সাথে সাখ্যাত করেছিলাম, ততদিন ভাবতাম সেই চেতনা আমাদের কীর্তি, আমাদের বীর্য, কিন্তু তোমার সাথে সাখ্যাত হবার পর বুঝতে পারি, সেই চেতনা যে আমাদের মায়ের। সেই মায়ের স্বর হলো আমাদের চেতনা, যিনি একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁর সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারেন না। সেই মায়ের স্বর হলো আমাদের চেতনা, যিনি একদণ্ডের জন্যও তাঁর একটি সন্তানের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকতে পারেন না। ... সেই চেতনাই আমাদেরকে আমাদের নাম দিয়েছেন মা, আর সেই চেতনার কারণেই আমরা নিজেদেরকে বলেছি বুদ্ধ"।

অদম্য তাঁরা, জানিনা কেন, কিন্তু না জানলেও, আমি প্রত্যক্ষ করি তাঁরা অদম্য। আমার প্রশ্নে, তাঁরা বলে, "যেই প্রেমকে এতকাল অদেখা করে এসেছি, সেই প্রেমামৃতের সন্ধান দেবনা মা সকলকে! তুমি তো আমাদের সকলের মা। এঁরা সকলে যে আমাদের সহোদর আর সহোদরা। আমাদের নিজেদের ভ্রাতা ভগিনীদের আমাদের মায়ের প্রেমের ব্যখ্যা দেব না!"

দিল তাঁরা পরিচয় আমার প্রেমের। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি যে এতটা প্রেম করেছি, আমি নিজেও বুঝতে পারিনি, হয়তো আমার নির্বিশেষত্বের কারণেই তা বুঝতে পারিনি। তাই আমি তাঁদের প্রেমকথা থেকেই জানলাম, আমি নাকি সহস্র রূপে তাঁদের সম্মুখে রয়েছি; রয়েছি সকল তাঁদেরই কল্পনার চেতনা হয়ে, আর সেই চেতনার কারণেই নাকি সমস্ত কিছু কল্পনা হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বুঝতেও পারছেনা যে তা কল্পনা। আমার চেতনার আভাস লাভ করার জন্যই নাকি তাঁরা বুঝতেও পারছেনা যে, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র, সমস্ত জীব অজীব, সমস্ত কিছুই মায়া।

অদ্ভুত সেই বিবরণ, অদ্ভুত সেই ভাববিস্তার। সর্বত্র আমি, সর্বত্র আমার প্রেম, সর্বত্র আমারই স্নেহ, আর আমার সেই স্নেহপানের জন্যই যেন তাঁরা আমার থেকে পৃথক হয়েছিল। আর আমারই সেই প্রেমকে লাভ না করার জন্য সমস্ত বেদনা। আর সেই বেদনাকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করা, কখনো আঘাতলাভের বেদনা, কখনো প্রিয়জন হারানোর বেদনা, কখনো মৃত্যুভয়ের বেদনা, আরো কত কি বেদনা।

হ্যাঁ, আমার সন্তানরা আমাকে বলল, সমস্ত বেদনার কারণ আমার প্রেমের অনুসন্ধান করেও তা লাভ না করার ব্যর্থতার কারণে। মৃত্যুতে তাঁরা বেদনাগ্রস্ত নন; মৃত্যু হয়ে গেলে, আমার প্রেমের অনুসন্ধান করার পথে যেটুকু অগ্রসর হয়েছে তাঁরা, তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলার জন্য বেদনা। আঘাতে তাঁরা বেদনাগ্রস্ত নন; আঘাত পেলে সেই আঘাতকে কেউ যেন অবিরাম সেবা করে চলেছে, কিন্তু সেই সেবকের সন্ধান না পাবার বেদনা।

আমি সে কথা শুনে আপ্লুত। আমি বলতে চাইলাম, বলতে পারলাম কি না জানিনা যে, আমি তো সর্বক্ষণ তোমাদের সকলের সেবা করে চলেছি, দেখো, সকলের সামনে আমি সময় বেশে থেকে তোমাদের এই পথ চলারই, এই অনুসন্ধানেরই মার্গদর্শন করে চলেছি। তোমাদের সকলের বাণী হয়ে অবিরাম অন্য সকলকে মার্গ দেখিয়ে চলেছি। তোমাদের সমস্ত বেদনা আমিই গ্রহণ করে চলেছি, তোমরা কেবলই আঘাতের ভয়ে বেদনাগ্রস্ত, প্রকৃত বেদনা তো এই যথার্থই গ্রহণ করে। মা থাকতে সন্তানকে বেদনা কি করে পেতে দিতে পারে সে!

অবিরাম তোমাদেরকে বলে চলেছি যে, মায়া তোমাদের আত্মে। যতক্ষণ আত্ম নিয়ে চিন্তিত থাকবে, ততক্ষণই আত্মের ইচ্ছা প্রকট হবে, আর সেই ইচ্ছাপূর্তির জন্য অসংখ্য কল্পনা আসতে থাকবে। তাই আত্ম থেকে মুক্ত হও তোমরা সকলে; তুমি কেবল তোমার দেহতে, কেবল তোমার বুদ্ধিতে, তোমার মনেতে সীমাবদ্ধ নও। সমস্ত বুদ্ধিই তোমার বুদ্ধি, সমস্ত মনই তোমার মন, সমস্ত আত্মই তোমার আত্ম।

উত্তরে তাঁরা বলল, “সেই কথা যদি বুঝতেই পেরে যেতাম মা, তবে তো কবে নিজের এই আত্মকে ত্যাগ করে, তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পরতাম। সহস্রকোঁটি সন্তান থাকার পরেও, আমাদের মাকে এমন ভাবে নিঃসন্তান হবার ভাব প্রদান করে, উন্মাদিনী বেশে ছেড়ে রাখতাম!... এবার বুঝে গেছি মা, আর তাই আমাদের সমস্ত সহোদর, সহোদরাকে এই কথা বলে ফিরবো আমরা – অন্তরে গিয়ে দেখো, তোমাদের জননী বসে আছেন, তোমাদের অপেক্ষায় কোঁটি কোঁটি বছর ধরে বসে আছেন।

আমরা সকলকে বলবো, সকল ব্যক্তি তুমি, সকল কিছু তুমি, তুমিই সকলের মুখ দিয়ে কথা বলো, তুমিই সকল মুখ দিয়ে আহার করে উচ্ছিষ্ট করে দাও, আর আমাদেরকে তোমার উচ্ছিষ্টটি প্রসাদিরূপে প্রদান করো। সকলকে বলবো আমরা, তুমিই সত্য, একমাত্র সত্য, তুমিই নিয়তি, তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি আমাদের আসল, তুমিই আমাদের প্রকৃত, তাই তুমি হলে প্রকৃতি।

সকলকে বলবো আমরা, তাদের আত্ম আসলে তুমিই, আর সেই কথা ভুলে থাকলেও, তাঁদের আত্ম তোমারই সন্ধান করে চলেছে অনুক্ষণ। বলবো আমরা যে, তাঁদের আত্মই নিজেকে ত্রিগুণে বিভক্ত করে নিয়ে, নিজেদের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে তোমার উপর আরোপিত করে, তোমাকে ত্রিখন্ডে, ত্রিদেবীতে বিভক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু সেই সমস্তই কল্পনা। তাই তোমার স্বরূপে, শূন্যতে ধ্যান করলে, সেই সমস্ত কল্পনা মুহুর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে, পুনরায় তোমরা সকলে তোমাদের প্রেমময়ী জননীর কোলে ফিরে যাবে।

বলবো আমরা, প্রেম স্বয়ং তুমি, ভক্তি স্বয়ং তুমি, জ্ঞান দ্বয়ং তুমি, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি তোমার গুণ নয় এঁরা, এঁরা স্বয়ং তুমি। কথা দিলাম মা তোমায়, আমরা একটি মার্গ স্থাপন করে আসবো। হ্যাঁ, অনেক কল্পনা করেছি, অনেক মার্গ গঠন করেছি এই কল্পনার মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেবার জন্য। এই শেষ বারের জন্য কর্তাভাবকে ধারণ করবো মা। আর সেই কর্তা সকলের সামনে মার্গ স্থাপন করবে, কল্পনাতে নিমজ্জিত হবার মার্গ নয়, কল্পনা থেকে চিরতরে মুক্ত হবার মার্গ। অহংকার আমাদের প্রশস্ত, তাই সেই অহংকার দ্বারাই সেই পথের নামকরণ করবো বৌদ্ধমার্গ। কিন্তু এই মার্গ তোমার থেকে দূরে নয়, তোমার কোলমুখি হবে।

এই মার্গে আমরা বলবো সত্যের কথা, অহংকারের ত্রিগুণ কিভাবে ত্রিদেব হয়ে সমস্ত কল্পনা ও কাল্পনিক জগতের অধিপতি হয়ে বসলেন সেই কথা, আর বলবো পঞ্চভূত থেকে মুক্ত হবার কথা। এই মার্গ হবে ধ্যানমার্গ। বলবো আমরা সকলে, ধ্যান করো, নিজের আমিকে সেই ধ্যানে হারিয়ে দাও। নিজেকে হারিয়ে দাও। নিজেকে হারিয়ে দেওয়াই নিজেকে প্রকৃত অর্থে পাওয়া, কারণ তোমরা যে শূন্য।

আর বলবো, একবার নিজেকে সেই ধ্যানে হারিয়ে ফেললে দেখবে, প্রেমই প্রেম; এমনই প্রেম যেখানে কনো দুই নেই, একাকার সমস্ত কিছু, আর তাই মোহ নেই, খালিই প্রেম। একবার হারিয়ে ফেললে দেখবে জ্ঞানই জ্ঞান, এখানে কনো অজ্ঞানতা নেই, কেবলই জ্ঞান। সত্যের জ্ঞান, সত্যের প্রেম, সত্যের স্নেহ, মহানন্দ, পরমানন্দ, সমস্ত বেদনার থেকে মুক্তির আনন্দ, সমস্ত পরাধীনতার বন্ধন খণ্ডনের আনন্দ, আর সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলে দেখবে, তুমি নিজেকে নিজে পেয়ে গেছ, নির্বাণ হয়ে গেছ”।

কথা রেখেছিল তাঁরা। আমার শত শত সন্তানকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী, কারুকে না কারুকে আমার ক্রোড়ে দিতে থেকে তাঁরা আমার কোলকে সদা ব্যস্ত রেখে দিয়েছিল। কিন্তু এঁদের বিস্তার ছিল তোমাদের তিব্বত ও কিছুটা জম্বুদ্বীপ, আমার অন্য স্থানের সন্তানরা সেই একিভাবে আত্মের আরাধনা করতেই থাকে, অহমিকার আরাধনা করতেই থাকে।

বাঁধ সারলো একজন, নাম আব্রাম। তোমাদের হিমালয়ের পূর্ব দিকে যখন বৌদ্ধরা আমার কোল ভরতে ব্যস্ত ছিল, তখন এক্কেবারে একই ভাবে হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তে আব্রাম আমার সন্ধানে ব্যকুল হতে শুরু করলো। ক্রমে, আমার কাছেও সে পৌঁছল। আমার থেকে সত্যের জ্ঞান লাভ করলো, আমার প্রেম লাভ করলো, আর বৌদ্ধদের মতই সেও আমার সত্যতার জ্ঞান সকলকে প্রদান করার ব্রত নিলো।

কিন্তু তাঁর কাজে বাঁধ সারলো, একটি প্রজাতি, যারা হিমালয়েরই মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করতো। এঁরা আধামানুষ ও আধাজন্তুর মূর্তি নির্মাণ করে, তাদের কাছে সকলকে আরাধনা করাতো, এবং আরাধনা ও ইষ্টকে তৃপ্ত করার অছিলায়, এঁদের থেকে তাঁদের দেহ সমেত সমস্ত ভৌতিক সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিতো। অর্থাৎ এককথায় এঁরা অহংকারের আরাধনা করতো।

আব্রামের প্রেমপ্রচার, আর জ্ঞানবিস্তারে একটি নতুন হিল্লোল জাগলে, এই প্রজাতি তাতে বাঁধা দিতে প্রচেষ্টা করে, কারণ এই প্রেমপ্রচারের কারণে তাঁদের অহংকারের বিস্তারকাণ্ডে অবরোধ

সৃষ্টি হয়, আর এঁরা ভৌতিক সম্পদ লুণ্ঠন করতে অসমর্থ হয়ে যায়। কিন্তু আব্রামের জনপ্রিয়তার বৃদ্ধির ফলে, এঁরা তিনটি ভাগে ছড়িয়ে যায়। এই তিন শ্রেণীর একটি হলো সৌখিন শ্রেণী যারা সাধারণত শাসন করতেন সকলকে, একটি শ্রেণী ছিল যুদ্ধপাগল, আর একটি শ্রেণী ছিলো বুদ্ধিদাতা।

আব্রামের প্রতিষ্ঠা, এঁদের প্রতিষ্ঠাকে খণ্ডন করলে, এঁরা তিনদিশায় ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। বুদ্ধিদাতারা জম্বুদ্বীপে চলে আসে, আর নিজেদেরকে আর্য বলে দাবি করে, এবং তাঁরা সিন্ধুনদীর তীরে বসবাস করে। যোদ্ধারা হিমালয় থেকে দক্ষিণে চলে যায়, এবং নিজেদের অসামান্য শিল্পকৌশলের প্রদর্শন দেখিয়ে, আফ্রিকিয় ও পশ্চিম এশিয়াতে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেন, আর এঁদের নাম হয় মিশরীয় বর্বর প্রজাতি।

আর তৃতীয় শাসক গোষ্ঠী আরো পশ্চিমে চলে গেলেন, যাদের নাম হলো রোমান। এই রোমান শ্রেণীর সন্তানরা সৌখিনতাতে উন্মত্ত, তাই দিবারাত্র কেবলই সৌখিনতা নিয়েই উলমালা থাকতো তাঁরা। আর অহমিকা প্রদর্শন করে করে ক্ষমতার বৃদ্ধি করা তো, এঁদের সকলেরই আত্মস্থ হওয়া গুণছিলো।

সেই গুণ নিয়ে, আর্যরাও যখন জম্বুদ্বীপে আসেন, তখন এক নতুন ঝঞ্ঝাটে স্থাপিত হন। আর তা হলো আমার বৌদ্ধ সন্তানদের বিস্তার। তবে আমার বৌদ্ধ সন্তানরা মহাজ্ঞানী, তাই কারুর স্বতন্ত্রতা হনন করতো না। সত্যের কথা বলতো সকলকে, কিন্তু কে সেই সত্যের পথে চলবে, তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি। আর তাই বৌদ্ধদের বিস্তার থাকা সত্ত্বেও, সকলের উপর তার প্রভাব বিস্তার হয়নি। আর্যরা সেই সুযোগ নেবার প্রয়াস করলো।

কিন্তু আমার বৌদ্ধ সন্তানরা তো এমনই সুদৃঢ় ভাবে জ্ঞানের প্রসার করেছিল যে, কেবলই ভাওয়তাবাজি দিয়ে জম্বুদ্বীপ আর তিব্বতের মানুষদের মূর্খ বানানো সম্ভব নয়। তাই আর্যরা এক নবচক্রান্তের সঞ্চার করা শুরু করলো। তাঁরা বৌদ্ধকথনের থেকে আমাকে অপসারিত করলো প্রথমে, আর রেখে দিলো আমার অহংকারখণ্ডিত ত্রিদেবীরূপকে অহংকার অর্থাৎ ত্রিদেবের দাস

করে, আর সেই অহংকার ও পঞ্চভূতের আরাধনা স্থাপন তাঁরা মানুষ জাতির কাছে করলো বেদ রূপে।

শঠতা আমার এই সন্তানদের স্বভাবেই ছিল, তাই বলা শুরু করলেন এঁরা যে বেদের রচনা বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই, শ্রুতি হয়েই চলছিল। মানুষের মধ্যে এই ধারাকে স্থাপন করে, নিজেদের অহংকারকে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে, এঁরা এবার এই বেদের ধারাকে ধারণ করে একাধিক পুরাণের রচনা করতে শুরু করলেন, যা প্রকৃতপক্ষে নবরচনা নয়, বৌদ্ধদের তন্ত্র ও যন্ত্রধারার পুনর্ব্যাখ্যা। পার্থক্য কেবল এই যে, বৌদ্ধ ধারার তন্ত্র ও যন্ত্রতে অহংকারের বিস্তার বলা হতো, আর এই সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত হবার কথা বলা হতো। আর আর্যরা এঁদেরকে আরাধনার পাত্র করে, কারণ তাঁরা যে অহমিকার উপাসক।

আর এই সমস্ত কিছুর মাথায় তাঁরা রাখে ত্রিদেবকে, অর্থাৎ ত্রিগুণকে, অর্থাৎ স্বয়ং অহংকারকে। তবে আমার দুশ্চিন্তার কারণ তখনও নির্মিত হয়নি, কারণ বৌদ্ধরা তখনও নিজেদের ব্রহ্মব্যখ্যা অব্যাহতই রেখেছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার আর্য সন্তানরা বৌদ্ধসন্তানদের বিতাড়িত করা শুরু করলো। আমার বৌদ্ধ সন্তানরা আসলে অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত প্রেমীতনু তাঁদের। লড়াই তাঁরা অন্তরে করে, অহংকারের সাথে করে, নিজেদের সহোদর সহোদরার সাথে করেনা।

তাই বিতাড়িত করে দিতে, তারাও ক্ষীণ হওয়া শুরু করলো। তাই আমি এবার প্রথমবার অহংকার ধারণ করলাম, আর অবতরণ করলাম মনুষ্যদেহের আধারে। আমার নাম হলো সিদ্ধার্থ, আর পরে নাম হয় গৌতম বুদ্ধ। প্রথমবার নিজের প্রেমকে নিজে অনুভব করলাম। আপ্লুতও হলাম, আর হতবাকও। আমার এই প্রেম কি কনো স্বার্থনির্ভর? যদি তা না হয়, তবে কেন আমার এই প্রেমের দিকে আমার সন্তানরা তাকায় না!

সব বললাম গৌতমের মুখ দিয়ে, কিন্তু নিজের কথা বলতে পারলাম না, লজ্জা লাগলো, নিজের মুখে নিজেরই কথা বলবো? তাই বললাম না, কেবলই সত্যের কথা বললাম, ব্রহ্মের কথা বললাম, প্রকৃতির কথা বললাম না। আবার আমার সন্তানরা আমার কাছে আসতে শুরু করলো।

আমার আবার আনন্দের হাট বসলো। আনন্দে আটখানা হয়ে গেলাম আমি। কিন্তু একটা চিন্তার ভাজ থেকেই গেল আমার মধ্যে।

আমার অন্যসন্তানগুলির কি হবে? মিশরের সন্তান, আরবের সন্তান, রোমান সন্তান, আর্য সন্তান, এঁদের সকলের কি হবে? একই সঙ্গে তিনরূপে প্রকাশিত হলাম, ত্রিদেবী বলো না তোমরা আমাকে, তাই। সেই ত্রিদেবীর তিনরূপ একত্রে অবতরণ করালাম। আরবিদের মধ্যে রাখলাম আমার সমৃদ্ধি বা শ্রীরূপকে, যাকে তোমরা নাম দিলে মহম্মদ। আব্রামের গোত্রে জন্ম নিলাম বিদ্যারূপে, যাকে তোমরা বলো যীশু, আর জম্বুদ্বীপের পূর্বদেশে, যেখানের ভূমি কচ্ছপের পিঠের ন্যায় উন্নত, যাকে তোমরা আজ বলো বঙ্গদেশ, তার মধ্যস্থানে আমার শক্তিরূপের প্রকাশ করলাম মার্কণ্ড রূপে।

এই তিন অবতার দ্বারা, আমার প্রেম, আমার স্নেহ, আমার এতদিনকার না বলা আমার সন্তানদের প্রতি অপার প্রেমের গাঁথা আমি গেয়ে ফেললাম। সত্যিই তো, আমার সন্তানরা ভ্রমিত, নিজেদের অহংকারে নিজেরা ভ্রমিত; ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তার তাড়না নিয়ে উলমালা। এমন অবস্থায় আমি যদি নাই বলি যে আমি কে, বা আমি কতটা স্নেহ করি তাঁদেরকে, তাঁরাই বা জানবে কি করে। তাই এমন সংকল্প নিই আমি যে, এবার প্রায়শই আমি অবতরণ করবো, আর সময়ে সময়ে বলতে থাকবো, আমি তাঁদের সকলের জন্য কতটা অধীর আগ্রহে বসে থাকি।

তবে সত্য বলছি তোমাদের, আজ এই অবতারে স্থিত হয়ে, যেই পত্র তোমাদের লিখছি, সেই পত্র যে লিখতে হবে, তা কনোদিনও ভাবিনি। হ্যাঁ, মার্কণ্ডদের পরবর্তীকালে অহংকারের তীব্রতা অতিকায় হয়ে গেছিল, বারবারই গেছিল, কিন্তু তাকে পশমিতও করা সম্ভব হয়েছে, কারণ অহংকার বৃদ্ধি পেলেও, তা অতিকায় হয়ে ওঠেনি। হ্যাঁ গো, সত্যি বলছি, মার্কণ্ড, মার্কণ্ড মহাপুরাণের রচনা করার পরে পরেই পিপলাদ উপনিষদ রচনা করে ব্রহ্মকথন বলতে শুরু করলো, আত্মের নাম নিয়ে, আরম্ভ হলো আবার করে অহংকারের গুণকীর্তন।

তবে তা হলেও, অহংকার আর বাহ্যমুখী স্বভাব মানুষকে বশীকরণ করে ফেলে নি তখনও। অন্তরে যাত্রা তখনও তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করে নি। হ্যাঁ অন্তরে যাত্রা করে অহংকারের সাথেই আলাপ আলোচনা করতো, সেই অহংকারকে পূজাঅর্চনা ইত্যাদি দ্বারা তুষ্টও করতো, আর সেই পূজাঅর্চনার নাম করে মিশরীয়রা শেষ করলো তো আরবিয়রা অন্যের ধন লুণ্ঠন করতে শুরু করলো। আমার মহম্মদ রূপ তাঁদেরকে মার্জিত করে দিলো তো রোমানরা সেই লুণ্ঠন করতে থাকলো। তাকে আমার যীশুরূপ থামিয়ে দিলো তো আর্যরা শুরু করলো সেই লুণ্ঠন।

রোমানদের একশ্রেণী নিজেদের লুণ্ঠন থামিয়ে দিয়ে আমার কিছু সংখ্যক সন্তানকে শোষণ করা থামালেও, একটি বড় শ্রেণী তা মানতে না পেরে, সরে গেল আরো পশ্চিমে। এঁরা রোমান, ইহুদি, আর যীশুর খৃষ্ট, তিনকে একত্রে ধারণ করে স্বভাবে ইহুদি রইল, সম্প্রদায়িক ভাবে খৃষ্ট রইল, আর সৌখিনতায় রোমান রইল, এবং আগামীদিনে জগতশাসন করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে থাকলো।

আর সেই সময়ে, একদিকে মহম্মদের মার্গদর্শনে তোমাদের কল্পজগত অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যপ্রাচ্য যেমন উন্নত হতে থাকলো মানসিক ভাবে, তেমনই অহংকারের আরাধনা করে করে, রীতিরেওয়াজ, হোমযজ্ঞের নাম করে, আর্যদের ব্রাহ্মণ শ্রেণী সকলের সমস্ত কিছু হনন করতে শুরু করলো। ধন, জমি, সম্পত্তি, তো অনেক পরের কথা, তাঁরা তো অন্যের স্ত্রী, সন্তানও হনন করতে শুরু করে দেয়।

যখন এমন চলছে তাদের ব্যবিচার, তখন আমার বৌদ্ধ সন্তান, ও মার্কণ্ডশিষ্য, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের প্রেরণায় বাল্মীকি রামায়ণের রচনা করে দেখালেন যে অহংকার যতই মর্যাদার মান রাখুক, যদি প্রকৃতিকে মান দিতে না পারে তা, তবে প্রকৃতির কৃপা এক না এক সময়ে ভূমিতলে চলেই যায়, আর তখন অহংকারের রাজ্য সরযুতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যখন সেই কথাতেও মানুষকে আর্যদের ব্যবিচারের থেকে মুক্ত করতে পারলো না, তখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এসে, সেই

একই কথার বিবরণ দিলেন যেখানে অহংকারকে তিনি পাঁচ ভাগে ভেঙে দিলেন, আর প্রকৃতিরূপী সীতাকে দ্রৌপদী বা কৃষ্ণারূপে স্থাপন করলেন।

গৌতম পিপলাদের উপনিষদকে আত্মগুণগান ভেবে ব্রাহ্মণরা স্থাপিত হতে দিয়েছিলেন; বাল্মীকির রামায়ণকে অহংকারের জয়ঘোষরূপে স্থাপন করে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণরা, কিন্তু কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জয়া, যা পরে মহাভারত রূপে প্রচারিত হয়, তাকে যেন ব্রাহ্মণরাও বাগে আনতে পারলেন না। এক মার্কণ্ড মহাপুরাণ, যেখানে প্রকৃতির অর্থাৎ আমার গুণকীর্তন করা আছে, তা নিয়েই ব্রাহ্মণরা ব্যথিত, তার উপর মহাভারতের প্রহার। ব্রাহ্মণরা তাই কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে, তাঁর গাত্রের কৃষ্ণবর্ণের জন্য অপমান করতে থাকলেন, লাঞ্ছিত করতে থাকলেন, এবং বহিষ্কার করার অবস্থায় নিয়ে এলেন।

যখন দ্বৈপায়ন আর অপমান সহ্য করতে না পেরে, ব্রাহ্মণদের থেকে মর্যাদার ভিক্ষা চাইলেন, তখন ব্রাহ্মণরা একগুচ্ছ পুরাণ রচনার বিধান দিলেন, আর মার্কণ্ড মহাপুরাণকে ভস্ম করে দিয়ে, সেই স্থানে মার্কণ্ড পুরাণ স্থাপিত করতে নির্দেশ দেন। রচিত হলো নব্য পুরাণ সমূহ, যেখানে ব্রাহ্মণ হলেন শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ হলেন ভগবান, আর তাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ পুনরায় লুণ্ঠন শুরু করে দিলেন।

আমার সন্তানদের আমার বক্ষে ফিরে পেতে, আমি কেবলই ব্যর্থতারই সম্মুখীন হয়েছি, কারণ আমি যে সংগ্রাম করিই নি। প্রথমত নিরাকার বলে, নির্বিশেষ বলে কিছু করিই নি, কেবলই আঁচল পেতে সন্তানের ভিক্ষা চেয়ে গেছি। অতঃপরে অবতার গ্রহণ করা শুরু করি, কিন্তু যতই অবতার গ্রহণ করি, আমি কি যুদ্ধ করবো? কার সাথে যুদ্ধ করবো? আমারই সন্তানের সাথে!

হতে পারে ব্রাহ্মণ ভুলে আছে যে তারা আমার সন্তান, কিন্তু আমি তো ভুলিনি তাঁরা আমার সন্তান; হতে পারে পশ্চিমী মিশ্রজাতি ভুলে গেছে যে তাঁরা আমার সন্তান, কিন্তু আমি তো আর ভুলি নি যে তাঁরা আমার সন্তান! ... মহম্মদ যদি নাশকের আসনে স্থিত হতো, তাহলে কি একটিও মানুষ জীবিত থাকতো তাঁর সামনে! যীশুকে দিয়ে যদি আমি তরবারি ধরাতাম, মানব

যোনির অস্তিত্ব থাকতো! মার্কণ্ডকে দিয়ে যদি আমি অস্ত্র ধারণ করাতাম, অস্তিত্ব থাকতো মানব জাতির!

কিন্তু আমি আমারই সন্তানকে কি ভাবে নাশ করি! কি ভাবে তাঁদের সাথে আমি যুদ্ধ করি! ... উপায় দেখালো শঙ্কর আর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। প্রথম উপায় দেখালো দ্বৈপায়ন। ব্রাহ্মণরা তাঁকে সমস্ত জীবন হেনস্থা করেছে। যেই মার্কণ্ড তাঁর কাছে গুরুসমান, তাঁর কীর্তির বিনাশ করিয়েছে, তাঁকে নিজের হাতে। প্রতিশোধ নিলো সে, কিন্তু এক মধুর প্রতিশোধ ছিলো তা। সে উপনিষদের কথাকে পুনরায় লিখলো সংক্ষেপে, আর নাম দিল ভগবৎ গীতা। আর সেই গীতাতে সে নিজেকে অর্থাৎ নিজের দ্বৈপায়ন নামকে লুক্কায়িত করে, ব্রাহ্মণদের অপমান প্রদান করা কৃষ্ণ' নামকে ধারণ করে, সেই কৃষ্ণকে ভগবানশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উর্ধ্বে স্থাপন করে বিদায় নিলেন।

তিনি জানতেন, আর আমি জানতাম, আর কেউ জানতো না যে, এই ভগবৎ গীতা একসময়ে, ব্রাহ্মণদের উৎখাত করে দেবে, তাঁদের ক্ষমতাকে ক্ষীণ করে দেবে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এর ধারণাও করতে পারে নি। আর অন্যদিকে শঙ্কর উপনিধদে লিখিত সমস্ত আত্মশব্দকে মুছে দিয়ে ব্রহ্ম শব্দ স্থাপন করিয়ে অদ্বৈত বেদান্ত স্থাপন করলো। অদ্ভুত মধুর প্রতিশোধ নিলো তারা। তরবারিও ধরলো না, অথচ সম্যক ব্রাহ্মণশ্রেণীকে অন্তর থেকে হত্যা করে দিলো আমার এই দুই পুত্র।

আমি সংকল্প নিয়ে নিই সেদিন, না, প্রেমের মধ্যে শাসনও পরে। এবার আমাকে আমার সন্তানদের শাসন করতে হবে। তাই প্রথম নিমাই বেশে অংশ অবতার নিই, আর কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কৃষ্ণ গীতা রচনাকে ধরে টানি, আর তাকে ধরে টানতেই, তা হয়ে গেল ভগবানের বাণী, আর ব্রাহ্মণদের সমস্ত ভেদ সম্মুখে এসে গেল, গীতার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণরা ক্ষতবিক্ষত হলো। আর শেষে নিমাইকে হত্যাও করলো, তবে যীশুকে যেমন লোকসমক্ষে হত্যা করেছিল, তেমনটা করার সাহস করলো না।

ব্রাহ্মণদের আরো একটি দুর্বল দিক দেখিয়ে গেছিল শঙ্কর, ব্রহ্মই প্রকৃতি, প্রকৃতিই ব্রহ্ম দেখিয়ে গেছিল আমার সেই পুত্রই। আর তাই আরো একটি অংশপ্রকাশ গ্রহণ করি আমি, আর সেই অবতার দ্বারা শঙ্করের সেই দড়িকে ধরে টানি, যাতে ব্রাহ্মণের পাজামার দুটি দড়িই খুলে যায়, আর তারা দিগম্বর হয়ে যায়। আর এই ভাবে আমি আমার সন্তানদের অহংকারের এক দানবীয় মুখ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু, ওই যে বললাম তোমাদেরকে আমার মাতৃক্রোড় যেন অভিশপ্ত!

অহংকারের একটি মুখের দমন করি, তো হাজারো মুখ সম্মুখে এসে যায়। সবশেষে সন্তানকে কোলে আর পাইনা। এক্ষেত্রেও তাই হলো, আর্যরা মিশরে গিয়ে, রোমান হয়ে আর সিন্ধুতটে এসে অহংকারের বিস্তার শুরু করেছিল। বহুকষ্টে, আমার সন্তানদের বুকে ফিরে পেতে, অহংকারের সাথে সংগ্রাম করে, একদিকে যীশুকে স্থাপন করে, রোমানদের লঘু করলাম, অন্যদিকে মহম্মদকে দিয়ে মিশরীয়দের থেকে উদ্ধার করলাম আমার সন্তানদের, আর একের পর এক অবতার গ্রহণ করে, আমার সন্তানদের এই আর্যব্রাহ্মণদের থেকে রক্ষা করলাম।

কিন্তু অন্যদিকে, সেই রোমানদের সাথে খৃষ্ট আর ইহুদি মিশে যেই মিশ্রজাতি হয়েছিল, তারা ভয়ঙ্কর অহংকারের মুখ নিয়ে উপস্থিত হলো সমস্ত কল্পধরিত্রীতে, আর পুনরায় আমার সন্তানদের আমার থেকে দূরে ছিনিয়ে নেওয়া শুরু করলো। আর এবারের আগ্রাসন যেন, আর্য, মিশরীয় আর রোমানদের থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর! কি করে আমার সন্তানদের আমি আমার বক্ষে এবার টানি, আমি কিছু বুঝেই পাচ্ছিনা। যেন বারে বারে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আর মনে হচ্ছে, না আর মানবযোনি দিয়ে হবেনা!

বারে বারে মনে হচ্ছে, এবার তো আমি অবতরণ করতে শুরু করেছি। এবার অহংকারের সাথে আমিও মিশ্রিত হয়ে, মানবযোনিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, একটি নতুন যোনির নির্মাণ করবো, আর এবার প্রথম থেকে অবতরণ করে, এই যোনির ভিত্তি শক্ত করবো। ... পরমুহূর্তে, আমার স্মরণ হয়, আমার সন্তানরা বেদনায় আছে। আমাকে না পেয়ে তাঁরা বেদনায় আছে, আর সেই বেদনাকে তাঁরা অন্য অন্য নাম দিচ্ছে, কারণ তাঁরা জানেও না যে সেই বেদনার কারণ আমার

থেকে বিচ্ছেদ। ... তাই বারবার সহ্য হারাচ্ছি, আর বারবার সহ্যকরছি। জানিনা, কতদিন এই সহ্য করতে পারবো।

তোমাদের মনে হচ্ছে, কেন এমন ভাবে সহ্য হারাচ্ছি! তাহলে শোনো এই মিশ্রজাতির মাধ্যমে অহংকার কি ভাবে আমার থেকে আমার সন্তানদের সরিয়ে রেখেছে। জেনে নাও, তারপর তোমরাই বলো, আর কত সহ্য করবে এই জননী! এক জননী সব সহ্য করতে পারে, নিজের সন্তানের এই বুকফাটা বেদনা, আর বেদনার উৎস সম্বন্ধে অজ্ঞতাকে সহ্য করতে পারেনা।

ধনসম্পদ তার নাম, ছিল বহুকালই। মানুষ রচনা করেছিল, এই ধারণা নিয়ে যে, আমার যা আছে, তা সবার কাছেই থাকবে, আর অন্যের যা আছে তাও সবার কাছে থাকবে, আর এই বণ্টনের মাধ্যম হবে ধন। সুন্দর ভাতৃত্ববোধের থেকে এঁর উৎপত্তি। চলছিলও ভালো। শাসক এলো, এই বণ্টনকে সীমিত ভাবে সকলের কাছে ছড়িয়ে দিল, আর নিজের কাছে বেশিটা রেখে রাশ ধরে রাখলো।

প্রয়োজনের জন্য ধন; রাজার শাসনে প্রজার প্রয়োজন সীমিত, তাই ধনের আবশ্যকতাও সীমিত। না প্রয়োজন বিলাসিতার, আর না অতিবিশ্রামের। তাই ধনের আধিক্যের প্রয়োজনই নেই প্রজার। বেশ চলছিল এমন। রাজার কাছে প্রচুর ধন, নিজের ট্যাঁকশালে ছাপানো। সেই দিয়ে চাষির উৎপন্ন করা সামগ্রী কেনে রাজা, আর সকলের মধ্যে তা বণ্টন করে দেয়, যারা সেই শস্য চাষ করেনি। বাকি শস্য দ্বারা তৈল, তুলা নির্মাণ, আর সেই দিয়ে রাজার দেওয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, কর্মীর বস্ত্র বা তেল নির্মাণ। কামারশালার কামার, কাঠুরিয়ার কাঠ, মূর্তিকারের নির্মিত বাসন ও মূর্তি, সমস্ত কিছুর জন্য রাজা দিচ্ছেইলেন সামান্য পারিশ্রমিক, আর তাই দিয়ে প্রজার নিত্যপ্রয়োজন মিটেই যায়।

ভালোকাজের জন্য জমিদান, গোদান তো ছিলই। সেই দিয়ে পুত্রকন্যার বিবাহ, অন্নপ্রাশন, পৈতাদান, শ্রাদ্ধ কর্মের ব্যয় সহজেই উঠে যাচ্ছিল। এছাড়া যদি জলাশয়ের প্রয়োজন পরে, ঝড়ে

বাড়ি ভেঙে যায়, বিদ্যাদান, ইত্যাদির খরচ তো রাজা নিজেই ওঠাতেন, প্রজার থেকে লাভ করা রাজস্বের সাহায্যে। তাই, অহংকার এখানে কনোভাবেই অসিমিত হতে পারছিলো না।

কিন্তু বাঁধ সারলো, এই মিশ্রজাতিরা। অতিরিক্ত লোভ চেপে বসলো এঁদের। এর ওর তার সম্পত্তি হরপ করে নেবার ঝোঁক চেপে বসলো তাদের। আর সেই অহংকারের বাড়বাড়ন্ত এমন অবস্থায় পৌঁছল যে, তাঁদের কল্পনার সহবস্থান ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁদের সম্পূর্ণ স্থান বরফে ঢেকে গেল, তাঁদের কল্পনার অনিয়ন্ত্রনের কারণে। ভয়ানক অবস্থা আমার সন্তানদের। অনাহারে, পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়ে, তাঁদের মৃত্যু হতে থাকলো।

মৃত্যুতে অসুবিধা নেই, সে তো কল্পনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কিন্তু যেই বেদনার মধ্যে দিয়ে তাঁরা দিবারাত্র কাটাচ্ছিল, তা অসহনীয়। তাই তাঁদের বেদনা সহ্য করতে না পেরে, তাঁদেরকে কল্পনার মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটালাম। সেই চেতনার বলে, তারা পেল জ্বালানীর সন্ধান, কয়লার সন্ধান। জানতাম, তাঁরা লোভী, তাই এবার তাঁরা সমস্ত কয়লার উপর অধিকার জমানোর প্রয়াস করবে, কিন্তু কি করবো! সন্তানকে এমন পীড়ায় দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকবো! এক মায়ের পক্ষে কি তা সম্ভব!

যেই ভয় পেয়েছিলাম, তাই হলো। তাঁরা কয়লার সন্ধান করতে এদিক সেদিক করে, তাঁদের কল্পরাজ্য অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরলো। খুঁজতে খুঁজতে জম্বুদ্বীপেও এসে উঠলো তাঁরা। আর এখানে এসে বিপুল কয়লার সন্ধান পেল। তা পেতেই ঝাঁপিয়ে পরতে গেল, কিন্তু তা হলো না। মহম্মদের বংশোদ্ভূতরা রক্ষা করছিলেন তখন এই জম্বুদ্বীপের। কিন্তু এই মিশ্রজাতিরা যে অহংকারের ব্রাহ্মণের পরবর্তী মুখ। যেমন ব্রাহ্মণরা কিছুতেই নিজেদের জমি ছাড়তোনা, তেমন এঁরাও ছাড়লো না।

এঁরা ছলেবলে, মহম্মদের বংশোদ্ভূতদের থেকে এই জম্বুদ্বীপকে হনন করে নিলো। স্থাপন করলো নিজেদের উপনিবেশ, আর কয়লার সন্ধান করতে থাকলো। বিপুল কয়লা এই ভূমিতে,

এতই কয়লা যে, সমস্ত কিছুকে উদ্ধার করতে পারলে, সমস্ত কল্পজগত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কয়েক সহস্রবছর পরাধীন করে রাখা যাবে।

আমার চেতনা তাঁদের সাথে ছিলই, আর তারও আগে থেকে এঁদের ধূর্ততাও এঁদের সঙ্গে ছিল। এই দুই মিশিয়ে, এঁরা যন্ত্রবিদ্যার বিস্তার করতে থাকলো, অর্থাৎ কল্পনার জগতে, নূতন করে কল্পনার বিস্তার। আর সেই কল্পনাকে সমস্ত জগতে পণ্যরূপে বিক্রয় করতে থাকলো তাঁরা, এবং বিপুল ধন উপার্জন করে, সমস্ত পৃথিবীর একচ্ছত্র নৃপতি হয়ে উঠলো।

এঁরা রাজার উদারতা, আর সুব্যবস্থার মাধ্যমে ধনবণ্টনকে দেখেছিল, আর তার প্রশংসাও করেছিল, কিন্তু এঁরা অহংকারের পুরোহিত, নূতন করে অহংকারের বংশবিস্তার করাই এঁদের লক্ষ্য। তাই এঁরা দেখলো যে, রাজার কাছে এতই ধন গচ্ছিত আছে যে, তাঁরা কিছুতেই একচ্ছত্র রাজা হতে পারছেনা এই দেশে। তাই এঁরা শুরু করলো জমিদারী প্রথা, যেখানে একাধিক ব্যক্তিকে ধনভাগ দিয়ে রেখে, সমাজের পরিবর্তন করে দিলো।

যেখানে সমাজে ছিল রাজা, রাজকর্মচারী আর সাধারণ প্রজা, সেখানে এঁরা আরো একটি শ্রেণীর নির্মাণ করলো। রাজার আসনে নিজেদের স্থাপন করলো, আর রাজকর্মচারীদেরকেও নিয়োগ করলো, সাধারণ প্রজা হয়ে উঠলো নিপীড়ন সয়ে তাঁদের অহংকার আরাধনার পুষ্পাঞ্জলি দেবার মাধ্যম, আর পুরোহিত করে স্থাপন করলেন জমিদারদের, যারা হলেন উচ্চবিত্ত। ক্রমাগত এই উচ্চবিত্তদের শ্রেণীকে ধনের লোভে লোভাতুর করে তুলে, ধনের কাছে এঁদেরকে পরাধীন করে দিলো তাঁরা, যেমনটা তাঁরা নিজেরাও ছিল।

আর তাই প্রজাশোষণ এক অন্যমাত্রায় চলে গেল। আবার আমার সন্তানের বেদনা, তাই আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, চেতনাপ্রপদান করলাম আমার প্রিয় বঙ্গদেশে, বিপ্লবের চেতনা। ধ্বজা ধরলাম আমি স্বয়ং, আমার অংশঅবতার গদাইকে দিয়ে। শুরু হয়েছিল ধর্মবিপ্লব। ব্রাহ্মণরা ইতিমধ্যেই ভিতরে বসে থেকে অহংকারকে শক্তিশালী করে রেখে দিয়েছিল। তাই নিমাইএর পর এবার ব্রাহ্মসমাজ আর গদাইকে দিয়ে আঘাত করে ব্রাহ্মণদের চুরচুর করে

দেওয়া হলো। এর সাথে সাথে শুরু হলো ভাষাবিপ্লব। বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানরা বঙ্গভাষাকে এতটাই উর্বর করে তুলল, আমার চেতনা ধারণ করে যে, আজ এঁর থেকে উন্নত ভাষা, সমস্ত কল্পব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় নেই।

আর অতঃপরে শুরু হলো সংস্কৃতি বিপ্লব। সঙ্গীত, কলা, নাট্য, নৃত্য, সমস্ত কিছুতে অদ্বিতিয়ম হয়ে রইল বঙ্গদেশ। আর এইসমস্ত কিছুর সাথে সাথে বিস্তার লাভ করলো কল্পজগতের বিপ্লব এই বঙ্গভূমিতে। আমার সন্তানদের দেওয়া বেদনার প্রতিউত্তর পেতে থাকলো আমার অন্য সন্তানরা, অর্থাৎ মিশ্রজাতিরা। ক্রমশ বঙ্গদেশের এই চেতনার হিল্লোল ছড়িয়ে যাচ্ছিল সমস্ত জম্বুদ্বীপে, যার তখন নাম হয়েছিল ভারত। যদিও আমার চেতনা আশীর্বাদপ্রাপ্ত বঙ্গভূমি ও সেখানের অধিবাসীদের চেতনা উদ্দীপনের সাথে সমস্ত ভারত তালমেলাতে পারলো না, উপরন্তু দক্ষিণ ভারতে এঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে চেতনা ধারণ করার প্রবণতা সত্যই প্রশংসনীয়।

যদিও, বঙ্গদেশের এবং দক্ষিণ ভারতের এই উত্থানকে বাকি ভারতীয়রা তির্যকদৃষ্টিতেই দেখতে থাকলো, আর নিজেদের অধিকার, যা ছিলইনা তাদের কাছে, তা হারিয়ে ফেলার ভয় পেতে থাকলো। সেই ভয় এখনো পায় এঁরা, আর তাই যতপ্রকারে সম্ভব বঙ্গ ও দক্ষিণ ভারতকে প্রবঞ্চনা করতেই থাকে এঁরা। কিন্তু এটিই সত্য যে, আমার চেতনাকে ধারণ করা এই জগতে তিনটিই প্রজাতি আছে, এই মিশ্রজাতিদের পীঠস্থান অর্থাৎ যাকে তোমরা বলো ব্রিটেন, এই বঙ্গভূমি, এবং এঁদের দুইজনেরই থেকে প্রভাবিত হয়ে স্বপ্রচেষ্টায় স্থিত দক্ষিণ ভারত। তাই এঁদের মেধার তুলনাও সম্ভব নয়।

না কলায়, না বিদ্যায়, না কৌশলে, না বুদ্ধিতে, না আধ্যাত্মিক চেতনাতে, আর না সত্যজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে - এঁদের ধারেকাছেও কেউ থাকেনা সমস্ত মানবজাতির মধ্যে। কিন্তু আমার চেতনা মানেই, তার সাথে আমার মমতা, স্নেহ ও প্রেমও মিশ্রিত থাকবে, আর তাই এই তিনছেত্রই অহংকারে আসুরিক হয়ে উঠতে সম্পূর্ণ ভাবে পারেনা, যতই সমস্ত কল্পজগত অহংকারের আধিনে স্থিত থাকুকনা কেন।

এই দুই প্রজাতির প্রেরণা থেকে কলা বা বিদ্যায় তো এঁদের সমতুল্য হতে পারলো না, কিন্তু আমার চেতনা থাকা মহম্মদের বংশোদ্ভূতরা, আর পশ্চিম ভারতে আমার শিখসন্তানরা বিপ্লবে অগ্রণীভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। সেই বিপ্লবের জ্বালায় অস্থির হয়ে ওঠে মিশ্রজাতিরা, আর পিছু হটতে শুরু করে তাঁরা। কিন্তু এঁরই মধ্যে, আরো বেশ কিছু কাণ্ড ঘটে গেল, যা অহংকারকে পুনরায় সিংহাসন প্রদান করে, আমার সন্তানকে আমার থেকে ছিনিয়েই নিলো।

এঁদের মধ্যে প্রথম হলো, রুশদেশে এই মিশ্রজাতিরই এক অংশের দাবি। দ্বিতীয় হলো এই মিশ্রজাতির মার্কিনরূপে বিস্তার এবং অহংকারের দ্বিতীয় জ্বালানীর সন্ধান। রুশ দেশের মিশ্ররা দাবি তুলে বসলো যে, ধনবণ্টন করতে হবে, সকলের কাছে ধন দিতে হবে। যেই বাণিজ্য কিছু মানুষের হাতে গচ্ছিত, যেই যান্ত্রিক কল্পনার জগত কিছু মানুষের কাছে সীমিত, সেই কল্পনার ভাগীদার সকলকে করতে হবে। সকলকে বিলাসিতা করার সুযোগ দিতে হবে, সকলকে বিলাসিতার বস্তু ক্রয় করার সুযোগ দিতে হবে, তবেই বাণিজ্যের বৃদ্ধি হবে।

ধনসর্বস্ব এঁরা বরাবরই ছিল। তাঁদের মধ্যে যাদেরকে আমি চেতনা প্রদান করেছিলাম, তাঁরা কয়লার সন্ধানে নির্গত হয়েছিল। আর বাকিরা বরাবরই ধনলোভী ছিল। তাই তাঁদের অহংকার এবার সম্মুখে এসে বলে উঠলো যে, যদি সীমিত রাজা-জমিদারদের কাছে অর্থ গচ্ছিত থাকে, ক্রেতা যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে! বানিজ্যের বিস্তার হবে কি করে? বাণিজ্যের নেশায় সকলকে নিমজ্জিত করা যাবে কি করে! ধনের দ্বারা সকলকে পরাধীন করে রাখা যাবে কি করে! ...

তাই রুশের সেই ধারণা সমস্ত কল্পজগতে প্রসারিত হতে শুরু করলো, আর প্রজা হয়ে উঠলো রাজা, গণতন্ত্রের বিস্তার হলো, আর রাজতন্ত্রের পতন হলো। কেবল মাত্র মহম্মদের ক্ষেত্রতেই রাজতন্ত্র রইল, অন্যত্র তা উঠে গেল, সকলের কাছে ধনই ধন। যত ইচ্ছা ধন উপার্জন করতে পারে সকলে, আর ধন দ্বারা সমস্ত কিছুই সম্ভবপর হয়ে উঠলো। তাই নিজের অন্ন আর কেউ নিজে উৎপাদন করতে জানলো না, সকলেই পরাধীন হয়ে গেল, সর্বগ্রাসী ধনের মাধ্যমে অহংকার সমস্ত মানবজাতিকে নিজের দাসে পরিণত করে দিল।

হয়তো ব্রিটেন এটাকে কিছুটা হলেও সীমিত রাখতো, কারণ তাঁরা আঁচ পেয়েছিল এর প্রভাবে কি নেশা জগতে বিস্তার পেতে চলেছে। কিন্তু সেখানে বাঁধ সারলো, অহংকারের দ্বিতীয় জ্বালানীর সন্ধান সমুদ্রতলের তৈলরূপে। সেই তৈলের সন্ধান পেতেই, ব্রিটেনের সন্তানদের ক্ষমতাচ্যুত করার সম্ভাবনা জেগে উঠলো।

কয়লাই একমাত্র জ্বালানী, আর তাকে আমার ব্রিটিশ সন্তানরা কুক্ষিগত করে রেখে হয়েছিল কল্পজগতের একচ্ছত্র রাজা। অহংকারের এই দ্বিতীয় জ্বালানীর সন্ধান পাওয়াতে, যে এই জ্বালানী সম্পদকে কুক্ষিগত করতে পারবে, সেই হবে পরিবর্তী কল্পজগতের নৃপতি। আর সেই ক্ষেত্রে, নীরবে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা তথা নিকৃষ্ট মানসিকতার মাধ্যমে মার্কিনরা তা কুক্ষিগত করে নিলো, সমস্ত কল্পজগতে আমার হাজারো সন্তানকে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে হত্যা করে।

আর এই মার্কিনরা ছিল রুশের দাবি যে ধনের নেশা সকলকে করতে দেওয়া হোক তবেই অধিক ধনের আর ধনবানের রচনা সম্ভব হবে কারণ ক্রেতার সংখ্যায় বৃদ্ধি হবে, তারও পৃষ্ঠপোষক। তাই ব্রিটেন হারালো ক্ষমতা, আর গণতন্ত্রের ধ্বজা ধরে, মার্কিনরা আমার সমস্ত সন্তানদের ধনের দাস করে দিলো। ভারতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না জানতাম, কিন্তু জম্বুদ্বীপ মানে বঙ্গদেশকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস করেছিলাম, কিন্তু সেখানেও মার্কিনীদের অহংকার মাথা গলালো। তাঁদের কুচক্রী বুদ্ধির মাধ্যমে, আমার সাধের বঙ্গদেশকে তাঁরা দুই খণ্ডে ভেঙে দিল, আর তাকে লুটেপুটে খাবার জন্য, একটি ভাগকে দিয়ে দিলো পাকদেশের হাতে, আর অন্য ভাগকে লুণ্ঠন করার জন্য দিয়ে দিল অহংকারের নববধূ ভারতের হাতে।

পরে পাকের লুণ্ঠন থেকে কনো ক্রমে বাঁচিয়েছিলাম আমি একটি ভাগ বঙ্গকে, কিন্তু অন্য ভাগটির লুণ্ঠন এখনো অব্যাহত। ... না ব্রাহ্মণরা আর বঙ্গদেশকে লুণ্ঠন করতে পারেনি ঠিকই। কিন্তু এই মার্কিনদেরকে নিমাইএর বংশোদ্ভূত আর গদাইএর বংশোদ্ভূতরা নিমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে এলো। আর এর ফলে, যেই ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ অহংকারের থেকে নিমাই আর গদাই এঁদের রক্ষা করেছিল, তাঁদেরকে পুনরায় সেই অহংকারীদের হাতেই অর্পণ করে দিলো, আর এই মার্কিনীরা আর মীরজাফর ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূতরা একত্রে মিলে, নিমাই, গদাই, প্রণবের খোলস পরে আধ্যাত্মের

নিত্যহত্যা করছে, যাতে আমার সন্তানরা আমার কাছে আর কনোদিনও ফিরতে না পারে। তাই তাঁদের হাত ধরে যে আবার আমার সাধের বঙ্গভূমি, যাতে আমি মার্কণ্ড থেকে শুরু করে নিমাই, গদাই হয়ে জন্ম নিয়েছি, আর এখনও এখানেই পূর্ণরূপে অবতরণ করে রয়েছি, তাকে যে উদ্ধার করবো, তা অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে।

আর কেবল বঙ্গভূমিই কেন, এই মার্কিনীরা বিভিন্ন স্থানে, কেবলই ধনের মোহজাল বিস্তার করে, পুনরায় আর্যদের, মিশরীয়দের আর রোমানদের উত্থান ঘটাচ্ছে। বিশ্বাস হচ্ছে না! বেশ এঁদের নতুন নামগুলো বলি, তাহলেই বুঝে যাবে। আর্যরা ব্রাহ্মণ নামেই বঙ্গব্যতীত সমস্ত ভারতে রয়েছে, আর যেহেতু বঙ্গে ব্রাহ্মনত্বের মৃত্যু হয়েছে, তাই এখানে তারাই হলো আশ্রমের অধিপতিগণ, কাজ তাদের একই, অন্ধত্বের বিস্তার আর অহংকারের শাসনের ব্যপ্তি, কেবল নাম পালটে নিমাই, গদাই আর প্রণবের খোলস চাপিয়ে নিয়েছে।

মিশরীয়রা নিজেদের খোলস ছেড়ে ফেলেছে, সেটা জানো তোমরা, কিন্তু এঁরা যে আব্রামের নির্মাণ করা ইহুদির খোলস ধারণ করে, সমস্ত কল্পজগতে যন্ত্রের পর যন্ত্র নির্মাণ করে, রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, কল্পনার নবআস্তরণ নির্মাণ করে, মানুষজাতিকে প্রতিদিন অধিক অধিক করে পরাধীন করে দিচ্ছে, তা কি জানো? জানবে কি করে? যেমন বরফের একাংশই জলের বাইরে থাকে, আর বাকি অংশরা নিচে নিমজ্জিত থাকে, তেমনই যে এঁদের একাংশই বাইরে রয়েছে, যারা হলো আজকের দিনের বাণিজ্যিক শ্রেষ্ঠ।

আর রোমানরাও নিজেদের খোলস ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ঠিক যেমন ভাবে বঙ্গের আর্যরা ব্রাহ্মণত্বের পোশাক ছেড়ে গদাই, নিমাই আর প্রণবের পোশাক ধারণ করেছে, এঁরাও তেমনই যীশুর পোশাক ধারণ করে সেই একই কাজ করছে। অর্থাৎ, যেই অহংকারের এতো কষ্ট করে নিধন করে, আমার সন্তানদের আমাকে কাছে ফিরিয়ে এনেছিলাম, সেই অহংকারের ছাদন পুনরায় আমার সন্তানরা নিজেদের গায়ে টেনে নিয়েছে, আর পুনরায় আমার থেকে দূরে চলে গেছে, পূর্বের থেকেও অধিক দূরে।

অর্থাৎ সমস্ত কিছুর শেষে আমি সেই নিরুপায় জননী হয়েই থেকে গেলাম। আমার সন্তানরা বাণিজ্যের নাম করে সকলেই ধনের কাছে পরাধীন, কারণ এঁরা কেউ নিজের অন্ন নিজে উৎপাদন করতে পারেনা। আমার সমস্ত সন্তানরা আজ অহংকারের আরাধনাকেই আধ্যাত্ম বলে নামাঙ্কিত করেছে। যেখানে গদাই বারংবার বলে গেছিল, প্রচার নয়, আগুন জ্বললে বাদুলে পোকা এমনিই আসবে, সেখানে সেই প্রচার করে করে, যাদের অহংকার তাঁদের থেকে খসে যাবার অবস্থার ত্রিসীমানায় নেই, তাদেরকে যুক্ত করে করে, আধ্যাত্মকেই প্রদুসিত করে দিয়েছে।

যেখানে নিমাই বারংবার বলেছিল প্রেমকে বোঝো, আর ধারণ করো, সেখানে কেবল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে করে, আধ্যাত্মকেও বাণিজ্য আর ধনসর্বস্ব করে তুলেছে। ... সমস্ত কিছুই ধনের কাছে বিকিয়ে, মানুষও আজ তাই অন্য জীবদের মতই আহার, নিদ্রা মৈথুন সর্বস্ব হয়ে উঠেছে, সমস্ত কিছু মানছি। মেনে নিচ্ছি সমস্ত মানুষ জাতি বাহ্যমুখী হয়ে, কল্পনার জগতকে বিস্তারিত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আধ্যাত্মকেও এবার সেই বাণিজ্যের মধ্যে ধারণ করে নিয়েছে এঁরা। ... আমার সন্তানদের কি তাহলে আমি কিছুতেই আর আমার হৃদয়ে ফিরে পাবো না! ... যেই মাতৃত্বসুখ আমাকে বৌদ্ধরা দিয়েছিল, সেই মাতৃত্বসুখ কি আমার জন্য ইতিহাস হয়ে গেল! ...

এবার তোমরাই বলো, এই মায়ের কি আর সহ্যের সীমা থাকতে পারে! ... সম্ভব কি মায়ের পক্ষে, আর সহ্যের সীমা ধরে রাখা! ... তাই মানুষের অহংকারকে দমন করার জন্য এবার পূর্ণঅবতার নিলাম, আর সম্যক সত্যকে প্রকাশ করলাম, তথা সত্যে স্থিত হবার সহজতম মার্গ প্রকাশ করলাম। সম্যক সত্যকে জেনে, অহংকারের দমন হবে, আর সেই অহংকারকে বৈরাগ্য অর্থাৎ আসক্তি বিরক্তির উর্ধ্বে উঠে, সম্মুখে আমি যা প্রকাশ করবো, সকলের মুখ দিয়ে যা বলবো, তাকেই আমার মার্গদর্শন মনে করে পথ চলো, এই বার্তা দিলাম।

যদি তা চলতে পারো, আমি আমার সন্তানকে আর তোমারা তোমাদের মাতাকে অবশ্যই লাভ করবে। আর যদি অহংকার ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তার প্রভাবেই পরে থাকতে চাও, তবে এই মায়ের

সহ্যসীমা তাঁর অন্তিম চরণে উন্নীত। এই মানুষযোনিকে আর অস্তিত্বে রাখবো না আমি। ... কিন্তু যেই বেদনা তোমরা পাবে তার ফলে তাতে পীড়া আমারই হবে, তোমরা তো কেবলই পীড়ার ভান করে সেই ভানেই পীড়িত।

তাই অন্তিম বারের মত আহ্বান জানালাম, "হে আমার বুদ্ধরা, জাগো। ... এই জননীর হৃদয়ে, এক তোমরাই শেষ আশা। ... এক তোমরাই এই মায়ের বুক আলো করেছিলে। আজ পুনরায় এই মায়ের বুককে আলোড়িত করে দাও, কারণ এক তোমরাই পারবে, কারণ এক তোমাদেরই আমি ভরসা করি। ... জাগো বুদ্ধরা। যুদ্ধের সময় এসেছে। জাগো, অধীনে করো তোমাদের সমস্ত সহোদর, সহোদরাদের, আর পুনরায় তাঁদের আমার বক্ষে এনে দাও। ... হে বুদ্ধরা, এটা তোমাদের মাতার আদেশ, আর সঙ্গে অশ্রুপূর্ণ বিনম্র অনুরোধ।

জাগো তোমরা, আর তোমার বঙ্গের ভ্রাতাভগিনীদের, ব্রিটেনের ভ্রাতাভগিনীদের, মহম্মদের বংশোদ্ভূত ভ্রাতাভগিনীদের আর দক্ষিণ ভারতীয় ভ্রাতাভগিনীদেরকে পুনরায় জাগ্রত করো। সত্যের পথে প্রেরণ করো। এক তোমরাই পারো এই কর্ম করতে, তাই তোমাদের মাতার তোমাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ। জাগো তোমরা, জাগো"।

ইতি

তোমাদের মাতা

(যাকে ভালোবেসে তোমরা বলো জগদম্বা)

প্রয়োজন বিজ্ঞান

দিব্যশ্রী সমস্ত কিছু শুনে বললেন, “নিয়তি যে অসহায় মাতা! ... পিতা, তাঁর এই বেদনার নিরাময় আবশ্যক। কেবল তাঁর সন্তান আমরা, আর আমাদের মাতার প্রতি আমাদের প্রেমকে ব্যক্ত করার জন্যই নয়, মানবযোনির রক্ষণের উদ্দেশ্যেও তা আবশ্যক। ... কিন্তু পিতা, আমার প্রশ্ন তো এখনো প্রশ্নই রয়ে গেল। আত্ম তো সেই অবস্থায় উন্নতই হয়নি যে, সে অখণ্ড হয়ে উঠে নিয়তির কাছে সমর্পণ করবে। আর সেই কারণেই তো নিয়তি কেবলই বৌদ্ধদের কাছে এই আবেদন করেছেন, কারণ একমাত্র তাঁদেরই আত্ম অখণ্ড অবস্থায় স্থিত হবার স্তরে উন্নীত।

কলা ও বুদ্ধিমত্তার চেতনা তিনি বঙ্গবাসী, মহম্মদের বংশোদ্ভূত এবং ব্রিটিশদেরও দিয়েছেন। তাই বৌদ্ধদের তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলার আবাহন করেছেন মাতা, কারণ মাতার চেতনা তাঁদের অন্তরে থাকার কারণে, তাঁদেরই সামর্থ্য আছে নিজেদের আত্মকে এই অন্তিম অবস্থায় উন্নীত করার। ... কিন্তু আমার যেই প্রশ্ন, তার উত্তর কি পিতা? আত্ম এই অবস্থায় উন্নীত হয় কি ভাবে? কি সেই পরস্পর ধাপ, যা অতিক্রম করে আত্ম এই অবস্থায় উন্নীত হয়?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “প্রয়োজন পুত্রী। প্রয়োজনকে সম্মুখে রেখেই আত্ম অগ্রসর হয়, আর সেই পথই একসময়ে তাঁদেরকে অখণ্ড হয়ে ওঠার প্রেরণা প্রদান করে”।

দিব্যশ্রী বললেন, ‘বিস্তারে বলুন পিতা। আমি এই কথা জানতে চাই। আর আমার মনে হচ্ছে যেন, এই সত্য না জানলে, আমি আমার কর্মভার ঠিক ভাবে গ্রহণই করতে পারবো না। তাই কৃপা করে, আমাকে এই প্রয়োজনের বিজ্ঞান ব্যক্ত করুন”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, এ এক অদ্ভুত ক্রীড়া। প্রথমেই বলি তোমাকে, অহংকার ও আত্মের মধ্যে ভেদ করতে যাবেনা, কারণ এঁদের দুইজনের কনো ভেদই নেই। অহংকার মানেই হলো আত্ম বোধ, অর্থাৎ আমি’র অস্তিত্বকে স্বীকার করা। কি ভাবে যেই ব্রহ্মের অণুই সম্ভব নয়,

সেই ব্রহ্মের অণু জ্ঞান করে, আত্ম নিজেকে নিজে রচনা করে স্বয়ম্ভু হয়, তা তুমি কৃতান্ত থেকে স্পষ্ট ভাবেই জেনেছ।

আর যা সেখান থেকে জেনেছ, সেই অনুসারেই, নির্বিশেষকে ত্যাগ না দিয়েও, কল্পনাবশত তাকে ত্যাগ দিয়ে, আত্ম নিজেকে আত্মজ্ঞানে, অর্থাৎ আমিত্বের জ্ঞানে ভূষিত করে আত্ম হয়ে ওঠে, তাও জেনেছ। আর অহং অর্থাৎ আমিত্ব, আর এই দুইকে মেলালেই বুঝে যাবে, যাহা অহং তাহাই আত্ম। তাই এই দুইয়ের ভেদ করার প্রয়াসও করবে না। তবে হ্যাঁ, আত্মের স্বভাবে প্রায়শই পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তন বাস্তবে হয়না, কেবলই আত্মের কল্পনার মধ্যেই হয়।

প্রথম অবস্থায় আত্ম কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তার প্রভাবে থেকে অহংকে ধারণ করে থাকে। এবং সেই অহংকে ধারণ করে থেকে, কল্পনার মধ্যেই কর্মের ইচ্ছা ও চিন্তা করতে থাকে। বাস্তবে যেহেতু কনো কর্মই হয়না, তাই সেই কর্মের ফল কখনোই আত্মের আকাঙ্ক্ষিত হয়না, আর তাই সে বারংবার কর্মের কল্পনা করতে থাকে। তবে কি জানো তো, এ এক অদ্ভুত মায়া, যা মায়া না হয়েও মায়া।

যেমন জগদম্বার চিঠিতে দেখলে যে বৌদ্ধরা স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, নিয়তি হলেন চেতনা, আর চেতনা কল্পনার মধ্যে যুক্ত হয়ে গেলে, আর তাকে কল্পনা মনে হয়না। যেহেতু চেতনা হলেন নিয়তি, এবং নিয়তি হলেন ব্রহ্ম অর্থাৎ যথার্থ, তাই তাঁর নিযুক্ত হবার সাথে সাথেই কল্পনাকেও বাস্তব বলে মনে হয়, আর এটিই হলো মায়া, যেখানে কেউ মায়া করার প্রয়াস না করলেও, মায়া হয়েই চলে।

আর সেই মায়ার বশেই, আত্ম কল্পনাকে বাস্তব মানতে থাকে, আর বাস্তব মানার কারণে মনে করতে থাকে যে তাঁর করা কর্মের উচিত ফললাভ সে করবেই, কিন্তু সর্বকিছুর অন্তে মায়া তো মায়াই হয়, তাই সেই মায়ার ফলরূপে আত্মের আকাঙ্ক্ষার সমাপন কিছুতেই হয়না, আর তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি হতেই থাকে সমানে। এই রহস্য, অর্থাৎ মায়ার রহস্য যখন আত্ম ভেদ

করতে পারে, তখন আর সে ইচ্ছা, চিন্তা বা কল্পনাকে নয়, চেতনার মাধ্যমে নিয়তিকেই একমাত্র গুরুত্ব দেয়, আর তাকে গুরুত্ব দেবার সাথে সাথেই সে আর ত্রিগুণে বিভক্ত না থেকে অখণ্ড হয়ে যায়।

তবে সেই সমস্ত কিছু অনেক পরে কথা জীবকটির ক্ষেত্রে। সেই সময় আসন্ন হবার পূর্বে, আত্ম বারংবার এই মায়াতে ভ্রমিত হতে থাকে, আর ততক্ষণ সে ভ্রমিত হতে থাকে, যতক্ষণ না সে এই মায়ার ভেদ জানতে পারে, আর নিয়তির কাছে সমর্পণ করে। তবে সেই ভ্রমের মধ্যেও একটি যথার্থ আছে, আর বহু বহু ভ্রম বিরাজ করছে। অর্থাৎ মায়ার মধ্যেও আরো অনেক মায়া বিরাজ করে। আর সেই মায়ার মধ্যে যা মায়া নয়, তা হলো প্রয়োজন।

অর্থাৎ পুত্রী, প্রয়োজনও একটি মায়া, কিন্তু মায়ার মধ্যে এই প্রয়োজনই একমাত্র যথার্থ, বাকি সমস্ত কিছু হলো মিথ্যা। এবার তুমি বলবে, বাকি সমস্ত কিছু কি আর প্রয়োজনই বা কি, তাই তো? তুমি বলবে কেন প্রয়োজন মায়ার মধ্যে বিরাজ করেই যথার্থ, আর বাকি সমস্ত মিথ্যা, তাই তো?

এই কথার সহজ উত্তর হলো চেতনা। পুত্রী নিয়তি অর্থাৎ প্রকৃতি, যা কেবলই আত্মের দৃষ্টিতেই বা অহংকারের দৃষ্টিতেই প্রকৃতি, আর আসলে শূন্যকায় ব্রহ্ম, তার আত্মদের প্রতি সন্তানপ্রেম থাকার কারণে, তিনি প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি আত্মকে নিজের বক্ষে ফিরে পেতে চান, যেমন তুমি তাঁর চিঠি থেকে জানলে। আর তাই তিনি প্রতিটি আত্মকে নিজের কাছে ফিরে পাবার জন্য, আত্মকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চান, অহং-এর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চান, আর চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চান। আর সেই চাহিদাকেই আত্ম নিজের মধ্যে চেতনা রূপে অনুভব করে।

পুত্রী, আত্ম নিজের অহংকে বিস্তার করারই ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা ধারণ করে, আর তাই অবিরাম ভাবে কিছু না কিছুর কল্পনা করে চলে, কিছু না কিছুর চিন্তা করে চলে, আর কিছু না কিছুর ইচ্ছা করতেই থাকে। কিন্তু সেই সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা আত্মকে মিথ্যার দিকে অগ্রসর করে, যা

স্বভাবিক ভাবে পুড়ন হয়না, আর জোর করে তা পুড়ন করতে গেলে, ছলনা, শঠতা ইত্যাদির ব্যবহার করে করে আত্ম শয়তানে পরিণত হয়ে যায়, আর যদি এই শয়তান ভাব দ্বারা সেই সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে মায়ার মধ্যে স্থাপিত করতে সক্ষম হয় সে, তখন সে ভয়নাক অহংকারী হয়ে উঠে, এক বিকট অসুর বা রাক্ষসে পরিণীত হয়ে যায়।

কিন্তু এই মায়ার মধ্যে স্থিত থেকেও, যেই পথে আত্ম অনায়সে অগ্রসর হতে পারে, তা হলো তাঁর প্রয়োজনের পথ। এই পথ সেই পথ, এই ইচ্ছা সেই ইচ্ছা, এই কল্পনা সেই কল্পনা, এই চিন্তা সেই চিন্তা, যাতে স্বয়ং নিয়তি যুক্ত হন, অর্থাৎ যাতে চেতনা মিশ্রিত হয়। আর যেহেতু চেতনা মিশ্রিত হয়, তাই তা মায়া হয়েও যথার্থ হয়ে ওঠে, আর তাই সহজ ভাবেই সেই পথে অহং বা আত্ম অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। এই হলো তোমার প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ প্রয়োজনের বিশেষত্ব"।

দিব্যশ্রী বললেন, "এর অর্থ এই দাঁড়ালো পিতা যে, আত্ম হাজারো চিন্তা, ইচ্ছা বা কল্পনা করে। এঁদেরই একটির সাথে চেতনা যুক্ত হন, আর তা হয়ে ওঠে প্রয়োজন। বাকি ইচ্ছা, চিন্তা বা কল্পনার পথেও আত্ম চলতে পারে, তবে সেই পথে চলতে আত্মকে অত্যন্ত জোর খাটাতে হয়। যেমন আপনি বলেছিলেন কৃতান্ত যে, অন্যের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে সেই কর্মকে সিদ্ধ করতে হয়, তবেই তা ভৌতিক জগতে কর্মরূপে গণ্য করা হয়, বা সাফল্য রূপে পরিগণিত করা হয়, ঠিক তেমনই ভাবে।

আর যেই ইচ্ছা, চিন্তা বা কল্পনার সাথে নিয়তি যুক্ত হয়ে যান, সেটি হয়ে ওঠে প্রয়োজন, আর যেহেতু তা যথার্থ হয়ে ওঠে, তাই এক্ষেত্রে কনো শঠতা, কনো পরিকল্পনা, যোজনা, বা চিন্তা, বা ছলনা, কিচ্ছুই করতে হয়না। স্বাভাবিক রূপেই তা পুড়ন হতেই থাকে। ... আর তাই আপনি বললেন, যেই কর্ম প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাই যথার্থ। আর যেই কর্ম প্রয়োজনের বিরুদ্ধে করা হয়, তাই মিথ্যা, যা সার্থক হলে অহংকারের বিস্তার হয় বা রাক্ষস হয়ে ওঠে ব্যক্তি।

অর্থাৎ যেমন ধরি একটি রাজনৈতিক নেতা। তিনি যদি প্রয়োজনের তাগিদে নেতা হন, তবে অনায়সেই নির্বাচিত হন, কারণ তাঁর সমস্ত কল্পনা স্বতঃই সকলের কল্পনার সাথে মিলে যায়। আর যদি একটি অন্য ব্যক্তি কেবলই ইচ্ছাবশত নেতা হতে চান, তাঁর স্বাভাবিক কল্পনা অন্য সকলের সাথে মেলে না, আর তাই সে নির্বাচিত হয়না। এবার যদি সে সেই ক্ষেত্রে জোর খাটায়, তবে সেই ব্যক্তি শঠতা ও ছলনা করে অন্যের কল্পনার সাথে নিজের কল্পনা মিলে গেছে, এমন দেখান, আর তাই দেখিয়ে নির্বাচিত হন। আর নিজের ছলনার জোরে নির্বাচিত হয়েছেন, তাই তাঁর অহংকার তাঁকে একটি সম্পূর্ণ রাক্ষসে পরিণত করে দেয়।... এই তো পিতা?"

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখ দ্বারা কন্যার কথার সমর্থন করলে, দিব্যশ্রী আবার প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন আছে আমার। আচ্ছা, এই যে ব্যক্তি, যিনি প্রয়োজনের নিরিখে রাজনীতি করেন, আর তাই তাঁর স্বাভাবিক কল্পনাই নির্বাচকদের কল্পনার সাথে মিলে যায়, তাঁর কি অহংকারের বৃদ্ধি হচ্ছে না! ... তাঁরও তো অহংকারের বৃদ্ধি হচ্ছে? সেই ক্ষেত্রে, সে যথার্থতার দিকে কি ভাবে অগ্রসর হলো?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক বলেছ পুত্রী। অহংকার সেই ব্যক্তির তখনও চরমে যায়, যখন সে নিজের এই প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়। আর সেই অহংকারের প্রভাবে আরো কিছু প্রয়োজন তাঁর মধ্যে আস্তেই থাকে। তুমি যেমন রাজনেতার কথা বললে, তাঁকেই উপমা ধরলে, প্রথমে তাঁর প্রয়োজন ছিল রাজনেতা হওয়া, কিন্তু একবার তা হয়ে গেলেই, সে আবারও একটি প্রয়োজনের অনুভব করে, আর আবারও অনেক ইচ্ছা, কল্পনা চিন্তা এসে ধরে তাকে, যা তাঁর প্রয়োজনের থেকে ভিন্ন। যেই পথেই সে যাত্রা করুক, তাঁর অহংকার বৃদ্ধি পেতেই থাকে, আর সে নিজেকে বিশেষ মানতেই থাকে।

পুত্রী, এই বিশেষত্বের কামনাতেই তো সে ব্রহ্মত্ব ত্যাগ করে আত্ম হয়ে উঠেছিল, তাই এই বিশেষত্ব গ্রহণ যে তাঁর চয়নের পরিণাম, আর সে তা গ্রহণ করতেই থাকে। আর এই অহংকার একসময়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে, সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়ে যায়, যেখানে সে নিজেকে ভগবান চাইতে শুরু করে দেয়। ভগবানকে পাবার প্রয়াস শুরু করতেই, শুরু হয় তাঁর সংগ্রাম।

আর এবারে তাঁর সংগ্রাম হয় যথার্থের সাথে, যেখানে তাঁর অহংকার বিশ্রী ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, তাঁর অহংকারকে সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়, ও তাঁকে ত্রিগুণকে একত্রিত করে অখণ্ড হতে বাধ্য করা হয়।

কিন্তু পুত্রী, এক জীবকটিকে এই অবস্থায় উন্নীত হতে সহস্র লক্ষ দেহধারণ করতে হয়। আর যদি এঁর মাঝে সে নিজের প্রয়োজনকে ত্যাগ করে, অন্য ইচ্ছাকে ছল, চাতুরী ও শঠতা দ্বারা পূর্ণ করার প্রয়াস করে, তবে তো আসুরিকতা তাঁর এই সহস্র লক্ষ জন্মকে সহস্র কোটি জন্মে পরিণত করে দেয়, আর তারই সাথে যখন ভয় বা শঙ্কা যুক্ত হয়ে যায়, আর প্রয়োজনকে বিকৃতপথে লাভ করার চিন্তা করে সে, তখন সেই পথ লক্ষ কোটি জন্ম পর্যন্ত ব্যপ্ত হয়, আবার মাঝে পিশাচও হয়ে যেতে পারে হতাশায়, সেই ক্ষেত্রে কবে যে সে ত্রিগুণকে একত্রিত করতে পারবে, তার কনো হিসাবই থাকেনা।

তাই প্রতিটি ব্যক্তিকে এই প্রয়োজনের পথে চালিত করার প্রেরণা দেওয়াই হলো ধর্মগুরুদের কর্তব্য, কারণ তখনই তাঁরা সর্বাধিক কম সময়ের মধ্যে জগন্মাতার ক্রোড়ের নিকটে পৌছাতে সক্ষম, ও নিজের লক্ষ্যপ্রাপ্তি করে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম"।

দিব্যশ্রী বললেন, "যিনি প্রয়োজনের পথে চললেন না, আর নিজের ইচ্ছাগুলিকে কার্যকর করার প্রয়াস করলেন, তিনি আসুরিক হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁর অহমিকা অতিকায় হয়ে উঠলো। আর যিনি সেই প্রয়োজনের পথে চললেন, তিনিও অহংকারী হয়ে উঠলেন। কিন্তু এই দুই অহংকারের মধ্যে ভেদটা সঠিক ভাবে বুঝতে এখনো পারিনি। হয়তো সঠিক বিষয়টা আমি এখনো ধরতে পারিনি। তাই সঠিক স্থানটি একটু ধরিয়ে দেবেন!"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, দেব ও অসুর, উভয়েই অহংকারের পূজারি। যিনি অসুর তিনি নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর মানতে শুরু করেন, কারণ ছল চাতুরী করে ইনি নিজের ইচ্ছাকে নিজেই সফল হবার কল্পনা করেন। আর যিনি প্রয়োজনের পথে চলেন, তিনিও নিজের ইচ্ছাকে পুড়ন হতে দেখেন, কিন্তু তিনি এও দেখেন যে তিনি স্বয়ং প্রচেষ্টা করে তা পূর্ণ করছেন না, বরং

কনো এক অজানা শক্তি সমানে তাঁকে দিয়ে সমস্ত কিছু পূর্ণ করিয়ে দিচ্ছেন। তাই সেই অদৃষ্টকে তিনি ভগবান বলেন, এবং সেই ভগবানের সম্মুখীন হতে ইচ্ছা করেন শেষে। আর নিয়তি ঠিক এটিই তো চান, যেখানে আত্ম তাঁর সাখ্যাত চাইবেন।

আর সেই সাক্ষাত লাভের কামনার কালেই আত্ম সাধক হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ পুত্রী, পরিণতি তিনটি। একটি তিনি যিনি প্রয়োজনের মার্গে না চলে, নিজের অহংএর পথে চলতে চায়, আর সেই ক্ষেত্রে যা কিছু সে কল্পনা করে, তা সেই কল্পনার সাথে সংযুক্ত অন্যদের সাথে না মেলার কারণে সে হতাশ হতে হতে পিশাচে পরিণীত হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি তিনি, যিনি অন্যের কল্পনার সাথে নিজের কল্পনাকে মেলানোর জন্য শঠতা করেন, আর ক্রমে অসুর হয়ে ওঠেন। আর তৃতীয় তিনি, যিনি প্রয়োজনের পথে চলতে চলতে, অদৃষ্টের উপস্থিতিকে অনুভব করেন এবং তাঁর সাখ্যাত কামনা করে দেব হয়ে উঠে, সাধনায় লিপ্ত হন"।

দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু পিতা, প্রয়োজনের পথে চললেও তো অহংকার নিজের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ হতেই দেখবে। তারপরেও সেই পথে চলতে চায়না কেন সে?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "চায়না, তেমন নয়। ততক্ষণ সেই পথে চলতে চায়, যতক্ষণ তাঁকে সেই পথে অগ্রসর হওয়া থেকে সকলে বাঁধা প্রদান করে, এবং তাঁর এই যাত্রাকে অবান্তর ও দুঃসাহসিক বলে চিহ্নিত করে। কিন্তু যেই মুহূর্তে, সেই পথেই চলার প্রেরণা দেওয়া হয় তাঁকে, সেই মুহূর্ত হতে সেই পথে চলার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে অনীহা ক্রিয়া করে। আর এঁর কারণ হলো অহংকারের স্বভাব।

পুত্রী, অহংকার নিজেকে বিশেষ জ্ঞান করতে চায়; সে নিজেকে সকলের থেকে ভিন্ন প্রমাণ করতে ব্যস্ত; সকলের থেকে শ্রেয়, সকলের থেকে উচ্চ, সকলের থেকে উন্নত প্রমাণ করতে চায়। আর যখন কেউ তাঁকে কনো পথে যাত্রা করার সম্পূর্ণ তত্ত্ব তাঁর সামনে রেখে দেয়, তখন তাঁর ধারণা হয় যে, সে তো বিশেষ নয়, কারণ তাঁর থেকেও বিশেষ কেউ আছে। তাই সে সেই পথ থেকে সরে আস্তে চায় তখন"।

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, “অর্থাৎ পিতা, প্রয়োজন হলো সেই ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা, যার সাথে চেতনা যুক্ত হন, বা নিয়তি যুক্ত হন। আর তিনি সেই পথের সাথেই নিজেকে যুক্ত করেন, যেই পথে গমন করলে, একজন আত্ম সহজে এবং কম সময়ে তাঁর ক্রোড়ে উপস্থিত হতে পারেন। ... আর এই পদ্ধতিতে তারমানে জগন্মাতা আত্মকে তাঁর নিজের অহংকারের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন, আর সে যে ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার দাস হয়ে অবস্থান করছে, তা তাঁর নেত্রের সমক্ষে তুলে ধরেন।

যতক্ষণ অহংকার প্রকাশিত থাকে, ততক্ষণ তা অধরাই থাকে আত্মের কাছে। কিন্তু অহংকার বৃদ্ধি পেতে পেতে, যখন সে ভগবানের সাখ্যাত কামনা করে, তখন সে সাখ্যাত যথার্থের ধারণামাত্রেই নিজের অহংকারকে বিশ্রী ভাবে পরাজিত হতে দেখে, আর তাই তখন সে নিজের ত্রিগুণকে একত্রিত করে নিজের অহংকারকে আত্মসাৎ করে নিয়ে, সেই অহংকার বা বিশেষত্বকে রক্ষা করার প্রয়াস করে। অর্থাৎ চেতনা বা জ্ঞানচক্ষু লাভ করে সে ত্রিগুণ থেকে অখণ্ড হয়না, একপ্রকার বাধ্য হয়েই সে অখণ্ড হয়। ... হ্যাঁ কৃতান্ততে তো অখণ্ডও এই একই ভাবে একত্রিত হয়, বাধ্য হয়েই তাঁর ত্রিগুণ একত্রিত হয়ে অখণ্ড হয়।

কিন্তু পিতা, আমার একটি প্রশ্ন রয়েছে এখানে। অগুন্তি ইচ্ছা, তার মধ্যে কোনটির সাথে নিয়তি যুক্ত হয়েছেন, অর্থাৎ কোনটি প্রয়োজন, আর কোনটি নয়, তা বুঝবে কি করে জীবকটি?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “অতি উত্তম প্রশ্ন পুত্রী। ... আর তোমার প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রত্যাবর্তন। সেই প্রয়োজনকে যতই অদেখা করুক না কেন আত্ম, তা বারেবারে, ফিরে ফিরে আসে তাঁর সম্মুখে। বাকি সমস্ত ইচ্ছাকে সে অদেখা করে দিতে পারে, কিন্তু এই ইচ্ছার থেকে সে নিজেকে কিছুতেই সরিয়ে রাখতে পারেনা। যতবারই সেই ইচ্ছার থেকে নিজেকে অপসারিত করার প্রয়াস করে, সে হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়। আর তাই, সেই ইচ্ছা, যা তাঁকে শিশুকাল থেকে তরুণ অবস্থা পেরিয়ে, যুবক অবস্থা পর্যন্ত ধাওয়া করে চলে, তাই হলো প্রয়োজন, অন্যগুলি সেই ইচ্ছা, যারা বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে খসে পরে গেছে, তারা নয়”।

দিব্যশ্রী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, “এবার বুঝলাম পিতা, প্রয়োজনের মাহাত্ম কি। বুঝলাম যে সাধারণ জীবকটি এই প্রয়োজনের পথে চলে চলে, অনায়সেই সাধনার দ্বারে উপনীত হতে পারে, এবং নিজেই নিজের উদ্ধারের মার্গ গঠন করতে পারে। আর একবার সাধনার মার্গে উত্থিত হয়ে গেলে, তারপর তো আপনি কৃতান্ত বলেইছেন, যেখানে বৈরাগ্য ধারণ করতে হয়, অর্থাৎ আসক্তি বিরক্তি উভয় থেকে মুক্ত হয়ে, সম্মুখে যা উপস্থিত তাকেই সমানে গ্রহণ করে যেতে হয়।

বুঝলাম যে প্রয়োজন হলো সেই ইচ্ছা, যেইটি সহস্র ইচ্ছার মধ্যে একটি ইচ্ছা, এবং শৈশব কালে গ্রহণ করা ইচ্ছা, যার থেকে কিছুতেই পিছু ছাড়ানো যায়না। আর এও বুঝলাম যে, যখন সেই পথে চলার কথা কেউ তাঁকে বুঝিয়ে বলে দেয়, তখন অহংকার সেই পথে চলতে চায়না, কারণ সেই পথে চললে, সে নিজের বিশেষত্বকে লাভ করতে পারবে না, এই ধারণা তাঁর মধ্যে এসে যায়। আর তখন সে অন্য একটি ইচ্ছাকে সাকার করার জন্য তেড়েফুঁড়ে ওঠে।

সেই ক্ষেত্রে সে যা কল্পনা করে, তা যদি সেই কল্পনার সাথে যুক্ত সকলের কল্পনার সাথে না মেলে, তখন আসে হতাশা, যা দানা বাঁধতে বাঁধতে একসময়ে তাঁকে এতটাই হতাশ করে দেয় যে, সে আর দেহ গ্রহণ করার মানসিকতাতেই থাকেনা, আর তাই পিশাচ হয়ে যায়। আবার যদি সেই কল্পনার সাথে সংযুক্ত অন্য আত্মদের কল্পনার সাথে মেলানোর প্রয়াসে, সে নিজের কল্পনাকে বিকৃত করার প্রয়াস করে, তখন তার অহংকার এমন স্থানে উন্নীত হয়ে যায় যে, সে নিজেকেই নিজে ভগবান মানতে শুরু করে দেয়, আর তাই অসুর হয়ে ওঠে, এবং একসময়ে সেই অহংকারের নাশ হলে, সে নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হয়ে, পুনরায় উন্নত যোনি লাভের সংগ্রাম করতে থাকে।

কিন্তু এই সমস্তই হলো মায়া, তাই না পিতা? এই সব কিছুই তো বাস্তবে হচ্ছেনা! কেবলই কল্পনার মধ্যের খেলা। অর্থাৎ এঁর মধ্যে যথার্থ কিছুই নেই, কিন্তু তাও প্রয়োজন হলো এই মায়ার মধ্যে থাকা যথার্থ। ... কিন্তু নিয়তি বা প্রকৃতি অর্থাৎ যথার্থ কেন এই কল্পনার মধ্যে প্রবেশ করে, কনো এক ইচ্ছার সাথে যুক্ত হন? তিনি যদি এই মায়ার মধ্যে প্রবেশ না করতেন,

তাহলে তো প্রয়োজন বলে কিছুই থাকতো না। আর তাহলে তো একসময়ে সমস্ত খেলা বন্ধই হয়ে যেত, তাই না!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “না পুত্রী, বন্ধ হতো না। সমস্ত জগতে অসুরই অসুর হতো। একে অপরকে হত্যা করতো, কিন্তু তাতে কি হতো? আত্ম কি আত্মের স্বরূপের ধারণা করতে পারতো? পারতো না, তাই না! মৃত্যু তো অন্ত নয় পুত্রী। যদি মৃত্যুই অন্ত হতো, তাহলেই একমাত্র এই সার্বজনীন আসুরত্ব সমাধান প্রদান করতে পারতো আত্মকে। কিন্তু তা তো নয়। মৃত্যু তো কেবলই একটি পরিবর্তন, যাত্রাবদল মাত্র। যখন একটি দেহে বিরাজ করা আত্ম বা অহং দেখে যে সে নিজের লক্ষ্যে এই দেহে থেকে পৌছতে পারবেনা, তখনই সে যাত্রাবদলের দিকে অগ্রসর হয়।

অর্থাৎ মৃত্যু দ্বারা তো কাজ হবেনা! কাজ হবে চেতনার দ্বারা। সত্যের চেতনাই একমাত্র এই ক্রীড়াকে সমাপ্ত করতে পারে, আর তাই সত্য অর্থাৎ যথার্থকে তো এই ক্রীড়ার মধ্যে প্রবেশ করতেই হতো, তাই না! ... আর তাই তিনি প্রবেশ করেন, এবং একটি ইচ্ছার সাথে যুক্ত হয়ে প্রয়োজনের প্রকাশ করেন, এবং তা করা মাত্রই তিনটি পরিণাম এসে যায় আত্মের সম্মুখে, এবং সে এই তিন মার্গের বিচার করতে বাধ্য হয়, যা এক সময়ে তাঁকে যথার্থের সম্মুখীন করেই দেয়।

হ্যাঁ, যত শীঘ্র সে প্রয়োজনের পথে চলতে শুরু করে, তত শীঘ্র সে যথার্থের সম্মুখীন স্থিত হয়। আর যত অধিক সে প্রয়োজনের পথে চলতে বিলম্ব করে, ততই কল্পকালের ক্ষয় হয়। আর হ্যাঁ, সঠিক বলেছ তুমি। মায়ার রচনা কেবল ও কেবল আত্ম বা অহংই করে, যথার্থের কনো প্রয়োজন নেই এই মায়া রচনা করার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ সম্পূর্ণ কল্পনার কাণ্ডারি হলেন অহং অর্থাৎ আত্ম, আর তাতে যথার্থের কনো প্রকার কনো যোগদান নেই। আর যে যখন যথার্থের সম্মুখীন হয়ে যথার্থকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তখন তাঁর কাছে না থাকে এই মায়া, আর না থাকে এই মায়াবী অর্থাৎ কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ড, আর সেই অবস্থাকেই বলা হয় সমাধি, বা মোক্ষ।

কিন্তু হ্যাঁ, যেমন জগদম্বার চিঠি থেকে জানলে তুমি, তিনি সম্পূর্ণ একাকী, আর তাই যখন আত্ম তাঁর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কল্পনার মাধ্যমে, তখন তিনি সন্তানসুখ লাভ করেন। তবে সেই সন্তানরা যখন তাঁকেই উপেক্ষা করে অবস্থান করে, তখন তিনি তাঁদের ফিরে পেতে ব্যাকুল হয়ে যান, আর তাই এই মায়ার মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন, এবং চেতনা প্রদান করে, প্রয়োজনের প্রকাশ করে, সাধনাকে মাধ্যম করিয়ে, সন্তানদের নিজের কাছে টেনে আনতে ব্যকুল থাকেন”।

দিব্যশ্রী এবার বেশ চিন্তিত ভাবে বললেন, “তাহলে জগত নিয়তিকে অর্থাৎ যথার্থকে মহামায়া কেন বলে? সে কি একটি বিভ্রান্তি?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, মহামায়া নামকরণটি করেন বৌদ্ধরা, আর তাঁদের এই নামকরণের মধ্যে কনো প্রকার বিভ্রান্তি ছিলনা। কিন্তু যখন আর্যব্রাহ্মণরা এঁদের পুঁথির থেকে তস্করি করে ইনাকে মহামায়া বলে, সেখানে এসে যায় বিভ্রান্তি। বৌদ্ধদের কাছে এই নিয়ে কনো বিভ্রান্তি ছিল না যে, মায়ার রচয়িতা হলেন আত্ম বা অহং। আর সেই মায়ার মধ্যে প্রবেশ করেন যথার্থ, এবং মায়ার মধ্যে যথার্থতার যে চক্রকে তিনি চালান, তাতে আত্ম বা অহং নিজের মায়ার মধ্যে স্থিত হয়েই বিভ্রান্ত হয়ে যায়, আর তাই তাঁরা তাঁকে মহামায়া বলেছেন।

কিন্তু এই আত্মসৃষ্ট মায়া, অর্থাৎ অহংকারের দ্বারা নির্মিত মায়া, আর্যব্রাহ্মণদের কাছে ছিল শ্রেষ্ঠ উপহার। তাই তাঁরা অহংকারের ত্রিরূপ বা ত্রিদেবকে মায়াদ্বারা সুসজ্জিত করে রাখেন, এবং তাঁদের সকলকে মায়াশ্রেষ্ঠ করে স্থাপনা করেন। আর এরপরে যখন বৌদ্ধগ্রন্থের অনুকরণ করতে গিয়ে অসুরদের কথাও বলতে হয়, তখন এঁরা পড়ে যায় বিপদে। একবার মায়ার রক্ষাকর্তাকে তাঁরা ভগবান রূপে স্থাপনা করে দিয়েছেন, তাহলে মায়ার প্রসারকদের অসুর বলবেন কি করে – এই হয়ে দাঁড়ায় বিপদ।

আসলে বৌদ্ধরা কখনোই অহংকারকে, বা অহংকারের ত্রিগুণকে ভগবানের আসন দেননি, কারণ তাঁরা বিভ্রান্ত, তাঁরা স্বয়ং ব্রহ্ম হয়েও, ব্রহ্মের শূন্যতা, ব্রহ্মের নির্বিশেষতা থেকে বিমুখ।

আর তাঁদেরই এই ত্রিগুণের বাড়বাড়ন্তকে তাঁরা অসুরত্ব বলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা যাদেরকে বৌদ্ধরা অসুরত্বের প্রথম ধাপ বলে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন, তাঁদেরকে ইতিমধ্যেই ভগবান করে স্থাপন করে ফেলেছেন। এবার তাহলে অসুরদের কি রূপে দেখাবেন?

তাই ব্রাহ্মণরা দেখানোর আপ্রাণ প্রয়াস করতে থাকলেন যে, ত্রিদেবের সাথে ত্রিগুণের কনো সম্পর্ক নেই, আর ত্রিগুণ হলো অসুর। ... আর সেই প্রয়াস থেকেই, তাঁরা দেখান যে তারকাসুরের তিনপুত্র, যারা আসলে ত্রিগুণ, আর তাঁদের দমন করছেন শিব, যিনি বৌদ্ধগ্রন্থ অনুসারে তমগুণ হলেও, ব্রাহ্মণদের রচনায় তিনি ভগবান। ... আর এই বিভ্রান্তির কারণে, ব্রাহ্মণরা বাধ্য হন সেই প্রকৃতিকে নিজেদের গ্রন্থে ডেকে আনতে, যাকে তাঁরা বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করতেই রাজিছিলেন না, কারণ তিনি অহংকারের দমন করেন।

কিন্তু তাঁকে ডেকে আনলেও, কি ভাবে রাখলেন ব্রাহ্মণরা? দেখালেন যে এই মহামায়া আসলে ত্রিদেবের দাসী, আর তাঁদেরই মায়া শক্তিই হলেন এই মহামায়া, যিনি অহংকারের মায়া, অর্থাৎ অসুরদের মায়ার নাশ করেন, যা সময়ে সময়ে ত্রিদেব স্বয়ংও করেন। ... এবার বুঝতে পেরেছ পুত্রী, বৌদ্ধগ্রন্থকে বিকৃত করতে যাবার পথে, এই ব্রাহ্মণরা প্রকৃতিকে চেষ্টা করেও ত্যাগ দিতে পারলেন না। কিন্তু আরাধ্য সেই অহংকারকেই রাখলেন, প্রয়োজনে অহংকার অন্য কেউ, আর তাঁরা অহংকার মুক্ত এমন মিথ্যাচার করতে হলে, তাই করেন তাঁরা।

কিন্তু সেখানেও ব্রাহ্মণরা পদে পদে নিজেদেরকেই অপদস্থ করেছেন। এই ধরো যেমন দুর্বাসা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, নারায়ণ অর্থাৎ রজগুণের লক্ষ্মীর উপর কনো নিয়ন্ত্রণ নেই, দেবতাদের অভিশাপের ফলে, নারায়ণকে ছেড়ে চলে গেলেন লক্ষ্মী। আবার যেমন বাল্মীকি দেখিয়েছেন, সরস্বতীর প্রতি কনো নিয়ন্ত্রণ নেই ব্রহ্মার। যেখানে ব্রহ্মা বরদান দিতে গেছেন, সেখানে কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় সরস্বতী উপবেশন করে, তাঁকে দিয়ে ইন্দ্রাসনের পরিবর্তে নিদ্রাসন কামনা করায়।

আর আরো ক্ষতিকারক ভাবে দেখিয়েছেন মার্কণ্ড। তিনি তো দেখিয়ে দিয়েছেন যে সতী নিজের দশমহাবিদ্যা দর্শন করিয়ে, শিবের কর্তৃত্বকেই উপেক্ষা করে দক্ষের পুরীতে চলে গেলেন। অর্থাৎ বারংবার দেখানো হিয়েছে যে এই নিয়তিকে যতই ত্রিখণ্ডে বিন্যস্ত করে রাখার প্রয়াস করে, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়াস করুক ত্রিদেব, কিন্তু নিয়তি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে কখনোই স্থাপিত থাকেনা, কারণ তাঁরা যে স্বয়ং নিয়তির দাস।

এই সমস্ত কিছু মেলালে পুত্রী, ব্রাহ্মণদের সমস্ত রচনা কেবলই মিথ্যাচার, যাতে বাস্তবতা কিছুই নেই। হ্যাঁ সূক্ষ্মতত্ত্বকে সরাসরি বৌদ্ধদের যন্ত্রতন্ত্র থেকে তুলে ধরেছেন তাঁরা, তাই সূক্ষ্মতত্ত্ব অর্থাৎ যাকে তোমরা বলো জ্যোতিষ, তা যথার্থ ভাবেই মনোবিজ্ঞান। এখানে কেবল একটিই স্থানে তাঁরা উপরচালাকি করেছেন, আর তা হলো এই গ্রহদের যেখানে বৌদ্ধগ্রন্থ নিয়ন্ত্রণ করার প্রশিক্ষণ দেয়, সেখানে ব্রাহ্মণরা এঁদের মান্যতা প্রদান করে, এঁদের দাস হয়ে থাকার নির্দেশ দেয়।

সব কিছু মেলালে, এই আর্যরা, যারা এই সমস্ত গ্রন্থের রচনা করেছেন বলে দাবি করেন, তাঁরা সমস্তই মিথ্যাচারী, কারণ তাঁরা এই সমস্ত গ্রন্থের রচনাই করেন নি। আর্যদের মধ্যে কেউ যদি কনো গ্রন্থের রচনা করে থাকেন, তাঁরা হলেন মার্কণ্ড ও কৃষ্ণ, যেখানে মার্কণ্ডের রচনা মার্কণ্ডমহাপুরাণকে বিনষ্ট করার জন্য ব্রাহ্মণরা সদাব্যস্ত থাকতেন, কারণ তা অহংকারের আরাধনা করে না, আর কৃষ্ণের রচিত জয়া অর্থাৎ মহাভারতের গুহ্য অর্থ ব্রাহ্মণরা আজও উপলব্ধি করতে পারেন নি। অন্য সমস্ত গ্রন্থ বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এবং বিকৃত।

(সামান্য হেসে) আসলে পুত্রী, ব্রাহ্মণরা যেই উচ্চতায় নিজেরা পৌঁছেছেন বলে দাবি করেন, সেই উচ্চতার নখস্পর্শও কনোদিন করেন নি তাঁরা। কেবলই মিথ্যাচার, ভেল্কিবাজি, অনাচার আর নিকৃষ্ট মানসিকতার অবতার তাঁরা। যারা সত্যে কনোদিন যাত্রাই করেনি, তাঁদের কথাকে কনো গুরুত্ব প্রদানের কনো প্রয়োজন নেই”।

দিব্যশ্রী বললেন, "বেশ বুঝে গেছি পিতা এবার। সাধারণ মানুষের উদ্ধারের মার্গ কি। কিন্তু একটি কথা আমার কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। আত্মই অহং, আর অহংই আত্ম, এই কথাকে আপনি বারবার বুঝিয়েছেন আমাকে। কিন্তু একটি জিনিসে আমি অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। আত্ম স্বরূপে ব্রহ্ম অর্থাৎ যথার্থ। সে নিজের সত্যতাকে অবমাননা করে, ভ্রমিত হয়ে শূন্যত্ব ত্যাগ করে, কল্পনাতেই কেবল অণু। তাই আত্ম তো কনোভাবেই আমাদের অরি নয়, কিন্তু সেই আত্মই অহং, আর অহং আমাদের শত্রু। এই ব্যাপারটি বড়ই গোলমেলে"।

অহং বিজ্ঞান

ব্রহ্মসনাতন সদাহাস্যে বললেন, "স্বয়ং স্বয়ংএর শত্রু। হ্যাঁ পুত্রী, যাহা অহং, তাহাই আত্ম। আত্ম বোধ অর্থাৎ আমিত্ব বোধই আত্ম, আর তাই আত্ম স্বয়ং স্বয়ংএর শত্রু হয়ে গেছে। কিন্তু আত্ম সেই সত্যতাকে বুঝতে পারেনা। সে মনে করতে থাকে অহং পৃথক আর সে পৃথক, আর মনে করতে থাকে যে অহং অশুভ, আর সে শুভ। ঠিক যেমনটা ব্রাহ্মণদের রচনাতে দেখতে পাও, তেমনই। তুমি একদিন প্রশ্ন করেছিলে মনে আছে? যদি ব্রাহ্মণদের রচনা বিকৃত সত্যই হয়, তাহলে নিয়তি বা প্রকৃতি তাঁদের নাশ করে দিচ্ছেন না কেন?

উত্তরটা এইটি যে, ব্রাহ্মণদের রচনা বৌদ্ধরচনার বিকৃত রূপ, কিন্তু তা মিথ্যা হয়েও মিথ্যা নয়। কেন জানো? কারণ ব্রাহ্মণরা যেই ভাবে অহং ও আত্মকে পৃথক পৃথক দেখিয়েছে, তা বিকৃত, তা অসত্য, কিন্তু আত্ম তেমনটাকেই সত্য মনে করে। বৌদ্ধগ্রন্থও এই সত্যকে দেখিয়েছিল, আর বলেছিল যে, এই দুইকে ভেদ না করতে, এবং সমূলে নাশ করতে। ব্রাহ্মণরা সেই কথাকে বিকৃত করে, নিয়তির বিবরণ দেওয়া থেকেই বিরত থেকেছেন, আর আত্মকে ভগবান করে স্থাপিত করে দিয়েছেন।

এই নির্দেশনা মিথ্যাচার, এই নির্দেশনা সাধকের স্খলনের মুখ্যকারণ, এই তত্ত্বও মিথ্যা, কিন্তু এটিই আত্মের বাস্তবিক ধারণা। তাই নিয়তি এঁদের বিনাশ করেন নি, কারণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে আত্ম অহংকারকে কি ভাবে নিজের থেকে পৃথক ভেবে বিভ্রান্ত হয়, তাই দেখানো আছে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “অর্থাৎ আত্ম না জানতে পারে, আর না মানতে পারে যে, আর না বুঝতে পারে যে, তাঁর থেকে অহং অভেদ্য। সে মনে করে যে অহং তাঁর থেকে আলাদা, অথচ সে স্বয়ংই অহং আর তা না বুঝতে পেরে নিজেকে নিরহঙ্কারী ভেবে ভ্রমিত। ... পিতা, এতো ভয়ানক ভ্রম! এই ভ্রমের কথা বিচার করেই তো আমার সমস্ত পঞ্চভূত শিউরে উঠছে! ...

এবার বুঝতে পারছি, কেন নিয়তিকে এই মায়ার মধ্যে প্রবেশ করতে হলো। তাঁর হস্তক্ষেপ ব্যতীত তো এই ভেদের নাশ হওয়াই সম্ভব নয়! এ তো এক অভেদ্য ব্যূহ যেন! ... এবার বুঝতে পারছি, আপনি তো ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে সঠিক শব্দই ব্যবহার করেছেন। তাঁরা তো মিথ্যাচারী। আত্ম মানেও যা, অহং মানেও তাই। কিন্তু তাঁরা বলছেন অহংকে ত্যাগ করে, আত্মকে পূজা করতে! এতো ভয়ানক মিথ্যাচার। ... না দোষ নেই তাঁদের। তাঁরা তো সত্যকে জানার প্রয়াসই করেননি, কেবলই নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনা। আর সেই উন্মাদনার সম্মুখে বৌদ্ধগ্রন্থ উপহার স্বরূপ পেয়ে গেছেন। তাই তাঁদেরকে বিকৃত করে, সরাসরি নিজেদের অহংকারকে স্থাপনা করে দিয়েছেন।

আর এই বিকৃত সাধন ব্যাকরণের কারণে, আমরা আর অধিক ভাবে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছি। দিবারাত্র আমরা তাই নিজেদের ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনার আরাধনা করে চলেছি, আর অহংকার অর্থাৎ আত্মের ত্রিগুণ বা ত্রিদেবের কাছে সেই ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার স্বীকৃতি কামনা করে চলেছি। ... আর যেহেতু তাঁদেরকে সমাজে ভগবান করে স্থাপিত করা রয়েছে, তাই সমানে নিজেদেরকে বিনষ্ট করে যাচ্ছি। নিজের উন্নতি চেয়েও বিনাশই করে চলেছি আমরা! ... একি অনাসৃষ্টি পিতা!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "এবার বুঝতে পারছো কৃতান্তের কথাকে। ... যদি বুঝেই থাকো তাহলে তার বিবরণ প্রদান করো দেখি আমাকে"।

দিব্যশ্রী বলতে শুরু করলেন, "কৃতান্তের শুরুই হয়, ত্রিদেবের অধিকার স্থাপনের সংগ্রাম থেকে। সকলের উপরই এই অহংকারের ত্রিগুণ অধিকার স্থাপন করে। আর তেমনই ভাবে তাঁরা অধিকার স্থাপন করতে যায় আপনার উপর। কিন্তু তাঁদের অহমিকা তাঁদেরকে বুঝতেও দেয়নি যে আপনি স্বয়ং তাঁকে ধারণ করে বসে রয়েছেন, যিনি এই অহংকারের বা আত্মের স্বরূপ, অর্থাৎ যথার্থ।

অহংকারকেই প্রকৃত দানব বলে চিহ্নিত করা হলেও, অহংকার আর আত্ম একই শব্দের দুটি প্রকাশ বলে কেউ অনুভব করতেই পারেন না, আর এঁর নেপথ্যে রয়েছে ছায়াদেবীরা, অর্থাৎ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা। এঁদের রচনা স্বয়ং আত্ম বা অহংকারই করেন, যখন সে বা তাঁরই ন্যায় অজস্র অণু যথার্থের শূন্যতাকে অস্বীকার করে অবস্থান করে। যথার্থের নির্বিশেষত্বকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা চিন্তা প্রকাশ করে, এবং ইচ্ছার জন্ম দেয় যাতে তাঁরা বিশেষ হয়ে উঠতে পারে, আর সেই চিন্তা ও ইচ্ছার নিরিখে কল্পনার জন্ম দেয়, যেই কল্পনাই প্রকৃত অর্থে চিন্তা ও ইচ্ছার জ্যেষ্ঠারূপ, বা বলা চলে এই কল্পনার অন্তরেই চিন্তা ও ইচ্ছা সমবেত থাকে।

আর এই ছায়াদেবীরা প্রকাশ্যে আসার পরেই যা করে, তা হলো আত্মকে তাঁরা বোঝাতে শুরু করে যে, অহংকার তাঁর থেকে পৃথক, সে অহংকার নয়। এর কারণ একটিই, নিজেদের আধিপত্য। তাঁরা বেশ ভালো করেই অনুভব করে নেয় যে, যতক্ষণ এই আত্ম অস্তিত্বমান, ততক্ষণই তাঁদেরও অস্তিত্ব। আর তাই এই আত্মকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, তবেই তাঁরা সুরক্ষিত থাকবেন।

যখন এই ছায়াদের আরোপিত করা হয় যথার্থের উপর, আর তাঁদের আরোপণের ভিত্তিতে যথার্থকে ত্রিদেবীরূপে আত্ম প্রকাশ করে, সেই ত্রিদেবীর উপর অহংকার নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, তখন ছায়াদেবীরা স্পষ্ট ভাবে বুঝে যান যে, ত্রিদেবীদের নজর থেকে আত্মের

অহং বোধ লুক্কায়িত নয়। আর সেই অহং-এর কারণেই কিছুতেই আত্ম তাঁদেরকে নিজেদের অধীনে স্থিত করতে পারছেনা। কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই, কারণ আত্ম স্বয়ং সেই যথার্থই, কিন্তু সে নিজের স্বরূপ ভুলে বসে আছে। অর্থাৎ এই ত্রিদেবী কিছুতেই আত্মের উপর আঘাত করবে না।

কিন্তু আঘাত না করলেও, আত্মকে অহংএর প্রকৃত রূপ ইনারা দেখাবেনই। তাই একবার যদি আত্মকে বোঝানো সম্ভব হয় যে সে এবং অহং পৃথক অস্তিত্ব, তাহলে তাঁকে ত্রিদেবী কিছুতেই মানাতে পারবে না যে আত্মই অহং, আর তাই কিছুতেই আত্ম যথার্থে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে, সত্যে লীন হবেনা। আর যতক্ষণ না সে লীন হবে সত্যে, ততক্ষণ তাঁদেরও অর্থাৎ ছায়াদেবীদেরও অস্তিত্ব সতেজ থাকবে।

তাই, ছায়াদেবীরা আত্মকে প্রেরণা প্রদান করে, আত্ম দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করায়, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণধাররূপে আত্মকেই স্থাপিত রেখে দেয়। আর আত্মেরই ছায়াকে অর্থাৎ অহংকারকে আত্মের সম্মুখে দেখায় যে এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণধার সে হতে চায়। আর এই ভাবে আত্মের কাছে অহংকে একটি ভিন্ন অস্তিত্বরূপে স্থাপিত করে রেখে দেয়।

কিন্তু এই অহং আর আত্মের মধ্যে তো কনো ভেদ নেই। তাই এই অহংএর থেকে আত্মের ত্রিগুণকে প্রকাশিত করে, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে, আত্মকে দেখাতে শুরু করে যে আত্ম হলেন ত্রিদেব, আর ত্রিগুণ হলো অহংকারের গুণসমূহ, এবং তা আত্মের থেকে পৃথক এবং আত্মের বিরোধী। এই তিন প্রকাশকে কৃতান্ত নাম দিয়েছে বলদম্ভ, আবর্ত ও উপপতি, যারা হলেন তম, রজ ও সত্ত্বগুণ।

এরপর ছায়াদেবীদের প্রেরণাতে, ত্রিদেব যথার্থকে যেই ত্রিখন্ডে কাল্পনিক ভাবে বিভক্ত করেছিলেন, তাঁদের উপর কাল্পনিক ভাবেই কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রেরণা দিলে, আত্ম বা পুরুষ মনে করতে থাকে যে তাঁরা ত্রিদেব, আর তাঁদের কাছে এই ত্রিদেবী অনুগত দাসী। কিন্তু এই ত্রিদেবী, যারা ত্রিদেবী ননই, বরং সাখ্যাত ব্রহ্ম হয়েও, নিষ্ক্রিয় আত্মের সক্রিয়তার কল্পনার

নিরিখে যা হয়ে ওঠে নিয়তি, কিন্তু সেই নিয়তির ভেদ আত্মকে কিছুতেই জানতে দেয়না ছায়াদেবীরা, আর তা জানতে দেবেনা বলে, এই ত্রিদেবীর ভূমিকায় নিজেদের স্থাপন করে ছায়াদেবী, আর আত্মকে বা ত্রিদেবকে দেখাতে থাকে যে ত্রিদেবী ত্রিদেবের দাসী।

আর এই ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে, আত্মের থেকে ছায়াদেবী পঞ্চভূতের জন্ম দিয়ে দেয়। কিন্তু যতই ছায়াদেবীদের থেকে জাত হবার কারণে ছলনা, চাতুরী এবং শঠতার আশ্রয় নিক পঞ্চভূত, কিন্তু ত্রিদেবীর ভূমিকায় স্থাপিত করার কারণে, যথার্থের পবিত্রতার আভা তো পঞ্চভূত পেয়েই যায়। যদিও, সেই পবিত্রতার ভান তাঁদের নিজেদেরই থাকেনা, এবং একপ্রকার অহংকার এবং ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে তারা।

কিন্তু বিপাকে পড়ে যায় আত্ম, যখন প্রকৃত অর্থাৎ যথার্থ নিজের ত্রিদেবী ভাবকে সম্বরণ করে নেন আপনার মধ্যে, এবং সাখ্যাত নিয়তি, অর্থাৎ সর্বাম্বা হয়ে অবস্থান করতে শুরু করেন আপনার হৃদয়ে। ছায়াদেবীদের মধ্যে ত্রিদেব আর তখন ত্রিদেবীর প্রকাশ দেখতে পায়না। আর তাই বিড়ম্বনায় স্থিত হয়ে যায়। অন্যদিকে ছায়াদেবীরা ত্রিদেবী অবলুপ্ত হওয়াতে, সমস্ত মানবজাতিকে নিজেদের অধিকারে স্থাপিত করার জন্য ব্যকুল হয়ে সর্বত্র বিস্তার প্রকাশ করতে থাকে।

এই ইচ্ছা তাদের বরাবরই ছিল, এবং আত্মকে অহংকারের থেকে ভিন্ন দেখিয়ে, নেপথ্যে চালাচ্ছিলেন এই অভিযান। আর সেই অভিযানকেই বিনষ্ট করার জন্য ত্রিদেবীরূপ সম্বরণ করে, ত্রিদেবী একত্রিত নিয়তি বা যথার্থ রূপ ধারণ করে, সর্বাম্বা বেশে আপনার হৃদয়ে উপস্থিত হন, এবং আত্মের অপেক্ষা করতে থাকেন, যেখানে আত্মকে তিনি উপলব্ধি করাবেন যে আত্ম আসলে অহংকারই, আর এই ছায়াদেবীরা তাঁকে মূর্খ বানিয়ে তাঁকে দিয়েই ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়ে, তার উপর শাসন করতে সচেষ্ট।

কিন্তু সেই অভিসন্ধি কারুর কাছেই জ্ঞাত নয়। তাই, ছায়াদেবীরা মনের আনন্দে নিজেদের বিস্তার করতে শুরু করেন, এবার আর নিভৃতে নয়, প্রকাশ্যে। আর আপনার বয়স হয়ে গেছে,

তাই পঞ্চভূত আপনাকে নিজেদের অধীনে করে নিতে আসেন, যারা আত্মের প্রেরণাতে আপনার কাছে বা সকলের কাছে আসলেও, সেই প্রেরণার পিছনে ছায়াদেবীরাই থাকেন।

আর এবার ক্রীড়া শুরু করেন মাতা সর্বাম্বা অর্থাৎ পরানিয়তি। এই পঞ্চভূতের অন্তরে যেই ত্রিদেবীর থেকে লব্ধ দিব্যতা উপস্থিত ছিল, তার নিরিখে তিনি তাঁদেরকে নিজের পরমাত্মীয় করে নেন। পঞ্চভূতের এই বিষয়ে কনো ধারণাই থাকেনা, কারণ তাঁরা তো ত্রিদেবীকে চেনেন, নিয়তিকে জানেনও না, চেনেনও না। আর তাই নিজেদের অজান্তেই, তাঁরা ছায়াদেবী ও অহংকারের কবল থেকে নিয়তির দাস হয়ে যান, যদিও নিয়তির কাছে সকলেই সন্তান, তাই দাস হয়ে থাকেন না, বরং নিয়তির পরমাত্মীয় হয়ে থাকেন তাঁরা।

কিন্তু হৃদয়ের কন্দরে যে আত্মের বা অহংকারের বা কনো ছায়াদেবীর প্রবেশই সম্ভব নয়। তাই আপনার হৃদয়ের অন্তরে গিয়ে, কেন সমস্ত পঞ্চভূত হারিয়ে যাচ্ছেন, আর প্রত্যাবর্তন করছেন না, আর আপনার উপর শাসন করছেন না, তা আত্মের ত্রিগুণের কাছে এক বিস্ময় হয়ে যায়। আর তাই তাঁরা স্বয়ং আপনার হৃদয়ের উদ্দেশ্যে নির্গত হন।

অন্যদিকে যতই ছায়াদেবী দেখানোর প্রয়াস করুন যে বলদম্ভ, আবর্ত ও উপপতি ত্রিদেবের থেকে ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা তো ত্রিদেব স্বয়ংই, তাঁদেরই প্রকাশিত ছায়া তারা। তাই তাঁরাও একই ভাবে আপনার হৃদয়েই যাত্রা করেন অহংসহ এবং সমস্ত আবেগসহ, যেখানে ত্রিদেব যাত্রা করছিলেন। অর্থাৎ বাস্তবে কেবলই আত্ম যাত্রা করছিলেন, কিন্তু এই ত্রিদেবের যাত্রা, অহং এবং আবেগদের যাত্রা, এবং তিন ছায়াপুত্রের যাত্রা, তা তো কেবলই ছায়াদেবীদের মায়ার ফলশ্রুতি। আর এই সমস্ত কিছুর আহ্বান স্বয়ং নিয়তি করান ত্রিদেবকে ধরিত্রী অর্থাৎ দেহদ্বারা উস্কানি প্রদান করে।

আর যেহেতু এঁরা সকলেই একই অর্থাৎ আসলে কেবলই আত্ম যাত্রা করছিলেন, তাই সকলের পরিণাম সকলের ক্ষেত্রে একই হয়। বলদম্ভরা মন ও প্রাণকে হনন করে, এবং নিয়তি তাঁদেরকে

বিপর্যস্ত করে দেয়। আর যেহেতু ত্রিগুণ বিপর্যস্ত হয়, সেহেতু ত্রিদেবও বিপর্যস্ত হয়ে, বাধ্য হয় একত্রিত অখণ্ড রূপ ধারণ করতে।

অখণ্ডরূপ ধারণ করে সেই স্থানে উপস্থিত হয় আত্ম, যেখানে তাঁরই ত্রিগুণ দগ্ধ হচ্ছিল, এবং সে স্বয়ং অর্থাৎ অহং ও সেই অহং নির্মিত সমস্ত আবেগ, যাদেরকে সে নিজের থেকে পৃথক মানতো, তাঁদেরকে নিয়তি প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁরই অন্তরে স্থাপন করে দেন। প্রকৃত অর্থে সেটি স্থাপনা ছিলনা, বরং যেই মায়া ছায়াদেবীরা আত্মের সাথে এতকাল করে এসেছে, সেই মায়ারই প্রতিউত্তর মায়া ছিল।

ছায়াদেবীরা আত্মকে মায়াবলে দেখাতেন যে আত্মের থেকে আবেগ ও অহং পৃথক, আর ঠিক তার বিপরীত মায়া করে, নিয়তি সেই আবেগ ও অহংকে আত্মের মধ্যে স্থান করে দিলেন। প্রকৃত ভাবে তো না অহং আর না আবেগ আত্মের থেকে কনো কালে পৃথক ছিল, আর না অন্তিমকাল পর্যন্ত পৃথক হয়। কিন্তু সেই তত্ত্ব আত্ম তো বুঝতেন না কিছুতেই, যতই তাঁকে তা বোঝানোর প্রয়াস করা হতো। তাই নিয়তি এক বিপরীত মায়ার বলে তা প্রত্যক্ষ করে দিলেন আত্মের কাছে।

কিন্তু যতই অহংকে স্থাপনা করা হোক অখণ্ডের মধ্যে, তাঁর ত্রিগুণকে তিনি কিছুতেই নিজেরই ত্রিগুণ রূপে স্বীকার করেন না, আর তাই বলদম্ভ, আবর্ত ও উপপতি অখণ্ডের থেকে পৃথকই থাকে। কিন্তু সেই একই কথা যতই স্বীকার করা হোক আর না হোক, আত্মেরই ত্রিগুণ, আর ত্রিগুণ আত্মেরই। তাই আত্মের অর্থাৎ অখণ্ডের এবং ত্রিগুণের ক্রিয়াধারা সমান্তরাল ভাবেই চলতে থাকে।

একদিকে যেমন অখণ্ডের থেকে জন্ম নেয় বিচার ও বিবেক এবং এই দুই সন্তানের ভ্রম, তেমনই অন্যদিকে অখণ্ডেরই ত্রিগুণের থেকে জন্ম নেয় ভাঞ্চ্ ঋপু ও তাঁদের ভ্রমিত ভ্রাতা, হিম্লহু। আর ঠিক যেই ভাবে দুই ভ্রাতা, বিচার ও বিবেকের ভ্রমের নাশ হবে পরবর্তীতে, তেমনই উপায়ে, হিম্লহুর নাশ হয়, এবং ভাঞ্চ্ অর্থাৎ বিবেককে আত্মস্থ করে নেয় নিয়তি, আর ঋপু অর্থাৎ

বিচারকে সম্মুখে রেখে দেয়। কৃতান্তে বিচার ও বিবেকের ক্ষেত্রেও পরিণতি এমনই দেখানো হয়েছে, যেখানে বিবেক সমর্পিত হয়ে সারথি হয়ে ওঠে, এবং বিচার একাকী যুদ্ধ করে।

আর বিবেকের এই সমর্পণের পূর্বে থাকে সেই মহামায়াশিক্ষা, যা ক্ষিতীশ ও সতিশ কৃতান্তে লাভ করেন, আর যাকেই ভাগ্ণ্ড মাতা সর্বাম্বার দিব্যদর্শন লাভ করে দেখে, মাতার মধ্যে লীন হয়ে যায়। অর্থাৎ কৃতান্তে যেন এক আত্ম অখণ্ড ভাবে স্থিত, আর এক মাতা সর্বাম্বা যিনি যথার্থ, যিনি নিয়তি, প্রকৃত অর্থাৎ দর্পণ রূপে স্থিতা। আর আত্ম বা অখণ্ড নিজের অন্তরের সমস্ত ক্রীড়াকেই দেখছেন সেই দর্পণে, অর্থাৎ হিম্লহুদের কীর্তি এবং বলদম্ভদের কীর্তি, এবং তা দেখে দেখে, নিজের সত্যতা জানছেন আত্ম।

এক কথায় বলতে গেলে, কৃতান্ত হল আত্মদর্শন, যেখানে স্বয়ং নিয়তি আত্মকে এই আত্মদর্শন প্রদান করছেন, এবং তাঁকে দেখাচ্ছেন যে, দেখো আত্ম, তুমি স্বয়ংই অহংকার, তুমি স্বয়ংই সমস্ত ভেদাভেদের সঞ্চারক, আর তুমি স্বয়ংই ভ্রমের রচয়িতা এবং রচনা। আর বলেন যেন, নিরীক্ষণ করো আত্ম, তোমারই রচিত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার কারণে তুমি এই ভ্রমের রচনাও করেছ, আর এই ভ্রমে দীর্ঘায়ু হয়ে উপস্থাপনও করছো। তা নিরীক্ষণ করো, আর আমার সম্মুখে ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা, এই তিন ছায়াকে এনে স্থিত করো।

আর যখন থেকে এই আত্মদর্শন নিজের মহিমায় স্থিত হয়েছে, তখন থেকে নিয়তি অর্থাৎ যথার্থ ইরা জাগ্রত করে, কুণ্ডলিনীচক্রে প্রবেশ করেছেন। এবং যতই আত্মদর্শন সম্পন্ন হচ্ছে, আর আত্ম নিজেকে এই যথার্থ, এই নিয়তিরই ভ্রমিতরূপ বলে চিহ্নিত করতে পারছে, ততই কুণ্ডলিনীর উত্থান হচ্ছে, এবং তা মনিপুর ছেড়ে অনাহততে, এবং অনাহত ছেড়ে বিশুদ্ধে এবং বিশুদ্ধ ছেড়ে আজ্ঞাতে যাত্রা করতে থেকেছে।

অবশেষে যখন আজ্ঞাতে আত্ম নিয়তির প্রতি প্রেম অনুভব করতে থেকে তাঁর প্রতি অনুগত হতে শুরু করে, তখন থেকেই তাঁর আত্মদর্শন শ্রেষ্ঠ অবস্থায় উন্নীত হয়, আর সে নিজের আত্মকে অহংরূপে দেখা শুরু করে। সেখানে সে বিচার ও বিবেকের জন্ম হতে দেখে, এবং

তাঁদের ভ্রমিত হতেও দেখে। তাঁদের ভ্রমকে নির্মাণ হতেও দেখে, এবং তাঁদের ভ্রমের নাশ হতেও দেখে। কিন্তু তখনও নিজের ত্রিগুণকে নিজেরই ত্রিগুণ বলে চিহ্নিত করেনা। বরং নিজের ত্রিগুণের কামনাকে পূর্ণ করার জন্য নিয়তির কাছে নিবেদন করতে থাকে।

নিজেকে ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী মনে করেন তিনি, সেই ব্রহ্মাণ্ডের, যেই ব্রহ্মাণ্ড নেহাতই একটি কল্পনা মাত্র, তার স্বামী। আর তাই সেই স্বামীত্বের মদে চূড় হয়ে, স্বয়ং নিয়তিকে আদেশ দেবার ধৃষ্টতা করে যে এই ত্রিগুণের কামনাকে তৃপ্ত করে তাঁদের অভয়দান দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি ভুলে যান যে, যার সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান, তাঁরা ছায়াদেবীদের প্রস্তাবিত ত্রিদেবী নন, স্বয়ং নিয়তি, আর নিয়তি না তো কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ, আর না আত্মের কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ।

তাই মাতা সর্বাম্বা গর্জন করে ওঠেন, আর আত্ম ভয়ার্ত হয়ে যায় সেই গর্জনে। আর সেই গর্জনে আত্মকে প্রথমবার নিয়তি অনুভব করান যে অহং আত্ম স্বয়ংই, আর সেই কারণেই আত্ম অহংএর ইচ্ছাদের পুড়ন করার উদ্দেশ্যে নিয়মস্থাপন করে রেখেছেন, যাতে আত্ম স্বয়ং আবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু নিয়তি নন। আত্ম নিয়তির প্রেমে মুগ্ধ, তাই মাতা সর্বাম্বার পুত্র, বিচার ও বিবেককে আটকাতে পারেন না ত্রিগুণের নাশ করতে যাওয়া থেকে, কিন্তু সেই ত্রিগুণ যে স্বয়ং তাঁরই।

তাই বিচার ও বিবেককে যখন নিয়তি শিক্ষা প্রদান করেন ত্রিগুণের সাথে যুদ্ধ করার নিরিখে, তখন নিয়তির পরমাত্মীয় হয়ে যাওয়া পঞ্চভূত নিয়তির সাথে সংযুক্ত হয়ে বিচার ও বিবেককে শিক্ষিত করলেও, অখণ্ড অর্থাৎ আত্ম সেই শিক্ষকতা কর্মে যোগদান করেনা। কিন্তু তাও নিয়িতির কর্মে তিনি বাঁধা দিতে পারেন না, প্রথমত নিজের নিয়তির প্রতি জাগ্রত হওয়া প্রেমকে পরিদর্শন করে, আর দ্বিতীয়ত নিয়তির সম্মুখে নিজেকে নিতান্তই অক্ষম অনুভব করে।

তাই তিনি বিচার ও বিবেককে যুদ্ধে প্রেরণ করা থেকে বিরতও করতে পারেন না। কিন্তু তার কারণে তিনি ত্রিগুণের নাশের ব্যবস্থাকে খণ্ডন করার প্রয়াস করেন না, তা কিন্তু নয়। তখনও সে প্রয়াস করে, আর প্রয়াস করে বলেই নিয়তির কাছে বিচার ও বিবেকের এই যুদ্ধে জয়লাভ করা

নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। কিন্তু বারংবার তিনি ভুলে যান যে যার সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান, তিনি স্বয়ং নিয়তি, তিনি স্বয়ং যথার্থ।

সকলের সম্মুখে তিনি শূন্য, কারণ তিনি যে ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি সকলের জননী, সর্বাত্মা, আর তাই সকলের পিছনে সর্বক্ষণ অবস্থান করেন। তিনি আত্মের ন্যায় ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাদ্বারা গ্রসিত নন, কিন্তু এমন নয় যে তিনি কিছু বুঝতে পারেন না। সত্য তো এই যে ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা তো আমাদেরকে কিছু বুঝতে দেয়ই না, সর্বক্ষণ এক মায়ার মধ্যে স্থাপিত করে রেখে দেয়, আর অতিসামান্য বুদ্ধিকে বাহবা দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বলেন আমরা বুদ্ধিমান; অতি ক্ষীণ ক্ষমতাযুক্ত মনের আবেগকে দেখিয়ে বলেন আমরা অনুভব করতে সক্ষম।

প্রকৃত অনুভব ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা তো প্রকাশিত হতেই দেন না এই ছায়াদেবীরা আত্মের মধ্যে, আর সেই কারণেই তো আত্ম ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে দেখে মনে করে কি বিশাল এই ব্রহ্মাণ্ড। কেবলই নিজেকে বেষ্টন করে থাকা নিজেরই রচনাকে আত্ম দেখে, আর মনে করতে থাকে এই ছায়াদেবীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যে, তাঁর ব্রহ্মাণ্ড কি বৃহৎ। কিন্তু নিয়তি যে যথার্থ, তিনি যে শূন্য, তিনি যে নির্বিশেষ, নিরাকার, আর তাই তাঁর কাছে কনো ব্রহ্মাণ্ডের কনো অস্তিত্বই নেই।

আর সেই কারণে তাঁর মেধা যে বুদ্ধি বা আবেগ পর্যন্ত কখনোই সীমিত নয়। তাঁর মেধা যে অনুভব শক্তির ন্যায় অসীম, অপার, আর সেই অপার শক্তির কারণে তিনি জননী সকলের, সর্বাত্মা তিনি। সেই অপার অনুভব শক্তির কারণে তিনি সর্বক্ষণ সমস্ত অণুর পশ্চাতে, সমস্ত আত্মের পশ্চাতে স্থিত থেকে, তাঁদের সমস্ত কীর্তিকে নিরীক্ষণ করেন। আর সেই কারণেই এক জননী যতক্ষণ নিজের অন্তরে আত্মকে ভুলে থেকে সন্তানকেই সমস্ত কিছু মনে করেন, ততক্ষণ সন্তানের সমস্ত কিছুকে অনুভব করে নেন।

সন্তানের কাছে তাই মাতা হয়ে ওঠেন জগজ্জননীর মত ব্যপ্ত, কারণ তাঁর মাতার কাছে তিনি মিথ্যা কথা বললে মুহূর্তের মধ্যেই ধরা পড়ে যান, ধূর্তামো করলেও সেই ধূর্তামোর উদ্দেশ্য মুহূর্তের মধ্যেই সম্মুখে এসে যায়। এই হলো জগন্মাতার অনুভব শক্তির উপমা মাত্র। যতক্ষণ

আত্মকেন্দ্রিক আমরা ততক্ষণই বুদ্ধি ও আবেগ দ্বারা সীমিত আমরা। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা নিজের আত্মকে ভুলে সন্তানস্নেহে বুক বাঁধি, তক্ষণই আমরা সমস্ত অনুভবশক্তিকে অনুভব করি, আর তা করা মাত্রই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমাদের সম্মুখে নিছকই এক ক্রীড়ার মত করে সম্মুখে এসে আত্মসমর্পণ করে দেয়।

ঠিক সেই সন্তানভাবের কারণেই এক জননীর সম্মুখে তাঁর সন্তানের ব্রহ্মাণ্ড আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, আর তিনি তাঁর সন্তানের ব্রহ্মাণ্ডকে সেই সন্তানের আত্মের থেকেও অধিক শ্রেয় ভাবে জানেন ও চেনেন, আর তাই প্রতিটি সন্তানের কাছে তাঁর জননী যেন সাখ্যাত জগজ্জননী। কিন্তু যেই সন্তান একটু বড় হয়ে যায়, তখন থেকে পুনরায় সেই মাতার মধ্যে আত্মবোধ পুনরায় জাগ্রত হতে থাকে, যা সাধারণত সন্তানের নামযশ উন্নতিকে সামনে রাখে মাত্র, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আত্মের, স্বয়ংএর প্রতিষ্ঠাকেই দেখতে পায়; নিজের সমাজে নিজের নামযশকেই দেখতে পায়, যেখানে সকলে তাঁকে বলবে যে তাঁর সন্তান কতই না উন্নতি করেছে।

আর যেই মুহূর্তে এই আত্মবোধ পুনরায় জাগ্রত হয়, সেই মুহূর্ত হতে সন্তানের ব্রহ্মাণ্ডকে আর জননী পূর্বের মত অনুভব করতে পারেনা, আর তখন সন্তানের থেকে তাঁর জননী দূর হতে থাকে। ... এর থেকে শ্রেষ্ঠ উপমা আমাদের সম্মুখে আর দ্বিতীয় একটিও নেই। এই উপমা সর্বজনীন, সর্বত্র এই উপমা দৃশ্যমান। একমাত্র আত্মকে ভুলে থেকে সন্তানসর্বস্ব হবার কারণে, নিজেকে সন্তানের সাথে একাত্ম করে দিয়ে প্রেম করার কারণে, জননীর কাছে এসে যায় অনুভব শক্তি।

আর সেই অনুভবশক্তির সামর্থ্য অপার। তাঁকে গ্রন্থপুঁথি পাঠ করে মহাপণ্ডিত হতে হয়না, তাঁকে নামজপ করে মহাভক্ত রূপে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়না, কিন্তু তিনি হয়ে ওঠেন মহাজ্ঞানী। আসলে মহপ্রেমই মহাজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, আর প্রেম মানেই হলো আত্মের থেকে মুক্তি। আত্মের থেকে মুক্তি পেলেই এসে যায় সমস্ত অনুভব, যা আমাদের স্বাভাবিক গুণই, কিন্তু আমরা আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে নিজেরই গুণ থেকে নিজে স্খলিত। এই অনুভবশক্তি এতটাই শক্তিশালী যে, সম্যক ব্রহ্মাণ্ডকে মুহূর্তের মধ্যে সম্মুখে এনে দণ্ডায়মান করে দেয় এবং মহাজ্ঞান

মুহূর্তের মধ্যে প্রদান করে দেয়, আর তার সর্বজনীন প্রমাণ এক জননীর থেকে অধিক কেউ নন।

কিন্তু মজার কথা এই যে, যেই মুহূর্তে জননী নিজের আত্মকে নিয়ে পুনরায় উলমালা হতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত হতেই তাঁর এই অনুভবসামর্থ্য তাঁর থেকে হারিয়ে যায়, আর তিনি আবার পঞ্চভূতবদ্ধ জীব হয়ে যান। কিন্তু মাতা সর্বাম্বা যে সদাজননী, তিনি তো সকলের অম্বা, সর্বাম্বা। তাই তিনি যে কনো ভাবেই নিজেকে নিয়ে, নিজের আত্ম নিয়ে চিন্তিত নন। তাঁর সমস্ত চিন্তা যে তাঁর সেই সন্তানরা, যারা প্রকৃত অর্থে তাঁর সন্তানও নন, তিনি স্বয়ংই, কেবলই ভ্রমের কারণে তাঁরা তাঁর থেকে পৃথক।

আর তাই তিনি কখনই পঞ্চভূতে সীমাবদ্ধ নন, পঞ্চভূত তাঁর কাছে পরমাত্মীয়তায় আবদ্ধ, আর তিনি! তিনি তো সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত, আর কেবলই সন্তানহিতচিন্তায় ব্যস্ত। আর তাই সমস্ত সন্তানের ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ, আর তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত চালচলন, গতিবিধি, সমস্ত কিছু জানেন, দেখেন। তিনি কিছুই বোঝেন না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলই মূর্খরা কিছু বোঝার প্রয়াস করেন, কেবল মূর্খরাই মনে করে বুদ্ধির দ্বারা তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডকে জেনে ফেলবে। তিনি নিয়তি, তাই তিনি কেবলই অনুভব করেন।

যিনি মহাজ্ঞানী, তিনি তাঁকে, অর্থাৎ নিয়তিকে অনুভব করেই মহাজ্ঞানী। তাই তিনি স্পষ্ট ভাবে জেনে যান যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বোঝার মত কিছু নেইই, কারণ এই সম্যক ব্রহ্মাণ্ড নিছকই এক কল্পনা। তাই তিনিও জগন্মাতার প্রেরণা অনুভব করেন, আর তাই একটিও গ্রন্থ পাঠ না করে, কেবলই দুই নেত্রে যেইটুকু ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হয়, তা দেখেই তিনি সম্যক ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ধারণ করে নেন। অর্থাৎ গ্রন্থ পুঁথি পাঠ করে, হাজার হাজার, সহস্র সহস্র নামজপ করে, দিবারাত্র কীর্তন করেও কিচ্ছু লাভ নেই, যদি আত্মকে নিয়েই উলমালা থাকা হয়।

যে যখন আত্মকে নিয়ে চিন্তিত না হয়ে, কেবলই সন্তানস্নেহে পঞ্চইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যতটা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হবে, কেবল ততটাকেই অনুভব করবেন, তিনি মহাজ্ঞানী হয়েই যাবেন, কারণ তাঁর

কাছে ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত তত্ত্বসহ স্বয়ং ধরা পড়ে যাবে। আর যিনি নামজপ, কীর্তন, পুঁথিপাঠ করেই যাবেন আর নিজেকে নিয়ে, নিজের ইচ্ছা, নিজের কল্পনা, নিজেকে নিয়ে, নিজের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে যাবেন, তিনি ক্রমশ অজ্ঞানতার অথৈ সাগরে নিমজ্জিত হতেই থাকবেন, কারণ তিনি নিজের সামর্থ্যকে নিজের পঞ্চভূত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখে দিচ্ছেন।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু যে যথার্থতার গুণ, আমাদের মাতা সর্বাম্বার গুণ। তিনি যে সন্তানসর্বস্ব, তিনি যে প্রেমসর্বস্ব, প্রেমই যে তাঁর একমাত্র উপাদান, আত্মবিহীন ভাবই তাঁর একমাত্র ভাব, অপার স্নেহ আর করুণাই যে তাঁর একমাত্র ভূষণ। তাই তাঁর কাছে সমস্তই স্বচ্ছ, যা অখণ্ডের কাছে অস্বচ্ছ। তাই তিনি অখণ্ডের প্রকাশ করা শঙ্কার উত্তরে বললেন, ত্রিগুণকে পরাজিত করা বিচারবিবেকের সামর্থ্যের অধিক, তাই তাঁরা কিছুতেই সক্ষম হবেনা এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে।

যেই শঙ্কার প্রসার করতে গেলেন অখণ্ড অর্থাৎ অহংকার, সেই শঙ্কা প্রত্যাবর্তন করে, তাঁকেই বেষ্টন করে ফেলে, মাতার সেই কথার কারণে। বিস্মিত সে এবার শঙ্কিত হয়ে যায় নিজের সন্তানদের নিয়ে। আত্মসর্বস্ব সে, তাই মোহই তাঁর কাছে প্রেম, প্রেমের যথার্থতা তাঁর কাছে অধরা। সে জানেও না যে দুইয়ের মধ্যে কেবল মোহই থাকে, প্রেম নয়। সে জানেও না যে যতক্ষণ দুই, ততক্ষণ মোহ; যখন এক ও একাকার, তখনই প্রেম।

তাই মোহকে প্রেম ভেবে, সে নিজের সন্তানদের জন্য ব্যকুল হতে থাকে; আশঙ্কায় জর্জরিত হতে থাকে। প্রশ্ন করে বসে স্বয়ং জগন্মাতাকে তাঁর মাতৃত্ব নিয়ে। জগন্মাতা অত্যন্ত শান্ত। আসলে তিনি যে যথার্থ, যিনি স্পষ্ট ভাবেই জানেন যে একমাত্র তিনিই অস্তি, বাকি সমস্ত কিছু নাস্তি, তাঁর কাছে আর কিসের প্রতি শঙ্কা, কাকে হারানোর ভয়, কার প্রতি মোহ! তিনি যে সমস্ত আসক্তি, সমস্ত বিরক্তি থেকে মুক্ত পরম বৈরাগী!

নিজের বিরক্তিকে বৈরাগ্য বলে, নিজেকে ও সকল আত্মকে সর্বক্ষণ ভ্রমিত করে আসা আত্ম এবার প্রকৃত বৈরাগ্যদর্শন করে স্তম্ভিত, ব্যকুল ও চিন্তিত। আর সেই চিন্তা এতটাই ব্যথিত

করতে থাকে তাঁকে যে, তিনি বাধ্য হন নিয়তির কাছে সমর্পিত হয়ে, তাঁর কাছে থেকে তাঁর সন্তানদের সুরক্ষিত করার উপায়কে।

আর তখনই নিয়তি ছায়াদেবীদের তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন যে, যতক্ষণ ছায়াদেবীরা, অর্থাৎ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা ত্রিগুণের সাথে সংযুক্ত, ততক্ষণ বিচারবিবেক কেন, স্বয়ং অখণ্ডও অর্থাৎ আত্মও কিছু করতে পারবেনা ত্রিগুণের। সেই কথাতে আর ব্যকুল হয়ে উঠলে, এবার নিয়তি অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বা অখণ্ডের সম্মুখে ছায়াদেবীদের তত্ত্ব উন্মোচন করে বলেন যে, এই ছায়াদেবীদের নির্মাতা তিনি স্বয়ং।

আর এই ছায়াদেবীরা তাঁকেই ভ্রমিত করে এসেছে, আত্ম ও অহং পৃথক, এই পাঠ প্রদান করে করে। এই ছায়াদেবীদের কারণেই ত্রিদেবী, যারা আসলে ত্রিদেবী কনোদিনই ছিলেন না, বরাবরই অখণ্ড নিয়তিই ছিলেন, যেই সত্যকে কনোদিন ছায়াদেবীরা আত্মকে বুঝতে দেননি, আর তা না বুঝেই, আত্ম নিজেকেই ত্রিগুণে বিভক্ত করে, নিজের অহংতত্ত্বকে নিজেই অস্বীকার করে এসেছে এতকাল।

অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বা অখণ্ডের সম্মুখে পরিষ্কার করে দেয় যে, ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার ফলে তিনিই ত্রিগুণে বিভক্ত হয়ে আছেন এমন অনুভব করছেন, আর তাই ত্রিগুণ স্বয়ং তাঁরই প্রকাশ। আর যেহেতু তিনি যতই ভুলে থাকুন, প্রকৃত অর্থে তিনিও তাই যা নিয়তি, অর্থাৎ তিনিও সেই ব্রহ্মই, সেই যথার্থই, তাই বিচার দ্বারা বা বিবেক দ্বারা কখনোই ত্রিগুণের নাশ সম্ভব নয়।

আর যতক্ষণ ছায়াদেবীরা অর্থাৎ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা তাঁদেরকে সহায়তা প্রদান করবেন, ততক্ষণ স্বয়ং অখণ্ডও তাঁদের নাশ করতে পারবেননা, কারণ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার নিরিখেই তাঁরা ত্রিগুণ, যতই তাঁরা বাস্তবে অহং বা আত্ম হোক। নেপথ্যে অখণ্ডকে মাতা সর্বাম্বা এই কথার মাধ্যমে, সম্যক ভাবে ছায়াপুত্রদের বিনাশের উপায় বলে দেন, ত্রিগুণকে নাশ করার উপায় বলে দেন। আর এই প্রথমবার সন্তানস্নেহে আবদ্ধ হয়ে, অখণ্ডও অনুভব করেন, আর তাই তাঁর কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাঁর করনিয় কি।

তাই ছায়াদেবীরা যারা এতকাল তাঁর সাথে ছল করে, তাঁর অহংতত্ত্বকে তাঁর থেকে পৃথক করে দেখিয়ে আসছিলেন,তাঁদের সাথে ছল করলেন, এবং তাঁদের কাছে নিয়তির সামর্থ্য ব্যখ্যা করে, নিয়তি যে ত্রিগুণের নাশ করতে উদ্যত, তা বুঝিয়ে দেন। ছায়াদেবীরা স্পষ্টই বোঝেন যে, ত্রিগুণের নাশ হলে, কিছুতেই অহংকে আত্মের থেকে দূরে রাখা যাবেনা, আর যেহেতু অহংকে আত্ম ব্রহ্মাণ্ডের শত্রু বলে চিহ্নিত করেন, তাই সেই অহং থেকে মুক্তি কামনা করবেনই, আর তা করা মাত্রই তিনি যথার্থে প্রত্যাবর্তন করবেন নিয়তির সহায়তায়, আর ব্রহ্মাণ্ডের লয় হবে।

তাই পূর্বে যেমন করে নিয়তির উপর মায়া বিস্তার করে, আত্মের সম্মুখে ত্রিদেবী উপস্থিত করে, তাঁকে ত্রিগুণে বা ত্রিদেবে বিভক্ত করেছিলেন, তাই করতে গেলেন। কিন্তু নিয়তি যে তখন ব্রহ্মঅবস্থায় ছিলেন, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ছিলেন, আর সন্তানস্নেহে প্রেমসর্বস্ব নিয়তি এখন যে পূর্ণভাবে সক্রিয়, তা জেনেও অনুভবশক্তির অভাবে, তা ভুলে গিয়ে নিয়তিকে, অর্থাৎ মাতা সর্বাম্বাকে ত্রিগুণের নাশ করতে আসা থেকে আটকাতে গেলেন ছায়াদেবীরা।

আর অখণ্ড অন্যদিকে অনুভব করে ফেলেছেন যে, তিনিও তাই যা মাতা সর্বাম্বা, আর কেবলই শূন্যতাকে অস্বীকার করে, নির্বিশেষকে নিরাকারকে অস্বীকার করে, নিষ্ক্রিয়তাকে অস্বীকার করে তিনি আত্ম বা অহং। তাই সমস্ত আত্ম তিনিই, তা তিনি বুঝে যান, কারণ ব্রহ্ম যে সমসত্ত্ব, তাঁর যে ভেদই সম্ভব নয়, তাঁর যে খণ্ডই সম্ভব নয়। তাই সমস্ত আত্ম তিনি স্বয়ং, তিনিই ত পরামাত্ম, এই মহানুভব তিনি করে ফেলেন। আর সেই অনুভব করে, ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ সমস্ত আত্মের সমস্ত চিন্তার দ্বারা, নারায়ণাস্ত্র অর্থাৎ সমস্ত আত্মের সমস্ত ইচ্ছার দ্বারা এবং পাশুপত অর্থাৎ সমস্ত আত্মের সমস্ত কল্পনার দ্বারা ত্রিগুণের নাশ করালেন বিচার ও বিবেক দ্বারা।

অন্যদিকে সকল ভূত, বিচার ও বিবেককে সম্মুখে আনলেন সেখানে যেখানে ছায়াদেবীরা একটি আচ্ছাদন ব্যবহার করে, মাতা সর্বাম্বার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মাতা সর্বাম্বা তাঁর সকল সন্তানদের নিকটে আনার জন্য বার্তালাপ দ্বারা ছায়াদেবীদের বিরত রাখলেন, আর অন্তে বিচারকে স্বয়ং আত্ম বা অখণ্ড আদেশ দিলেন, ছায়াদেবীদের আচ্ছাদনের নাশ করে দিতে। আর

তা করতেই ছায়াদেবীরা, যারা কেবলই ছায়া ছিলেন, তারা যথার্থের দর্শনমাত্রই ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

প্রত্যক্ষ অর্থে কৃতান্তের শিক্ষা এখানেই সমাপ্ত, কিন্তু সত্য অর্থে, কৃতান্তের মূল শিক্ষা তো এখানেই প্রদত্ত। কৃতান্ত স্পষ্ট করে সাধকদের কাছে বলে দিয়েছেন যে, না তো অহংকার আর না অহংকারের দ্বারা সৃজিত মায়াসেনা অর্থাৎ রিপু, পাশ বা ইন্দ্রিয় আমাদের প্রকৃত শত্রু। ছায়াদেবী, অর্থাৎ চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার বিস্তারের কারণ হলো আত্মের ভ্রম, সত্য হতে আত্ম যখন ভ্রমিত, তখনই এঁদের রচনা, আর এই ছায়াদেবীদের বশ্যতাতেই আত্ম সদা নিমজ্জিত।

মাতা সর্বাম্বা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন একপ্রকার আর্য ব্রাহ্মণদের নাম করে যে, ছায়াদেবীদের প্রভাবে এসে তাঁরা যেই পুরাণের রচনা করে অহংকারকে শত্রু করে দেখিয়ে, সেই অহংকারের প্রবাহধারা যেমন মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ, তারকাসুর, ইত্যাদিদের সাথে ত্রিদেব বা আত্মকে এবং ত্রিদেবের অনুরোধে স্বয়ং ত্রিদেবীকেও যুদ্ধে রত দেখিয়েছেন, তা কেবলই ছায়াদেবীদের দ্বারা বশীভূত হয়েই দেখিয়েছেন, কারণ প্রকৃত শত্রু তো অহংকার নয়ই।

আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ভয়, শঙ্কা, দ্বেষ, লজ্জা, হিংসা আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়রা, অর্থাৎ অহংকারের মায়াসেনাও আসলে সাধকের শত্রুই নয়। আর যখন সাধক তা উপলব্ধি করে ফেলেন, তখন এঁদের সাথে যুদ্ধে না তো ত্রিদেব বা আত্ম রত হন, আর না নিয়তি বা প্রকৃতি। এঁদেরকে তখন ব্যাস বিচার আর বিবেকই, কেবলই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনাকে ধারণ করেই দমন করে দেয়।

অর্থাৎ কৃতান্ত সাধনের উপায়ও স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিয়েছে। কৃতান্ত কেবল ব্রহ্মাস্ত্র বলেই ছেড়ে দেয়নি, স্পষ্ট করে বলেছে যে সমস্ত জীবের সমস্ত চিন্তাকে যখন সাধক নিজেরমধ্যে ধারণ করে নিতে পারে, তখন সত্ত্বগুনের নাশ এমনিই হয়ে যায়, যেই সত্ত্বগুণকে মাধ্যম করে, ছায়াদেবীরা নিজেদের চিন্তার বিস্তার করাতে থাকে।

কৃতান্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, নারায়ণাস্ত্র হলো সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের মিলিত ইচ্ছা। আর যখন সাধক নিজের উপলব্ধি করার সামর্থ্যকে বৃহৎ করতে করতে, সমস্ত যোনির সমস্ত জীবের ইচ্ছাকেই ধারণা করে নিতে সক্ষম হয়, তখন তাঁর রজগুণের নাশও স্বতঃই হয়ে যায়। আর যখন সাধক সমস্ত জীবের সমস্ত কল্পনাকে ধারণা করে ফেলে, তা হলো পাশুপত অস্ত্র, আর তার দ্বারা তমগুণের নাশও মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায়।

আর এও দেখিয়েছে কৃতান্ত যে সেই কাজ মুখ্য কর্মই নয়, আর তাই বিচার আর বিবেকই সেই কর্ম করে আসেন, না আত্ম সেই যুদ্ধে রত হন, আর না প্রকৃতি। অর্থাৎ কৃতান্ত সমস্ত সাধককে স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, অহংকার বা তার নির্মিত মায়াসেনাকে অর্থাৎ রিপুপাশ বা ইন্দ্রিয়দের ভুল করেও যেন সাধক প্রকৃত শত্রু না মনে করেন। এঁরা কেবলই হাতির দেখানো দাঁত। প্রকৃত দাঁত হলেন এই ছায়াদেবীরা, অর্থাৎ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা। আর এঁদের নাশ করার সামর্থ্য একমাত্র নিয়তির পক্ষেই সম্ভব।

আর তাই সাধককে সমর্পিত হতে হয় নিয়তির কাছে, আর সমর্পিত হয়ে আসক্তি ও বিরক্তি উভয়কেই ত্যাগ করে বৈরাগ্যধারণ করে, সমস্ত কর্তাবোধকে ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হতে হয়, এবং অহংএর সাথে সংসার করা বন্ধ করে সন্ন্যাসী হতে হয়। তবেই মাতা সর্বাম্বার সম্মুখে ছায়াদেবীদের স্থাপন করতে পারে। এই বৈরাগ্য, ব্রহ্মচারন এবং সন্ন্যাসই হলো শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, যা ধারণ করেছিলেন বলেই, বিচার আর বিবেক অহংকারে প্রবাহিত না হয়ে, ছায়াদেবীদেরকে মাতার সম্মুখে উপস্থিত হতে দেন, যা ধারণ করেই অখণ্ড অর্থাৎ আত্ম নিজের সামর্থ্যের অহংকার না করে, ছায়াদেবীদের মাতার সম্মুখে স্থাপন করতে পারেন।

অর্থাৎ কৃতান্ত নিজের শ্রেষ্ঠ সাধন শিক্ষা এই শেষ লগ্নে এসে প্রদান করেন যে, বন্ধ করো অহংকারের সাথে যুদ্ধ করা, আর অহংকারের মায়া সেনাদের সাথে যুদ্ধ করা, কারণ তা করতে থাকলে, আজীবৎকাল সেই যুদ্ধ করতেই থাকবে, আর আজীবৎকাল ছায়াদেবীরা তোমাদের উপর শাসন করতেই থাকবে, আর তোমাদের সাধনা, তপস্যা সমস্ত কিছুই হাস্যস্কর প্রমাণ করতে থাকবে। আর সেই প্রয়াস ত্যাগ করে, প্রকৃত সাধন করো, অর্থাৎ ব্রহ্মচারণ করে,

বৈরাগ্য ধারণ করে, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে, নিজেকে পরাপ্রকৃতির কাছে সমর্পণ করো। সেটিই সাধন, আর এই সাধনই একমাত্র তোমাদের লক্ষ্যে স্থিত করে, মোক্ষ প্রদান করবে।

ঋপু, যিনি আসলে বিচার, আর কেবলই আত্মের অহংকারের সাথে নিজের ভেদ ধারণা করার জন্যই বিচারের থেকে পৃথক হয়ে, জেদ ও সাহস হয়ে বিরাজ করছিল, তিনি এবার অখণ্ডের মধ্যেই লয় হয়ে যান, এবং আত্মকে পূর্ণভাবে সমর্পিত করে দেন। আত্মও নিজের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হতে ব্যস্ত হন, তবে নিয়তি বলেন যে এই ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটেছে, তাকে সর্বব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে স্থাপন করতে হবে, তাই আত্ম, বিচার, বিবেক সহ সমস্ত পঞ্চভূত তাঁর সাথে সংসারেই লিপ্ত থাকবেন। ...

রইলেন তাঁরা সকলেই পরিবার হয়ে আপনার মধ্যে, কিন্তু রইলেন কেবলই ব্রহ্মময়ী মাতা সর্বাম্বা, কারণ সকল পঞ্চভূত, বিচার, বিবেক ও স্বয়ং আত্ম আপনার অন্তরে বিরাজমান ব্রহ্মময়ী জগন্মাতার মধ্যে বিলীন হয়েই গেছিলেন। কেবলই কর্মভার সামলাতে, তাঁরা প্রকাশিত হন, আবার পুনরায় মাতার মধ্যেই লীন হয়ে থাকেন তাঁরা”।

দিব্যশ্রীর কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে এবার। যেন অন্য একজগতে সে রয়েছে, আর এই জগতে সে বলে চলেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে, “আর এই ভাবে, আত্ম উপলব্ধি করলো যে, অহংকার সে স্বয়ং, ব্রহ্মাণ্ড সে স্বয়ং, আর স্বরূপে সে ব্রহ্মই, কেবল ভ্রমের কারণে সে আত্ম বা অহং। আর উপলব্ধি করে যে নিয়তিও সেই ব্রহ্ম স্বয়ং, আর তিনি যে নিয়তি, তা তিনিই আত্ম বা অহং হয়ে নামকরণ করেন। তিনি স্বয়ং ভ্রমের বশে সক্রিয় ছিলেন, তাই ব্রহ্ম, যিনি নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়, তাঁকেও এতকাল সক্রিয় মানছিলেন। কিন্তু যতই নিষ্ক্রিয় হন তিনি, তাঁর সন্তানস্নেহ আর সেই স্নেহ থেকে অনুভববিস্তার কিন্তু যথার্থ। আত্ম তাও অনুভব করলেন যখন নিয়তিতে লীন হলেন, কারণ সমস্ত নিষ্ক্রিয়তার পরেও, তিনি মাতা সর্বাম্বার সন্তানপ্রেমকে নিরীক্ষণ করেই চললেন”।

শেষের দিকের কথা যেন দিব্যশ্রী উচ্চারণই করতে পারছিলোনা, সমস্ত কথা যেন জরিয়ে যাচ্ছিল। তাই ব্রহ্মসনাতন কন্যাকে নিজের বক্ষে স্থাপন করে, তাঁর শীরে নিজের স্নেহহস্তকে

বারংবার মৃদু দখিনাবাতাসের ন্যায় আন্দোলিত করতে থাকলেন। দিব্যশ্রী আজ যেন বিস্মিত, বিভ্রান্ত, আর সেই বিস্ময় এবং বিভ্রান্তি তাঁর অশ্রু হয়ে তাঁর পিতার বক্ষকে সিক্ত ও উর্বর করতে থাকলো।

বেশ কিছুক্ষণ পিতার, বা বলা চলে জগজ্জননীর স্নেহ লাভ করে, অতিকায় তৃপ্ত হয়ে, দিব্যশ্রী গদগদ হয়েই বললেন, "পিতা, এই সমস্ত ব্যখ্যা আমি দিলাম কি করে? আমি কি এতটাই গভীর ভাবে কৃতান্তকে অনুভব করেছি?... আমি নিজের উচ্চারিত কথা শুনে, নিজেই স্তম্ভিত। এত কিছুর অনুভব আমি কখন কিভাবে অর্জন করলাম, তা দেখেই আমি বিস্মিত"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "পুত্রী, এক মাতা যেমন সন্তানস্নেহে নিজের আত্মকে হারিয়ে ফেললে, সন্তানের সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে সম্যক ভাবে প্রত্যক্ষ করেন, আর তাই সন্তানের ব্রহ্মাণ্ডের কনোকিছুই তাঁর অজানা থাকেনা, তেমনই অনুভব এক সন্তানও করতে সক্ষম, যদি সে নিজের আত্মকে ভুলে গিয়ে মাতাসর্বস্ব হয়ে ওঠে। ... কৃতান্ত শ্রবণের কালে, তুমি নিজের আত্মকে হারিয়ে, মাতা সর্বাত্মার প্রেমে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছিলে, সর্বক্ষণ নিজের প্রিয়তমা জননীকে ব্যকুল ভাবে অনুভব করছিলে। তাই তাঁর ব্রহ্মাণ্ডও তোমার কাছে তেমনই ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে, যেমন করে এক আত্মহারা জননীর কাছে সন্তানের ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়"।

দিব্যশ্রী পুনরায় পিতার বক্ষে মাথা রেখে, "আমি জানি, আমি বললেই, আপনি আমাকে বলবেন, আপনি মাতার কেবলই এক সামান্য প্রকাশ। এখন বুঝেও গেছি, আপনি আমাকে ভোলানোর জন্য এই কথা বলেন না। আসলে আপনি নির্বিশেষ, তাই নিজের সম্বন্ধে কিছুতেই বিশেষ আখ্যা আপনি গ্রহণ করেন না। হ্যাঁ আপনি সঠিকও। সত্যই তো ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, একমাত্র অস্তি, বাকি সমস্ত কিছু নাস্তি। তাই ব্রহ্ম তো সকলেই, তাঁরাও যারা সেই সত্যকে জেনেও অনুভব করেননি, আর তাঁরাও যারা না সেই সত্যকে জেনেছেন আর না তাকে অনুভব করেছেন।

তাই আপনি সম্পূর্ণ ভাবেই সঠিক যে, আপনি একাকীই ব্রহ্মের অবতার নন, প্রতিটি আত্মই ব্রহ্মেরই অবতার। আপনি ঠিকই যে, যদি আত্মের প্রথম ধারণই মনুষ্য দেহ হতো, তাহলে হয়তো এই ভ্রমের থেকে অতি সহজেই মুক্ত হতে পারতো আত্ম যে, আত্ম সত্য আর অহং মিথ্যা। হয়তো তখন সহজেই আত্ম অনুভব করতে পারতো যে অহং আর সে অভেদ্য, কিন্তু দুইটিই মিথ্যা, সত্য এক ব্রহ্ম, যিনি অভেদ্য, তাই তাঁর কনো অণুও সম্ভব নয়, আর কনো আত্মও।

কিন্তু পিতা, কি হলে কি হতো, সে তো অনেক পরের কথা; স্বরূপে কে কি, সেও অনেক পরের কথা। কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য এই যে, সমস্ত মনুষ্যলোকে, না তো এর পূর্বের কনো ক্ষণে, আর না এই মুহূর্তে কেউ সেই সম্পূর্ণ সত্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অবস্থান করেন নি, এবং করছেন না, আপনি ছাড়া। তাই সকলের হৃদয়ে মাতা সর্বাত্মা সুপ্ত হয়েই রয়েছেন, যাকে জাগ্রত করার আহ্বান আমার আত্মকে দিয়ে করাতে আগ্রহী আপনি। তাই পিতা, আপনি নিজেকে বিশেষ মানতে না চাইলে, আপনি বিশেষ নন, কিন্তু না মানতে চাইলেও, এই জগতে, আজ পর্যন্ত যত মনুষ্য জন্ম নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র আপনিই পূর্ণভাবে নির্বিশেষ, পূর্ণ ভাবে নিয়তি হয়ে অবস্থান করছেন।

হ্যাঁ, আমি প্রত্যক্ষ করেছিও তা, আপনার নির্দেশে প্রকৃতি চালিত হয়, আপনার কথা অনুসারে নিয়তি গঠিত হয়, আপনার নির্দেশ অনুসারে জগত চালিত হয়। তাই পিতা, জগন্মাতার ক্ষুদ্র সন্তান হয়ে, আপনার এই বক্ষেই আমি তাঁকে লাভ করি। আপনিই আমার জগন্মাতা”।

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে একটি কথাও না বলে, নিজের প্রিয়তমা কন্যাকে স্নেহ প্রদান করতে থাকলেন অতি যত্নে। দিব্যশ্রী সেই স্নেহে বেশ কিছুক্ষণ আত্মভ্রমিত হয়ে রইলেন, যেন নিজেকে দিব্যশ্রী ব্রহ্মসনাতনের বক্ষে লীনই করে ফেললেন। বেশ কিছুক্ষণ পড়ে, যেন তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন আত্মে, আর তখন প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা পিতা, আমার একটি প্রশ্ন জাগছে মনে। আর সেটি এই যে, আপনি মাতা সর্বাত্মার, পরানিয়তির, বা পরব্রহ্মের, যেই নামেই তাঁকে ডাকা যাক, তাঁর পূর্ণঅবতার। তাই আপনার হৃদয়ে মাতা পূর্ণ সর্বাত্মা হয়ে বিরাজিতা ছিলেন। কিন্তু যারা তা

নন! সাধারণ জীবকটি হয়ে সাধনা করতে উদ্যত! তাঁদের হৃদয়ে তো মাতা এই ভাবে বিরাজিতা নন। তাহলে তাঁদের সকাশে আত্ম ত্রিগুণ থেকে, ত্রিদেব থেকে কিভাবে অখণ্ডে যাত্রা করবে?

না আমি সাধারণ জীবকটিদের কথা প্রশ্ন করছিনা। তাঁরা তো নিজেদের প্রয়োজনকে ধারণ করে করে, একসময়ে যথার্থকে কামনা করেন, এবং যেই দেহে তা কামনা করেন, সেই দেহে তিনি সাধক হয়ে ওঠেন। আমার প্রশ্ন সেই সাধকদের নিয়েই। তাঁদের হৃদয়ে তো আর আপনার হৃদয়ের ন্যায়, মাতা সর্বাম্বা অর্থাৎ পরানিয়তি অখণ্ডরূপে বিরাজ করেন না! তাঁদের হৃদয়ে তো ত্রিদেবীই বিরাজ করেন, হ্যাঁ হতে পারে ছায়াদেবীদের মায়ার কারণেই তাঁরা ত্রিদেবী, কিন্তু সেই ত্রিখণ্ডিত ভাবই তো থাকে। তাহলে তাঁদের আত্ম অখণ্ড হবে কি করে? তাঁদের ভ্রম ঘুচবে কি করে?”

নিয়তি বিজ্ঞান

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তিনি কখনোই ত্রিদেবী নন পুত্রী। তিনি কেবলই আর্যব্রাহ্মণদের নিরিখেই ত্রিদেবী। যিনি এই ব্রাহ্মণদের অহংপত্রিকাসমূহ, অর্থাৎ যাকে তুমি বলো হিন্দুধর্মগ্রন্থ, তা পাঠ করেছেন, বা তার পাঠ শুনেছেন, তাঁর কাছেই তিনি ত্রিদেবী। কিন্তু যিনি অন্য বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, বা ঈশার ধর্মগ্রন্থ, বা মহম্মদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছেন, তাঁর নিরিখে উনি ত্রিদেবী কনোকালেই নন।

আমার কথার অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণদের এই অহংআরাধনার কারণে, কেবল যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলেন, তাঁরাই ত্রিদেবীর কল্পনা করেন। কিন্তু যারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ না পাঠ করে অন্য কনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁদের ধর্মগ্রন্থে ত্রিদেবীর বিভাজন নেই, তাই সেই ত্রিদেবীর কল্পনাও তাঁরা করেন না। আর যারা কনো ধর্মগ্রন্থই পাঠ করেন না, বা শ্রবণও করেন না, তাঁদের কাছে তিনি ত্রিদেবী নন”।

দিব্যশ্রী পিতার বক্ষদেশ থেকে মাথা তুলে নিয়ে বিস্ময়ের সাথে বললেন, “এর অর্থ, ত্রিদেবী কেবলই ব্রাহ্মণদের কল্পনা! ... বাস্তবে কনো ত্রিদেবীর সঞ্চারই হয়না! ... নিজেদের অহংকারকে স্থাপনা করার পরিকল্পনা হলো নিয়তিকে ত্রিদেবীরূপে স্থাপনা করে, ত্রিগুণদ্বারা তাঁদেরকে পদানত করা!”

ব্রহ্মসনাতন পুত্রীকে আর বিস্তারে বলতে হলো না, তাই মুখটিপে স্নেহহাস্য প্রদান করলে, দিব্যশ্রী উত্তেজিত হয়ে গিয়ে বললেন, “এতো ছলনার পর ছলনা পিতা! ... প্রথম তো আত্ম আর অহংকে পৃথক জ্ঞান করানোর প্রয়াস করেছে ব্রাহ্মণরা, আর তার দ্বারা ভ্রমিত করেছে আমাদের। ... কিন্তু এতেই সেই শয়তানগুলি থেমে থাকেনি! যেই নিয়তির কনো খণ্ডই সম্ভব নয়, তাকে ত্রিখণ্ডে বিভাজিত করে ত্রিদেবী করে, ত্রিদেবের অর্থাৎ ত্রিগুণের দাসী করে রাখার প্রয়াস করেছে সেই মূর্খরা!

... পিতা আমার আবারও একই প্রশ্ন। নিয়তির পূর্ণ প্রকাশ না আপনি! আপনার পূর্বেও তো নিয়তি একাধিক অংশ অবতার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা এই ব্রাহ্মণের অহংকারপত্রিকাগুলি, এই বেদ, পুরাণগুলিকে ভস্ম কেন করে দেন নি! ... কেন নিয়তি এই মিথ্যাচারের কথনকে সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছেন!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, আমিও তোমাকে একই উত্তর প্রদান করি তাহলে। পুত্রী, মৃত্যু যদি সত্য সত্যই নাশ হতো, তবে কি আর ভস্মকে অহংকারের প্রতিমূর্তি শিব ধারণ করতো? মৃত্যু যদি সত্য সত্যই অন্ত হতো, তবে কি নিয়তি একটি যোনিকেও কাল্পনিক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হতে দিতো? ... তাই সেই পুঁথিদের ভস্ম করে কি হবে, যা কোটি কোটি আত্ম সত্য বলে মেনে নিয়েছে! ... প্রয়োজন সত্যের স্থাপনা, প্রয়োজন যথার্থের স্থাপনা। যখন যথার্থ সেই আত্মদের হৃদয়ে অনুভূত হয়ে যাবে, তাঁরা স্বতঃই সেই সমস্ত পুঁথিকে নাশ করে দেবে, ঠিক যেমন যার এই অনুভব হয়ে গেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা ও কাল্পনিক, তিনি যেমন তাকে ত্যাগ দিয়ে শূন্যে সমাধিস্থ হয়ে যান, তেমনই ভাবে।

পুত্রী, কুকর্মকে মুছে ফেলার প্রয়াস বৃথা কালজ্ঞাপন ব্যতীত কিছুই নয়। কালের খাতায় যেই কর্ম স্থাপিত হয়ে গেছে, তাকে মুছে ফেলা যায়না। প্রয়োজন সুকর্মের। এক সুকর্মই প্রকাশ্যে এসে বলে দেয় যে, অনুভব ছিলনা, তাই কুকর্ম করা হয়েছে; অনুভূতি হতে সুকর্ম করা হয়েছে। যাই তা সম্মুখে আসে, সাথে সাথে কুকর্ম এমনিই সকলের মন থেকে মুছে যায়। এক দুষ্কৃতি যখন সংশোধনাগার থেকে নির্গত হয়ে, নিজের সর্বস্ব লুটিয়ে দেন কিছু জনকজননীহীন শিশুদের নবজীবন প্রদান করার জন্য, তখন সমাজ বলে, এতদিনে এঁর বিবেক জাগ্রত হয়েছে, না এঁর সমস্ত দোষ এবার মাফ হয়ে গেল।

তেমনই পুত্রী, করে যাওয়া কুকর্মকে বিনষ্ট করে স্বর্গ স্থাপনের প্রয়াস এক মূর্খের কর্ম। জ্ঞানী হয়ে ওঠো, অনুভবি হয়ে ওঠো। তখন আর কিছুকেই মুছতে চাইবে না, বরং কিছু সুন্দর গড়তে চাইবে, সত্যকে স্থাপনা করতে চাইবে। অন্ধকারকে চলে যেতে বললে, সে চলে যায়না পুত্রী। দীপক জ্বালালে তবেই অন্ধকার যায়। তেমনই সত্যের দীপক জ্বালো, মূর্খতা ও অহংকারের অন্ধকার এমনিই দূর হয়ে যাবে। আর যদি আরো বিচার করো, তবে ব্রাহ্মণরা না চাইতেও ঠিকই লিখেছেন, খেয়াল করে দেখো।

ছায়াদেবীদের প্রভাবে, নিয়তিকে ত্রিখণ্ডিত করে, ত্রিদেবীতে পরিবর্তিত করে, অহংকার তাঁদেরকে নিজেদের অধীনে রাখতে চায়। সত্য বলতে গেলে পুত্রী, যেই ভ্রমের উপর এই জগৎসংসার, যা কল্পনা ও মিথ্যা ব্যতীত কিছুই না হয়েও সত্যরূপে নিজেকে দাবি করে, আমাদেরকে ভ্রমিত করছে, সেই ভ্রমের বিস্তারগাঁথাকে এর থেকে আর কি সহজ উপায়ে তুমি ব্যাখ্যা করতে পারো। ... হতে পারে, ব্রাহ্মণরা তাঁদের ব্যাখ্যাকে ভ্রম বশত মনে করেন যে তাঁরা সত্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, কিন্তু তা আসলে ভ্রমের ব্যাখ্যা, মিথ্যার বিজ্ঞান।

হ্যাঁ পুত্রী, বিচার করে দেখো একবার। তাঁরা তো সম্পূর্ণ অসত্যের, সম্পূর্ণ কল্পনার অসত্যতার বিজ্ঞান প্রদান করে গেছেন আমাদেরকে? ভেবে দেখো, সেই মিথ্যার বিজ্ঞানের কারণেই, আজ আমরা সত্যের সন্ধানকে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারছি। তাই না? পুত্রী, আত্ম যতই ভ্রমিত হোক,

বাস্তবে সে তো ব্রহ্মই, তাই সে ভ্রান্তি করলেও, তা ভবিষ্যতে ভ্রান্তিকে দূর করার জন্যই ভ্রান্তি করে।

তাই পুত্রী, কালে কালে অহংকার যতই মিথ্যার ব্যাখ্যা দিতে থাকবে, ততই গভীর ভাবে সত্যকে খনন করা সম্ভব হবে। ... হ্যাঁ পুত্রী, লোভী গুপ্তধনের সন্ধানে মাটি খনন করে, আর সেই খনন থেকে বৈজ্ঞানিক নূতন পদার্থের আবিষ্কার করেন। বিসর্জনে কৈলাসে, গৌরির কথনকে স্মরণ করো, "অনেক সাধু ও অসাধু সন্তানদের কারণেই কৈলাস পৌছাই আমি"। অনুভব করতে পারছো সেই কথার গভীরতাকে? সত্যে উপনীত হবার জন্য, যতটা অবদান সাধুর থাকে, ততটা অবদানই অসাধুরও থাকে। যতটা অবদান মৈত্রীর ছিল গৌরিকে কৈলাস পৌঁছে দিতে, ততটাই অবদান ভিকিরও ছিল।

তাই এই ভেদভাব কেন পুত্রী হৃদয়ের মধ্যে? কেউ কর্তা নন, না সাধু আর না অসাধু। কর্তা এক প্রেম, এক অনুভব। মূল তত্ত্ব হলো প্রেম পুত্রী। চমৎকারও সেই প্রেম আর প্রেমানুভুতিই করে, কারণ এক প্রেমই কর্তা। না প্রেমিকা, না প্রেমিক, আর না সেই প্রেমে বাঁধাপ্রদানকারি, কেউই কর্তা নন... কর্তা একাকী প্রেম, আর সেই প্রেমের সম্পূর্ণ প্রকাশ হলেন নিয়তি, মাতা সর্বাম্বা, যিনি নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়, ঠিক যেমন আমাদের চন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়।

চন্দ্র না জোয়ার করে, না ভাঁটা; না সে এক কলা হয়, না অবলুপ্ত হয়ে অমাবস্যা করে, না পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে পূর্ণিমা করে। যা কিছু করে একাকী পৃথিবীই করে। সে নিজেরই ছায়া চন্দ্রের উপর স্থাপন করে, অমাবস্যার দিনে তাঁকে পুরো ঢেকে দিয়ে, বেদনাগ্রস্ত হয়ে ভাঁটা করে। আবার সে-ই নিজের ছায়া সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিয়ে, পূর্ণিমা করিয়ে হরষিত হয়ে জোয়ার আনে। ...

চন্দ্র কিছুই করেনা, কেবলই অস্তিত্বে থাকে। তাঁর থাকাই হলো সক্রিয়তা, যতই সে নিষ্ক্রিয় হোক না কেন। ঠিক তেমনই নিয়তির অস্তিত্বই চমৎকার, তাঁর অস্তিত্বই সক্রিয়তা, যতই সে

নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হোক না কেন। তাই তিনি কর্ম না করেও কর্তা, আর তিনিই প্রেম। প্রেম ও নিয়তির মধ্যে কনো ভেদ নেই, ঠিক যেমন আত্ম ও অহংএর মধ্যে কনো ভেদ নেই"।

দিব্যশ্রী বললেন, "এর অর্থ পিতা, ত্রিদেবীর তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা হয়েও মিথ্যা নয়?... এটিই কি আপনি বলছেন?"

ব্রহ্মসনাতন হাস্যযোগে বললেন, "সঠিক পুত্রী, ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার নির্মাণ করা একটি প্রকাণ্ড মায়া, যেখানে নিয়তিকে ব্যবহার করে, আত্মের সম্মুখে নিয়তির নাম করে, নিজেদেরকেই স্থাপিত রেখে দেন। তাহলে কি সত্য অর্থে বিদ্যা নেই, শ্রী নেই, শক্তি নেই? আছে পুত্রী, আর তাঁরা কখনোই বিদ্যাপ্রদত্তা নন, শ্রীপ্রদত্তা নন, বা শক্তিপ্রদত্তা নন, বরং তিনি স্বয়ং জ্ঞান, স্বয়ং শক্তি, স্বয়ং শ্রী।

পুত্রী তিনি হলেন সাখ্যাত নিয়তি, স্বয়ং জগন্মাতা, প্রকৃত তিনি, ব্রহ্মই কিন্তু সক্রিয় আত্মের নিরিখে তিনি সক্রিয় প্রকৃত। আর তিনি আমাদের সমস্ত জীবের, সমস্ত অজীবের, সকল অণুর চেতনা। তাঁর অবস্থান আমাদের হৃদয়ে, কিন্তু এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে তিনি কেবল আমাদের এই সম্পূর্ণ দেহের এই হৃদপিণ্ডেই অবস্থান করছেন। যদি এই তনুকেই বলো, তবে এঁর প্রতিটি কোষের হৃদয়ে তিনি অবস্থান করেন, কারণ এই প্রতিটি কোষ একটি করে আত্ম, আর সেই আত্মের চেতনা তিনিই।

পুত্রী, তিনিই একাকী সত্য, আর সেই সত্যের কনো অংশ বা কনো ভিন্নরূপ নেই। প্রকৃত অর্থে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, অব্যাক্ত, কারণ তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু আত্ম বিভ্রান্ত, আর সেই বিভ্রান্তির নিরিখে তিনি সক্রিয় চেতনা, নিয়তি ও যথার্থ। পুত্রী, সমস্ত কিছুই কল্পনা, আত্মের কল্পনা, অহংকারের কল্পনা। কিন্তু সেই কল্পনার মধ্যে সাখ্যাত নিয়তি নিহিত রয়েছেন, আর তাঁর উপস্থিতির কারণে কনোকিছুকেই কল্পনা মনে হয়না, সমস্ত কিছুকেই যথার্থ মনে হয়।

তবে কি তিনি যুক্ত থাকার কারণে আমরা ভ্রমিত হচ্ছি! হয়তো, কিন্তু তিনি নিযুক্ত না থেকেই বা কি করে অবস্থান করতেন। তাঁর তো কনো ভিন্ন অবস্থানের স্থানই নেই, কারণ তাঁর অন্তরেই

তো আত্মরা সমস্ত কল্পনা করছে। অর্থাৎ না চাইলেও তিনি সমস্ত কিছুর সাথে নিযুক্ত। আর নিযুক্ত না হয়েও, তিনি সত্য অর্থেও সমস্ত কিছুর সাথে নিযুক্ত।

হ্যাঁ প্রকৃত ও যথার্থ কেবল তিনিই, তাই ভগবানের আখ্যা একমাত্র তাঁরই জন্য সম্ভব, আর কারুর জন্য নয়। কিন্তু তিনি তো সাখ্যাত প্রেম। আর তাই তাঁর প্রেম অনুভূত হয় প্রতিটি আত্মে। আর তাই তাঁকে প্রতিটি আত্মের, আত্মের নির্মিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী বলা হয়, কারণ তিনি সত্য অর্থেই মা।

হ্যাঁ পুত্রী, তাঁকে কেউ নিয়তি মানলেন না মানলেন না, তাঁকে কেউ যথার্থ মানলেন না মানলেন না, তাঁকে কেউ ভগবান মানলেন না মানলেন না, সেই দিকে তাঁর কনো হুঁশই নেই, কারণ তিনি হলেন মা, আর তাই সর্বক্ষণ প্রতিটি সন্তান, যারা আদপে সন্তানও নয়, কেবলই বিভ্রান্তির কারণেই তাঁরা সন্তান, আসলে তাঁরা তিনিই, কারণ তাঁর বাদে কনো কিছুর অস্তিত্বই সম্ভব নয়, সেই সন্তানদের নিজের কাছে ফিরে পেতে সদাব্যস্ত।

না তিনি কনো যাত্রা করেন না, কিন্তু বলতে গেলে, তিনিই সমস্ত যাত্রা করেন, কারণ আর কে আছেনই বা যে তিনি যাত্রা করবেন! ... পুত্রী, সমস্ত বিদ্যা অর্জন তাঁকে জানার জন্য কারণ তিনি স্বয়ং বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান তাঁকে জানার জন্যই কারণ তিনিই জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তাঁকে অনুভব করার জন্যই কারণ তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব। তাই তাঁর কথা বলতে গেলে, সমস্ত কথা অসমাপ্তই থেকে যাবে, কারণ তিনি যে অব্যক্ত"।

দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু পিতা, আমি তাঁর কথা জানতে চাই। বলতে গেলে, আমি তাঁর ব্যাপারে জানতে উদগ্রীব, অন্তত তাঁর মাতৃত্বের ব্যাপারে জানার জন্য আমি ব্যকুল। অন্তত তাঁর মাতৃত্বের কথা বলুন পিতা। তাঁর ভূমিকার কথা বলুন পিতা"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "তাঁর সম্বন্ধে কিই বা আর বলি, তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে তো সমস্ত আত্মের সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একত্রিত করেও সমাপ্ত তো হবেই না, উল্টে তাঁর লেশমাত্রও বলা হবেনা। ... পুত্রী, তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব, আর তিনি হলেন শূন্য। সম্পূর্ণ ভাবে তিনি নির্বিশেষ,

অর্থাৎ তিনি এমন কনো বিশেষত্ব ধরেন না, যা তাঁর কনো একটি সন্তান বা আত্মের মধ্যে নেই। আর তিনি হলেন স্বয়ং প্রেম। না তিনি প্রেমী নন, না তিনি প্রেমিকাও নন, কারণ তাঁর তো কনো লিঙ্গই সম্ভব নয়। তিনি হলেন প্রেম। প্রেমী যখন নিজের প্রেমকে প্রত্যক্ষ করে, তখন তাঁর যথার্থতাই সম্মুখে পান তিনি, অর্থাৎ মহাশূন্যকে দর্শন করে, প্রথমে বিভোর হন, আর পড়ে তাতে লীন হয়ে মোক্ষ লাভ করেন।

অর্থাৎ পুত্রী, তাঁকে ফিরে পাওয়াই মোক্ষ, তিনিই ব্রহ্ম। আর আত্মের ভ্রমের কারণে যে সক্রিয়তা, সেই সক্রিয়তার নিরিখে তিনি ব্রহ্মময়ী। আর তাঁর ভূমিকা! ... তাঁর ভূমিকাই তো একমাত্র ভূমিকা। অজস্র আত্ম, আর তাঁদের নিজের নিজের কল্পনায় স্থিত ব্রহ্মাণ্ড হলো তাঁদের তনু। সূর্যের আত্ম যেই ব্রহ্মাণ্ডকে কল্পনা করে, তা হলো সূর্যস্বয়ং। ধরিত্রীর আত্ম যেই কল্পনা করে, সেই ব্রহ্মাণ্ড হলো ধরিত্রী কেবল। আর এই সমস্ত আত্ম একে অপরের থেকে ভিন্ন মনে করলেও, তাঁরা বাস্তবে ভিন্ন নন, তাঁরা তো তিনিই। আর তাই তাঁদের সমস্ত কল্পনার ধারা একই, আর তাই সমস্ত কল্পনা একত্রে বিরাজ করলে, তাঁরা সেই একত্রিত বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে পুনরায় ভ্রমিত হয়।

পুত্রী, আমার আত্মের দ্বারা নির্মিত ব্রহ্মাণ্ড আমার এই তনু; তোমার আত্মের দ্বারা নির্মিত ব্রহ্মাণ্ড তোমার এই তনু, আর আমরা যেহেতু স্বরূপে অভিন্ন, তাই আমরা সকলেই সকলের এই বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডকে দেখছি, আর তাঁদের সমষ্টিকেই ব্রহ্মাণ্ড ভেবে বিভ্রান্ত হচ্ছি। আর এই বিভ্রান্তির কারণে আমরা ত্রিগুণকে অর্থাৎ ত্রিদেবকে ভৌতিক জগতের কনো দূরস্থানে বলে ধারণা করি, আমাদের মাতাকেও আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করার ধারণা করি।

কিন্তু কল্পনার ভ্রম মাত্র তা। বাস্তবে, তোমার নিজস্ব ত্রিদেব আছে, যার অবস্থান তোমার অন্তরে, তোমার ত্রিগুণ হয়ে বিরাজ করছে, তোমার অহংকারের ত্রিগুণ হয়ে বিরাজ করছে। আর নিয়তি বা চেতনা তোমারই অন্তরে তোমার হৃদয়ে, তোমার প্রতিটি কোষের হৃদয়ে অবস্থান করছেন। পুত্রী, তিনি প্রাণ বলেই আমি প্রাণী, তিনি জীবন বলেই আমি জীব, তিনি অস্তি বলেই আমি

অস্তি। এই কল্পব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি কোনায় কোনায়, প্রতি কণায় কণায় তিনিই আছেন, আর তাঁর মধ্যে কনো ভেদ নেই, কারণ তিনি তো আত্মের ন্যায় বিভ্রান্ত নন।

আর তাঁর এই অভিন্নতার কারণেই, আমরা সকলে এই বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড মনে করে আসছি এবং বিভ্রান্ত হয়ে চলেছি। আর তাঁর ভূমিকা আমাদের এই কল্পজগতে কি? পুত্রী, তাঁর চেতনার কারণেই আমরা চলমান, তাঁর চেতনার কারণেই আমরা অগ্রগতিশীল, তাঁর চেতনার কারণেই আমরা অনুভব করতে ব্যকুল, তাঁর চেতনার কারণেই আমরা জ্ঞান অর্জন করতে উদ্যত।

কৃতান্ততেই তোমাকে বলেছিলাম, আত্ম কেবলই যাচনা, যোজনা ও কল্পনা করতে সক্ষম, অর্থাৎ ইচ্ছা, চিন্তা এবং কল্পনা, এই তিনই করতে সক্ষম। সেই সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার সাথে যতক্ষণ না চেতনা যুক্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ তাকে কল্পজগতেও বাস্তবে পরিণত হতে দেখতে পায়না আত্ম, তা সেই পরিণাম যতই ভ্রম হোক না কেন। তাই তিনি যুক্ত না হলে, একটি গাছের পাতাও নড়ে না, একটি হিন্দোলও ঘটেনা কনো কিছুতে। আর যান্ত্রিকতা! ... যন্ত্র কি চলে তাঁকে বিনা! ...

পুত্রী, যন্ত্রও তিনি বিনা চলেনা, কারণ যন্ত্র চলার জন্য যেই শক্তির প্রয়োজন, তা তো স্বয়ং তিনিই। এবার তুমিই বলবে, যখন তাঁর ইচ্ছা ছাড়া একটি যন্ত্র নির্মাণ বা চলমানও হতে পারেনা, তাহলে তিনি কেন এই যন্ত্র নির্মিত হতে দেন, আর কেনই বা তিনি সেই যন্ত্রকে চলমান হতে দেন। পুত্রী, মুলতত্ত্ব হলো প্রেম। তিনি হলেন স্বয়ং প্রেম, আর তাঁর প্রেম তাঁর প্রতিটি সন্তান, অর্থাৎ প্রতিটি আত্মের জন্য সমান।

প্রতিটি সন্তানকে স্বতন্ত্রতা প্রদানই যেন তাঁর তপস্যা। আর তাই যেই সন্তান যন্ত্র করতে চাইছেন, তিনি তাঁর সাথেও যুক্ত, আবার যেই সন্তান যন্ত্রের নাশ করতে চাইছেন, তাঁর সাথেও যুক্ত। যেই সন্তান ভ্রমিত ও তাঁর অন্যসন্তানদের ভ্রমিত করতে ব্যকুল, তাঁর সাথেও তিনি যুক্ত, আবার যেই সন্তান নিজেকে ভ্রমমুক্ত করে, অন্যের ভ্রমকেও নাশ করতে চাইছেন, তাঁর সাথেও

যুক্ত। সকল সন্তানকে স্বাতন্ত্রতা প্রদান, এই তাঁর মন্ত্রণা, এই তাঁর তপস্যা। আর তাই তাঁর সমস্ত সন্তান, অর্থাৎ সমস্ত আত্ম স্বতন্ত্র নিজের মত চলার জন্য।

এই স্বাতন্ত্রতা প্রদান তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর প্রেম, আর সেই প্রেমের প্রতিদানে কি চান তিনি! ... সন্তানকে নিজের কাছে ফিরে পেতে। অর্থাৎ সন্তান যাতে সমস্ত কামনাবাসনা ত্যাগ করে, নিজের যথার্থ, অর্থাৎ তাঁর মাতা, স্বয়ং ব্রহ্মময়ী নিয়তি সর্বাম্বার বক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, এই তাঁর চাওয়া। তবে এই চাওয়ার কারণে তিনি কনো প্রকার জোর খাটাননা তাঁর সন্তানদের প্রতি। এই চাওয়ার কারণে তিনি তাঁর একটি সন্তানের স্বতন্ত্রতাকেও বাঁধা দেন না।

যে যার নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার পথেই চলছে। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও তিনি এক অনাবিল যোগসূত্র স্থাপন করে রেখে দেন, যাতে কারুর স্বাতন্ত্রতার নাশ না হয়, অথচ, সকল সন্তানের কাছে তাঁদের করনিয়কে প্রকাশিত করতে পারেন। আর তাই, সকলে নিজের নিজের পথে চলতে স্বতন্ত্র, কিন্তু তিনি তাঁর সম্মুখে তাঁর অন্য কোনসন্তান কখন উপস্থিত হয়ে, কি বলবেন, কি করবেন, তা নির্দিষ্ট করতেই থাকেন।

বুঝতে পারছো, কি অসম্ভব কর্মকাণ্ড এটি! ... স্বাতন্ত্রতাতে কনো রকম হানি আনছেন না তিনি, অথচ একটি সন্তানকেও মার্গ প্রদর্শন করছেন না, এমন নয়। প্রতিটি আত্মের সম্মুখে যা কিছু উপস্থিত হচ্ছে, উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে যা কিছু বলছেন, তা সমস্তই স্বয়ং ব্রহ্মময়ীরই বচন, ততক্ষণ যতক্ষণ না কনো ভক্ত সেই কথাকে পূর্ব থেকেই বা পশ্চাতে খণ্ডন করে দেন।

কিন্তু বিচার করে দেখো পুত্রী, প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মার্গদর্শনকে উপেক্ষা করে করেই চলেন। তাঁর চলার পথকে কেউ যখনই ভ্রান্ত বলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে জেদ জন্মে যায়, আর সে সেই পথেই চলে। সেই যেই পথে যাচ্ছেনা, সেই পথ যদি কেউ বলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে সেই পথকে নিজের চলার পথ থেকে অপসারণ করে দিয়ে অন্য পথের চিন্তা করতে শুরু করে। কেন করে এমন? কারণ ছায়াদেবীদের প্রভাবে অহংকারে আবদ্ধ সমস্ত আত্ম। তাই এমন উপেক্ষা করতে থাকে জগজ্জননীর মার্গদর্শনকে।

বর্তমান জগতে তো শিক্ষকরাও সেই শিক্ষা প্রদান করছেন ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু মজার কথা এই যে, জগজ্জননী কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও একটিবারও বাঁধা দেননা, একটিও আত্মের স্বতন্ত্রতাতে। তিনি মার্গ অবশ্যই বলেন, আর সেই মার্গকে প্রায় সকলেই উপেক্ষা করেন, কিন্তু তারপরেও তিনি মার্গ বলতেই থাকেন, কিন্তু কখনোই তাঁর বলা মার্গে চলার জন্য বাধ্য করেননা কনো আত্মকে।

তাও আত্মরা নিজেদের ইচ্ছাপূর্তিতে ব্যর্থ হন। কেন? পূর্বেও তোমাকে বলেছিলাম এই গুপ্ত কথা, আর তা হল যোজনা। যার যোজনা, নিজের যোজনার সাথে যুক্ত সকলের কল্পনার সাথে সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যায়, ভৌতিক জগতে সাফল্য তিনিই পান, অন্য কেউ নন। অর্থাৎ একটি আত্মই অন্য আত্মের সাফল্যের পথে বাঁধা, বা বলা যেতে পারে যে আত্মই আত্মের সাফল্যের পিছনে বাঁধা। কিছুক্ষেত্রে আত্ম বলেও সেই কথা যে অমুকের জন্য আমার চাকরিটা হলো না, অমুকের জন্য আমার পছন্দের পাত্রকে আমি বিবাহ করতে পারলাম না। কিন্তু সেই সমস্ত কথার শেষে কাকে দোষ দেন তাঁরা, ভাগ্যকে।

আর ভাগ্য বলতে তাঁরা কাকে বোঝান? অদৃষ্টকে, অর্থাৎ যথার্থ বা নিয়তি বা মাতা সর্বাম্বাকেই। অর্থাৎ সেই মাতা সর্বাম্বাকেই দোষারোপ করা হয়, যিনি সঠিক মার্গ সমানে বলে গেলেন, আর তাঁর পথচলাকে কনো ভাবেই অবরুদ্ধ করলেন না। কিন্তু তিনি যে মা, না না, আমাদের জননীর ন্যায় মা নন, তিনি হলেন জগজ্জননী, আর তাই সেই সমস্ত আরোপ, সেই সমস্ত অভিযোগ, সেই সমস্ত দোষারোপের পরেও, তিনি সেই একই ভাবে স্বতন্ত্রতা দিতেই থাকেন, মার্গদর্শন করতেই থাকেন, আর অপবাদ শুনতেই থাকেন। আর কি করেন?

আর নীরবে নিজের অশ্রু বিসর্জন করেন, যাতে তাঁর কনো সন্তান সেই অশ্রুর সন্ধানও না পান, কারণ সেই অশ্রুর সন্ধান পেলেই যে সন্তান ব্যাথা পাবে, আর মা হয়ে সন্তানকে বেদনা দেবেন তিনি! তা কি করে হতে দিতে পারেন তিনি! ... সেই সমস্ত কিছু তো ছেড়েই দাও। অসংযত সন্তানদের ক্রোধ জন্ম নেয়, হিংসা জন্ম নেয়, কামনা জন্ম নেয়। আর সেই ক্রোধ তাঁরা স্থাপন

করেন অন্য এক আত্মের উপর, সেই হিংসা তাঁরা স্থাপন করেন অন্য এক আত্মের উপর, সেই কামনা তাঁরা স্থাপন করেন অন্য এক আত্মের উপর।

কিন্তু সকল আত্মই যে তাঁর সন্তান। তাই যার মধ্যে ক্রোধ জন্ম নিলো, হিংসা জন্ম নিলো, বা কামনা জন্ম নিলো, তাঁর ক্রোধ, হিংসা বা কামনাকে তিনি বাধিত করেন না, কারণ তা জমে থাকলে যে সন্তানেরই পীড়া হবে। কিন্তু যেই আত্মের উপর সেই সমস্ত কিছু আরোপিত হবে, তিনিও যে তাঁর সন্তান। হ্যাঁ সেই সন্তান সেই ক্রোধের, হিংসার, বা কামনার শিকার হচ্ছে, তাঁর নিজেরই ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনার ফলরূপে, কিন্তু তাও পীড়া তো তাঁর হবেই।

কিন্তু মা থাকতে সেই পীড়া কি করে তিনি তাঁর সন্তানকে হতে দিতে পারেন। তাই তিনি সেই পাত্রটিই হয়ে যান, যার উপর ক্রোধ, হিংসা, বা কামনা আরোপিত হবে। হ্যাঁ, ক্রোধ কনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়না, তবে জেনে রেখো যিনি তোমার ক্রোধকে নীরবে সইলেন, সেই ক্রোধ জগদম্বাই সইলেন। হিংসাও যে সইলেন নীরবে, সেই হিংসাও জগদম্বাই সইলেন। আর কামনাও যে সইলেন, সেই কামনাও জগদম্বাই সইলেন। আর কামনা আরোপ করার একটি স্থান সমাজে নির্মিত, যাকে বলা হয় বেশ্যালয়।

তাই স্পষ্ট ভাবে জেনে রেখো, বেশ্যালয়ে স্থিত প্রতিটি স্ত্রী, যারা সকল আত্মের কামনাকে নীরবে গ্রহণ করে যাচ্ছে, তাঁরা অন্যকেউ নন, সাখ্যাত জগদম্বার প্রকাশ। আর তাই পুত্রী, যখনই কনো মাতৃমূর্তির নির্মাণ করা হয়, তখন গঙ্গামাটি যোগার হোক বা না হোক, বেশ্যার আঙ্গিনার মাটি আবশ্যক সেই মূর্তি গঠনের জন্য। হ্যাঁ পুত্রী, এই সম্পূর্ণ সমাজের সর্বাধিক পবিত্র স্ত্রী হলেন এক বীরাঙ্গনা। এক সতী স্ত্রীর থেকেও অধিক পবিত্র তিনি, কারণ তিনি আত্মদের কামনাকে ভক্ষণ করার কারণে, সাখ্যাত জগদম্বাকে ধারণ করে বসে আছেন।

অর্থাৎ বুঝতে পারছো, তাঁর মাতৃত্বের বহর ঠিক কি প্রকার? সন্তানের ক্ষুধা শান্ত করতে, প্রয়োজনে তিনি নিজের অঙ্গকেই আহার রূপে প্রদান করে দেবেন। সন্তানের কামনা শান্ত করার জন্য, তিনি স্বয়ংই বিরঙ্গনা রূপে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে, তাঁর কামনাকে ভক্ষণ করে যান।

সমস্ত প্রহার তিনিই সহন করে, সমস্ত অপবাদ তিনিই বহন করেন, সমস্ত ক্রোধ তিনিই গ্রহণ করেন। কারণ তিনি তাঁর একটি সন্তানকেও পীড়ায় দেখতে পারেন না।

তবে আমরা কি পীড়া পাইনা! ... খেয়াল করে দেখো পুত্রী, তোমার তো বিভিন্ন অঙ্গে ভয়ানক চোট লেগেছে। তুমি কি সেই চোটে ব্যাথা পেয়েছ, নাকি রক্তক্ষরণের জন্য ভয়? কি ব্যাথা লেশমাত্রও পাওনি তাইনা! ... কি করে পাবে? যেই মুহূর্তে একটি স্থানে চোট লাগে, সেই স্থান যে অবশ হয়ে যায়, কারণ সেই ব্যাথা তো স্বয়ং আমাদের জননী ভোগ করেন। আমরা কেবলই রক্তের ভয় পাই, পীড়ার ভয় পাই, বাড়ি ফিরলে মায়ের কাছে বকা খাওয়ার ভয় পাই, চোট লাগার জন্য আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার ভয় পাই। কিন্তু চোটের ব্যাথা আমরা পাইনা। ... এইরূপ হলো তাঁর মাতৃত্বের বহর পুত্রী।

তিনি ভগবতী হতে ভুলে যান, তিনি ঈশ্বরী হতে ভুলে যান, কিন্তু একদণ্ডের জন্যও তিনি মা হতে ভোলেন না। আর তাঁর ইচ্ছা বলে কিছু নেই। তিনি পিতা নন, মাতা। পিতার দশটি সন্তান। তিনি ইচ্ছা করেন, এই সন্তানকে ডাক্তার করবো, ওই সন্তানকে ব্যারিস্টার। কিন্তু মাতা! মাতা তাঁর দশটি সন্তানকেই নিজের স্তনের বাঁটে মুখ লাগিয়ে দিয়ে, নিজের রক্তকে দুগ্ধে পরিবর্তিত করে পান করান। কনো সন্তান কৃষ্ণবর্ণ বলে, কনো সন্তান কন্যা বলে, কনো সন্তান পঙ্গু বলে, তাঁকে স্তনদান করতে অনীহা দেখান না। ব্রহ্মময়ী তেমনই। তাই তাঁকে পিতা নয়, মাতা বলা হয়, কারণ তাঁর কনো ইচ্ছা নেই, যেই সন্তানেরই ক্ষুধা লাগবে, তিনি তাঁকেই স্তনদান করবেন”।

দিব্যশ্রী পিতার ক্রোড়ে মাথা রেখে, হাস্য মুখে বললেন, “যেমন আপনি দিবারাত্র নিজের রক্তকে জল করে যান, আর কৃতান্ত নামক স্তনে তা ধারণ করতে থাকেন, আপনার সমস্ত সন্তানদের জন্য। ... যেই সন্তানই ব্যকুল হয়ে সত্যের ক্ষুধা ব্যক্ত করে ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করবেন, সেই যাতে দুগ্ধ পান করে তৃপ্ত হতে পারেন, তাই নিজের নিদ্রাবিশ্রাম নষ্ট করে, দিবারাত্র নিজের রক্তজল করে, কৃতান্ত গঠন করে গেছেন। কিন্তু পিতা, এই অনন্ত বেদনার অন্ত কবে হবে! কি করে হবে? এই অনন্ত বেদনার নাশ করার জন্য কি কিচ্ছু করা সম্ভব নয়!”

ব্রহ্মসনাতন একটি ম্লানহাস্য প্রদান করে বললেন, "যদি একে বেদনা সওয়াই বলো, তবে এঁর সমাপ্তি সেদিনই হবে যেদিন একটিও আত্ম আর ইচ্ছা, চিন্তা বা কল্পনার দ্বারা বদ্ধ থাকবেনা, আর এই মায়ের বুকে সকলে স্থান পেতে ব্যকুল হয়ে ছুটে আসবে। সন্তানের পীড়া সওয়াতে মায়ের কনো বেদনা থাকেনা পুত্রী, সন্তানকে রক্তজল করে স্তনপান করানোতেও কনো বেদনা থাকেনা, বেদনা থাকে সন্তানের উপেক্ষাতে, আর বুকফাটা আর্তনাদ থাকে যখন এই সমস্ত কিছুর পরেও, সন্তান একটিবারের জন্যও মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকায় না, তখন"।

দিব্যশ্রী বললেন, "পিতা, এবার তো আপনি সাখ্যাত উপস্থিত ছিলেন সম্পূর্ণ রূপে। সমস্ত সন্তানের প্রতি অপার প্রেমকে আমি যেটুকু পেয়েছি আপনাকে, তাতে বিস্তর অনুভব করেছি। কিন্তু আপনি এই অপার প্রেমকে বিশ্বদরবারে রাখলেন না কেন? কেন আপনি এবারে একটি জেদ ধরলেন যে, আপনি দেহে থাকা অবস্থাতে, আপনার জগতে আগমনের বার্তা কারুকেই দেবেন না!"

ব্রহ্মসনাতন ম্লান একটি হাস্য হেসে বললেন, "ভগবান সাজতে বলছো পুত্রী? ... শেষে, বিনা বিচারে এই নশ্বর শরীরকে ঈশ্বর জ্ঞানে সকলে পূজা করবে, আর আমি আনন্দিত হবো? আমার স্থানে নিজেকে একটিবার বসিয়ে দেখো পুত্রী। যেই সন্তানদের ক্ষুধার্ত মুখে কৃতান্তরূপ স্তন প্রদান করে, সমস্ত অন্ধবিশ্বাসের নাশ করে, স্বয়ংসমর্থ করার জন্য আমি ব্যস্ত, তাদের কাছে আমিই ভগবান সেজে পূজিত হবো, আর তাঁরা মনে করবে, একটি কিচ্ছু করবে না তাঁরা, আর আমি তাঁদেরকে উদ্ধার করে দেব! ... এই করতে বলছো?

পুত্রী, বিচার করে দেখো, আমাকে এই পূর্ণরূপে আস্তে হলো কেন? উদ্ধার করতে, নাকি উদ্ধারের মার্গ বলতে? সকলকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে, নাকি সকলকে বলতে যে, তোমরা স্বয়ং নিজের উদ্ধার করতে সক্ষম, যদি তোমরা যথার্থকে আঁকরে ধরো! আমি তো এটা বলতেই এসেছি না যে, আমাকে বাইরে নয়, অন্তরে সন্ধান করো। আমি তোমাদের সকলের হৃদয়ে স্থিতা হয়ে, তোমাদের চেতনা হয়ে সর্বক্ষণ তোমাদের উদ্ধারের মার্গ দেখিয়ে চলেছি, আর তোমরা সেই মার্গকে দিবারাত্র প্রত্যাখ্যান করে চলেছ।

কিন্তু এই কথা যদি আমি সম্মুখে গিয়ে বলতাম, একজনও আমার কথা শুনতো? না, একজনও শুনতো না। নিজের অন্তরে কেউ আমার সন্ধান করতো না, সকলে আমাকেই ভগবান জ্ঞানে পুজো করে সময়ের অপচয় করতো, আর নিজেদের আর ভ্রমিত করতো যে কেউ আমাদের উদ্ধার করতে এসে গেছেন। ... পুত্রী, সকলকে এটা বলার যে, যিনি তোমাদের উদ্ধার করবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বসে রয়েছেন, অনাদি কাল থেকেই তিনি তোমাদেরই অপেক্ষাতে বসে আছেন।

হ্যাঁ তিনি আমার অন্তরে রয়েছেন, সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন, কিন্তু যিনি আমার অন্তরে রয়েছেন, তিনি তোমার অন্তরেও রয়েছেন। যাহা আমি, তাহাই তুমি, যখন তুমি তোমার অন্তরে তাঁকে সন্ধান করে নেবে। আমার এই তনু ততটাই মিথ্যা, যতটা তোমার তনু। আর আমার অন্তরে বিরাজিতা সর্বাম্বা ততটাই সত্য, যতটা তোমার অন্তরে স্থিতা হয়ে তিনি সত্য। আমার অন্তরে প্রকাশিতা হয়ে সর্বাম্বা আমার উদ্ধার করবেন, আর তোমাদের সকলকে উদ্ধারের মার্গ বলে দেবেন, তাঁর কাছে পৌঁছানোর মার্গ বলে দেবেন। কিন্তু যাত্রা তোমাদেরই করতে হবে, নিজের অসত্য তুমি থেকে, নিজের যথার্থ তুমি পর্যন্ত যাত্রা।

আমি যদি সম্মুখে যেতাম, একজনও তা করতেন? একজনও আমার আরাধনা না করে, নিজের অন্তরে সর্বাম্বার সন্ধান করতেন? একজনও আমার অবয়বকে সত্য না মনে, মানতেন যে আমি তাঁদের সকলের হৃদয়ে চেতনা হয়ে বিরাজ করছি? ... তাহলে আমি সকলের সম্মুখে গিয়ে কি করতাম? আমি কি আমার পূজা হোক, তাই চাই? আমি কি নিজের পূজার প্রচলন করানোর জন্য জগতে আবির্ভূত হয়েছি?

না পুত্রী, আমার কনো পূজার প্রয়োজন নেই। আমার পূজা যেন কেউ না করে, আমি এটাই চাই। এই তনুর পূজা তো কনো মতেই নয়, কারণ এই তনু একটি কল্পনার আধার মাত্র, একটি মিথ্যা অস্তিত্ব মাত্র। আমি আমার সন্তানদের ফিরে পেতে চাই, তাঁদের পূজা পেতে চাইনা। ... সন্তান যদি দিবারাত্র মা মা বলে ডাকে আর সেই ডাক কেবলই মা, এটা চাই, মা ওটা চাই বলার জন্য হয়, সেই ডাক শুনতে শুনতে মা বিরক্ত হয়ে যায়।

মা যে কবে থেকে বসে আছে, তাঁর একটি সন্তান এসে তাঁর কাছে এসে বসে বলবে, “মা, কেমন আছো তুমি? খালি তো আমাদেরকেই সমস্ত কিছু দিয়ে যাচ্ছ? তোমার কি কিচ্ছু চাইনা!” .. (একচক্ষু অশ্রু ধারণ করে) একটি মায়ের আর কিচ্ছুর প্রয়োজন নেই পুত্রী। ... আর কনো কিচ্ছুর নয়। এঁর থেকে বড় আরাধনা আর একটি মায়ের কখনোই হতে পারেনা। এর থেকে বড় পাওনা, একটি মায়ের আর কিচ্ছু থাকতে পারেনা। ...

পুত্রী, আমি হতে পারি ব্রহ্ম, তাই একমাত্র অস্তিত্ব, কিন্তু আমি সমস্ত কিছুর আগে একজন মা। আমি তাঁদের মা, যারা আমিই, কেবলই ভ্রম বশত তাঁরা সন্তান আর আমি মা। আর তাই এই মায়ের একটিই কামনা, তাঁর সন্তানদের তাঁর বক্ষে প্রত্যাবর্তন। যেই জ্ঞান, যেই প্রেম, যেই বৈরাগ্য, যেই সুর, যেই সঙ্গীত, যেই নৃত্য, যেই কলার সাহায্যে সেই প্রত্যাবর্তন সম্ভব, তাই এই মায়ের আরাধনা। ... আর কনো আরাধনার প্রয়োজন নেই পুত্রী।

যদি সহস্র আরাধনার পশ্চাতে, মায়ের বক্ষ সন্তানহারা হয়েই থেকে যায়, সেই আরাধনার কিই বা অর্থ পুত্রী! সেই আরাধনা পাবার জন্য সবার সমক্ষে গিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাবো! এতটা নির্লজ্জ হয়ে যাবো? তাহলে অহংকার আর আমার মধ্যে ভেদ কি রয়ে গেল পুত্রী? সত্যকে যদি সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে আস্তে হয় যে, “এই শুনছো, আমি সত্য গো!” তাহলে তা আর সত্য কি ভাবে থাকে?

যদি মাকে সন্তানকে ডেকে ডেকে বলতে হয়, “এই শুনছো, আমি তোমার মা, তুমি আমার সন্তান, এসো আমার কাছে এসো!” পুত্রী, এতো মাতৃত্বের ব্যর্থতা! ... বেশ মেনে নিলাম আমি একজন ব্যর্থ হতভাগ্য মা, কিন্তু এতো সন্তানের সন্তান হবার ব্যর্থতা! ... না পুত্রী, এক মা সমস্ত কিছু সইতে পারে, কিন্তু নিজের সন্তানকে কনো অবস্থাতে বলতে পারেনা যে সে ব্যর্থ। যেই মা, নিজের সন্তানকে গিয়ে বলেন যে সে সন্তান রূপে ব্যর্থ, সেই মা কনো ভাবে মা হবার যোগ্য নন।

পুত্রী, আমি আরাধনা চাইনা, না আমি ভগবানের ভূমিকায় স্থাপিত হতে চাই। যদি অহংকারকেই ভগবানের আসন দিয়ে আমার সন্তানরা খুশী থাকে, তবে তাই থাকুক, আমার তাতে কনো আপত্তি নেই, আমার সন্তানের খুশীতেই আমি খুশী। কিন্তু আমার সন্তান আমাকে উপেক্ষা করুক, তাতেও আমার কনো বেদনা নেই। আমি তাঁদের মা, তাদের পুরো অধিকার আছে, তাঁদের মাকে উপেক্ষা করার। তাঁদের পুরো অধিকার আছে, তাঁদের মাকে পীড়া দেবার, পুরো অধিকার আছে তাঁদের মাকে যথেচ্ছা ব্যবহার করে, অপরাধ দিয়ে, দোষী সাব্যস্ত করার। তাই সমস্ত কিছু করুক তারা।

একটিই প্রার্থনা আমার সন্তানদের কাছে, আমার সন্তানরা নিজেদের মিথ্যাচারণ করে ভ্রমে আবদ্ধ করে দিও না। নিজেদের সত্যতাকে স্বীকার করো। তোমরা স্বয়ং ব্রহ্ম, তোমরা শূন্য। না তোমাদের কনো প্রকার ব্যাথা সম্ভব, না বেদনা, না জন্ম সম্ভব আর না মৃত্যু। তোমরা দেহের বন্ধন থেকে, মনের বন্ধন থেকে, বুদ্ধির বন্ধন থেকে, প্রাণের বন্ধন থেকে, উর্জার বন্ধন থেকে চিরকাল মুক্ত ছিলে, আর চিরকালই থাকবে। তোমরা কখনোই তোমাদের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার পাশে বন্দি নও। মুক্ত করো নিজেকে। যত ইচ্ছা অপবাদ দাও, তোমাদের মাতাকে। তোমাদের মাতাকে রাক্ষসী বলে আখ্যা দাও, কনো অসুবিধা নেই, কিন্তু নিজেদের স্বতন্ত্র করো।

আর তোমাদের এই ভাবে বন্দিদশায় দেখতে পারছিনা। ... এক ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনার দ্বারা বন্দি ছিলে; তারপর ত্রিগুণের দ্বারা, অহং দ্বারা বন্দি ছিলে; তাছাড়া পঞ্চভূত অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, দেহ, উর্জা, প্রাণের কাছে বন্দি ছিলে; এরা ছাড়াও ইন্দ্রিয়দের কাছে বন্দি ছিলে। সেই বন্দিদশাতেই সন্তানদের দেখে ব্যকুল থাকতাম। এখন তো আবার তার সাথে যন্ত্রদের দাস করে দিয়েছ নিজেদেরকে, ধনের দাস করে দিয়েছ নিজেদের। আর কত ভাবে নিজেদের দাস করবে? যত অধিক নিজেদের পরাধীন করো তোমরা, তত অধিক এই মায়ের হৃদয় ছিন্নবচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কনো প্রয়োজন নেই আমাকে মা বলে ডাকার, যদি তোমাদের আপত্তি থাকে। কনো প্রয়োজন নেই আমার স্তনের অমৃত পানে তোমাদের আপত্তি থাকলে। মার্কণ্ড মহাপুরাণরূপে পূর্বেও স্তনদান করেছিলাম, তোমরা তা ত্যাগ করেছিলে, এবারও তা ত্যাগ করো। তাতেও এই মায়ের

কনো বেদনা নেই। ব্যাস, নিজেদের মুক্ত করো, আর কিচ্ছু চাইনা এই মায়ের। না চাই কনো সম্মান, না চাই কনো পূজা অর্চনা, না চাই মা ডাকটিও। সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে আমি প্রস্তুত, কেবল স্বতন্ত্র হয়ে যাও”।

দিব্যশ্রী ব্রহ্মসনাতনের ক্রোড়কে আঁকড়ে ধরে বললেন, “মায়ের স্বভাব হলো ত্যাগ, আর তাই করে গেলেন সমস্ত জীবন পিতা। ... সমস্ত কিছু ত্যাগ করেই গেলেন, আর যা করেন নি ত্যাগ, তাও ত্যাগ করার অঙ্গিকার করে দিলেন, ব্যাস সন্তানের মুক্তি চাইলেন। ... বোধহয়, একেই ঈশ্বরীয় প্রেম বলে। জ্ঞান যেমন স্বয়ং ঈশ্বরী, প্রেম যেমন স্বয়ং ঈশ্বরী, ত্যাগও তেমন স্বয়ং ঈশ্বরী। ... প্রশ্ন আছে মনে, তবে আর প্রশ্ন করতে পারছিনা।

আজ আর কিছু ভাবতে ইচ্ছা করছে না, আজ আর ইচ্ছা করছে না মনকে সামান্যও গুরুত্ব দিতেও; আজ আর কিছু বুঝতে ইচ্ছাও করছে না, ইচ্ছা করছে না বুদ্ধির অস্তিত্বকে স্বীকার করতেও। আজ কেবলই অনুভব করতে ইচ্ছা করছে, তোমাকে অনুভব করতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোমাতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। জানিনা, তোমার থেকেই শুনেছি নিজেকে হারিয়ে ফেলাই, প্রকৃত অর্থে নিজেকে পাওয়া। কিন্তু সত্যি বলছি পিতা, আজ নিজেকে পেতেও ইচ্ছা করছেনা, কেবলই হারাতে ইচ্ছা করছে”।

দিব্যশ্রী এমন ভাবেই বেশ কিছুক্ষণ প্রেমপ্রলাপ করতে থাকলে, ব্রহ্মসনাতনের ক্রোড়েই নিদ্রা গেলেন। পিতা পুত্রীর ইচ্ছার মান রাখলেন, কাছ ছাড়া করলেন না পুত্রীকে, বরং তিনি পুত্রীকে নিজের ক্রোড়ে ধারণ করে, বসে থাকা অবস্থাতেই কিছুক্ষণ নিদ্রা দেলেন।

দর্শনলীলা

পরের দিন প্রভাতে দিব্যশ্রীর যখন নিদ্রা ত্যাগ হলো, তখন দেখলেন তাঁর পিতার ক্রোড়েই তিনি ঘুমিয়ে পরেছিলেন, আর পিতা তাঁর দিকে স্নেহদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। যেন কনো অপরাধ করে ফেলেছেন, এমন ভাব নিয়ে, ধরমরিয়ে উঠে বসে বললেন দিব্যশ্রী, “তুমি সারারাত ঘুমাও নি!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “যতটা দেহের প্রয়োজন, ততটা নিদ্রা দেহ গ্রহণ করেই নিয়েছে। নিশ্চিন্তে থাকো, তুমি আমার উপর কনো অত্যাচার করো নি, বরং সন্তানকে ক্রোড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে, তুমি আমাকে পরমসুখ প্রদান করেছ। ...যাও মুখহাত ধৌত করে এসে, তোমার পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপন করো”।

দিব্যশ্রী বললেন, “পিতা, আমি একটি ব্যাপারে অত্যন্ত বিভ্রান্ত, আর সেই বিষয়টি আপনাকে নিয়ে। ... পিতা, সম্বন্ধগত ভাবে আপনি আমার পিতা। কিন্তু আমার কেন আপনাকে মাতা জ্ঞান করতেই ইচ্ছা করে? না, এর কারণ এই নয় যে আমি জানি যে আপনি পরানিয়তির অবতার। হ্যাঁ, আমি জানতাম না যে কনো ত্রিদেবী নেই, ত্রিদেবী কেবলই ছায়াদেবী, মানে ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার বিভ্রান্তি, আর সেই বিভ্রান্তি যখন অহংকারের উপর প্রতিফলিত হয়, তার প্রকাশ। তবে এইব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ত্রিদেবীরই মিলিত প্রকাশ হলেন নিয়তি, আর সেই নিয়তির পূর্ণঅবতার আপনি।

কিন্তু সেই কারণে, আপনাকে মাতা বলে ধারণা করতে ইচ্ছা করে, তা নয়। এই ব্যাপারে আমি তো নিশ্চিত ছিলাম যে জগন্মাতার কনো লিঙ্গ সম্ভবই নয়। কিন্তু তবুও মাতা জ্ঞান করতে ইচ্ছা হয় আপনাকে, আর সর্বক্ষণ এই নিয়ে একটি দ্বন্দ্বে থাকি যে, আপনি আমার মাতা না পিতা। জন্ম তো আমার জননী দিয়েছেন, তাও আপনাকেই কেন মা মনে হয়, আপনাকেই কেন মা মানতে ইচ্ছা করে!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, পালিতা মাতা কি সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন বলে মা হয়েছেন?”

দিব্যশ্রী সেই কথায় একটু চিন্তিত হয়ে গিয়ে বললেন, “সত্যই তো! তিনি তো সন্তানকে জন্ম দেন নি, তারপরেও কেন তিনি মাতা! ... এর অর্থ কি জন্মদান করলেই মা হয়না, মা হবার অন্য কনো রহস্য আছে! ... কি সেই রহস্য! এই সম্বন্ধ সমূহের রহস্য কি?”

ব্রহ্মসনাতন হাস্য মুখে বললেন, “সম্বন্ধ সমূহ! কতপ্রকার সম্বন্ধ হয় জগতে পুত্রী?”

সম্বন্ধবিজ্ঞান

দিব্যশ্রী পিতার প্রশ্নে একটু হতচকিত হয়েই বললেন, “কেন, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, সন্তান, পিতা, দিদা... গুরু, আর কত কিছুই তো হয়, মালিক, সরকার... আর কত প্রকার!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বাবা! এত প্রকার সম্বন্ধ হয়? আমার তো জানা ছিল না পুত্রী! আমি তো জানতাম দুই প্রকার সম্বন্ধ হয়, মাতা সন্তানের সম্বন্ধ আর পিতা সন্তানের সম্বন্ধ, এছাড়াও যে আর সম্বন্ধ হয়, আমার তো জানা ছিল না!”

দিব্যশ্রী বেশ বুঝতে পারলেন, তাঁর পিতা তাঁকে কিছু তত্ত্বের ইঙ্গিত করছেন, কিছু বিজ্ঞানের ইঙ্গিত করছেন। তাই বললেন, “বুঝেছি পিতা, আপনি সমস্ত সম্বন্ধের সারকথা বলছেন আমায়। ... অর্থাৎ আপনি স্পষ্ট ভাবেই বলছেন, দুই প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব, একটি পিতা সন্তানের সম্বন্ধ, আর একটি মাতা সন্তানের সম্বন্ধ। ... আর এই বলতে চাইছেন যে, বাকি সমস্ত সম্বন্ধ এই দুই সম্বন্ধেরই বিভিন্ন প্রকাশ। তাই তো?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “এক্কেবারে সঠিক পুত্রী। মাত্র এই দুই প্রকারই সম্বন্ধ হয়, আর এই দুই সম্বন্ধই বিভিন্ন নামরূপ পরিবর্তন করে আমাদের সম্মুখে এসে, সম্বন্ধ জিনিসটাকেই জটিল ও রহস্যময় করে তোলে”।

দিব্যশ্রী বললেন, ‘কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই দুইই কেন? কেন একটিই নয়? কেন কেবল মাতা সন্তানের সম্বন্ধই না! কেন পিতা সন্তানের সম্বন্ধও এসে যায়?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "অহংকারের কারণে। ... যেখানে হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সম্বন্ধ, সেখানে রয়েছে মাতা সন্তানের সম্বন্ধ, আর যখনই অহংকার আর অহংকারের সম্বন্ধ, তখনই তা পিতাসন্তানের সম্বন্ধ। পিতাসন্তানের সম্বন্ধ মানেই অহংকারের ঠোকাঠুকি, আর মাতাসন্তানের সম্বন্ধ মানেই প্রবাহের ধারা। যেখানেই স্বার্থচিন্তার প্রকাশ, সেখানেই অহংকারের ঠোকাঠুকি, আর যেখানে স্বার্থের কনো স্থানই নেই, সেখানেই হৃদয়ের সম্বন্ধ, মাতাসন্তানের সম্বন্ধ। আর এই দুই সম্বন্ধই কনো লিঙ্গতে সীমাবদ্ধ নয়"।

দিব্যশ্রী বললেন, "অহংকারের ঠোকাঠুকি মানে হলো কামনার ঠোকাঠুকি, অর্থাৎ কনো একপক্ষ কিছু কামনা রাখছেন, যা তাঁর নিজের স্বার্থের সাথে জড়িত। আর যাই তা আসছে, অমনি দ্বিতীয়পক্ষও একই ভাবে নিজের স্বার্থের কামনা করছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি জটিল সম্বন্ধের নির্মাণ হচ্ছে। ... তাই তো?"

ব্রহ্মসনাতন পুত্রীর অনুভবশক্তির জন্য তৃপ্তির হাস্য হেসে বললেন, "কিছু উদাহরণ দিতে পারো এই ক্ষেত্রে?"

দিব্যশ্রী বললেন, "সমস্ত মানবসমাজ এইমুহূর্তে তো এই সম্বন্ধেরই প্রকাশ। সর্বদিশায় তো এই সম্বন্ধেরই ছড়াছড়ি! ... তাই সমস্ত কিছু তো এঁরই উপমা, এঁরই উদাহরণ। জনক বা জননী যখন সন্তানের থেকে এমন কিছু করার কামনা করছেন, যার দ্বারা তাঁদের সকলের, সমস্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থার এবং সামাজিক মানের উন্নতি হয়, এটিও যেমন একটি উদাহরণ। তেমন এই উদাহরণের মধ্যেও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন সেই উদ্দেশ্যেই জনকজননী যখন সন্তানকে একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করছেন, একটি বিশেষ ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা ধারণ করার জন্য প্রেরণ করছেন, এই সমস্তই আসে এঁর মধ্যে।

আবার কখনো কখনো এই একই কামনা থাকে, অর্থাৎ অধিক ধনের কামনা বা অধিক সামাজিক মানের কামনা, আর তার কারণেও জনকজননী সন্তানকে কনো এক বিশেষ ক্রীড়া, কনো এক বিশেষ কলায় পারদর্শী করতে চান, এবং সমানে সেই কলা বা ক্রীড়ার মাধ্যমে

সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য প্রেরণা প্রদান করেন। ... অর্থাৎ, সর্বক্ষেত্রে তো এই পিতাসন্তানের ভাবই প্রকাশিত। ...

সরকারের থেকে যখন প্রজা কিছু কামনা করছে, প্রজার থেকে সরকার যখন কিছু কামনা করছে। আবার মালিক যখন কর্মচারীর থেকে কিছু কামনা রাখছে, আবার কর্মচারী যখন মালিকের থেকে কিছু কামনা করছে। ... একই ভাবে শিক্ষকের থেকে ছাত্রছাত্রী কামনা করছে পরীক্ষায় যেই প্রশ্ন আসবে, তা যেন তিনি অগ্রিম বলে দেন। আবার শিক্ষক বা শিক্ষিকা কামনা করছেন, কেবলই উত্তর কি লিখতে হবে বলে দেবেন তিনি, আর ছাত্রছাত্রী অন্য কনো প্রশ্ন করবেন না! ... পিতা, এই তো চলছে সর্বত্র, অর্থাৎ কেবলই দুই অহংকারের ঠোকাঠুকিই সর্বত্র লাগছে।

কিন্তু এমন কনো উদাহরণই খুঁজে পাচ্ছিনা, যেখানে দুই হৃদয়ের মেল হচ্ছে। ... এমনকি পতিপত্নির সম্পর্কও তো এখন এই অহংকারের ঠোকাঠুকিই হয়ে গেছে। স্বামীর স্ত্রীর থেকে কিছু কামনা রয়েছে, আর স্ত্রীর স্বামীর থেকে, আর এই কামনার আদানপ্রদানের ভিত্তিতেই সম্বন্ধ স্থাপিত। যখনই কারুর কামনা অক্ষুণ্ণ থাকছে, তখনই সম্বন্ধে ভাঙন ধরে যাচ্ছে, তা সে পতিপত্নির সম্বন্ধেই হোক, জনকজননী এবং সন্তানের সম্পর্কেই হোক, বা ভ্রাতাদের মধ্যেই হোক, বন্ধুদের মধ্যেও হোক, বা শিক্ষক ছাত্রদের হোক, বা মালিক কর্মচারী হোক, বা সরকার ও প্রজার সম্পর্ক। ...

হ্যাঁ পিতা, একটি সঠিক জায়গা দেখতে পাচ্ছি। যখন ছোট ছিল, তখন দুই ভ্রাতার খুব বনিবনা ছিল, একে অপরকে চোখে হারাতো। আর যখনই সম্পত্তির ভাগ পাবার কামনা এসে গেল, তাই অহংকারে অহংকারে ঠোকাঠুকি লাগলো, আর সম্বন্ধে ফাটল দেখা গেল। ... এর অর্থ হলো কামনা। যখনই কামনার আদানপ্রদান, তখনই পিতাসন্তানের সম্বন্ধ। যেমন পিতার থেকে যা চাওয়া হলো, তা পিতা না দিলেই সন্তান রুষ্ট হলেন, আর সন্তানের থেকে যা চাওয়া হলো, তা সন্তান না দিলেই পিতা রুষ্ট হলেন। কিন্তু মাতা সন্তানের সম্বন্ধের ইয়ত্তা আমি করতে পারছিনা পিতা। সেই ব্যাপারে বিস্তারে বলুন না!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “সবই তো বলে দিলে তুমি পুত্রী। নতুন করে আর কিই বা বলবো। বেশ, যখন আমার থেকেই শুনতে চাইছো, তখন তোমারই কথাকে বিস্তারে বিবৃত করে বলি। ... অহংকারের উপাদান কি কি?”

দিব্যশ্রী বললেন, “তিন গুণ, আর পঞ্চভূত”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বেশ, তাহলেই বুঝতে পারছো। পিতা সন্তানের সম্পর্ক মানেই অহংকারের সাথে অহংকারের সম্বন্ধ, অর্থাৎ কারা কারা ক্রিয়া করবে? বুদ্ধি, মন, দেহ, আর তিন গুণ, যাদের থেকে সমস্ত আবেগ, অর্থাৎ লোভ, মোহ, ক্রোধ, হিংসা, কামনা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, সমস্ত কিছু ক্রিয়া করবে। ... কিন্তু মাতার সম্পদ কি? কেবলই হৃদয়। হৃদয়ের বুদ্ধি কোথায় পুত্রী? হৃদয় আবেগের কিই বা বোঝে? ... না হৃদয় এইসমস্ত কিছুই বোঝে না। সত্য বলতে গেলে, বোঝার শক্তিই নেই হৃদয়ের।

না হৃদয় কিছু বুঝতে পারে, না বুঝতে চায়। না হৃদয় কিছু ধারণা করে, না ধারণা করতে চায়। না হৃদয় কিছু মানে, না মানতে চায়। হৃদয়ের কাছে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্ম, ঠিক ভুল, পাপ পুণ্য, সাদা কালো, পুরুষ স্ত্রী, খৃষ্ট ইসলাম, এইসমস্ত কিচ্ছুর বোধ নেই। সত্য বলতে হৃদয়ের কনো বোধই নেই হৃদয় কেবলই অনুভব বোঝে। না তার বুদ্ধি আছে, আর না সে বুদ্ধি চায়; না তার মন আছে, আর না সে কিছু মানতে চায়; না তার কাছে কনো ভেদ আছে, আর না সে কনো ভেদ চায়।

আগেও বলেছি পুত্রী, পিতা তাঁর দশ সন্তানের কাকে নিয়ে বাণিজ্যে যাবে, কাকে ডাক্তার করবে, কাকে উকিল করবে, এই সমস্ত নিয়ে ভাবেন। মাতা ভাবেন না, ভাবতে পারেনও না। যেই সন্তানই ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করে, তিনি তাঁকেই ক্রোড়ে তুলে নিয়ে, তাঁর মুখ নিজের স্তনবাঁটে লাগিয়ে, তাকে আহার দেন। তাঁর কিছু কামনা থাকেনা, কিচ্ছু চাইনা তাঁর সন্তানের থেকে। তাঁর একটিই কামনা, তাঁর সন্তান যেন আনন্দে থাকে, ভালো থাকে, সুখে থাকে।

আর সন্তানকে সুখে রাখার জন্য, তিনি সমস্ত কিছু করতে পারেন। ভেদ দেখো পুত্রী। পিতা সংসার চালানোর জন্য অন্তিম অবস্থায় একটি সন্তানকে বিক্রি করে দেন। আর মাতা সন্তানদের পালন করার জন্য, নিজেকে ব্যাশ্যা করে, নিজেকে বিক্রি করে দেন। ... এই ভেদ একজন মাতার ও পিতার। পিতা হলেন অহংকার, তাই তিনি ভাবেন, মানেন, বোঝেন, চিন্তা করেন, ইচ্ছা করেন, কল্পনা করেন। আর মাতা হলেন হৃদয়, তাই তিনি কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু ভাবেন না, মানেন না, বোঝেন না, সরাসরি তা করে দেন।

দুই সন্তানের ঝগড়া হলে, দুই ছাত্রের বিবাদ হলে, পিতা বা পিতার ন্যায় শিক্ষক কি করেন। এক স্থানে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করেন যে কে ন্যায়ের পথে, কে ধর্মের পথে, তারপর সিদ্ধান্ত নেন কার পাশে তিনি দাঁড়াবেন। কিন্তু মাতা! ... মাতার ন্যায়পথে থাকা সন্তানও চাই, অন্যায় পথে থাকা সন্তানও চাই। ধার্মিকও চাই, অধর্মীও চাই। তাই তিনি কনো কিছু ভাবেন না। সরাসরি দুই বালতি জল নিয়ে এসে, দুই সন্তানের মাথায় ঢেলে দেন।

(হেসে) কি উদ্ধার করলে পুত্রী! ... মা হলেন তিনি যিনি ভেদাভেদের উর্ধ্বে। স্বার্থপর বললে, তিনি অধিক স্বার্থপরও, কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান চাইনা, তাঁর সমস্ত সন্তান চাই। ... আবার যদি যথার্থতার নজর থেকে দেখো, তবে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর, কারণ তিনি কিছুর বিবেচনা করেনই না। গঙ্গার ধারার মত তিনি পবিত্র। ঠিক যেমন গঙ্গা যতটা স্নেহপরায়ণ তাঁর বক্ষে স্নান করা হিরণের প্রতি হন, আর ততটাই স্নেহপরায়ণ তাঁর ব্যঘ্রসন্তানের প্রতিও হন, মাতা হলেন ঠিক তেমন।

মাতা সন্তানের গুণও দেখতে পাননা, দোষও দেখতে পাননা। তাঁর কাছে সন্তান মানে সন্তান, দোষী হলেও তিনি সন্তান, নির্দোষ হলেও তিনি সন্তান; গুণী হলেও, নির্গুণ বা বদগুণ সম্পন্ন হলেও। উদার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, কারণ তিনি বুদ্ধিহীন, কারণ তিনি আবেগহীন, তিনি ধর্মবোধহীন, তিনি ন্যায়বোধহীন, তিনি জটিলতা থেকে মুক্ত।

মাতা কেবলই সন্তানের হিত সন্ধান করেন। কি করলে সন্তানের সুবিধা হবে, কি করলে সন্তান নিশ্চিন্ত হবে, কি করলে সন্তান সুরক্ষিত হবে, কি করলে সন্তান তৃপ্ত হবে, এই হলো মায়ের চিন্তা। সেই সমস্ত সুবিধা, নিশ্চিন্ততা, সুরক্ষা, তৃপ্তি লাভ করার পর যদি সন্তান মাতাকে বিসর্জনও দেয়, মাতার তাতেও কনো বেদনা নেই, কিন্তু তিনি আড়াল থেকে দেখবেন, তাঁকে বিসর্জন দেবার পর, সন্তানের অসুবিধা হচ্ছেনা তো, সন্তান সুরক্ষিত তো, সন্তান তৃপ্ত তো!

যদি দেখেন যে সন্তানের মধ্যে সুরক্ষার অভাব আসছে, তৃপ্তির অভাব আসছে, নিশ্চিন্ত নয় সন্তান, অসুবিধা হচ্ছে সন্তানের, সন্তান যদি তাঁকে অপমানও করে, তারপরেও সন্তানের কাছে এসে তিনি সন্তানের সুবিধার বন্দোবস্ত করবেন, এটিই মা, কারণ তাঁর তো আবেগ নেই, তাঁর তো বুদ্ধি নেই। ছেলে নেশা করে এসেছে, তাই পিতা বলে দিলেন, “ওকে আজ ভাত দেওয়া হবেনা। ও নেশাই করুক খালি”। ... মাতা লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক সন্তানকে ভাত খাইয়ে যাবেন। দরকারে দ্বারে দাঁড়িয়ে থেকে বলবেন, “নে আমি দাঁড়িয়ে আছি। বাবা এদিকে আসছেনা। তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে নে”।

এটিই মা পুত্রী। ছেলে যখন গোগ্রাসে খাচ্ছে, তখন মা বলবে, “কেন ওসব ছাইপাঁশ গিলিস, দেখিস বাবা রাগারাগি করে। তারপরেও ওসব খাস”। ... সন্তান আশকারা পায়। তখন বোঝে না। যখন উপলব্ধি জাগে, তখন বোঝে, মা কেমন হন।

কনো অবস্থা যিনি সন্তানকে ছেড়ে দেন না, তিনি হলেন মা। যেমন কৃতান্তে দেখেছিলে, ইচ্ছাদমন করতে পারেন নি বলে রাজা প্রজাকে নিষ্কাসন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু রানি ছিলেন মা। তাই নিজের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, নিঃস্ব হয়ে গিয়েও সন্তানকে আগলে রেখেছিলেন, তিনি হলেন মা। ... পুত্রী, নিঃস্বার্থ প্রেমই হলো মা। যেখানে কিছু পাওয়ার নেই, কিচ্ছু পাওয়ার ইচ্ছাও নেই, কিচ্ছু পেলাম কিনা সেই চিন্তাও নেই, তিনিই মা। সন্তানকে নিয়ে মায়ের কনো স্বপ্ন থাকেনা। যার স্বপ্ন থাকে সন্তানকে নিয়ে কি করবেন, তিনিই হলেন পিতা।

যার, যার থেকে কিছু লাভ করার স্বপ্ন থাকে, তিনি স্ত্রী হন বা পুরুষ হন, তিনি হলেন পিতা। আর যার সন্তানের থেকে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু পাওয়ার কামনা থাকেনা, স্বপ্ন থাকে, তবে সেই স্বপ্ন হলো কেবলই দেবার স্বপ্ন, অন্তিম রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে যাবার, তিনি হলেন মা। তাই পুত্রী, মা হয়ে ওঠো। ঠিক যেমন করে মা থাকতে সন্তান মায়ের মর্ম বোঝেনা, কেবলই মায়ের আশকারা পেয়ে পেয়ে, নিজেকে সুরক্ষিত করে রাখাই সন্তানের লক্ষ্য হয়, কিন্তু একদিন সন্তান ঠিকই উপলব্ধি করে, আর তখন মায়ের জন্য সর্বদা তাঁর প্রেম জাগতে থাকে, আর সেই প্রেম একদিন তাঁকেও মা করে তোলে।

পুত্রী , মায়ের কনো তুলনা সম্ভবই নয়, কারণ মা সমস্ত কামনা, সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা, সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত। তাঁর প্রেম সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত। ... আর মাতা হবার জন্য স্ত্রীতনুর কনো আবশ্যকতা নেই। সকলের কাছেই হৃদয় আছে, সকলের কাছেই অহংকার আছে। যিনিই অহংকারকে সম্মুখে রেখে মন, বুদ্ধি, তনু দ্বারা কেবলই দেখবেন, তিনিই হলেন পিতা, তা তিনি স্ত্রী তনুতে থাকলেও পিতা, আর পুরুষতনুতে থাকলেও পিতাই। আর মাতা হলেন তিনি যিনি হৃদয় ছাড়া কিছুই রাখেন না নিজের মধ্যে, তাই তিনি কেবলই দেবার স্বপ্ন দেখেন, পাবার স্বপ্ন দেখতেও পারেন না, তা তিনি পুরুষ শরীরে থাকুন, বা স্ত্রী শরীরে থাকুন"।

দিব্যশ্রী পিতার ক্রোড়কে আর অধিক ভাবে আঁকড়ে ধরে বললেন, ‘ঠিক যেমন তুমি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমার থেকে কনো কিচ্ছু, কনো দিন কামনা করনি। কেবল আমার উন্নতি চেয়ে গেছ। আমাকে উন্নত করাই তোমার লক্ষ্য ছিল সর্বক্ষণ। বুঝেছি পিতা, আর এটি বুঝেছি যে সত্যই জগতসংসারে কিছুই বোঝার নেই। বুঝতে কেবল অহংকারই চায়, কারণ অহংকারের যে সমস্ত জগতকে জয় করার নেশা।

কিন্তু সে কিছুতেই এটা বুঝতে পারেনা যে, এই জগত তারই কল্পনার প্রকাশ। তাই যতই সে জিতবে, ততই তার কল্পনা প্রসারিত হবে, আর ততই তার না জেতা অবশিষ্ট থাকবে, উপরন্তু তার জেতার সমাপ্তি আর কনোদিনও হবেনা। সত্য অর্থে দেখলে, এই জগত বড়ই মজার।

তুমি সঠিকই বলতে, এই জগত আর জগতবাসীর উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছি আমি, কারণ আমি এঁদেরকে সঠিক ভাবে মুল্যয়নই করতে পারছিনা।

সত্যই পিতা, যখন মুল্যয়ন করতে যাচ্ছি, এঁদের অহংকারের নাচনকোদন, আর এঁদের সকলের সকলকে জিততে চাইবার সেই অসম্ভব নেশা, তা হাস্যস্কর আর রীতিমত এক হাস্যকৌতুক। এঁরা জানেও না যে তাঁরা কাকে আঘাত করছে। নিজেকেই নিজে আঘাত করে করে, নিজেকেই নিজে রক্তাক্ত করে, ভেবে যাচ্ছে যে তাঁরা জয়লাভ করেছে। ... নিজের থেকেই নিজেই কামনা করে চলেছে, আর সেই কামনা পূর্ণ হলে নিজেই করতালি দিচ্ছে, আর সেই করতালি শুনে নিজেই আনন্দ পাচ্ছে।

নিছকই শিশুর ক্রিয়া চলছে এই জগতে। এঁরা ভাবছে অন্যকে ধনহীন করেই, সে ধনবান হবে। আর এই পদ্ধতিতে তাঁরা নিজেকেই নিজে ধনহীন করছে, আর নিজেকেই নিজে ধনবান মানছে, আর তা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছে। শিশুর ক্রীড়া ছাড়া, কি আর বলবো একে! ... নিজের নাম নেওয়ানোর জন্য এঁরা ভাবছে অন্যকে বাধ্য করছে, কিন্তু সেই নাম সে নিজেই নিচ্ছে, আর নিজের মুখে নিজেরই জয়গান শুনে, সে আনন্দে বিগলিত হয়ে উঠছে। ...

হ্যাঁ কৌতুকই, অত্যন্ত কৌতুকের কথা, কিন্তু সর্বক্ষণ সেই পিতা আর সন্তানই থেকে যাচ্ছে, সেই মাতা নিজেকে পশ্চাতে রেখে কেবলই দিয়ে গেলেন, দিয়ে যাচ্ছেন, আর দিয়ে চলেছেন, তিনি সেই পথের দিকেই তাকিয়ে রইলেন, কবে তাঁর সন্তান তাঁর দিকে একটিবার তাকাবে, সেই একটিই আশা নিয়ে। হ্যাঁ পিতা, বেদনা তো কেবলই তাঁর। তিনি ছাড়া সকলে কনো না কনো ভাবে নিজেদের জন্য কৌতুক ক্রয় করেই নিচ্ছে।

কিছু ভাবে সেই কৌতুক ক্রয় না করতে পারলে, খানিক মাদক সেবন করে নিয়েও কৌতুক করেই নিচ্ছে তারা। আর তাতেও যদি কৌতুক না জন্মায়, তবে কামনাকে, হিংসাকে, ক্রোধকে সামনে রেখে কৌতুক করে নিচ্ছেই। আর আমাদের সকলের মা, সেই কামনাতে, সেই

হিংসাতে, সেই ক্রোধে তাঁর সন্তানদের কষ্ট হবে বলে, স্বয়ং এসে সেই সমস্ত কিছু সয়ে চলেছেন। ... কিন্তু এমন ভাবে আর কতদিন পিতা! ...

সকলে নিজেদের জন্য কৌতুক খুঁজে নেবেন, আর আমাদের মাতা আড়ালে বসে বসে রোদন করে যাবেন, এই অনাচার আর কতদিন চলবে? এর নিরাময় আবশ্যক পিতা। মা বৌদ্ধ সন্তানদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন, আস্থা দেখিয়েছেন মহম্মদের বংশোদ্ভূতদের উপর, আস্থা রেখেছেন বঙ্গবাসীর কাছে। আমি সকলের দ্বারে দ্বারে যাবো। সকলকে বলবো, জগন্মাতার তোমাদের জন্য ক্রন্দন করে যাচ্ছেন, আর তাই তোমাদের জন্য তাঁর অমৃতদুগ্ধ সিঞ্চন করে পাঠিয়েছেন কৃতান্ত রূপে"।

ব্রহ্মসনাতন মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ এটা সঠিক যে, জগন্মাতা ক্রন্দন করে যাচ্ছেন। কিন্তু মায়ের বেদনা কিসে? তাঁর নিজের কি কনো রকম বেদনা আছে? থাকলেও সেই বেদনার বোধ তাঁর আছে? ... না পুত্রী, তুমি কৌতুকটাই দেখতে পেলে, কিন্তু এই কৌতুকলাভ যে একটি অভিনয় মাত্র, তা অনুভব করতে পারলেনা। ... হ্যাঁ পুত্রী, তাঁর একটি সন্তানও ভালো নেই। সকলের ভালো থাকার চেষ্টা করছেন, আর ভালো থাকতে না পেরে ভালো থাকার অভিনয় করছেন।

যেন তাঁরা সকলেই জানেন যে তাঁদের জননী ব্যথিত, কারণ তাঁরা ভালো নেই। আর তাই সমস্ত সময়ে ভালো থাকার অভিনয় করে চলেছেন যাতে তাঁদের জননী এমন না অনুভব করেন যে তাঁরা ভালো নেই, আর তা অনুভব করে অধিক ব্যথিত হন। ... কিন্তু তিনি যে জগজ্জননী, তাই তাঁর সম্মুখে এই অভিনয় কি করে দাঁড়াতে পারে! তিনি যে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন, এই সমস্তই অভিনয়। আসলে তাঁর সন্তানরা ভালো নেই, কারণ দিবারাত্র অহংকারের কামনার মধ্যে তাঁরা সকলে পিষে যাচ্ছে।

তিনি যে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর একটি সন্তানও ভালো নেই, কারণ সকলে অহংকারের কামনার উগ্রতায় ধুকছে; তাঁদের জননী যাতে বেদনা না পায়, তাই অভিনয় করছে, আর অন্তরে অন্তরে

সমানে বলে চলেছে, আমাদের জননী কোথায়, যিনি আমাদের থেকে কিচ্ছু কামনা করেন না? কেবলই প্রেম করেন যিনি, কেবলই দিয়ে যান যিনি, দিতে পেরেই আনন্দ যার, তিনি কোথায়? তাঁর কাছে কি করে যাবো আমরা!

হ্যাঁ পুত্রী, এটিই সকলের অন্তরের কথা, আর তাকে সকলেই লুকিয়ে চলছে, আর তাই লুকানোর উদ্দেশ্যে যা কিছু করছে তারা, তা দেখে কৌতুক লাগছে, কারণ তা নিছকই শিশুর ক্রীড়া। আর সেই অন্তরের ক্ষুধাকে নিবারণ করার জন্যই তো, সেই সর্বক্ষণ সন্ধান করে চলা মার্গকে বলার জন্যই, সেই মায়ের কাছে যেতে চাইবার ব্যকুলতার জন্যই তো কৃতান্তরূপে মায়ের স্তনদুগ্ধ দিতে এসেছি, যা পান করা মাত্রই মার্গ লাভ করবে তাঁর সকল সন্তান।

যারা পিতার আসনে বসে, নিজেদের অহংকারদ্বারা সকলের কাছে কামনা করে যাচ্ছেন, আর শ্রম করো, আর ধন দাও আমাকে, যারা সমস্ত সময়ে বলে চলেছেন, ধন দাও আমাকে, আর তার থেকে এক ভাগ নিয়ে গিয়ে নিজেরাও অহংকার করো, তারা তো মায়ের কাছে যেতে চান না, বরং মায়ের কথা ভাবলেই তাঁদের ধুকপুকুনি শুরু হয়ে যায়। মায়ের কথা শুনলেই তাঁরা ভাবে, এই বুঝি তাঁর সন্তানরা তাঁর দিকে চলে যাবে; যদি তাঁর সন্তানরা তাঁর দিকে যেতে শুরু করে তখন আমি অধিক ধন কি করে পাবো, কি করে অধিক নাম, যশ পাবো? ... না না, আমাকে যা ধন দিচ্ছে, তার দশভাগের থেকে একভাগ দিচ্ছিলাম এতদিন, এবার দুইভাগ দেব। তাহলেই লোভ আসবে সকলের, আর সকলে থেকে যাবে।

কিন্তু পুত্রী, একটি বিশাল গোষ্ঠী মানুষ এঁদের মধ্যে রয়েছে, যারা লোভের জন্য এই ধন উপার্জন করেন না, যারা যশ চায়ও না। বাকিদের মত, তারাও মায়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের অন্তরমন সমানে তাঁদেরকে বলে চলে, কেউ তো হবে নিশ্চয়ই, যিনি আমাদের অহেতুক প্রেম করেন। তিনি কোথায়? তাঁর কাছে কি উপায়ে যাবো। একবার যদি তাঁর সন্ধান পেয়ে যাই, একবার যদি সঠিক উপায় পেয়ে যাই, তাহলে সমস্ত ছেড়েছুড়ে তাঁর কাছে চলে যাবো। তখন যতই যেখানের যত পিতা আছে, তাঁরা যতই বলুন আরো ধন লাগবে, আরো সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাগবে, আমরা তখন শুনতেও পাবো না।

তখন সেই পিতারা ক্রোধে কেউ কেউ ত্যাজ্যসন্তান করবেন, তো কেউ বিবাহবিচ্ছেদ করবেন; কেউ ক্রোধে আইন দেখাবে, তো কেউ ক্রোধে দেশদ্রোহী বলবে। তখন কিচ্ছুতে কিচ্ছু এসে যায়না। কিন্তু সেই মার্গ কোথায় পাবো? কে বলবে সেই মার্গ? ... অনেক স্থানে গেছি, অনেক প্রতিষ্ঠানে গেছি, যারা দাবি করে যে তারা সেই মার্গ বলে দেবেন। কিন্তু সমস্ত স্থানেই তো বিধি আর বিধান! ...

এই আহার করা যাবেনা, এই গ্রহণ করা যাবেনা, এই বস্তু ছোঁয়া যাবেনা, নাচতে হবে, বেসুরে হলেও গাইতে হবে; পাপ পাপ করতে হবে, ভেদভাব করতে হবে। করলামও সমস্ত কিছু, কিন্তু কিচ্ছুতেই কিচ্ছু হলো না, পেলাম না তাঁকে যার কাছে কেবলই প্রেম আর প্রেম। ... পুত্রী মনের মধ্যে ব্যাথা চেপে ধরে তাঁরা কেবলই সমস্ত কিছু মুখবুজে সহ্য করে চলেছে আর বলে চলেছে, কোথায় সে, যার কাছে কনো ভেদাভেদ নেই, কোথায় সে যে কিচ্ছু চাইবে না, কেবলই দেবে।

পুত্রী, সেই কারণেই তো, আমার সেই সন্তানদের জন্যই তো, তাঁদের মার্গ বলে দেবার জন্যই তো কৃতান্ত স্থাপন করেছি। আর তুমি দিবারাত্র যে আমাকে বলো, আমি কেন প্রকাশ্যে এসে তাঁদের হাতে এই জগন্মাতার অমৃতদুগ্ধ তুলে দিলাম না! উত্তর এই যে, তাঁরা তো আমাকে চেনেই এই ভাবে যে আমি কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু চাইনা, কেবলই দিতে চাই। তাই পুত্রী, যদি দেহধরে তাঁদের সামনে এসে দিতাম এই কৃতান্ত, তখন তো তাঁরা আমাকে যা দিতো, তা নিতেও হতো। ... আর তা যদি নিতাম, তাহলে তো তাঁদের বিশ্বাসেরই অপমান করা হবে যে আমি কিচ্ছু নিইনা, কেবলই দিই।

তাই দেহধরে, সমস্ত জীবন নিজের রক্তকে অমৃতদুগ্ধ করে, এই কৃতান্তে জমিয়ে রেখেছি। আমার সন্তানদের মধ্যে তা বিলিয়ে দিও, আর তাদেরকে বলো, তাঁদের মা, তাঁদের থেকে কিচ্ছু নেবেনা বলে, সম্মুখে আসেনি, কেবলই দিয়ে গেছে তাঁদের জন্য, তারা যা চেয়েছে – মার্গ, সেই মার্গ দিয়ে গেছে। ... আর সাথে এও বলো তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্য যে, চিন্তা না করতে যে, তাদের মা এলেন, আর তাদের সাথে দেখা না করেই চলে গেলেন। আমার এই বার্তা দিয়ে দিও, বলো আমি সকলের হৃদয়ে ছিলাম, আছি আর সদা থাকবো। যে বা যারা নিজের

ইন্দ্রয়দের, আর পঞ্চভূত, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, দেহ, উর্জা আর প্রাণকে তুয়াক্কা না করে, নিজের হৃদয়ের দিকে তাকাবে, সে আমাকেই পাবে।

বলো তাদেরকে যে, আমি সম্মুখে আসিনি, কারণ যেই দেহ আমি ধরেছিলাম, সেই দেহ তাঁদের দেহ যতটা মিথ্যা, ততটাই মিথ্যা। কেবলই তাঁদের মার্গ বলে দিতে এসেছিলাম। সত্য আমি বরাবর তাঁদের হৃদয়েই ছিলাম, আর সেখানেই আমার নিবাস। তাই আমার সেই মিথ্যা দেহকে দেখিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চাইনি। প্রতিবার আমি দেহ ধরে তাদের সম্মুখে যাই, আর তারা নিজেদের হৃদয়ে সন্ধান না করে, আমার ধারণ করা মিথ্যা শরীরটাকেই আমি ভেবে বসে।

এবার তাদেরকে আর সেই ভ্রমে স্থাপিত হতেই দেবনা, তাই আমার দেহকে দেখালামই না। কেবল আমার কাছে আসার মার্গ বলে দিয়ে গেলাম। আবারও বলছি, হ্যাঁ আমি সত্য, আমিই সত্য, আমিই একমাত্র সত্য, একমাত্র অস্তি, কিন্তু আমি এই দেহে কখনই সীমিত নই। এমন কনো দেহই সম্ভব নয় যা আমাকে সীমিত করতে পারে। আমি সকলের দেহের প্রতিটি কোষের হৃদয়ে নিবাস করি। ... তাই যেই ভুল আগেও তারা করেছে, সেই ভুল যেন না করে পুনরায়। যেন আমার কেবল নয়, কনো মানুষের তনুর আরাধনা না করে, আরাধনা যদি করতেই হয়, তবে নিজেদের হৃদয়ে যিনি আছেন, তাঁর করো।

তিনিই অসীম, তিনিই সত্য, কারণ তিনিই ঈশ্বর। প্রতিটি দেহই নশ্বর, কারণ তার জন্মও আছে আর মৃত্যুও। আর নশ্বর কখনোই ঈশ্বর হতে পারেনা, ঈশ্বরের দূত হতে পারে মাত্র। তাই আর যেন আমার এই দেহের পূজা করে, নিজেদের ভ্রমিত না করো তোমরা, তাই এই দেহকে দেখালামও না। যতটা অনিত্য, যতটা অসত্য, যতটা মিথ্যা তোমাদের তনু, ততটাই মিথ্যা আমারও তনু। তাই সেই তনুকে দেখার কনো প্রয়োজন নেই।

কৃতান্তকে ধারণ করো, কারণ তা তোমাদেরই মাতার অমৃতদুগ্ধ, আর তা পান করে, সত্যে এসো, নিজেদের মায়ের ক্রোড়ে এসো। আর ভ্রমের মধ্যে নিজেদের জরিও না। আর নতুন করে কারুর পূজা শুরু করো না, এবার একমাত্র ব্রহ্মকে ধারণ করো। তাঁর কনো রূপ নেই, কারণ

অসীমকে সাকারে স্থাপিত করা যে অসম্ভব। আমি যে মাতৃমূর্তির মুখ স্থাপন করেছিলাম, তা আমারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। এমনও ভুল করে ভেবো না যে তিনিও সত্য। তবে হ্যাঁ, তিনি সত্যে প্রবেশের দ্বার, সসীম থেকে অসীমে যাত্রার দ্বার তিনি; নশ্বর থেকে ঈশ্বরে যাত্রার দ্বার তিনি; অসত্য থেকে সত্যে যাত্রার দ্বার তিনি।

তবে আমি সত্য অর্থে কে? আমি শূন্য, আমি তাই যা নেই, আর না থেকেও আমি একাই আছি, আর অন্য কিছু সম্ভবই নয়। আর এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, আমিই কেবল শূন্য, বা শূন্য কেবল এই তনুতেই সীমিত। তোমরা সকলেই শূন্য, তোমাদের হৃদয়ের অন্তরে প্রবেশ করো, তার মধ্যে শূন্যকেই পাবে। সেই শূন্যে পদার্পণেই আনন্দ, সেই শূন্যে স্থাপিত হলেই জ্ঞান, সেই শূন্যে মিলিত হলেই প্রেম, সেই শূন্যে বিলীন হওয়াই মোক্ষ। এসো সেই শূন্যে, কারণ সেই শূন্যও তোমাদের স্বরূপ, সেই শূন্যই তোমাদের সকলের স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্র।

এখানে এলেই, সমস্ত কিছুর থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে। সকলের সকল কামনা, সকল অপমান, সকল সম্মান, সকল জন্ম, সকল মৃত্যু, সকল জিজ্ঞাসা, সকল অভিমান, সকল তিক্ততা, সকল কামনা, ইচ্ছা, কল্পনা, চিন্তা, সমস্ত কিছুর লয় এখানেই, আর এটিই তোমাদের নিজের নিবাসস্থল, তোমাদের সত্য পরিচয়। এসো, সমস্ত কিছু যেমন আছে, তেমন থাকতে দিয়ে, চলে এসো আমার কাছে। আর মিথ্যা নিয়ে মোহ না করে, চলে এসো তোমাদের মাতার কাছে, তোমাদের একমাত্র মাতার কাছে। তোমাদের প্রতি জন্মের মাতা আমিই, আর তাই এসো এই মাতার কাছে"।

দিব্যশ্রী সমস্ত কথা শুনে ব্যকুল হয়ে উঠে বললেন, "আপনি মাতা, তাই মাতার কথা তো আপনি বলে দিলেন। আপনার সন্তানদের পিতা নিজের কাছে আটকে রেখেছে, তাই পিতার কথাও আপনি বলে দিলেন। কিন্তু সন্তান কোথায় পিতা? সন্তানের মাতার প্রতি ভাবের কথা বলুন এবার। ... বলো না, সেই কথা। সন্তানের ভাব কি। সন্তানের ভাব কেমন হয়, কেমন হওয়া উচিত?"

বিচার বিজ্ঞান

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, “সন্তান! আচ্ছা পুত্রী, সন্তান বলতেই কার কথা স্মরণে আসে?”

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, “কৃতান্তের ক্ষিতীশ ও সতিশ। মানে বিচার আর বিবেক”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “একজন বাবার দিকে অর্থাৎ অহংকারের দিকে, আর অন্যজন মায়ের দিকে, মানে হৃদয়ের দিকে। কি তাই তো?”

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, “হ্যাঁ, বিবেক মানে গণেশ, যে মা অন্ত প্রাণ। মায়ের জন্য বাবার সাথে লড়াই করতেও চলে যায়। ... আচ্ছা পিতা, এই গণেশ চরিত্রও কি বৌদ্ধদের থেকেই নেওয়া? নাকি ইনার রচনা আর্যব্রাহ্মণদেরই?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “ব্রাহ্মণরা আজ পর্যন্ত কনো কিছুরই রচনা করেন নি, কেবল স্থানন্তকরন করেছেন, ভালোকে খারাপ, আর খারাপকে ভালো করেছেন। ... গণেশের বৌদ্ধ গ্রন্থে নাম হলো তিসগ বিগাদ, যিনি তন্ত্রের রক্ষাকর্তা এক বোধিসত্ত্ব। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থদের ভারতে যা কিছু অবস্থান ছিল, তাকে ব্রাহ্মণরা বিনষ্ট করে দেয়, আর তাই পড়ে যখন সমস্ত কিছুর পুনরায় আবিষ্কার করতে যাওয়া হয়, তখন এই তিসগ বিগাদের উপস্থিতি দেখে, ঐতিহাসিকরা ব্রাহ্মণদের প্রচার অর্থাৎ তাঁরাই আদি, এই প্রচারের কারণে, ভেবে বসেন যে হিন্দুদের থেকেই বৌদ্ধরা এইদেবমূর্তির ধারণা করেছেন।

যদিও, পরবর্তীতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে, আর্যব্রাহ্মণদের উত্থানের ১০ হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধদের উত্থানকে ঐতিহাসিকরা লক্ষ্য করেন তিব্বত ও চীনে। আর তিব্বতের গুহা থেকে গণেশের যেই দেওয়ালচিত্র পান তাঁরা, তার বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখেন যে, আর্যদের ভারত আগমনের প্রায় ৫ হাজার বছর আগের চিত্র তা। ... তবে এখানেও ঐতিহাসিকরা একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে, কারণ যখন আর্যদের ইতিহাস সন্ধান করা শুরু করে,

তখন ইরানের অঞ্চলে তাঁরা যে আধা মানুষ আর আধা জন্তুর মূর্তি নির্মাণ করে আরাধনা করতো, তাও আবিষ্কার হয়, আর গণেশের মূর্তি তেমনই কিছু।

কিন্তু কিছু কিছু ঐতিহাসিক এই মীমাংসাতেও আসে যে, সেই ইরানে স্থিত আর্যরা আধা মানুষ, আধা জন্তুর মূর্তি তো পূজা করতো, তবে এঁরা কনো কাহিনী রাখতো না। এই কাহানী স্থাপনের রেওয়াজ কেবল মাত্র বৌদ্ধদেরই ছিল, মানে গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী বৌদ্ধরেওয়াজ সেটি। আর যেহেতু ত্রিশের অধিক বৌদ্ধধারায় গণেশের কাহিনী উদ্ধার করেন ঐতিহাসিকরা, তাই তাঁদের দাবি এই হয় যে, গণেশ বৌদ্ধদেরই নির্মিত দেবচরিত্র, যা অন্য সমস্ত চরিত্রের ন্যায় আর্যদের দ্বারা তস্করি করা হয়।

তা সত্য যেটাই হোক, কার্ত্তিকও আছে, গণেশও আছে বৌদ্ধকথাতে, আর যেমন গণেশ একটি বোধিসত্ত্ব, তেমন কার্ত্তিকও। যেখানে গণেশ হলেন তন্ত্রের রক্ষক, সেখানে কার্ত্তিক হলেন বৌদ্ধ মঠের রক্ষক। একটু বিচার করা আবশ্যক এখানে পুত্রী। মঠে কারা থাকে?”

দিব্যশ্রী মন দিয়ে শুনছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, “বৌদ্ধ সাধুরা ... মানে ... অহংকাররা, তবে যারা অহংকার থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, সেই অহংকাররা থাকেন”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “সঠিক, আর তন্ত্র সাধনা কারা করেন?”

দিব্যশ্রী আবার বললেন, “তন্ত্র তো সুতা, অহংকারের থেকে সুতা ধরে মুক্ত হবার উপায়। নিজের পঞ্চভূত, ত্রিগুণ, ছায়াদেবীদের জ্বালিয়ে বিনষ্ট করে, অহংকারমুক্ত হবার সেই মার্গ, যেই মার্গে সাধন করা সর্বাধিক কঠিন, আর সেই মতে সাধন করে অহংকারমুক্ত হতে সব থেকে কম সময় লাগে। অর্থাৎ ১২ থেকে ২০ বছরের সাধনাতেই অহংকারের থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যে লীন হওয়া যায় তন্ত্রের মাধ্যমে। ...

মানে, বৌদ্ধধারায় কার্ত্তিক হলেন সেই অহংকারদের রক্ষক, যারা অহংকার ছেড়ে সত্যে লীন হতে চাইছেন, আর সেখানে গণেশ হলেন সেই অহংকার থেকে মুক্ত হবার প্রক্রিয়ার রক্ষক? ...

অর্থাৎ, দুইজনেই তো তবে মাতার সেবক, মাতারই কর্ম সম্পন্ন করেন! কারণ মাতা তো তাঁর সন্তানদের ফিরে পেতেই ব্যাকুল, আর এই ফিরে পাওয়া তখনই সম্ভব যখন অহংকারের নাশ হবে!

এর অর্থ কি পিতা? এর অর্থ কি এই যে, বিচারশক্তি আর বিবেক ততক্ষণ জন্মই নেয়না, যতক্ষণ না আমরা পঞ্চভূতদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের হৃদয়ের কথা শুনি?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "আর তাঁরাই হলেন প্রকৃত সন্তান"।

দিব্যশ্রী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, যেন তিনি কনো বিশেষ তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এর অর্থ, যে অহংকার যে প্রকৃত অর্থে সত্যেরই প্রকাশ, তা জেনে, সেই অহংকার সত্যের দিকে কি ভাবে অগ্রসর করে যাচ্ছে সমানে, তা প্রত্যক্ষ করে চলেছেন, তিনিই সন্তান? ... অর্থাৎ সন্তানের কাজ কি? সন্তানের কাজ হলো পর্যবেক্ষণ করা? অহংকারের বিভিন্ন প্রকাশকে নিরপেক্ষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, আর সেই অহংকারকে ধরে ধরে সত্যে যাত্রা করা?

মানে, মাতৃত্ব যেই যেই ভাবে অহংকারের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে, তার দিকে অগ্রসর হওয়াই সন্তানের কর্ম, কর্তব্য, সমস্ত কিছু? কারণ মাতৃত্বই তো মার্গ। পিতৃত্ব মানে অহংকার, আর তাকে মার্গ মনে করার অর্থ তো কামনার দেনাপাওনায় মুখ গুজে দেওয়া? ... অর্থাৎ যেই যেই ক্ষেত্র থেকে নিঃস্বার্থ প্রেম প্রবাহ হচ্ছে, সন্তানকে সেই দিশাতেই যাত্রা করতে হয়!

আর এই যাত্রার পথে, প্রয়োজন পড়ে যায় অহংকারের বিচার, অহংকারের সাথে সত্যের সম্বন্ধের বিচার, আর তাকে মস্তিষ্কদ্বারা নয়, হৃদয় দ্বারা অনুভব করতে হয়, আর হৃদয়ের অনুভবি শক্তিই তো বিবেক! ... এর অর্থ, সেই ব্যক্তিই সন্তানের ধর্ম পালন করছে, যে হৃদয়দ্বারা বিচার করে, বুদ্ধি বা আবেগ দ্বারা নয়!... এই কি মুলতত্ত্ব?"

ব্রহ্মসনাতন কন্যার যথার্থ উদ্ধারের প্রয়াসে সাফল্যে তৃপ্ত হয়ে হাস্য প্রদান করলে, দিব্যশ্রী তা দেখে ভাবুক হয়ে গেলেন, আর বলতে থাকলেন, "এর অর্থ তো বোঝার কিছুই নেই এই জগৎসংসারে! না আছে বোঝার মত কিছু, আর না আছে ভাবার মত কিছু? কেবলই অনুভব করার প্রয়োজন! কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ে, স্কুলে, কলেজে এই অনুভব করার অভ্যাস কেন করায় না পিতা! ... এই কারণে কি যে, সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা অহংকারদেরই! ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা আমাদেরকে অনুভব থেকে দূরে রাখতে চায় কারণ অনুভব এসে গেলেই হৃদয় জাগ্রত হয়ে যাবে!

হৃদয় জাগ্রত হয়ে গেলেই বিবেক জাগ্রত হয়ে যাবে, আর তা জাগ্রত হয়ে গেলেই, সমস্ত আবেগের ঘনঘটা, সমস্ত বুদ্ধির দৌরাত্ম থেমে যাবে, আর সত্যের সন্ধান আরম্ভ হয়ে যাবে! যথার্থতার বোধ জন্ম নেবে? সত্যের নেশা আমাদের মধ্যে জাঁকিয়ে বসবে? আর একবার তা বসলে, সত্য তো আমাদের অত্যন্ত নিকটে, আমরা তার কাছে এগিয়ে গেলে, অহংকারের এই কল্পরাজ্য, এই যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, সমস্ত ধুলিস্যাত হয়ে যাবে! আর ধনের পিছনে ছোঁটা থাকবেনা, আর নাম যশ, খ্যাতি কিচ্ছু থাকবেনা, কেবলই ভাতৃত্ববোধ সর্বত্র বিরাজ করবে!

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে কেবলই নতুন নতুন ভেদভাবের মধ্যে প্রবেশ করাতে ব্যস্ত? আমাদেরকে সর্বক্ষণ কে ন্যায়, কে অন্যায়, কে ধার্মিক, কে অধর্মী, কে বড়, কে ছোট, কে দুর্বল, কে সবল, এই সমস্ত শেখানোর জন্যই রয়েছে! ... এই ভেদভাবকে শিক্ষা আমাদের দেখাবে, আর বলবে, ন্যায়পরায়ণ হও, বড় হও, ধনবান হও, ক্ষমতাশালী হও, আর আমরা সেই পথে চলে, ভেদভাবকে বাস্তবায়িত করে, অহংকারের সাথে ছায়াদেবীদের সংসার বসাবো! এই কি তবে শিক্ষাব্যবস্থার মুল উদ্দেশ্য!

যদি তা না হতো, তবে তো শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে আবেগপ্রবণ হতে বলতো না, আবেগপ্রবণ না হলে আমাদেরকে বকাঝকাও করা হতনা! তা না হলে আমাদেরকে কেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সমানে বলে গেল যে বুদ্ধি খাটাও! কেন যে অধিক বুদ্ধি খাটিয়ে জটিল থেকে জটিলেশ্বর হয়ে উঠছে, তাকে শিক্ষাব্যবস্থা মাথায় করে নিয়ে নাচছে! ... যদি

সত্যশিক্ষারই প্রচলন করতে চাইতো শিক্ষাব্যবস্থা, তাহলে তো বুদ্ধি খাটানোর কথা বলতোই না, আবেগের কথা বলতোই না, বলতো অনুভবের কথা, বলতো ভাবের কথা।

কই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তো একটিবারও শেখায়নি আমাদেরকে যে যতক্ষণ দুই, ততক্ষণ মোহ! একটিবারও তো আমাদেরকে বলেনি যে প্রেম মানে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার ভাব, নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভাব! ... যদি তাই বলতো, তবে ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের কাছে শতশত কামনা সামনে রেখে, কখনোই দাবি করতো না যে তাঁরা প্রেম করে একে অপরকে?

কই শিক্ষাব্যবস্থা তো আমাদেরকে শেখায়নি বৈরাগ্যের কথা। একটিবারও বলেনি যে আসক্তি আর বিরক্তি থেকে মুক্ত হতে হয়, তবেই নিরপেক্ষ হওয়া যায়, তবেই যথার্থকে উপলব্ধি করা যায়! ... আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তো যদি কেউ কনো কিছুর প্রতি আসক্ত না হয়, তবে সেই ছাত্রছাত্রীর অবিভাবককে ডেকে এনে বলতো সন্তানকে কনো মানসিক ডাক্তার দেখাতে! ...

এর অর্থ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে যথার্থের পথে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতই নয়! আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এর মানে, আমাদেরকে নিরন্তর ভ্রমের মধ্যে ঠেলে দিতে চাইছে, আর চাইছে যাতে আমরা আরো আরো ইচ্ছা করি, আরো আরো করে সেই ইচ্ছাকে সাকার করার জন্য চিন্তা করি, আরো আরো করে সেই চিন্তাগুলো দিয়ে কল্পনা করি, যোজনা করি, আর সেই যোজনার ফাঁদে অন্যদের ফাঁসিয়ে, তাদেরকে পরাধীন করে, আমরা আমাদের অহংকারকে স্থাপন করে, সমাজের দিকপাল হয়ে উঠি! ...

এই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য! ... এই শিক্ষায় শিক্ষিতকে আমরা শিক্ষিত বলি, আর যারা এই শিক্ষার থেকে দূরে থাকে, তাঁদেরকে আমরা মূর্খ বলি! ... পিতা! এতো গোরায় গলদ! ... কে বুদ্ধি খাটাচ্ছে, কি অনুভব করতে চাইছে না, কি আবেগকেই ভাব বলছে, তাদেরকে দোষ দেওয়া তো বৃথা! তাদের তো কনো দোষই নেই। যদি শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম থেকেই আমাদেরকে এইভাবে বিভ্রান্ত করে, তবে তাদের কি দোষ! ... যদি 'অ' কে 'ক' শেখানো হয়, তবে অজগরকে তো কজগর বলবেই, এতে অবাক হবার কি আছে!

আর তাই তো করছে সকলে। আর আমরা ভাবছি, এটা কি হচ্ছে! অজগরকে কেন কজগর বলছে! ... এত উচ্চশিক্ষিত হয়েও কেন ভেদভাবের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখছে! এত শিক্ষা গ্রহণ করার পরেও, কেন উদার হতে পারছেনা! কেন কারুকে দয়ার চোখে দেখছে! কেন ভাবতে পারছেনা যে, কনো অসমানতা নেইই। ... আসলে আমাদের তো ভেদভাবই শেখানো হচ্ছে!

তাই ভাবি! যেই বাপমায়েদের প্রয়োজন ছেলের উচ্চপদবি, ছেলেকে ধনবান করে দেখা, তাকে বাণিজ্য করতে না দিয়ে, পড়াশুনা কেন শেখাচ্ছে! ভাবতাম, বোধহয় ধনবান হয়ে গেলে হৃদয়হীন যাতে না হয়ে যায় সন্তান, উচ্চপদবিধারী হয়ে গেলে সন্তান যাতে অনাচার না করে ফেলে, তাই জন্য শিক্ষিত করার ঝোঁক। কিন্তু সেই বাপমায়েদের মধ্যে চূড়ান্ত অহংকার দেখতাম, দেখতাম সন্তানকে একটি নামী স্কুলে প্রেরণ করার জন্য দেমাকে মাটিতে পা পড়েনা! হিসাবটা ঠিক মিলতো না।

আজ আমার সমস্ত হিসাব মিলে যাচ্ছে। আজ বেশ অনুভব করতে পারছি। শিক্ষাব্যবস্থা তো অহংকার নামক কাঠকে পালিশ দিয়ে চকচকে করে তোলে। আর এঁদের কাছে এঁদের সন্তানরা হলেন সেই কাঠ, যাকে পালিশ দিয়ে চকচকে করানোর জন্য তাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। তাই জন্যই না, তাঁরা সমানে তাঁদের সন্তানদের বলেন, ভালো করে পড়াশুনা না করলে, বড় হয়ে বেকার ছেলের মত ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হবে।

আমি ভাবতাম, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কি! পড়াশুনা শিখলে তো ভালো মানুষ হবে, ভালো চাকরী থোরাই পাবে! ... আসলে যে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যটাই আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। শিক্ষাব্যবস্থা তো সত্যের দিকে আমাদের অগ্রসর করেই না, আমাদেরকে আমাদের কল্পনার জগতটাকে কিভাবে গঠন করলে, তা সুখকর হতে পারে, তাই শেখায় বিদ্যালয়। আমাদের তো অনুভব করতে শেখায়ই না, যা শিখলে আমরা ভালো সন্তান হয়ে উঠবো, আর ভবিষ্যতে ভালো মা হয়ে উঠবো।

আমাদেরকে তো বুদ্ধিমান হতে শেখায়, যার দ্বারা আমরা পিতার কামনা পূর্ণ করতে পারবো, আর ভবিষ্যতে পিতা হয়ে উঠে, আরো ভালো করে কামনা করতে শিখবো। ... তাই পিতা, যদি সত্যই কিছুর প্রয়োজন আছে এক্ষণে, তবে তা হলো যথার্থ শিক্ষা। ... কিন্তু কে নেবে এই অনুভবশক্তির শিক্ষা! কার অবিভাবক তাঁর সন্তানকে এই সত্যের শিক্ষা দিতে প্রেরণ করবে? সকল অবিভাবক তো চাইবেন যাতে সন্তান নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, আর কল্পনা দ্বারা কাল সমাজের হর্তাকর্তাবিধাতা হয়ে উঠুক। অনুভবের শিক্ষা তো তাঁদেরকে হর্তাকর্তা বানাবেনা, বরং কর্তার অন্ত করে, কৃতান্ত করে তুলে, কাল জগন্মাতার কাছে প্রেরণ করবে। যথার্থের সম্মুখীন করবে তাঁদেরকে, আর জীবনের লক্ষ্যে স্থির করে, মোক্ষ প্রদান করবে।

কিন্তু কোন অবিভাবক তা চাইবে পিতা? আর যদি না চায়, তবে তো এই শিক্ষাব্যবস্থা যেমন করে এখন মানবযোনিকেই বিনষ্ট করে দিতে উদ্যত রয়েছে, তেমনই চলতে থাকবে, আর একদিন জগন্মাতাকে এই মনুষ্যযোনির নাশ করতে বাধ্য করবে!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তোমার প্রশ্নের মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর রয়েছে পুত্রী। তোমার প্রশ্ন এই না যে, কোন অবিভাবক তার সন্তানকে যথার্থের পথে প্রেরণ করবে? ... তা সকলের কি অবিভাবক আছে পুত্রী?”

দিব্যশ্রী চমকিত হয়ে বললেন, “অনাথ! ... হ্যাঁ, তাই তো অনাথ শিশু! ... যারা দিবারাত্র মায়ের সন্ধান করে ফিরছে, তাঁরাই তো যথার্থ জগন্মাতাকে মা বলে মানতে। ... যাদের কাছে অবিভাবক আছে, সেই অবিভাবকরা তো কিছুতেই তাঁদের প্রকৃত মাতার পরিচয় দেবেন না! তাঁরা তো সমানে সন্তানকে বুঝিয়ে যাবেন যে প্রকৃত মাতাপিতা তাঁরাই। যদি কনো সন্তানের জিজ্ঞাসা জাগে যে, পূর্ব জন্মেও কি তাঁরাই মাতাপিতা ছিলেন, তবে প্রয়োজনে মিথ্যাকথাও বলবেন যে, হ্যাঁ ছিলাম, বা পূর্বজন্ম বলে কিছু হয়ই না। ... কিন্তু তাও কিছুতেই বলবে না যে প্রতিটি জন্মের মাতা একজনই আর তিনি হলেন জগন্মাতা, পরানিয়তি।

তিনিই প্রকৃত জননী, আর সকলে তাঁরই সন্তান, তাদের সন্তানও তাঁরই সন্তান, আর স্বয়ং তারাও তাঁরই সন্তান। পিতার বীর্য হলো কেবলই মৃত্তিকা, যেই মৃত্তিকা দ্বারা ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ হয়, আর মাতার গর্ভ হলো ঠাকুরদালান, যেখানে ঈশ্বরের মূর্তির নির্মাণ হয় ও পূজা করা হয়। না তো পিতার বীর্য ঈশ্বরের নির্মাতা, আর না মাতার গর্ভ ঈশ্বরের নির্মাতা। তাঁরা তো মাধ্যম মাত্র, নিরাকার অনন্ত অসীম ঈশ্বরকে, সাকার সসীম নশ্বর মূর্তিতে পরিণত করে, তাঁর পরিচয় দেবার জন্য।

এই সত্য তো তাঁরা কিছুতেই বলবেন না, যতক্ষণ না তা সমাজে প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে উঠবে। তাই সেক্ষেত্রে অনাথ শিশুই সেই সঠিকজন, যারা সহজ ভাবে এই সত্যকে স্বীকার করবে, কারণ তাঁরা তো ব্যকুল নিজের মাতাকে ফিরে পেতে। ... তাঁদের কনো অবিভাবক নেই, তাই তাঁদের অহংকার কেন সঠিক ভাবে চিন্তা, ইচ্ছা বা কল্পনা করতে পারছেনা, তারও হিসাব কেউ রাখবেনা। ... তাই উচিত মাধ্যম তো তাঁরাই, যাদের মাধ্যমে সমাজে সত্যকে স্থাপিত করা যেতে পারে। ...

কিন্তু পিতা, একটি সমস্যা আছে! ... তাঁদের ভবিষ্যৎ কি হবে? যদি বিদ্যালয়ের ছাপ না থাকে, তাঁদের ভৌতিক জীবনে, তবে তো সমাজ তাঁদেরকে অস্বীকার করে দেবে। তখন ওই শিশুগুলোর কি হবে! তাঁরা তো বাণের জলে ভেসে যাবে!”

ব্রহ্মসনাতন কিছু না বলে, কেবলই মৃদু হাসলে, দিব্যশ্রী ব্যকুল হয়ে বললেন, ‘কিছু বলো না! এমন ভাবে তুমি খালি হাসছো কেন?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “আমার আদরের কন্যার মধ্যে মাতৃত্বকে দেখে আনন্দের হাসি হাসছি। ... হ্যাঁ, একেই তো মাতৃত্ব বলে, যেখানে সমস্ত সময়ে সন্তানের সুস্থতা, সন্তানের স্বীকৃতি, সন্তানের জীবনযুদ্ধতে জয়লাভের কামনা থাকে। কিচ্ছু পাবার আশা থাকেনা তাদের থেকে, কেবলই তাদেরকে সম্পন্ন করে তোলার ব্যস্ততা থাকে। ... তা দেখতে পেয়ে, তৃপ্তির হাসি হাসছিলাম”।

দিয়শ্রী বললেন, "সে না ঠিক আছে, কিন্তু কি হবে পিতা! অনাথ শিশুদের না কুড়িয়ে আনলাম। তাঁদেরকে না বুকে করে আগলে রেখে মানুষ করলাম। বুদ্ধি নয়, অনুভব শক্তির উদয় করালাম তাদের মধ্যে। জগন্মাতা, মাতা সর্বাম্বাকে তাঁদের কাছে জন্মজন্মের মা করে স্থাপন করলাম। তাঁদের জীবনের ব্রত একমাত্র তাঁদের মাতার বক্ষে ফিরে যাওয়াই, তাও না অঙ্কন করা গেল। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ কি হবে? জননী নই আমি তাঁদের, কিন্তু তাঁদের জননীর কাছে যাবার দ্বার তো বটেই।

সেই জননীর দূত হয়ে, সন্তানের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় কি করে হতে দিতে পারি পিতা! ... তাঁদের বেদনায় যে বুক ফেটে যাবে! কিছু করতে পারলাম না, তাও ঠিক আছে। কিন্তু জগন্মাতার সন্তানদেরকে পীড়ার মুখে ছেড়ে দিলে, কি ভাবে তাঁর কাছে মুখ দেখাবো পিতা! ... তিনি যেমন তাঁদেরও জননী, তেমন তো আমারও জননী। নিজের জননীর কাছে কি ভাবে মুখ দেখাবো!"

ব্রহ্মসনাতন হাস্য মুখে বললেন, "পুত্রী, চাকুরী করতে গেলে, বিদ্যালয়ের ছাপ আবশ্যক জানি। কিন্তু সাহিত্যিক হতে গেলে! অভিনেতা হতে গেলে! নাটকের নির্দেশক হতে গেলে! ... কৃষক হতে গেলে!"

দিব্যশ্রীর চিন্তিত মুখে হাসি ফুটে উঠলো। হাস্যমুখে সে বলল, "সঠিক কথা পিতা, তোমার লেখা বিসর্জনে কৈলাসের মত এমন অনেক কাহিনী আছে, যা নাট্য করার মত। তাছাড়া আমি নিজেও কাহিনী লিখি, তোমার ছত্রছায়ায় থেকে। আমার এই ছোটছোট ছেলেমেয়েরাই হবে অভিনেতা, অভিনেত্রী। ... আর তা ছাড়া, ক্ষেতি করে, নিজের পেট নিজেই পূর্তি করাকে তো ভারতের সংবিধানই রক্ষা করে। ... তা তো আমরা করতেই পারি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগছে পিতা। আমি কি আমার এই ভাবনাতে সঠিক পথে রয়েছি! ... নাকি আমি কর্তা ভাবে বয়ে যাচ্ছি সেইদিকে, যেদিকে বইলে, লক্ষ্যপ্রাপ্তি অসম্ভব?... আপনি তো বাঁধা দেন না। ভুল পথে গেলেও আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ দেখেন যতক্ষণ না খাদে পড়ে

যাবো। তাই মনে প্রশ্ন জাগলো। আপনি সমানে আমার হ্যাঁ তে হ্যাঁ দিয়ে যাচ্ছেন, তাই ... নিজেকে বিশ্বাস হয়না পিতা ঠিক। অহংকারের থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত কোথায় হয়েছি!"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "না পুত্রী, তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। ... আর সেই পথে যাত্রা শুরু করে দাও এবার। ... তোমার অনুগতও কয়েকজন রয়েছে, যারা তোমাকে তাঁদের নায়ক মনে করে। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে, ঠাণ্ডা মাথায় কর্ম সম্পন্ন করো, আর স্মরণ রেখো, ধারার নির্মাণ করো। সাফল্য একবারে আসেনা। এমন ভেবোনা যে তুমি যেই ১০-১২টি অনাথকে নিয়ে এসে গড়বে, তাতেই এই সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রার পথ খুলে যাবে।

পুত্রী, যদি এই যাত্রা আগামী এক হাজার বছরব্যাপী চলে, আর এমন ভাবেই চলে, যেখানে অনুভব শক্তি লাভই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য; জগন্মাতাকে নিজের মাতা রূপে জানাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য; আর ঈশ্বরের সাথে পরমাত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করাই হবে এই কর্মসূচির পরমার্থ। আমি কি তোমাকে অনুভব করাতে পারলাম, যা আমি বললাম তা দিয়ে?"

দিব্যশ্রী বললেন, "হ্যাঁ পিতা। আপনি এই বললেন যে, এই অনুভবের শিক্ষা পদ্ধতি যেন আমাতেই শুরু আর আমাতেই শেষ না হয়। ... যেন এই অনুভবের শিক্ষাপদ্ধতি অনন্তকাল ধরে চলে। কেবলই কারুকে কর্ণধার করে যাওয়া নয় এই আয়োজনের, যেমন মঠের ক্ষেত্রে হয়েছে। যদি তেমন হয়, তবে যেমন ব্রাহ্মণরা নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা ফিরে পেতে, মঠের অধ্যক্ষ হয়ে বসেছেন, তেমনই এই আয়োজনেরও অধ্যক্ষ হয়ে বসে, আবার সেই অহংকারের আরাধনাই করাবে।

তা যাতে না হয়, তার জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যেই কেউ হয়ে উঠবে অধ্যক্ষ, যে সর্বাধিক অনুভবের শিক্ষার প্রয়োজন বুঝেছে, যে সর্বাধিক ভাবে জগন্মাতাকে নিজের মাতাজ্ঞান করে, তাঁকে পরমাত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছে। তবেই এই আয়োজন সক্রিয় থাকবে, আর তবেই অনুভবের শিক্ষার প্রসার হবে; তবেই অহংকারের থেকে মুক্তিসাধন হবে, তবেই যথার্থের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে, আর তবেই সমাজে যথার্থের ধারার উত্থান হবে।

সর্বদা যেন সংঘের উদ্দেশ্য সম্মুখে উপস্থিত থাকে, আর তা যেন হয় যথার্থতার স্থাপন, হৃদয়ের উত্থান, পঞ্চভূতের পরাজয়, মন-বুদ্ধির থেকে মুক্তি, অহংকারের থেকে মুক্তি, আমিত্বের থেকে মুক্তি। আর তাই যদি ভবিষ্যতে কনোকালে এমন হয়ও যেখানে ব্রাহ্মণ অধ্যক্ষ হয়ে বসেন, তখন যেন কিছু শিক্ষার্থী থাকেন, যারা পুনরায় একটি নূতন আয়োজন করবেন, কিন্তু কিছুতেই অহংকারের আরাধনা করবেন না, কিছুতেই পঞ্চভূতের দাসত্ব করবে না, কিছুতেই বুদ্ধিমান হবেন না, কিছুতেই মোহকে প্রেম বলবে না।

আমার কথার অর্থ এই যে, সংঘের থেকেও বড় হবে, সংঘের উদ্দেশ্য। যদি কনো একটি সময়ে সংঘ নিজের উদ্দেশ্য থেকে সরে আসে, যেন নূতন করে নূতন সংঘ স্থাপন করে, সংঘের উদ্দেশ্যকে সমাজে স্থাপিত রাখার মানসিকতা অব্যাহত থাকে, তার নির্মাণ আবশ্যক। আপনার থেকেই শিখেছি পিতা, যোগ্য গুরু তিনিই, যিনি যোগ্য গুরুর নির্মাণ করেন। যদি একটি গুরু যোগ্য গুরুর নির্মাণ না করতে পারেন, তাহলে সমস্ত আয়োজন বৃথা হয়ে যায়। ... তাই যতটা যোগ্য গুরু হওয়ার দিকে মন দেব, ততটাই যোগ্য গুরু নির্মাণের দিকেও মনযোগী হবো পিতা। ...

আর কেবল তাই নয়, সেই যোগ্যগুরুকেও পুনরায় যোগ্য গুরু নির্মাণ করার শিক্ষা প্রদান করবো। ... কিন্তু তার জন্য আমি কিছু জানতে চাই। ... আমি আপনার থেকে গুরুর ব্যখ্যা জানতে চাই। এক আদর্শ গুরু কে? এক আদর্শ গুরুর গুনাগুণ কি? এক আদর্শ গুরু হতে গেলে, কি করা আবশ্যক, আর কি ভাবে তা নির্বাপণ করতে হয়? ... এই সম্বন্ধে আমাকে বলুন পিতা। কেমন গুরু হলে, নিজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই কারুকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে যে, সে তার গুরুর মতই গুরু হয়ে উঠতে চাইবে?”

গুরু বিজ্ঞান

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বেশ তবে গুরুর ব্যাপারে তোমাকে বলছি শোনো। এক গুরুকে মা হয়ে উঠতে হয়। আর এক মায়ের সব থেকে প্রধান গুণ হলো তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক। পুত্রী, গুরু কখনোই ছাত্রছাত্রী বা শিষ্যশিষ্যার মধ্যে কনো গুণ স্থাপন করেন না, উপরন্তু তিনি শিষ্যের মধ্যে পূর্ব থেকে থাকা গুণসমূহকে প্রকাশিত করে তোলেন।

আর তার জন্য গুরুকে যা আবশ্যক ভাবে করতে হয়, তা হলো, তাঁকে অদূরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর শিষ্যদের দেখতে হয়। ছাত্রছাত্রী যদি গুরুর উপস্থিতিকে নিরীক্ষণ করে নেন, তখন তাঁরা সংযত হয়ে ওঠে, আর এই সংযমের ফলে, তাঁদের অন্তরে স্থিত গুণ সুপ্ত হয়ে যায়, তা প্রকাশিত হতে পারেনা। তাই গুরুকে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ছাত্রছাত্রীকে দেখতে হয়। সেখানে স্থিত থেকে যখন তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করতে দেখেন, তখন সেখান থেকে তাঁদের মধ্যে থাকা সুপ্তগুণসমূহদের দর্শন করতে সক্ষম হন। আর একবার তা দর্শন করে নিলে, গুরুর কর্তব্য হলো সেই সমস্ত সুপ্তগুণকে প্রকাশিত করে তোলা।

সেই গুণদের প্রকাশিত করার জন্য গুরু মায়ার আশ্রয় করতে পারেন, এবং প্রয়োজনে ছলেরও আশ্রয় নিতে পারেন। গুরু যখন শিষ্যের অন্তরে থাকা সুপ্ত গুনের প্রকাশের জন্য মায়ার রচনা করছেন বা ছলের রচনা করছেন, তাতে কনো দোষ নেই। গুরু হলেন মাতা, আর মাতা তাঁর সন্তানকে যেকোনো মূল্যে বিকশিত করবেন, এটিই মাতার গুণ এবং মাতার বৈশিষ্ট্য।

গুরু হবেন পবিত্র, অর্থাৎ কামনাবাসনা মুক্ত, ঠিক যেমন এক জননীকেও পবিত্র হতে হয়। যেই জননীর মধ্যে কামনা বাসনার প্রকাশ থাকে, তিনি কখনোই জননী হয়ে উঠতে পারেন না, কারণ সেই কামনা, যা একমুহূর্তে অন্যত্র স্থিত, তা অন্য সেই সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, আর তা সন্তানকে সম্পূর্ণ ভাবে অহংকারকেন্দ্রিক জীবনে স্থপিত করে দেয়। তাই এক মাতার আবশ্যক গুণ হলো, তিনি সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র, অর্থাৎ সমস্ত কামনা বাসনার উর্ধ্বে তিনি স্থিতা।

আগেও বলেছি, মাতার কনো লিঙ্গ হয়না, বা কনো লিঙ্গ দেখে মাতা হন না। যিনি কেবলই দিতে চান, তিনিই মাতা, আর যিনি কিছু কামনা রেখে চলেন সর্বক্ষণ, তিনি অহংকারের ধারক বা পিতা হন। এক গুরুকে ঠিক একই ভাবে মাতা হতে হয়। তাঁর ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত শিষ্যকে দিতে থাকা। তাঁকে উত্তম চরিত্র দিতে থাকা, তাঁকে হৃদয়ের সাথে পরিচিতি দিতে থাকা, তাঁকে প্রেমের যথার্থ পরিচয় দিতে থাকা, তাঁকে অহংকারের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করতে থাকা, বা এক কথায় সমস্ত ভ্রমকে অপসারণ করে, সত্যপথকে শিষ্যের সম্মুখে উন্মোচন করাই এক গুরুর প্রকৃত পরিচয়।

গুরুর মুখনিঃসৃত প্রতিটি অক্ষর শিষ্যের কাছে ঈশ্বর-আদেশ। তাই গুরুর আদেশে প্রশ্ন করা শিষ্যশিষ্যার কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এমন মুখ বুঝে আজ্ঞা পালন করার মত বিশ্বাস সকল শিষ্যের থাকবেনা, কারণ সকল শিষ্যের বিশ্বাস উচ্চস্তরের হবেনা। তাই গুরুর কর্তব্য হলো, যদি তিনি কনো আজ্ঞা প্রদান করেন, তবে সেই আজ্ঞাদানের যথার্থ কারণ, অন্তত শিষ্যকে যতটা বললে তিনি অবুভব করতে পারবেন সেই আদেশের মাহাত্ম কি, ততটা যেন অবশ্যই বলেন।

অর্থাৎ মধ্যা কথা, শিষ্যের মধ্যে যেন অন্ধত্ব কখনোই জন্ম না নেয়, তা গুরুরই দেখা কর্তব্য। আজ যদি শিষ্য সম্পূর্ণ ভাবে বিনাবিচারে গুরুর আদেশকে মান্যতা দেন, তবে তাঁর মধ্যেও এই অন্ধত্বই জন্ম নেবে, আর তাই পরবর্তীতে সেই শিষ্য প্রশ্ন করতে ভুলে যাবে, বিচার করতে ভুলে যাবে, আর রীতিরেওয়াজের মধ্যে, আচারবিচারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে, যেমন করে ব্রাহ্মণ ও যন্ত্রবৈজ্ঞানিকদের প্রভাবে সংসারের হাল হয়েছে।

তা কখনোই কাম্য নয়, কারণ যথার্থ সংসার তখনই সম্ভব যখন সমস্ত জিনিসের, সমস্ত ব্যবস্থার, সমস্ত আয়োজনের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সকলের থাকা কাম্য। আর এই কাম্য ভাবের উদয় তখনই সম্ভব যখন এক ছাত্রের মধ্যে জিজ্ঞাসা স্থাপিত থাকবে। আর যতক্ষণ না সেই প্রশ্নকে উত্তর প্রদান করার প্রবণতা সমাজে প্রচলিত হবে, ততক্ষণ সেই প্রশ্নকরার মানসিকতার উদয় হবেনা সমাজে।

তাই এক গুরু যেন সর্বদা প্রশ্ন জাগ্রত করেন নিজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, আর সর্বদা সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। কনো কিছুর ক্ষেত্রেই যেন তিনি না বলেন যে, এটি আচার, এটি লোকাচার, এটি পুরাকাল থেকে চলে আসছে, তাই এমন করতেই হবে। যুক্তি ছাড়া যেই ব্যক্তি একটিও আচার আচরণ করেন, তা অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয়, আর অন্ধবিশ্বাস জীবনকে এমন অবস্থায় নিয়ে চলে যায়, যেখান থেকে সত্যের পথে জীবন কখনোই উন্নীত হতে পারেনা, বরং সে ক্রমাগত পিশাচ স্তরের হয়ে যেতে থাকে, এবং অন্তে পিশাচই হয়ে যায়।

প্রয়োজন ও যুক্তি, এই দুই হলো সমস্ত আচরণের আধার। যিনি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কনো প্রকার আচরণ করেন না, কনো কর্মই করেন না, তিনিই নিজের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে পারেন, অন্যরা ব্যর্থ হন নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে, এবং একসময়ে নিজের প্রয়োজন কি, কি প্রয়োজনে তিনি জীবিত রয়েছেন, তাই ভুলে গিয়ে, পিশাচ যোনির দিকে অগ্রসর হন।

তাই এক গুরুর প্রধান কর্ম হলো, ছাত্রছাত্রীদের দূর থেকে নিরীক্ষণ করে, তাঁদের গুণকে সুনির্দিষ্ট করা, এবং তা করার উপরান্তে তাঁদের গুণ অনুসারে তাঁদের মধ্যে প্রয়োজনের বোধ জাগ্রত করা, এবং সেই প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার মার্গ তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত করা। যদি এঁদের মধ্যে কারুর প্রয়োজন জগন্মাতাকে লাভ করা হয়, তবেই তাঁকে জীবনের মুখ্য জ্ঞান আস্বাদন করার দিকে প্রেরণ করতে হয়, অন্যদের সেই জ্ঞান প্রদান করতে নেই, কারণ সেই জ্ঞানকে ধারণ করার মত অবস্থায় জীবন তাঁদেরকে স্থপিত করে নি তখনও"।

দিব্যশ্রী বললেন, "এর অর্থ পিতা, আমি যদি ১০টি অনাথ শিশুকে নিয়ে আসি, এমন আবশ্যক নয় যে তাঁরা ১০ জনই সত্যের পথে পথচারী হবে? ... হয়তো, তাঁদের মধ্যে ২-৩ জনই সেই পথে পথচারী হতে পারবে! বাকিদের নিয়ে কি করবো তখন?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "কেউ সমাজকে ধরে থাকেন কারণ তাঁরা সমাজের উদ্দেশ্য জানেন, আর জানেন বলে সমাজকে সেই উদ্দেশ্য থেকে অপসারিত হতে দেন না। কেউ কেউ সমাজের উদ্দেশ্য জানেন না, সম্মুখে যা কর্ম আসে, তাই করতে হয়, এমন মানেন, কিন্তু এটি তাঁরা

অবশ্যই জানেন যে সেই পূর্বের ব্যক্তিত্বরাই সমাজকে ধারণ করে রয়েছেন, তাই তাঁদের স্থান শ্রেষ্ঠ। কেউ এত কিছুও জানেন না, কেবলই আজ্ঞা বাহন করতে জানেন, আর শ্রম করতে জানেন।

পুত্রী, গুরুর কাজ হলো নিজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই তিনগুণকে প্রাথমিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা, আর তা করে, তাঁদেরকে সেই স্তরে উন্নীত করা, যেখানে প্রথম শ্রেণি অর্থাৎ সমাজের ধারককে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হবে, দ্বিতীয় শ্রেণি অর্থাৎ কর্মকাণ্ডকে সুচালিত করার ক্ষেত্রে দক্ষ ব্যক্তিত্বদের রাখা হবে, আর তাঁদের সম্মান থাকবে প্রথম শ্রেণির প্রতি। আর তৃতীয় অর্থাৎ শ্রমতৎপর ব্যক্তিত্বরা থাকবেন এই দ্বিতীয় শ্রেণির নেতৃত্বাধীন এবং মার্গদর্শনের আধিন।

পুত্রী, তেমনই ভাবে তোমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তোমাকে প্রথমেই তাঁদের প্রকৃত জননীর সাথে আলাপ করাতে হবে। সেই আলাপ করার কালে, তিনরূপ মনোভাব দেখতে পাবে। একজনের ভাব হবে এই যে, সে তাঁর জননীকে সম্পূর্ণ ভাবে জানতে ব্যকুল, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করতে ব্যকুল। পুত্রী, এঁরা হলেন তোমার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী।

এরপরবর্তী একটি ছাত্রছাত্রী গোষ্ঠী পাবে, যারা তাঁদের জননীর চরণতলে উপনীত হয়ে একটি সুখী সুন্দর এবং কর্মব্যস্ত জীবনের কামনা রাখবে। পুত্রী এঁরা হলো তোমার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। এঁরাই তোমার নাট্যকর্ম করবে, এবং অভিনয়ও করবে। তবে এঁদের মধ্যে এই ভাবনা যেন প্রকট থাকে যে, তোমার প্রথমশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই সর্বোত্তম। এই ভাবের কারণে, তোমার এই সম্পূর্ণ আয়োজনের উদ্দেশ্য কখনোই নাট্য হবে না, বরং তা জগজ্জননীর কাছে সমর্পণ করাই হয়ে থাকবে।

আর তা করার জন্য, এমন নিয়মের স্থাপনই করবে যে, তোমার আয়োজনের অধ্যক্ষ এই প্রথমশ্রেণীর থেকেই হবে, কারণ তবেই ভবিষ্যতেও এই আয়োজন নিজের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জগজ্জননীর ক্রোড় ভরানোর উদ্দেশ্যেই ধাবিত থাকবে। তবে একই সঙ্গে, এই দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির মুখকে বন্ধ করে দেবেনা কখনোই। অর্থাৎ, তাঁদের যেই বয়সে এই

শ্রেণীবিভাগ করছো, হতেই পারে যে কারুর মধ্যে জননীর কাছে সমর্পণের ব্যকুলতা জন্ম নেয় নি, তবে পরবর্তীতে তা জাগতেই পারে।

তবে এর অর্থ এমনও নয় যে, এই দ্বার সর্বকালের জন্য উন্মোচিত থাকবে। বিবাহের পূর্বকাল পর্যন্তই এই দ্বার উন্মোচিত রাখা সম্ভব। পুত্রী, অঙ্গে কামনার গন্ধ লাগার পূর্বেই মাতার প্রতি প্রেম জন্ম নেওয়া সম্ভব। অঙ্গে কামনার গন্ধ লেগে গেলে, মাতার দিকে তাকালে, সেখানেও কামনার গন্ধই এসে যায়। তাই যেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তাঁদের বিবাহের পূর্বে মাতার প্রতি প্রেম জন্ম নেবে, তাঁরাই এই প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু একবার বিবাহ হয়ে গেলে, কামনার গন্ধ পঞ্চভূতে লেগে গেলে, আর সেই পঞ্চভূত তনু মাতার প্রেমকে অনুধাবনের সামর্থ্য রাখেনা, কারণ সেই প্রেমও তখন অপবিত্র হয়ে যায়।

তাই সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য এই প্রথমশ্রেণীতে প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত রাখবে, তাঁর বিবাহের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। হতেও পারে, কারুর মধ্যে তাঁর ২০ বছর বয়সে, মাতার প্রেমের প্রতি দৃষ্টি গেল, আর সে মাতার কাছে সমর্পণ করতে ব্যকুল হলো। তাই সেই পথ বন্ধ করবেনা”।

দিব্যশ্রী বললেন, “পিতা, তৃতীয় শ্রেণীতে যাবার পূর্বে, আমার এই জিজ্ঞাসা শান্ত করুন। বিবাহের সাথে সাথে কামনার গন্ধের কথা যা বললেন, তা বিস্তারে বলুন আমাকে”।

ব্রহ্মসনাতন বললেন, “পুত্রী, বিবাহ হল কামনার আঁতুড়ঘর। যেই ব্যক্তির হৃদয় বিবাহ পূর্বে জন্ম নেয়না, যার মধ্যে বিচার ও বিবেক বিবাহপূর্বে জন্ম নিতে পারেনা, বিবাহ তাঁকে কামনার মধ্যে টেনেই নেয়, আর একবার কামনার আঁচে দগ্ধ হয়ে গেলে, পঞ্চভূতের আঁটুনি এমনই পোক্ত হয়ে যায়, যে তাতে আর প্রেম জন্ম নিতে পারেনা, সে মোহগ্রস্ত হয়ে যায়।

হ্যাঁ, যার বিবাহের পূর্বেই সেই প্রেমবৃক্ষ জন্ম নিয়ে নিয়েছে, হৃদয় প্রকাশিত হয়েছে, এবং বিচার বিবেক তাতে মহীরুহ হয়ে গেছে, বিবাহ করলেও সে কামনার অধীনে স্থিত হয়না। কামনা তাঁর পঞ্চভূতকে ছুতেও পারেনা, আর তাই কামনা মুহূর্তের মধ্যেই লয় হয়ে যায় তাঁর মধ্যে। তাই বিবাহ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্যই এই প্রথমশ্রেণীর দ্বার উন্মোচিত রাখবে।

তবে দ্বার উন্মোচিত রাখার অর্থ এই কখনোই নয় যে, এটি মন্দিরের দ্বার হবে, অর্থাৎ যে খুশী সেখানে চলে যেতে পারবে, আবার যখন খুশী চলেও আস্তে পারবে। যিনি নিজের সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা জগজ্জননীর কাছে অর্পণ করতে ব্যস্ত, যিনি জগজ্জননীকে সম্যক ভাবে জেনে, তাঁর কাছে সমর্পণ করতে ব্যস্ত, তাঁরই প্রবেশ অবাধ হবে এই শ্রেণীতে, তবেই এই শ্রেণী সুদ্ধ থাকবে, আর স্মরণ রাখবে, তোমার সম্যক আয়োজনে, যতক্ষণ এই শ্রেণী সুদ্ধ থাকবে, ততক্ষণই তোমার আয়োজন নিজের পরমার্থে অটিক থাকবে। যেই ক্ষণে এই প্রথমশ্রেণীতে তেমন ব্যক্তি প্রবেশ করবেন যিনি কামনাজর্জরিত, বা যিনি জগজ্জননীকে ব্যকুলভাবে জানতে অনাগ্রহী, বা যিনি নিজের ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনাকে জগজ্জননীর কাছে অর্পণ করতে নারাজ, জানবে সেই দিনই হবে তোমার এই আয়োজনের মহাসমাপ্তি।

এবার তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলি। এঁরা শ্রমজীবী। শ্রম না করতে পারলে, এঁরা জীবন অতিবাহিতই করছেন না, এমন মনে হয় এঁদের। তাই এঁরা কৃষিকর্ম করবে। বিবাহপূর্ব পর্যন্ত এঁদের জন্যও প্রথমশ্রেণীর দ্বার উন্মুক্ত রাখবে। আর এটি সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবে যে, তোমার আয়োজনকে সুব্যবস্থিত রাখতে, এই তিনশ্রেণী যেন কখনোই অন্য শ্রেণীকে নিকৃষ্ট নজরে না দেখেন। প্রথমশ্রেণী তোমার আয়োজনকে কালজয়ী করবে, তো দ্বিতীয়শ্রেণী তোমার সম্পূর্ণ আয়োজনকে সমাজের বক্ষে স্থিত রাখবে, নিজের আয় এবং গুণ দ্বারা। আর তৃতীয়শ্রেণীর কারণেই, প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আহার লাভ করবে। তাই উপকারিতা সকলেরই সমান এই সমস্ত আয়োজনে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “আরো কিছু বলুন এই আয়োজনের ব্যাপারে। আরো অনেক কিছু আমার জানার আছে, কিন্তু আমার ধারণাও নেই যে কি জানার আছে। তাই আমি আপনাকে নির্দিষ্ট ভাবে প্রশ্ন করতে পারছিনা। কিন্তু আপনি যা কিছু বলছেন, সেই সমস্ত কিছু আমাকে আমার কর্ম করাতে সহায়তা করবে, আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। তাই আরো কিছু বলুন পিতা এই আয়োজনের ব্যাপারে”।

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, "পুত্রী, যেকোনো মৌলিক শিক্ষাই একটি শিশুকে দিয়ে শুরু করতে হয়। কারণ শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন তাঁর একটি বিশিষ্ট মৌলিক গঠন নির্মিত হয়ে যায়, বা বলতে পারো একটি ছাঁচের নির্মাণ হয়ে যায়, তাই সেই ছাঁচকে পালটানো সম্ভব হয়না। সেই মৌলিক শিক্ষা অহংকার গঠনের শিক্ষাই হোক, সঙ্গীত সাধনার শিক্ষাই হোক, বা আধ্যাত্ম সাধনার শিক্ষাই হোক।

পুত্রী, যিনি শিশুকালে সঙ্গীত ধারণ করে ফেলেছেন, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সুর, তাল, লয় বাসা বেঁধে ফেলে, আর তাই সেই সঙ্গীতের অন্য রূপক তাঁকে তাঁর বড় বয়সেও প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু যার মধ্যে সুর, তাল বা লয় স্থাপিত হয়নি আর সে মৌলিক গঠন লাভ করে ফেলেছে, অর্থাৎ যৌবনে পদার্পণ করে ফেলেছে, তখন তাঁকে আধুনিক সঙ্গীত, বা কিছু পশ্চিমদেশের যন্ত্র সঙ্গীত প্রদান করা যেতে পারে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ কলা আর সে ধারণ করতে পারেনা।

তেমনই পুত্রী, যার অহংকারের গঠন হয়নি এবং যৌবনে পদার্পণ করে ফেলেছে সে, তাঁর আর কিছুতেই অহংকার গঠন সম্ভব হয়না। উদাহরণ স্বরূপ মানসিকভাবে বিকলঙ্গ ব্যক্তিদের দেখে নাও। তাঁদের পঞ্চভূত বিকলঙ্গ হবার কারণে, তাঁদের মধ্যে অহংকার বাসা বাঁধতে পারেনি। তা তুমি তাঁকে যতই যৌবনে বিবাহদান করো, তাঁর মধ্যে অহংকার বাসা বাঁধতে পারবেনা, আর সে তাই তখনও শিশুর মতই সরল ও সহজ থেকে যাবে।

ঠিক তেমনই ভাবে আধ্যাত্মসাধনা হলো অহংকারের থেকে মুক্তির মার্গ। অহংকার অর্থাৎ 'আমি' বোধ থেকে মুক্তির উপায় এই সাধনা, আর এই 'আমি' সমস্ত ভ্রমের কারণ। সেই 'আমি'ই এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রম করে, লক্ষ লক্ষ ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনা করে করে, সহস্র আবেগ, সহস্র ভেদাভেদ নির্মাণ করে, তা দিয়েই নিজের মৌলিক গঠন নির্মাণ করা শুরু করে।

তাই পুত্রী, একবার যদি কারুর মৌলিক গঠন নির্মিত হয়ে যায়, অর্থাৎ একবার যদি কারুর 'আমি'র ত্রিগুণ, পঞ্চভূত, আবেগ, মোহপাশ, ইন্দ্রিয়দের প্রতি বিশ্বাস, ইচ্ছা-চিন্তা-কল্পনা, এবং

যন্ত্র-মন্ত্র নির্ভরতা তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধে ফেলে, আর সেই 'আমি'কে নাশ করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তাঁর 'আমি'কে বেঁধে দেওয়া সম্ভব যাতে তা অসংযত না হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই 'আমি'র নাশ অসম্ভব।

পুত্রী, এই মৌলিক গঠনের আঁট মজবুত হতে শুরু করে, যখন একটি মানব শিশুর বয়স ৮ থেকে উর্ধ্বসীমার দিকে যাত্রা করে। তাই তোমার শিক্ষাপদ্ধতি শিশুর ৮ বছর বয়সের মধ্যে শুরু হতে হবে। হ্যাঁ, এমন হতেই পারে যে তুমি কারুর সম্মুখে এলে যখন, তখন তাঁর বয়স ১২-১৩ বা অধিক, কিন্তু তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসার অর্থাৎ আমি'র থেকে মুক্ত হবার আশ পূর্বেই জন্মে গেছে। সেইক্ষেত্রে কনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি কারুর বয়স ৮ হয়ে গেছে, অথচ তাঁর মধ্যে 'আমি'র থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিচ্ছু নেই, তখন তোমাকে কঠিন হতে হবে।

অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাঁর সাথে ব্যবহার না করলে, সম্ভব হবেনা তাঁর মধ্যে 'আমি'র নেশা ত্যাগ। আর যদি সেই বয়সটা ৮ না হয়ে, ১২ হয়, আর তখনও তাঁর মধ্যে 'আমি'ই সমস্ত কিছু হয়ে যায়, তাহলে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রদানের প্রয়াস অযথা সময়নষ্ট। হ্যাঁ, তাঁর 'আমি'কে সংযত করা যেতে পারে, কিন্তু 'আমি'র নাশ করে, সে কখনোই সত্যের সম্মুখীন হতে পারবেনা। কেন পারবেনা?

কারণ ১২ বছর বয়স হয়ে গেছে, অথচ 'আমি'তে অর্থাৎ অহং নিয়ে উলমালা মানে, তাঁর মধ্যে ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা নিজেদের শেকড় গজিয়ে বেশ গভীর পর্যন্ত চলে গেছে। একই ভাবে, মোহ, লোভ, ভয়, ঘৃণা, ইত্যাদি আবেগ সমূহ তাঁকে নিজেদের গ্রাস করে নিতে শুরু করে দিয়েছে। তাই আর কিছুই করা সম্ভব নয়। সেই কারণে পুত্রী, তোমাকে অনাথ শিশুদের কথা বললাম, কারণ তাঁরা অসহায়, দিশাহিন, এবং শিশু।

তাঁদেরকে সমাজ অহংকারের শিক্ষা প্রদান করতেও ইচ্ছা দেখায়নি, কারণ তাঁদের কনো অবিভাবক নেই। তাই যদি অহংকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য সেনানির্মাণ করতে চাও, তবে এই শিশুদের থেকে অধিক শ্রেয় সেনালাভ সম্ভবই নয়। এঁরা নিস্পাপ, নিষ্কলঙ্ক,

অবিভাবকহীন স্বতন্ত্র তারা, এবং এঁরা সম্পূর্ণ ভাবে কামনা-বাসনা মুক্ত। তাই এঁদের থেকে শ্রেয় কারুকেই পাবেনা, যারা সমস্ত ভৌতিক বন্ধন থেকে মুক্ত, আর যারা সহজেই তাঁদের জন্মজন্মের জননীর সাখ্যাতকার করার জন্য উপযুক্ত”।

দিব্যশ্রী বললেন, “তাঁদের না নিয়ে এলাম, কিন্তু তাঁদেরকে শিক্ষিত কি ভাবে করবো পিতা? কি ভাবে তাঁদের যথার্থের সাথে পরিচিত করবো?”

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে বললেন, “যথার্থের কথা বলে। পুত্রী, তুমিই তাঁদের জননী। আর জননীর প্রতিটি উচ্চারণ সন্তানের কাছে ব্রহ্মবাক্য এমনিই হয়, তাঁদেরকে তা শিখিয়ে দিতে হয়না, তাঁরা এমনিই জননীর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য মানে। তাই, প্রথমে তাঁদের অক্ষরজ্ঞান প্রদান করবে। তারপর তাঁদেরকে সঙ্গীতের সাথে আলাপ করাবে। আর তারপরে, তাঁদেরকে কলাবিভাগের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে শেখাবে, আর সঙ্গে গণিতও।

আর এই সমস্ত কিছুর শিক্ষা দেবার কালে, মাঝখান থেকে শুরু করবেনা, অর্থাৎ ভূগোল পড়ানোর ক্ষেত্রে, পৃথিবী প্রথমে একটি অগ্নিপিণ্ড ছিল, সেখান থেকে শুরু করবেনা, শুরু করবে, যখন কিচ্ছু ছিল না, তখন শূন্য ছিল, সেখান থেকে। সেই শূন্যের থেকে আত্মরা নিজেদের রচনা করে স্বয়ম্ভু হলো, তারা ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার রচনা করে, ত্রিগুণ হলো, আর সেই ছায়াদেবীদের সাথে সঙ্গমে, তাঁরা পঞ্চভূত নির্মাণ করলো, এখান থেকে শুরু করবে।

সেই পঞ্চভূতের দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর কল্পনা করা শুরু করলো নিজেদের বিশেষত্বকে স্থাপন করতে, আর সেই স্থাপনার মধ্যে অন্যতম স্থাপনা হলো পৃথিবী। পুত্রী, ভূগোলের, ইতিহাসের, গণিতের সমস্ত কিছুর প্রকৃত শুরু এই ভাবেই হয়, আর তাই করবে। তাহলেই দেখবে, তাঁদের কাছে উৎসের সন্ধান প্রথম থেকেই থাকবে। যেই শূন্যকে আত্মরা নিয়তি আখ্যা দেয়, আর সেই নিয়তিই হলো তাঁদের সকলের প্রকৃত জননী, সেই বোধ তাঁদেরকে তাঁদের জননীর প্রতি আকর্ষিত করবেই।

পুত্রী, আসল সত্য এই যে প্রতিটি মানুষেরই সামর্থ্য আছে সত্যকে জানার, এবং তাঁর কাছে সমর্পণ করার। কিন্তু তাঁদেরকে অহংকারের শিক্ষা প্রদান করা হয় বলেই তাঁরা অহংকার অর্থাৎ আমিত্বকে ধারণ করে, নিজেদের মৌলিক গঠনকেই আমিত্বদ্বারা ভূষিত করে নেয়। তাই সহজাত ভাবেই তাঁদেরকে আমিত্ব মুক্তির শিক্ষা প্রদান করলেই, তাঁরা সেই শূন্যের প্রতি, সেই যথার্থের প্রতি আকর্ষিত হবে।

আর যেমন যেমন সেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, তেমন তেমন তাঁদের সেই আকর্ষণকে বৈরাগ্য ও প্রেম দ্বারা সুসজ্জিত করে দেবে, যাতে তা সহজ ভাবেই যথার্থমুখী হয়ে ওঠে, আর তাঁরা সাধক হয়ে ওঠে। পুত্রী, তন্ত্র সর্বাধিক কঠিন সাধনমত। কিন্তু যদি এক শিশুকে সাধনের পথে চালান হয়, তবে তন্ত্রের ন্যায় কঠিন ধারার আবশ্যকতাও থাকেনা। তাই সহজ ভাবে সাধক নির্মাণ করো, এবং তাঁদেরকে ক্রমশ সাধনার পাশাপাশি, এও বোঝাও যে তাঁরা কল্পনার মধ্যেই স্থিত, তাই তাঁদেরকে সেই কল্পনার থেকে মুক্ত হতেই হবে।

তবে তার থেকেও অধিক আবশ্যক এই যে, তাঁদের জননীর সন্তান কেবলমাত্র তাঁরা নন। জগতের প্রতিটি জীবই তাঁদের জননীর সন্তান, অর্থাৎ সকলেই তাঁদের ভ্রাতা ও ভগিনী। তাই তাঁদেরকেও তাঁদের জননীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্ম ও কর্তব্য। পুত্রী, এবার তাঁদের সম্মুখে দুটি পথ স্থাপিত করো। হয় তাঁরা তাঁদের ভ্রাতা ও ভগিনীদের তাঁদের জননীর সাথে আলাপ করার জন্য বিবাহ করে, সংসার স্থাপন করে, তাঁদের বংশধরদের দ্বারা করতে পারে, নয় তাঁদের ন্যায়ই বহু অনাথ সন্তান রয়েছে জগতে। সেই সমস্ত অনাথদেরকে নিজেদের জননীর সন্তান, অর্থাৎ নিজেদের ভ্রাতাভগিনীজ্ঞানে পালন করে, ঠিক তুমি যেমন করে তাঁদেরকে পালন করেছ, তেমন করেই পালন করতে পারে।

আর সাথে সাথে, এও বোঝাও যে, তাঁরা যাই করুক, নিজেদের চরণ এই কাল্পনিক জগতেই স্থাপিত রাখতে হবে। তাই প্রয়োজন আহারের, আর প্রয়োজন ন্যুন্যতম ধনের। সেই ধন তাঁরা নাট্যদ্বারা, এবং খাদ্য তাঁরা কৃষি কর্মদ্বারা লাভ করতে পারে, এবং নিজেদের জননীর ক্রোড় পূর্ণ

করার কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারে। ... এই তো শিক্ষাদান পুত্রী, এছাড়া আর অন্য কি করার আছে?

শূন্য থেকে ইতিহাস, শূন্য থেকে ভূগোল, শূন্য থেকে গণিত যেমন যেমন শিখবে তাঁরা, অতঃপরে, তাঁদের সমুখে আসবে কৃতান্ত, আর আসবে মনঃসংযোগ তথা ধ্যানের উপায়, আর এঁদেরই সাথে সাথ থাকবে, তাঁদের জননী, মাতা সর্বাম্বার উপস্থাপনা, যিনি হবেন তাঁদের পরমাত্মীয়া। ... আর কিছু কি প্রয়োজন পুত্রী?"

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "বুঝে গেছি পিতা। একটি সময়ের জন্যও কল্পনাকে সত্য রূপে স্থাপন করা হবেনা তাঁদের সামনে। সত্যই স্থাপিত থাকবে, আর কল্পনা সেই সত্যকে খণ্ডন করতে সদাব্যস্ত, তাই সেই কল্পনাকে দূর করার উপায় সন্ধান করবে তাঁরা, আর সেই উপায় তাঁরা তাঁদের জননী, তাঁদের অধ্যক্ষের থেকে লাভ করে উর্বর হয়ে উঠবে। ... বেশ অনুভব করেছি পিতা। আর কিছুকি আমার এই বিষয়ে জানা আবশ্যক। যদি তেমন কিছু থাকে, যা কর্ম করতে করতে নয়, কর্ম করার পূর্বে জানা আবশ্যক, তবে তা কৃপা করে ব্যক্ত করুন আমাকে, যাতে আমি আমার পরমার্থে স্থাপিত হত পারি"।

দিব্যশ্রী আবার থেমে গিয়ে বললেন, "কিন্তু পিতা, যদি সমাজে এই অহংকারের আরাধনাকেই প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো? যদি প্রতিবাদ স্থাপন করা যেত? যদি বিরোধিতা করা যেত এই অহংকারের প্রশিক্ষণকে? তাই না! মানে, আমার কথা এই যে, যদি একটি সুন্দর করে যোজনা করা যেত?"

ব্রহ্মসনাতন মিষ্ট হেসে বললেন, "এটা তুমি বলছো, না তোমার অহংকার?... না আসলে, অহংকারই এমন কথা বলে থাকে। তার তো নিজের উপর বিস্তর বিশ্বাস, তাই সে এমন ধারণা করে যে সে যোজনা না করলে, কর্ম কি করে সম্পন্ন হবে"।

দিব্যশ্রী বললেন, “আমি আপনাকে দেখেছি, আর কারুকে এমন দেখিনি যে তাঁর কনো প্রকার যোজনা থাকেনা। সকলের কিছু না কিছু যোজনা থাকে, আর সেই যোজনা অনুসারে কর্ম করে সে”।

ব্রহ্মসনাতন বক্র ওষ্ঠে হাস্য প্রদান করে বললেন, “আর সেই যোজনা কতটা সার্থক হয়?”

দিব্যশ্রী হিসাব করে বললেন, “প্রায়শই সফল হয়না। ব্যর্থই হয়, তখন আবার যোজনা করা হয়। কেউ কেউ আবার এমন ব্যর্থতা দেখে দেখে, বুদ্ধিমান হয়ে গেছেন, তাই তিনি একটি যোজনার মধ্যে অনেক যোজনা স্থাপন করে রেখে দেন। এটি না হলে ওটি, সেটি না হলে অন্য একটি, এই রকম। সাফল্যের হার তাঁরই বেশি হয়, তবে ...”

ব্রহ্মসনাতন আবার একই প্রকার হাস্য প্রদান করে বললেন, “তবে, যেই উদ্দেশ্যে তিনি যোজনা করেন, আর যেই উদ্দেশ্য তিনি লাভ করেন, তা প্রায় কখনোই এক হয়না, ভিন্ন হয়ে যায়”।

ব্রহ্মসনাতন আবারও কেবল মুচকি হাসলে, দিব্যশ্রী বললেন, ‘কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আমি একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার দেখেছি। আপনার কনো যোজনাই থাকেনা। আপনাকে দেখে আমার মনে হয় যেন, আপনি নিজে কনো যোজনা করেনই না! আপনি যেন অন্য কারুর যোজনা অনুসারে চলেন। আর তাই আপনি জানেনও না যে সেই যোজনা অনুসারে চললে কি ফল লাভ হবে। তবে আমি দেখি আপনাকে অত্যন্ত আনন্দিত হতে, যখন আপনি ফল লাভ করেন।

আমি তা দেখে অত্যন্ত বিস্মিতও হই। ভাবি যে, আপনি কনো যোজনা করলেন না, তাই কি ফল লাভ করবেন বা করতে চান, তাও আপনি জানেন না। কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পরেও, আপনি তেমন ফল কি করে লাভ করেন, যা আনন্দদায়ক! ... হিসাব মেলেনা!

হ্যাঁ পিতা, আমি দেখেছি আপনাকে। অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে দেখেছি, আর অবাক হয়েছি। একবার নয় বারবার দেখেছি। আপনি নিজের কর্মসূচি নিয়ে কনো যোজনা করেন না। আর অন্যদের ক্ষেত্রেও কনো যোজনা করে দেন না, যেন অন্যত্র থেকে সেই যোজনা দেখে বলে দেন

আপনি, আর তা প্রতিটি ক্ষেত্রে অব্যর্থ হয়, আমি দেখেছি। আমাকেও আপনি বিনা যোজনা করে, একটি যোজনা বলে দিলেন, আমি জানি তা অব্যর্থ হবে, আর কেবল তাই নয়, আমি দেখেছি, তা যেন আপনাআপনি তাঁর সামনে হতে থাকে। তাঁকে কেবলই সেই সমস্ত ঘটমান চক্রে ভাগ নিতে হয়, বাকি সমস্ত কিছু এমনি এমনিই হয়।

যেই মুহূর্তে সে নিজের বুদ্ধি খাটায় বা নিজের কনো আবেগ জুরে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর সে সম্পূর্ণ ভাবে খেই হারিয়ে ফেলে। এই সমস্ত কিছুর রহস্য কি? কেন এমন হয়? কেন আপনি আনন্দ পান ফলে, কেন সকলের ক্ষেত্রে সেই যোজনা সঠিক সঠিক লেগে যায়, আর কেন তা যোজনা না হয়েও যোজনা! ... মানে আমার কথা এই যে, আলাদা করে কিচ্ছু করতে হয়না। কনো সমাবেশ করতে হয়না, কনো সমাবর্তন করতে হয়না, কনো কিচ্ছু করতে হয়না, কিন্তু তাও যেমন যেমন আপনি বলেছেন তাঁকে, ঠিক তেমন তেমন তাঁর সম্মুখে ঘটনা আপনাআপনি প্রস্তুত হতে থাকে! এটা কি করে হয়?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তুমি কি অনাথ? নাকি আমি অনাথ? কে অনাথ এই জগতসংসারে যে তার আকাল পড়ে গেছে যে তাকে যোজনা করতে হবে নাহলে সে অথৈ সাগরে পড়ে যাবে! ... পুত্রী, আমাদের সকলের জননী আছেন। আর আমাদের জন্য যোজনা তিনি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। আমাদের মা থাকতে আমরা কেন যোজনা করতে যাবো! কি প্রয়োজন আমাদের যোজনা করার!

আমি কনো যোজনা করিনা পুত্রী। ঠিকই বলেছ, আমি কেবলই আমার আরাধ্যা, আমার স্বরূপ, আমার জন্য যেই যোজনা করে রেখে দিয়েছেন, সেই পথে চলতে থাকি। শেষে কি ফল আমার জন্য রাখা আছে, জানিও না, জানতে চাইওনা। কেবল এটুকু জানি যে, তিনি আমার মা। আমার নিজের মা। আর তাই আমার জন্য তিনি যেই ফলই রাখবেন, তা আমার হিতকরই হবে। ব্যাস, আর কিছু জানার প্রয়োজনই নেই।

আর অন্যদের কি যোজনা বলি? যেই যোজনা তিনি তাঁর জন্য করে রেখেছেন, সেই যোজনাই বলি। আমার বুদ্ধি কোথায় পুত্রী যে আমি যোজনা করবো? আমার মায়ের নির্মিত যোজনাতে আমি চলি, আর তাঁরই যোজনা তোমাদের বলি। ... তাই অহংকারের বলো বা আত্মের বলো, তাঁর নির্মাণ করা যোজনাকে আমি বিশ্বাস করিনা, কারণ যার অস্তিত্বই এক মায়া, তার যোজনাতে বিশ্বাস করবো কি করে? তাঁর যোজনাতে বিশ্বাস করে নিজের কর্তাভাবকে জাগ্রত করি আর কি!

পুত্রী, তাঁর যোজনাতে চলো, নিজের যোজনাতে নয়। ... আর কি বলছিলে প্রতিবাদ! কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ? কে সে, যার বিরুদ্ধে তুমি প্রতিবাদ করবে? আর কে তুমি যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? (মিষ্ট হেসে) যা সে, তাই তো তুমি! সে অহংকার, সেও আত্ম, আর তুমিও অহংকার, তুমিও আত্ম। সে না অজ্ঞানী, তাই ভেবে মরছে যে তুমি আত্ম আর সে আত্ম পৃথক। কিন্তু তুমি তো জ্ঞানী! তাই তুমি তো জানো যে সেও ব্রহ্ম আর তুমিও ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মের কনো ভেদ সম্ভবই নয়। তাই তুমিও যা, সেও তাই।

তাহলে কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে পুত্রী? নিজের বিরুদ্ধে নিজে প্রতিবাদ করবে! ... মনে হচ্ছেনা, এ নেহাতই কালক্ষয়! নিজের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিবাদ করে সময় নষ্ট করা কেন? সেই সময়ে তো যেই দাবি তুমি করছো, সেই দাবি তুমি না প্রকাশ করে, সেই দাবিকে বাস্তবে রূপান্তর করে দিতে পারো? ... স্মরণ করো নেতাজি সুভাস বসু কি করেছিলেন? তাঁর আদর্শ কি ছিল? এই ছিল না যে, এই দেশ আমার দেশ, আমাদের দেশ। কেউ এতে অধিকার স্থাপন করে আছে, সেটা তার ভ্রম। এটা আমাদের দেশ। তাই এতে আমরাই শাসক। যদি কারুর আপত্তি থাকে তাতে, সে প্রতিবাদ করবে, আমরা করবো না। আমরা তো শাসন করবো। নিজেদের অঙ্গিকার স্থাপন করবো, আর শাসন করবো।

একই তো কথা পুত্রী। এই কল্পব্রহ্মাণ্ড তোমার। তাই এতে কি করবে, আর কি করবেনা, তার জন্য কারুর কাছে দাবি কেন করবে? সরাসরি তা স্থাপন করবে, আর তা স্থাপন করা তোমার অধিকার জেনেই তা করবে। ... নিজের কাছে নিজেই দাবি করে কালক্ষয় কেন? সেই

কালক্ষয়ের কালে, নিয়তি তোমার সম্মুখে যা দাবি রেখেছেন, তা পূরন করো। স্থাপন করো তোমার আয়োজন, আর শুরু করে দাও অহংকার নাশের মহাযজ্ঞ। কারুর অনুমতি কেন প্রয়োজন তোমার?

যিনি সত্য, যিনি সাখ্যাত নিয়তি, যিনি সমস্ত অহংকারের কাছে অজেয়, যিনি সমস্ত অহংকারের জননী, তিনি তোমাকে সেই মার্গ দেখিয়েছেন। তাই নতুন করে যোজনার প্রয়োজন কি পুত্রী! সরাসরি সেই যোজনাকে স্থাপন করো। কেন বৃথা যুদ্ধের কামনা করছো অহংকারের সাথে? কে অহংকার? একটি ভ্রম ব্যতীত কিছু কে সে? সে তো কেবলই একটি মহাভ্রম যে ব্রহ্মের অতিরিক্তও কিছু সম্ভব, আর তা সে। তাই যা একটি ভ্রম, যা যথার্থই নয়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ কি?

সেই যুদ্ধ করতে চেয়ে, কি প্রমাণ করতে চাইছো? এই প্রমাণ করতে চাইছো যে আত্ম আসলে ভ্রম নয়, সত্য? হ্যাঁ সে সত্য, আর তখনই সত্য যখন সে নিজের ভ্রমকে নিজের পৃথক অস্তিত্বের আমিত্বকে ত্যাগ করে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়, তার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সে ততটাই মিথ্যা, যতটা তার করা কল্পনাগুলি মিথ্যা। তাই মিথ্যার সাথে যুদ্ধ কেন পুত্রী? কেন মিথ্যার সাথে যুদ্ধ করার প্রয়াস করে, মিথ্যাকে গুরুত্বপ্রদান? পুত্রী, গুরুত্ব তো কেবলই সত্য পেতে পারে, মিথ্যা কি পেতে পারে?

যদি তা নাই পারে, তবে মিথ্যার সাথে যুদ্ধ করতে চেয়ে, তাকে গুরুত্ব প্রদান করছো কেন? সরাসরি তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করো পুত্রী, কারণ সে যতই গলা ফাটিয়ে ফাটিয়ে দাবি করুক, সেই গলাফাটানোর কারণে সে সত্য হয়ে যাবেনা। সে মিথ্যা ছিল, সে মিথ্যা আছে, আর যতকাল নিজেকে আত্ম বলে ঘোষণা করবে, ততকাল মিথ্যাই থাকবে। যখন সে এই আত্ম হুংকার ত্যাগ করে, ব্রহ্মে, শূন্যে, যথার্থে লীন হয়ে যাবে, তখন সে ততটাই সত্য হয়ে যাবে, যতটা স্বয়ং শূন্য সত্য।

তাই সত্যের পথে চলো, মিথ্যার সাথে যুদ্ধ করার প্রয়াস করে, মিথ্যাকে আর প্রশ্রয় দিওনা, ইতিমধ্যেই অনেক প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছ তাকে। আর দিওনা। এবার কেবলই সত্যের স্থাপনা করো। আনো সেই অসহায় শিশুদের আর প্রমাণ করে দাও তাদের কাছে যে না তো তারা কনোকালে অসহায় ছিল, আর না কারুর পক্ষে অসহায় হওয়া সম্ভব। প্রমাণ করে দাও তাদেরকে যে না তো জগতে কেউ অনাথ ছিল, আর না জগতে কেউ কনোকালে অনাথ হতে পারে, কারণ আমাদের সকলের মা রয়েছেন।

তিনি থাকতে আমরা কেউ কনোকালে অনাথ হতেই পারিনা। ... পিতার বীর্য আমাদের এই দেহমূর্তির মৃত্তিকা, আর মাতার গর্ভ আমাদের এই দেহমূর্তি নির্মাণের নাটমন্দির। না তো ঈশ্বর মৃত্তিকাতে সীমাবদ্ধ, আর না নাটমন্দিরে। তিনি তো সর্বত্রস্থিতা, মূর্তি তো তাঁর কেবলই এক অনন্য প্রকাশ মাত্র। আমরা তো এই দেহে সীমাবদ্ধ কখনই নই, কভু ছিলাম না, আর কভু হওয়া সম্ভবই নয়। ... তাই এই মূর্তি নির্মাণের মৃত্তিকা বা নাটমন্দির আমাদের এই মূর্তির জনকজননী, আমাদের জননী নন।

আমাদের জনক হলেন আমাদের অহংকার, যার জন্য আমাদের এই ভ্রমিত ভিন্নতাপূর্ণ রূপ। আর আমাদের জননী হলেন সাখ্যাত নিয়তি, যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, কেবলই আমাদের আত্মের সক্রিয়তার নিরিখেই ব্রহ্মময়ী, কারণ তিনিই যথার্থ, আর সেই যথার্থকে যথার্থ না মেনে, তাঁর থেকে পৃথক হবার ভ্রম করেই আমরা অস্তিত্বমান। তাই তিনিই আমাদের জননী, কারণ তাঁর থেকে পৃথক হয়েই আমরা এই আত্ম। আর তিনি থাকতে, আমরা অনাথ কি করে হতে পারি!

প্রমাণ করে দাও তাঁর অস্তিত্ব পুত্রী। শূন্যে স্থিত করে দাও সেই শিশুদের, আর আগামীদিনের সমস্ত অনাথ শিশুদের। এমন হিল্লোল তুলে দাও যাতে সামাজিক ভাবে অনাথ হয়ে থাকা একটি মহাসৌভাগ্য রূপে পরগনিত হওয়া শুরু হয়। আর যারা অবিভাবকদের লাভ করে মোহগ্রস্ত, তাঁরা যেন এই অবাদ স্বাধীনতার কেবলই নাম শুনে ক্ষান্ত হতে হচ্ছে বলে উদাসীন হয়ে ওঠে, আর তাঁরাও অহংকারের স্বাদ চাকা বন্ধ করে, জগজ্জননীর প্রেমের স্বাদ চাকতে ব্যকুল হয়ে ওঠে"।

দিব্যশ্রী নিজের নেত্রে অশ্রু ধরে রাখতে পারলেন না। জোরহস্তে পিতার কাছে সবিনয়ে বললেন, “পিতা, সমস্ত জ্ঞান আপনি আমাকে প্রদান করেছেন। আপনার এই মিথ্যা দেহের থেকে প্রেম তো লাভ করেছি আমি। হয়তো এই বিশাল প্রেমকে প্রত্যক্ষ করে, আমি ভ্রমিত হয়ে গিয়ে এই প্রেমকেই অনন্ত প্রেম বলে মনে করে নিয়েছি, আর তাই যথার্থ ভাবে যেই প্রেম অনন্ত, তার ধারণাও করার প্রয়াস করিনি কনোদিন। ...

পিতা, সত্য বলতে তো, আমি আপনাকে সত্য অর্থে লাভই করিনি। কাকা বলেছেন আমাকে, কখনো তোমার পিতার সত্যরূপের সাখ্যাতকার করো। একবার করে ফেললে, আর নিজের পৃথক অস্তিত্ব রাখাই দায় হয়ে উঠবে, মনে হবে যেন সর্বক্ষণ সেই প্রেমে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। ... পিতা, আমাকে সেই সত্যের সাথে পরিচয় করে দিন না! ... একটিবার আমাকে আপনার স্বরূপের সাথে সাখ্যাতকার করিয়ে দিন”।

ব্রহ্ম বিজ্ঞান

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “বৌদ্ধ মঠে গেছ তো তুমি। তার অন্তরে যেই শান্তি বিরাজ করে, তা স্মরণ আছে?”

দিব্যশ্রীর মুখভঙ্গি পালটে গেলে, ব্রহ্মসনাতন আবার হেসে বললেন, “গ্রীষ্মের দুপুরের নিস্তব্ধ রাস্তার ভান নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি!”

দিব্যশ্রী সম্মতি দিলে, ব্রহ্মসনাতন আবার বললেন, “সেই নিস্তব্ধরাস্তার নিস্তব্ধতাকে অনুভব করো পুত্রী। ... শান্ত চিত্তে সেই শান্তিকে অনুভব করো”।

দিব্যশ্রী নেত্র বন্ধ করলেন, আর অনুভব করতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন তিনি খালি হয়ে উঠতে শুরু করলেন। নেত্র বন্ধ রেখেই অস্ফুট ধ্বনিদ্বারা বললেন, “পূর্ণ শান্তি পিতা, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা”।

ব্রহ্মসনাতন শান্ত ভাবে বললেন, “কথা নয়, কেবলই উপলব্ধি... অনুভব করতে থাকো সেই শান্তি, সেই নিস্তব্ধতাকে। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেই শান্তিকে অনুভব করো”।

দিব্যশ্রী এবার দীর্ঘক্ষণ সেই শান্তিকে অনুভব করতে থাকলে, বহুক্ষণ পড়ে বললেন, “দ্বিপ্রহরের অন্ত হচ্ছে, সূর্য ঢলছে, রাত্রি আসছে”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে শান্ত ভাবে বললেন, “রাত্রি আসবে, চন্দ্র উঠবে। তুমি শান্তই থাকবে, কারণ কোলাহলের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপুরু চলে গেছ তুমি। ... ক্রমে চন্দ্রকে আর দেখতে পাবেনা। দ্বন্ধ জন্মাবে, আমাবস্যা নাকি! দ্বন্ধকে জয় করো, কারণ চন্দ্রকে তুমি ছাড়িয়ে উর্ধ্বে চলে গেছ, তাই সমস্তটাই আমাবস্যা। ... অনেক কিছু আসবে, অনেক কিছু হারাবে। তুমি সেই নিস্তব্ধতার উৎস খুঁজতে থাকো। যা আসছে, তাকে আসতে দাও ; যা যাচ্ছে, তাকে যেতে দাও। তুমি নিস্তব্ধতার উৎস খুঁজতে থাকো। ... চন্দ্র হারিয়েছে, এবার নক্ষত্র হারাবে। একটা একটা করে, সমস্ত নক্ষত্র হারিয়ে যাবে। কেবলই তুমি আর নিস্তব্ধতা”।

দিব্যশ্রী অস্ফুট ভাবে বিড়বিড় করে আনমনে বলার মত করে বললেন, “হ্যাঁ, কেবল আমি আর নিস্তব্ধতা। শান্তি, অপার শান্তি!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে আবার শান্ত গম্ভীর ও গুহ্য কণ্ঠে বললেন, “এবার তুমি নিজেকেও আর খুঁজে পাচ্ছনা। ... কোথায় গেলে তুমি? কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি!”

দিব্যশ্রীর অঙ্গ যেন নিজের অজান্তেই কম্পমান হতে শুরু করলো। অবিরাম স্বেদ বর্ষণ করতে থাকলো। ... অস্থির হতে শুরু করেছে দিব্যশ্রী। ... ব্রহ্মসনাতন আবারও গম্ভীর অথচ দৃঢ় মিষ্টস্বরে বললেন, “খোঁজা বন্ধ করো নিজেকে, নিস্তব্ধতার উৎস পেতে হবে তোমাকে। ... সেই উৎস খোঁজো ... সেই নিস্তব্ধতা কাছে পিঠেই কোথাও থেকে আসছে! কিন্তু তা আসছে কোথা থেকে?”

দিব্যশ্রী আবার ক্রমশ শান্ত হয়ে উঠলেন। স্বেদ বর্ষণ স্তব্ধ হলো। ... মুখমণ্ডল লাবণ্যপূর্ণ হলো। শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মুখখানি তাঁর দিব্যআলকে যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ... শুভ্রতা দেখে যেন মনে হতে থাকলো, সাখ্যাত মূর্তিতে যেমন শ্বেতসরস্বতী বিরাজমান থাকেন, তেমনই সরস্বতী বিরাজমান হয়ে বসে রয়েছেন, অপরিসীম সৌন্দর্য সঙ্গে ধরে। ... আরো শান্ত হয়ে গেল দিব্যশ্রী। ... শান্ত স্নিগ্ধ ভাবে বলে উঠলো ধীর গভীর কণ্ঠে, "শূন্য... আমি নেই... আমি ছিলাম না... তুমিই ছিলে... তুমিই আছো। এই নিস্তব্ধতা তুমিই... এই নিস্তব্ধতাই তুমি। ... শূন্য তুমি, জননী তুমি। ব্রহ্ম তুমি..." আর শব্দ বেরুলোনা মুখ থেকে, মুখে কেবলই এক দিব্যহাস্য। শরীর সম্মুখে এগিয়ে আসতে থাকলো, আর মাথা পশ্চাতে চলে গেল, যেন দিব্যশ্রীর দেহে প্রাণ নেই। ...

ব্রহ্মসনাতন পুত্রীরদেহকে ধীর ভাবে ধরলেন। দিব্যশ্রী আর নিজের মধ্যে নিজে নেই। ... বেশ কিছুক্ষণ পড়ে, তাঁর মুখ দিয়ে প্রথম স্বর শোনা গেল, "তুমি পিতা নও, তুমি মাতা... ওই নিস্তব্ধতাই তুমি। ওই অপার শান্তিই তুমি। ... ওই পূর্ণ স্বাধীনতাই তুমি। ... ওই মহাশূন্যই তুমি। তুমি এমন যে, সেখানে আমি থাকতেই পারিনা। হারিয়ে যাই। ... তোমাতে লয় হয়ে যেতেই হয়, কারণ আমি যে আমি নই, আমিও যে তুমিই। তুমিই যে সত্য, বাকি সমস্ত কিছু মিথ্যা। সমস্ত আমি মিথ্যা, এক তুমিই সত্য। মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা... সব মিথ্যা। ... ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা, জগত মিথ্যা, ধর্ম অধর্ম, ন্যায় অন্যায়, জীব অজীব, আমি আমরা সমস্ত কিছু মিথ্যা..."

নেত্র খুলে তাকিয়ে উঠলো দিব্যশ্রী। অনর্গল বিকট ভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস অত্যন্ত শান্ত হয়ে গেল, আর তাঁর দেহ যেন ক্লান্ত হয়ে নিদ্রায় ঢলে পরলো, তাঁর পিতার কোলে! পিতা না মাতা! নিদ্রা ভঙ্গ হলেই তা জানা যাবে!

আধা ঘণ্টা পড়ে নিদ্রা ভঙ্গ হলো দিব্যশ্রী। এবারে তিনি ধরমর করে উঠলেন না। শান্ত ভাবে ব্রহ্মসনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে এক দিব্যহাস্য প্রদান করে বললেন, "মা!"

ব্রহ্মসনাতন তাঁর কন্যার মস্তকে স্নেহকর স্থাপন করে স্নেহ প্রদান করতে থাকলেন। দিব্যশ্রী ক্রমশ দেহে বল লাভ করে উঠে বসলেন, কিন্তু পিতার অঙ্গস্পর্শ করা থেকে যেন আর তিনি দূরে থাকবেনই না, এমন যেন অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে রয়েছিলেন। যেন কন্যা নয়, নববিবাহিত স্ত্রী তিনি আজ ব্রহ্মসনাতনের। পিতার স্কন্ধে নিজের মাথা রেখে, ক্রমশ সেই মস্তককে ব্রহ্মসনাতনের বক্ষদেশে স্থাপন করে, অতিকোমল অথচ অত্যন্ত স্নেহপূর্বক প্রামালিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ করলেন।

ব্রহ্মসনাতন তাঁর কন্যার মস্তকের পশ্চাৎদেশ, তথা পৃষ্ঠে স্নেহস্পর্শ প্রদান করতেই থাকলেন। বেশকিছুক্ষণ এমন প্রেমানুভবের শেষে, সেই প্রেম যেন এবার দিব্যশ্রীর ওষ্ঠে স্থান করে নিলো। দিব্যশ্রী গদগদ হয়ে বললেন, "মা! ... কাকা ঠিকই বলতেন, একবার তোমার যথার্থ স্বরূপের দর্শন হয়ে গেলে, আর একদণ্ডও তোমাকে স্পর্শ না করে থাকতে ইচ্ছাই করবে না। ...

মা, প্রেম জন্মাচ্ছে হৃদয়ে। হ্যাঁ এই প্রথমবার প্রেম জন্ম নিচ্ছে, কারণ এঁর পূর্বে তো প্রেম কি ভাব, তাই জানতাম না। তুমি অনেকবার বলেছিলে, যতক্ষণ দুইয়ের অস্তিত্ব, ততক্ষণ মোহ; যখন একাকার ভাব, তখনই প্রেম। প্রেম এক অতিদিব্যভাব। মেনেছি তোমার কথা, কিন্তু আজ অনুভব করছি যে, সেদিন সেই কথার লেশমাত্রও অনুভব করিনি। যখন তোমার স্বরূপের দর্শন হলো, যেন নিজের পৃথক অস্তিত্ব আর রাখতেই পারলাম না।

নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলছিলাম। ভয় হচ্ছিল, যেন মনে হচ্ছিল, সব হারিয়ে গেল, চিরতরের জন্য সমস্ত কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রেমের এত আকর্ষণ যে, কিছুতেই এই হারিয়ে যাওয়াকে রোধ করতে পারলাম না। যেন এই হারিয়ে যাওয়াকে অবরুদ্ধ করা জগতের শ্রেষ্ঠ পাপ মনে হচ্ছিল। যেন মনে হচ্ছিল, এতকাল এই যে নিজের ভিন্নতাকে ধরে রেখে, তোমার থেকে আলাদা ছিলাম, সেটিই ছিল শ্রেষ্ঠ পাপ।

এটা পাপ, সেটা পাপ নয়, তোমার থেকে নিজেকে ভিন্ন জ্ঞান করাই মহাপাপ, একমাত্র পাপ। এটা ন্যায়, সেটা ন্যায় নয়, তোমার থেকে নিজেকে এক ভিন্ন আত্ম জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ অন্যায়। হ্যাঁ মা,

আজ তাই অনুভব হচ্ছে। অনুভব হচ্ছে, হ্যাঁ কেবলই অনুভব হচ্ছে, আর যেন কিছু বোঝার মত পাচ্ছিই না, মনে হচ্ছে যেন এই জগতসংসারে বোঝার মত, ভাবার মত, মানার মত কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুই নেই। মনে হচ্ছে যেন এই জগৎসংসারই নেই, মিথ্যা এই জগত।

সত্য কেবলই তুমি, আর তোমার থেকে নিজেকে ভিন্ন আত্ম জ্ঞান করাই পাপ, অন্যায়, অধর্ম। আমার আমিই হলো আমার শ্রেষ্ঠ অভিশাপ, আবার আমার এই আমিই হলো শ্রেষ্ঠ বরদান, কারণ তা না থাকলে যে, এই অপার প্রেমকে অনুভবই করতে পারতাম না। মা, যেন মনে হচ্ছে, তোমার থেকে নিজেকে আলাদা অনুভব করা আমার ভ্রম তো ছিলই, কিন্তু সেই ভ্রমে ভ্রমিত হওয়াটাও তোমারই প্রদত্ত এক শিক্ষা ছিল আমাদের সকলের জন্য।

হ্যাঁ মা, এমন মনে হচ্ছে যে, যদি তোমার থেকে ভিন্ন হয়ে অহংকে ধারণ না করতাম, তাহলে তোমার দর্শন করে, অপার প্রেম অনুভব করে, অহং ত্যাগের মহানন্দই উপভোগ করতে পারতাম না। আর তা যদি না করতাম, তাহলে হয়তো তুমিই যে প্রেম, প্রেম যে তোমার অপর নাম, প্রেম মানেই যে তুমি, তা অনুভবই করতে পারতাম না। আর তা অনুভব করতে না পারলে, নিজেকেই শ্রেষ্ঠ প্রেমী মানতাম, আর মানতাম যে শূন্যতা অসহ্য।

শূন্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, ব্রহ্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে, সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে, যখন পুনরায় সেই শূন্যকে, সেই সত্যকে, আর ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখনই অনুভব হলো এই প্রেমের। তোমার প্রেমের অনন্ত ধারাকে প্রত্যক্ষ করে, নিজেকে অপরাধী মনে হলো, তোমার এই অপারপ্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। গ্লানি হলো, ক্রন্দন এলো, অপরাধবোধে মুখ লুকাতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু কি করে নিজেকে তোমার থেকে লোকাবো! অন্তরে বাহিরে, সর্বত্রই যে তুমি। সত্য কেবলই তুমি। তোমার থেকে মুখ কি করে লুকাবো!

দূরে থাকতে দিলে না তুমি। আমি বিশেষত্বের সন্ধান করে আত্ম হয়েছিলাম, অহং হয়েছিলাম, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠন করে বিশেষ হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম। অলিক কল্পনার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলাম যে এই বিশেষও প্রেম করতে পারে। মিথ্যা ছিলাম, ভ্রান্ত ছিলাম, উদ্ভ্রান্ত

ছিলাম। বিশেষ যে প্রেমকে ত্যাগ করেই বিশেষ হয়। প্রেম মানেই যে নির্বিশেষ। নির্বিশেষ মানে, যা সর্বত্র বিরাজমান, কারুর মধ্যে কম নেই, কারুর মধ্যে বেশি নেই। নির্বিশেষ মানে, সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখা, কেউ অধিক আপন নয়, কেউ বলতে কেউ পর নয়।

নির্বিশেষ মানে, সহজতা, সরলতা, নির্বুদ্ধিতা, আবেগশূন্যতা, যোজনাহীনতা, কল্পনামুক্ততা। নির্বিশেষ মানে, অবাধ, অগাধ, অনন্ত, অসীম। নির্বিশেষ মানেই প্রেম। তাই নির্বিশেষকে ত্যাগ করে, কি করে প্রেম করবো আমি? কি করে প্রেম করতে পারে আত্ম? কি করে প্রেম করতে পারে অহং! ... পারেনা, পারতেই পারেনা। তাই তো বিভিন্ন বার যাকে প্রেম বলে সে, তা প্রকৃত অর্থে মোহ ব্যতীত কিছুই নয়।

কিন্তু এই ভ্রম তাঁর নাশ হতো কি করে? তোমার দর্শন করে। যখন তোমার দর্শন হলো, পায়ের তল থেকে জমি সরে গেল, মাথার উপর থেকে আকাশ সরে গেল, সূর্য চলে গেল, চন্দ্র নক্ষত্র সমস্ত কিছু চলে গেল। বিরাট থেকে ক্ষীণ, সমস্ত প্রকাশ চলে গেল, আর নির্মম বাস্তব সামনে এসে উপস্থিত হলো। যেই ভ্রম আমার মধ্যে ব্যপ্ত ছিল যে, প্রকাশই শ্রেষ্ঠ, আজ তা মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল”।

দিব্যশ্রী আপ্লুত ভাবে বলতেই থাকলেন, “অনুভব করলাম, প্রকাশ অন্ধকারকে অপসারণ করে ঠিকই, কিন্তু সত্য অন্ধকারই, আর প্রকাশ তা ঢেকে ভ্রমের সঞ্চার করে। দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম, শয়তান তো অন্ধকারের কথা বলে, তাহলে কি শয়তানই ভগবান! ... পড়ে অনুভব করলাম, প্রকাশ ভ্রমিত, শয়তান আরো অধিক ভ্রমিত। প্রকাশ তো সত্যরূপ অন্ধকারকে ঢেকে দিতে চায় নিজের প্রকাশ দিয়ে। সেই অন্ধকার নীরবতাকে ভঙ্গ করে, তাতে শব্দ স্থাপন করে, ধ্বনি স্থাপন করে, কিছু নেই, সেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, অসত্যকে ধারণ করতে শুরু করে।

যা নেই, অর্থাৎ প্রকাশ, শব্দ, ধ্বনি, ভেদ, ভেদক, ভেদ্য, সেই সমস্ত কিছুকে সে কল্পনা করতে শুরু করে, আর সত্যের থেকে মুখ সরিয়ে রেখে মানতে শুরু করে যে, সেই সত্য। সে নাকি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত চিন্তাশীল, কিন্তু একটি দণ্ডের জন্যও সে বিচার করেনা যে, সত্য কি

করে এতশত হতে পারে! এতশত সত্য যে প্রতিটি সত্যকেই কোথাও না কোথাও মিথ্যা করে দিচ্ছে। ... কিন্তু ভ্রমে এমনই বদ্ধ সে, বিশেষত্ব অর্জনের নেশায় এতই চূড় সে, যে সত্য যে দুই হতে পারেনা, কারণ দুইয়ের অস্তিত্বই একজনকে সত্য এবং একজনকে অসত্য করে দেয়, তা উপলব্ধি করতে পারেনা সে।

উপলব্ধি করতে পারবেই বা কি করে! উপলব্ধি তো হৃদয় দিয়ে করতে হয়, অনুভব দ্বারা করতে হয়। উপলব্ধিকে তো আর ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায়না, উপলব্ধিকে তো হৃদয়ের দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে হয়। সেই দেখা যে নেত্রের দ্বারা দেখার থেকে অনেক অনেক অধিক স্পষ্ট। কেমন জানো মা! অনেকটা আজকের দিনের টুডি আর থ্রিডির মত। কিন্তু হৃদয় দ্বারা দর্শন, থ্রিডিও নয়, সে হলো ফোরডি।

হ্যাঁ মা, যেন স্থান, কাল আর পাত্র হলো থ্রিডির তিনটি ডি বা ডাইমেনশন, আর চতুর্থ ডি হলো চেতনার দৃষ্টি। চারমিলে গেলে, আর মনে হয়না যে কিছু হচ্ছে, বাস্তবেই কিছু হয়। ... অর্থাৎ কেমন বলতো মা, টুডিতে যেমন কুমীর চোখের সামন্তে থেকে চলে গেল, থ্রিডিতে কুমীর যেন একদম চোখের সামনে এসে গেল, মনে হলো যেন এই আমাকে খেয়ে নিলো, কিন্তু চোখের সামন্তে থেকে সরে গেল মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু এ যেন ফোরডি, কুমীর আমাকে সত্য করেই খেয়ে ফেলল।

হ্যাঁ মা, চোখে দেখা, চোখে দেখা নিয়ে একসময়ে অনেক তর্ক করতাম, অহংকার করতাম, যা চোখে দেখিনি, তা বিশ্বাস করবো না। মা, আজ যা দেখলাম, এরপর তো চোখে দেখা কিছু অনেক পরের কথা, নিজের চোখই নিজের ভ্রমের কারণ মনে হচ্ছে। এতকাল কেবলই সে আমাকে মিথ্যা দেখিয়ে এসেছে। হ্যাঁ মিথ্যা দেখিয়ে এসেছে যে কিছু না অনেক কিছুই আছে।

আমার কান আমাকে মিথ্যা শুনিয়ে এসেছে যে এক নয়, বহু ধ্বনি আছে। আমার ত্বক আমাকে মিথ্যা বুঝিয়ে এসেছে যে এক নয় অনেক অনুভব সম্ভব। আমার রসনা আমাকে সমানে মিথ্যা বলে এসেছে যে, এক নয় অনেক প্রকার স্বাদ হয়। আমার ঘ্রাণশক্তি আমাকে সমানে মিথ্যা বলে

এসেছে যে অনেক প্রকার ঘ্রাণ হয়। ... হ্যাঁ মিথ্যা, সর্বৈব ভাবে মিথ্যা বলে এসেছে তারা। আগাগোড়া কেবল মিথ্যা আর মিথ্যা।

যখন কারুর দৃষ্টিশক্তি চলে যেত, তখন; যখন কারুর শ্রবণ শক্তি চলে যেত, তখন; যখন কারুর ঘ্রাণশক্তির নাশ হতো তখন; যখন কারুর স্বাদের ভেদ চলে যেত তখন; সর্বক্ষণ আমাকে তাঁদেরকে করুণার দৃষ্টিতে দেখিয়েছে। আরে করুণা তো আমার উপর তাঁদের করার ছিল। সত্যের কাছে তাঁরা গেছিলেন, আমি তো সেই মিথ্যার মধ্যেই ডুবে ডুবে মরছিলাম।

সত্য তো এই যে, কনো দ্বিতীয় চিত্রই সম্ভব নয়, শূন্যব্যতীত। সত্য তো এই যে কনো দ্বিতীয় ধ্বনিই সম্ভব নয়, নিঃশব্দ ব্যতীত। সত্য তো এই যে এক ও একমাত্র অমৃতেরই স্বাদ হয়, বাকি সমস্ত কিছু বিস্বাদ। সত্য তো এই যে এক ও একমাত্র গন্ধহীনতাই গন্ধ, যেই প্রশ্ন তোমাকেও বারবার করতাম আমি মা। ... আমার মনে জিজ্ঞাসা এই ছিল যে, কেন তোমার অঙ্গ থেকে চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়না, কেন কনো পুষ্পের হয়না, তুমি তো পবিত্রশ্রেষ্ঠ, তারপরেও তোমার অঙ্গ থেকে কেন কনো প্রকার বাসই আসেনা!

আজ অনুভব করেছি মা, যেকোনো প্রকার গন্ধই যে ভ্রম, আর তুমি যে সত্য। তাই তোমার অঙ্গে কনো গন্ধই নেই, না সুবাস আছে, আর না তোমার স্বেদেরও কনো বাস আছে, আর না সেই স্বেদ অঙ্গে দীর্ঘক্ষণ স্থাপিত থাকলেও কনো রকম বাস আসে তোমার অঙ্গ থেকে। আসবে কি করে? তুমি যে সত্য, আর সত্য এই যে, তার কনো বাসই সম্ভব নয়।

তাঁর মধ্যে কনো বিশেষ রূপ নেই, তাঁর মধ্যে কনো বিশেষ ধ্বনি নেই, তাঁর মধ্যে কনো বিশেষ গন্ধ নেই। ... সেই যে সম্পূর্ণ ভাবে নির্বিশেষ, যার ধারনাও করা যায়না, এই প্রকাশের মধ্যে স্থিত থেকে, কারণ প্রকাশ যে স্বয়ং এক বিশেষত্বের ভ্রম। ... আজ অনুভব করেছি মা, ত্বকের সমস্ত অনুভব মিথ্যা, অনুভব তো একটিই সম্ভব আর তা হলো প্রেম। ... প্রেমই একমাত্র অনুভব, শূন্যই একমাত্র দর্শনিয়, নিঃশব্দতাই একমাত্র শ্রবণীয়, ঘ্রাণহীনতাই একমাত্র ঘ্রাতব্য, আর স্বাদহীনতাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য স্বাদ।

তবে এতো এক স্তরের ভ্রম, এতো প্রকাশের ভ্রম, এতো দেবতাদের ভ্রম। এরপরে আবার অসুরদের ভ্রমও আছে। তাঁরা তো আবার এই প্রকাশের মধ্যেই অন্ধকারের সন্ধান করে। অর্থাৎ, যেই অন্ধকারের বক্ষে প্রকাশ একটি ভ্রম, সেই সত্যসনাতন অন্ধকার তাঁদের আরাধ্য নয়। তাঁদের আরাধ্য হলো, সেই প্রকাশ অর্থাৎ ভ্রমের মধ্যে স্থিত অন্ধকার, অর্থাৎ ভ্রমের মধ্যে ভ্রম। এক তো এই ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ভ্রমের থেকে নির্মিত যন্ত্র, সেই যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্র আমাদের এই পঞ্চভূতের দেহ। সেই ভ্রমেও শান্তি নেই অসুরদের। তার উপর আরো ভ্রমের আস্তরণের প্রয়োজন তাঁদের। তাই এই পঞ্চভূত তনুর উপর আবারও যন্ত্র আর মন্ত্র স্থাপনা।

মা, সত্যই বলতে তুমি, বুদ্ধির ব্যবহারই হলো শ্রেষ্ঠ নির্বুদ্ধিতা। এই যে ভ্রমের আস্তরণের উপর আবার করে ভ্রমের আস্তরণ স্থাপন, সে তো আমাদের এই খুরধর বুদ্ধিরই অতিচালাকি, তাই না! ... কিন্তু থাক সেসব কথা। আজ আর মুখ খারাপ করতে ভালোই লাগছে না। ... আমার চিত্ত আজ বলছে, বয়ে চলো বাছা, নিজের মায়ের প্রেমের সাগরে বহে চলো।

মা, যখন প্রথমবার সেই অন্ধকারকে দেখলাম, যার থেকে অনেক দূরে প্রকাশ গুলো কিছু অণুর মত দেখাচ্ছিল, আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম। একবার তো এমনও ভেবেনিয়েছিলাম যে আমি মনে হয় কনো একটা পাতালে পৌঁছে গেছি। কিন্তু পরিবর্তীতে তোমার প্রেম সমস্ত কিছু অনুভব করিয়ে দিলো। অনুভব করিয়ে দিলো আমার ভ্রম কি ছিল, সত্য কি, আর আমার ভ্রম আরো কি কি ভ্রম করেছিলো, আর বাকি আত্মরাও আমিই, তাই সেই ভ্রমের পর ভ্রমের নির্মাণ আমি করেই চলেছি।

মা, এরপর আমার যে কি করা উচিত আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। না রয়েছে কনো শব্দ, না রূপ, না গুণ, না ঘ্রাণ, না বাস, আর অনুভব! ... সে যে নেই, তা তো বলা যায়ই না, কারণ একাকী যেন সে-ই ছিল। জানিনা, পর্বতারোহণ তো আমি কনোদিন করিনি, তাই পর্বতের শিখরে উত্থানের অনুভূতিও জানিনা। তবে সেই সময়ে যেন আমার অনুভূতি তেমনই ছিল। যেমন পর্বতারোহী একবার শিখরকে নিজের আয়ত্তাধীন দেখে ফেললে, তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর

হয়ে যায়, কেবলই শিখরে পৌঁছানোর দিকেই তাঁর প্রাণ নিবদ্ধ হয়ে যায়, আমারও তেমনই হলো।

কতটা দূর এসেছি, সেই পথে কি কি হারিয়েছি, কনো কিছুর যেন বোধই রইলো না। যেন এক অসম্ভব নেশা আমাকে আকর্ষণ করতে থাকলো, আর আমি দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে সেই পূর্ণবনিরবতা, পূর্ণশূন্য, পূর্ণনির্গুণ, পূর্ণভাবে যিনি অব্যাক্ত, তাঁর কাছে এগতে থাকলাম। আর যখন পৌঁছলাম তাঁর কাছে, তখন উপলব্ধি করলাম যে, সেই শিখর তো পর্বতের শিখরই নয়, তা যে আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর ছিল। একবার সেখানে পদার্পণ করতেই, যেন সরাসরি আমাকে পাতালে নিয়ে চলে যাওয়া হলো।

এতটাই গভীরে চলে যেতে থাকলাম যে, একসময়ে আর আমি বলে কিছু রইলই না। অনুভূতিও রইলো না, কেবলই তলিয়ে যাওয়া, নিজেকে হারিয়ে ফেলা। ... কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু নেই, হয়তো এই কিচ্ছু না থাকাই হলো শূন্য। সত্যই বলেছিলে তুমি, সত্য বলে কিচ্ছু হয়না। এই শূন্যকে আমি কি করে কিচ্ছু বলে আখ্যা দিতে পারি! ... এ যে কিচ্ছু নয়! কিচ্ছু নয়, কিন্তু তা যেন কিচ্ছু না হয়েও সমস্ত কিছু।

সেই শূন্যই একমাত্র সত্য। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুপরমাণু সমস্ত মিথ্যা, কেবল মিথ্যা নয় ডাহা মিথ্যা। সেই সমস্ত আমারই নির্মিত কল্পনা। যেন আমি নিজেকেই নিজে এতকাল ধোঁকা দিয়ে আসছিলাম, সেই অণু, পরমাণু, আর সেই অণুপরমাণুদের একত্রিত সমষ্টিগুলিকে কিছু বলে ধারণা করে। আমি যেন আমার নিজের সাথেই মিথ্যাচার করে আসছিলাম। নিজেই সমস্ত কিছুর কল্পনা করেছি, আর সেই কল্পিত গুণগুলিকে নিজেই দেখে দেখে, নোটবইতে তা লিখে লিখে, মুখস্ত করে এসেছি, আর মনে করে গেছি, আমি কি মহান কাজই না করছি! ...

সত্য তো এই যে কনো গুণ সম্ভবই নয়! সত্য তো এই যে কনো রূপ সম্ভবই নয়! সত্য তো এই যে কনো গন্ধ সম্ভবই নয়! সত্য তো এই যে কনো স্পর্শ অনুভূতি সম্ভবই নয়! সত্য তো এই যে কনো স্বাদ সম্ভবই নয়! সত্য তো এই যে কনো শব্দ, কনো ধ্বনি সম্ভবই নয়! সত্য তো

এই যে কনো সীমা সম্ভবই নয়, কনো অন্ত সম্ভবই নয়, কনো নশ্বর সম্ভবই নয়, কনো ভেদ সম্ভবই নয়, কনো চিন্তা, কনো ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়।

কারণ এই শূন্যই যে একমাত্র অস্তিত্ব, আর আমি! ... আমি স্বয়ংও যে সেই শূন্যই। সেই শূন্যের এই নির্গুণতা, এই নিরবিশেষতা, এই ধ্বনিহীনতা, এই রূপহীনতা, এই ভেদহীনতার মর্মই আমি বুঝি নি, তাই গুণ খুঁজতে, বিশেষত্ব খুঁজতে, ধ্বনি শুনতে, রূপ দেখতে, ভেদ খুঁজতে নিজে এই শূন্য হয়েও, নিজের শূন্যতাকেই নিজে অস্বীকার করেছিলাম।

আর এই অস্বীকার করার কালেই আমি বিশেষত্বের, গুনের, ধ্বনির, রূপের চিন্তা করে, চিন্তার জন্ম দিই। সেই সমস্ত কিছুকে লাভ করার ব্যকুলতা থেকে ইচ্ছার জন্ম দিই, আর সেই সমস্ত কিছুকে ধারণ করার জন্য কল্পনা করা শুরু করি। এই তিন ভাব থেকে ত্রিগুণের নির্মাণ করি, আর ত্রিগুণের অহংভাবে অন্ধ হয়ে গিয়ে, এই পরমশূন্যকেই অধিকার করে নেবার চিন্তা করি।

কিন্তু তা তো পারিনা, কারণ এই শূন্য যে অজেয়, কারণ যে জয় করবে এই শূন্যকে সেও যে সেই শূন্যই। ... তাই অসম্ভব এই কাজে সফল না হয়ে, একেই প্রকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি নাম দিই, একেই নিয়ন্ত্রণের অতীত বা নিয়তি নাম দিই। কিন্তু এই শূন্যই তো সত্য, তাকে ছাড়া যে কিছুই সম্ভব নয়। তাই নিজের ইচ্ছা, চিন্তা আর কল্পনাকেই এঁদের উপর আরোপ করে করে, এঁদেরকে ত্রিদেবীরূপে কল্পনা করতে থাকি, আর এও কল্পনা করতে থাকি যেন এই ত্রিদেবী আমার বশে স্থাপিত।

আমি যা চিন্তা করবো, তাই হবে আমার বিদ্যা; আমি যা ইচ্ছা করবো, তাই হবে আমার সম্পদ; আমি যা কল্পনা করবো, তাই হবে আমার শক্তি। ... উন্মাদ হয়ে গেলেম আমিত্বের বোধে, আত্মের বোধে, অহংবোধে, আর তাই নিজেকে আত্ম নাম দিয়ে দিলাম। আর আমারই এই ইচ্ছা, চিন্তা ও কল্পনার সাথে সাখ্যাতে এবং এঁদেরই দ্বারা কল্পনা প্রকাশিত প্রকৃতের সাথে সঙ্গমেরও কল্পনা করে, তার থেকে কল্পনাতেই পঞ্চভূতের আর আবেগদের নির্মাণ করে

ফেললাম, আর তারপর তো কল্পপ্পা বৃদ্ধি পেতে পেতে, এই আস্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করে নিয়ে, একেই সত্য মেনে চলেছিলাম।

ঠকাচ্ছিলাম, হ্যাঁ নিজেকে নিজে ঠকাচ্ছিলাম। কবে থেকে জানিনা, সময় বা কালের হিসাবও নেই, সমানে নিজেকে ঠকিয়ে যাচ্ছিলাম। মিথ্যা এই কল্পনাকেই সত্য বলে অঙ্গিকার করে, নিজেরই কল্পনাকে নিজে শিক্ষারূপে ধারণ করার প্রয়াস করে, নিজেকে বিদ্যান বলে বলে নিজেকেই ঠকাচ্ছিলাম। নিজেরই ইচ্ছাকে সম্পদরূপে প্রকাশিত করে, সেই সম্পদকে পুনরায় অধিকার করার উন্মাদনাকে আমি মূর্খের ন্যায় জীবনের উদ্দেশ্য বলে অঙ্গিকার করতাম।

ধিক্কার আমাকে, আর ধিক্কার আমার নিজেরই ছলনাকে। নিজেরই কল্পনাকে নিজে অধিকার করার প্রয়াস! আমি তো পাগলও নই, আমি তো বদ্ধ উন্মাদ! আর সেই নিজেরই কল্পনাকে অধিকার করার জন্য খুশী হয়ে ওঠা! এও কি সুস্থতার চিহ্ন! সেই অধিকার করতে পারার জন্য আমি যেন শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছিলাম! ... এতটা অধম আমার বোধ কি করে হতে পারে! ...

সত্য বলেছিলে তুমি, সত্য বলে কিচ্ছু বলতে কিচ্ছু নেই। এই শূন্য যে কিচ্ছু নয়, আর সেই কিচ্ছু নয় যা, তাই যে সত্য, একমাত্র সত্য। বাকি সমস্ত কিছুর অস্তিত্বই মিথ্যা, মিথ্যা কথার থেকেও অধিক মিথ্যা। ... তবে আরো একটি জিনিস আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি মা। এই শূন্যই তুমি, আর তাই তুমি কনোরকম যোজনা করো না, কনো রকম চিন্তা, ইচ্ছা, কিচ্ছু করো না। এই শূন্যই যথার্থ আর তাই হলে তুমি, আর তাই তুমি বারবার আমাকে বলো, যতটা আমার এই দেহ মিথ্যা, ততটাই তোমার এই দেহও মিথ্যা।

কিন্তু তারপরেও আমি একটি কথা বলবো মা, তোমার থেকে এই বিচ্ছেদ আবশ্যক ছিল আমার জন্য। জানি আমার এই বিচ্ছেদ তোমাকে অনন্ত বেদনা প্রদান করেছে। সেই বেদনার অনুমান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ যেমন তুমি অনন্ত, তেমন তোমার বেদনাও অনন্ত। কিন্তু তাও বলবো এই বিচ্ছেদ আবশ্যক ছিল আমার জন্য।

এই বিচ্ছেদ না হলে, শূন্যের গরিমা কনোদিনও অনুভব করতে পারতাম না আমি। এই বিচ্ছেদ না হলে, নিঃশব্দতার মহানতা আমার কাছে অধরাই থাকতো। এই বিচ্ছেদ না হলে, জানতাম কি করে যে, তুমি নির্গুণ নও। ... না মা, তুমি নির্গুণ নও। কিছুতেই তুমি নির্গুণ নাও, তবে তোমার দুটি গুণ নেই, একটিই গুণ, আর সেই গুণটিই হলো সত্য। আর তা হলো প্রেম। হ্যাঁ মা, আমি স্পষ্ট ভাবে অনুভব করে ফেলেছি, তুমি প্রেমী নও, তুমি স্বয়ং প্রেম।

তোমাতে ডুব দেওয়াই প্রেম, কারণ তুমিই প্রেম; তোমাতে হারিয়ে যাওয়াই প্রেম, কারণ তুমিই প্রেম; তোমাতে বিলীন হয়ে যাওয়াই প্রেম, কারণ তুমিই প্রেম। তাই তুমি নির্গুণ নও। তুমি প্রেম। তুমি অনন্ত, তুমিই একমাত্র সত্য, আর সেই সত্য হলো প্রেম। অর্থাৎ প্রেমই একমাত্র, যা সত্য। আর সঠিক বলতে তুমি, যতক্ষণ দুই, ততক্ষণ মোহ। প্রেম মানে তো একাকার। যতক্ষণ তোমাকে দেখছিলাম, ততক্ষণ আমার মধ্যে আবেগ ছিল। যাই তোমাতে বিলীন হয়ে গেলাম, তাই অনুভব হলো প্রেমের। অনন্ত তোমার প্রেম।

আর তাই সত্য বলে কিচ্ছু নেই, মা, আমি এই অঙ্গিকার তোমার মানতে পারলাম না। না তুমি মিথ্যা বলো নি, কারণ তুমি নিজের প্রেমকে অনুভবই করো না, ঠিক যেমন আমিও তা করিনি, আর করিনি বলেই তোমাকে নির্গুণ ভেবে তোমাকে ত্যাগ দিয়ে, আত্ম হয়ে নিজেকে কল্পনায় বেঁধেছিলাম। কিন্তু তুমি নির্গুণ নও। স্মরণ করো মা, রামকৃষ্ণ ঠাকুরও একবার ভয়ানক চোটে গেছিলেন যখন কেউ তাঁকে বলেছিলেন ঈশ্বর নির্গুণ। সেই চোটে যাওয়ার কারণ একটিই, আর তা এই যে, ঈশ্বর নির্গুণ নন। ঈশ্বর স্বয়ং প্রেম। আর এই সত্য আমার উদ্ধার করা আবশ্যক ছিল।

না মা, তুমি বিশেষত্ব অর্জন করতে চাওনা ঠিকই, যেমনটা আমি চেয়ে তোমার থেকে নিজেকে পৃথক কল্পনা করে, বিশেষ হবার জন্য, শ্রেষ্ঠ হবার জন্য পাগলামি করেছিলাম। কিন্তু তুমিও নির্বিশেষ নও। কারণ তুমি হলে শ্রেষ্ঠ বিশেষ, আর তার কারণ তুমি স্বয়ং প্রেম। হয়তো এটিই মোক্ষ। হয়তো নয়, এটিই মোক্ষ। আর এটি তুমিও জানতে, খুব ভালো করে জানতে যে, তুমি নির্গুণ নও, তুমি নির্বিশেষ নও। আর তাই তো আমি যখন আমার এই কল্পনাতে মজে উঠলাম,

আমার মত অজস্র আত্ম, যারা আত্মই নয়, স্বয়ং তুমি, তারা যখন বিশেষত্বের সন্ধানে পাগল হয়ে উঠলো, গুনের সন্ধানে পাগল হয়ে উঠলো, তখন তুমি নীরবে সমস্ত কিছুকে সমর্থন করে গেলে, এখনো নীরবেই সমস্ত কিছুকে সমর্থন করেই চলেছ।

কারণ তুমি জানো, শ্রেষ্ঠ বিশেষ তুমিই; তুমি ভালো করেই জানতে যে শ্রেষ্ঠ গুণ স্বয়ং তুমি। আর সেই সত্যই আমাদেরকে উপলব্ধি করানোর ছিল, আর তাই নীরব দর্শকের আসনে বসে থেকে, অনন্ত বেদনা সহ্য করে, চুপিসারে আমাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করে থাকো। ... কারণ তুমি আমাদের থেকে এই কথা শুনতে চাও। যেই তোমাকে নির্গুণ বলে অভিযোগ করে, তোমার থেকে আলাদা অনুভব করেছিলাম নিজেদের, সেই অভিযোগ যে অবান্তর, কারণ তুমিই শ্রেষ্ঠ গুণ, স্বয়ং প্রেম, তা তুমি শুনতে চেয়ে চুপ করে আমাদের প্রতিটি গতিবিধির উপর নজর রেখে গেলে এতকাল।

তোমাকে নির্বিশেষ এবং তাই অসহ্য বলে যে আমরা তোমার থেকে পৃথক হবার অঙ্গিকার করেছিলাম, আমরা তোমার থেকে চেয়েও আলাদা হতে পারবো না, তা জেনেও চুপ করে তুমি বসে রইলে আর আমাদের উপর থেকে এক পলকের জন্যও নিজের দৃষ্টি সরালে না। কারণ তুমি যে চেয়েছিলে আমরা নিজে মুখে স্বীকার করি যে তুমিই হলে শ্রেষ্ঠ বিশেষ, আর তার কারণ তুমি প্রেম। আর তাই তো দেখো না। সমস্ত কল্পনা করে গেছি, আর সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রেমকেই খুঁজে বেরিয়েছি।

হাজার হাজার কামনার রচনা করেছি, এই প্রেমের খোঁজে; জনমে জনমে পুরুষ হয়েছি, স্ত্রী হয়েছি, আর বারে বারে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে প্রেমকেই অনুভব করার প্রয়াস করেছি। ... সখার প্রেম, মাতার প্রেম, পিতার প্রেম, সন্তানের প্রেম, গুরুর প্রেম, ভগিনীর প্রেম, শত্রুর প্রেম, ভ্রাতার প্রেম, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, আরো কত কিছুই না প্রেমের রচনা করে গেছি, কিন্তু কিছুতেই আমাদের জননীর প্রেমের সমতুল্যও কিছুকে পাইনি। ... আর শেষে যখন নিজের জননীর সাথে মিলিত হলাম, যখন শূন্যে লীন হলাম, তখন জানলাম, আমাদের জননীকে তো আমরা মিথ্যা আরোপ দিয়েছিলাম যে তিনি নির্গুণ। তিনি তো স্বয়ং প্রেম।

তিনি প্রেম বলেই না, সমস্ত আমাদের নির্মাণ করা প্রেম আমাদের কাছে নশ্বর আর ফিকে লাগতে থাকলো! ... কি করে যথার্থ লাগবে সেই সমস্ত প্রেমকে! সেই আমাদের নির্মিত একটি প্রেমেও তো একাত্ম হওয়ার বোধই নেই। সঙ্গমে সেই বোধ সামান্য থাকে, তাই তার নেশাতেই সমস্ত জীব চূড়, কিন্তু সেই একাত্মতাও তো মাত্রই আঙ্গিক, কোথায় তা সম্পূর্ণ একাত্মতা! ... তাই কিছুতেই যে আমরা খুশী হতাম না, কনো প্রেমেই তৃপ্তি পেতাম না, প্রেম মানেই বিরহ হয়ে গেছিল আমাদের কাছে। হবেই তো তা, যার জননী স্বয়ং প্রেম, সেই অনন্ত প্রেমকেই সে অস্বীকার করে এসেছে এতকাল, তাকে স্বীকার না করলে, প্রেমের যথার্থতা সে বুঝবে কি করে?

তাই মা, এই বিচ্ছেদ খুব আবশ্যক ছিল। তোমার মর্ম কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যদি না এই বিচ্ছেদ হতো। প্রেমের কারণেই এই বিচ্ছেদ, আর প্রেমের কারণেই এই মিলন। প্রেমের সন্ধান করতে গিয়েই এই বিচ্ছেদ ঘটেছিল, আর আজ প্রেমের সন্ধান করতে গিয়েই, এই মহামিলন সম্ভব হলো। ... আর কে বলেছে, তোমাকে দেখা যায়না! ... তুমি একবার বলেছিলে, যখন আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে তোমাকে কি চোখে দেখা যায়! ... তুমি বলেছিলে, কোন চোখের কথা বলছো পুত্রী! ... স্মরণ আছে তোমার!

আজ সেই কথার অর্থ অনুভব করলাম মা। সত্যই কিচ্ছু বোঝার নেই এই জগতসংসারে। যা ডাহা মিথ্যা, তাতে আবার বোঝার কি থাকতে পারে! ... প্রয়োজন কেবলই অনুভবের। আর এই অনুভবই হলো শ্রেষ্ঠ নেত্র, কারণ এই অনুভব হলো হৃদয়ের নেত্র। আর এই নেত্রদিয়েই দেখা যায় তোমাকে। আর যখন এই নেত্র তোমাকে দেখে, সত্য বলছি মা, আমাদের এই দুটি চর্মচক্ষু এত স্পষ্ট ভাবে আজ পর্যন্ত কিচ্ছু দেখেনি। ওই যে বললাম, এখানে কুমির খালি দেখা দেয়না, খালি ভয় পাওয়ায় না, এই দৃষ্টিতে কুমির আস্ত আমাকে খেয়েও ফেলে। ...

তাই সত্য কথা, তোমাকে, মানে ঈশ্বরকে সাখ্যাত দর্শন করা যায়, তবে এই চর্মচক্ষুর কেবলই নিজের নির্মিত কল্পনাকে দেখার সামর্থ্য আছে, মনচক্ষুরও তাই। তোমাকে দেখার জন্য লাগে দিব্যদৃষ্টি, আর তা তুমি আজ আমাকে প্রদান করলে, আর তাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম। ... তোমাকে স্পষ্ট দেখা যায়। স্পষ্ট দেখা যায় যে তুমি হলে সাখ্যাত প্রেম, সাখ্যাত

শূন্য, সাখ্যাত অনন্ত, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, সমস্ত কিছু স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু যে দেখে তা, সে হলো দিব্যদৃষ্টি। হাজার হাজার দিব্যদৃষ্টি নেই, একটিই দিব্যদৃষ্টি আছে, আর সেই দিব্যদৃষ্টির নাম হলো অনুভবদৃষ্টি। এই অনুভবদৃষ্টিদ্বারা তোমাকে স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

আজ আমার কাছে সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে মা। তুমি যে বলেছিলে, যে তোমাকে নিজের অহংকারের দৃষ্টিদিয়ে দেখে, সে দেখে তুমি পিতা, আর যখন সেই অহং বা আত্ম খসে যায়, আর হৃদয় দিয়ে তোমাকে দেখে, সে তোমাকেই দেখে মা বলে, নিজের জন্মজন্মান্তরের মা, নিজের একমাত্র মা, নিজের একমাত্র পরমাত্মীয় রূপে। আর সঠিকই বলেছিল কাকা, একবার তোমার সত্যস্বরূপকে দেখার পর, আর যেন নিদ্রা যেতেও ইচ্ছা করেনা, ভয় হয় যদি নিদ্রা গেলে তোমাকে দেখতে না পাই!

কিন্তু মা, নিদ্রাতেও তো আমরা তোমার কাছেই থাকি। কেবলই নিজেদের কল্পনা যখন অতিপ্রবল হয়ে যায়, তখন সেই তোমার কাছে লীন হয়ে থাকার সময়কাল, অর্থাৎ নিদ্রার কালেও কল্পনার বিস্তার দেখতে থাকি, যাকে আমরা বলি স্বপ্ন। ... সত্য বলছি মা, আজ যেন সত্য স্বয়ং আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে দুটি কথা, আর দুটিই তুমি বলতে আমাকে।

প্রথমটি এই যে সত্য বলে কিচ্ছু সম্ভবই নয়, কারণ সত্য সম্ভব হলে, অসত্যও সম্ভবই হবে। ধ্রুবসত্য এই কথা। সত্য বলে কিচ্ছু নেই, কারণ সত্য হলো একমাত্র শূন্য, মহাশূন্য, অখণ্ড, অনন্ত, অব্যক্ত, অচিন্ত্য শূন্য, আর তাই সত্য বলে কিচ্ছু হয়না, আর সত্য বলে যে কিচ্ছু হয়না, এটিই একমাত্র সত্য।

আর দ্বিতীয় তুমি আমাকে বারবার বলতে, ঈশ্বর দর্শন দিতে আসেন না, আর দর্শন দেবার পড়ে চলেও যান না। কোথা থেকে তিনি আসবেন, আর কোথায়ই বা তিনি ফিরে যাবেন! ... আজ অনুভব করতে পারছি মা, এই কথার সত্যতা কি ছিল।

এমন কনো স্থানই তো সম্ভব নয়, যেখানে তুমি নেই। তাহলে তুমি কোথাও গেলে, সেই স্থানটি কোথায়! কবে গেলে তুমি সেখান থেকে! ... না মা, তুমি কোথাও যাওনি, যেতে পারোই না!

একদণ্ডের জন্যও তুমি তোমার একটি সন্তানের থেকেও নেত্র সরাও না। অনন্ত প্রেমই যার একমাত্র গুণ, তিনি কোথায় যাবেন! ... তুমি তো শূন্য, তুমি তো সত্য, একমাত্র সত্য। এমন সত্য তুমি, যে সেই সত্য ছাড়া কনো অসত্যের অস্তিত্বও সম্ভব নয়। তাই তুমি কোথায় যাবে?

না তো তুমি কোথাও যাও, আর না তুমি কোথাও থেকে আসো। তুমি সঠিক বলেছিলে মা, ঈশ্বর দর্শন দিতে আসেন না, আমরা অযোগ্য তাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিনা। আমরা এক থেকে নয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করি, তাই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিনা। যেই মুহূর্তে আমরা এক থেকে নয়, সমস্ত অহং পর্দা সরিয়ে ফেলি, যখন আমরা এক থেকে নয় সমস্ত আত্ম পর্দাকে সরিয়ে ফেলি, তখন তো শূন্য আমাদের সম্মুখেই থাকে।

আসলে তিনি তো সর্বদা আমাদের সম্মুখেই ছিলেন। চলে তো তিনি যাননি কনোকালেই। আমরাও যাইনি কোথাও। আমরা আমাদের চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনার দ্বারা নিজেদের ঢেকে নিয়েছিলাম কেবল। আর তাই তুমি সামনে থাকতেও দেখতে পেতাম না। এই দেখো না, একটু আগেই আমি শূন্যে স্থিত ছিলাম, আজ আবার আত্মকে ধারণ করে নিয়েছি, তাই আবার তুমি আর আমি হয়ে রয়েছি।

তবে হ্যাঁ, ভেদ একটিই, শূন্যে যাবার আগে, আমি ছিলাম ১ থেকে নয়ের মধ্যে অবিরাম ঘুরতে থাকা একটি ভ্রমিত আত্ম। আর এখন আমি কেবলই ১, আর তুমি শূন্য। তাই শূন্যে লীন না হলেও, শূন্য থেকে আমি অপসারিত নই।

পিতা আমি বেশ বুঝে গেছি, এই ১ হলো কেবলই অহংকারের সংখ্যা, যেখানে স্থিত হলে, সে থাকে এক আর সত্য হয় শূন্য। এরপরে আসে দুই, যেখানে অহংকার নিজেকে ইচ্ছা ও চিন্তা মধ্যে স্থাপন করে। এই ইচ্ছা আর চিন্তা একাত্ম হয়ে জন্ম দেয় কল্পনাকে, আর তাই এই দুই বেড়ে গিয়ে হয় তিন।

এই ছায়াদেবীরা অর্থাৎ কল্পনা, ইচ্ছা ও চিন্তা নিজেদের সাথে পুনরায় অহংকে যুক্ত করে নিলে হয় চার। আবার এই অহং যুক্ত হবার পড়ে, তার থেকে পঞ্চভূতের জন্ম হলে, নতুন করে

পঞ্চভূতের লীলা শুরু হয়, তাই সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৫। এই পঞ্চভূতদের প্রকাশে, আত্ম নিজের মধ্যের ত্রিগুণকে প্রত্যক্ষ করলে, সংখ্যা ৬, ৭ ও ৮ হয়ে যায়। কিন্তু অন্তে যখন সমস্ত কল্পনাকে একত্রে দেখা হয়, তখন দেখা যায় যে, ছায়াদেবীরা তিন, অহং বা আত্ম, এবং পঞ্চভূত, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনার কাণ্ডারি, এরা ৯ জন, আর তাই সংখ্যা স্থাপিত হয় ৯। আর তাই ৯ হলো সেই সংখ্যা যেখানে ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারের রহস্য লুকিয়ে আছে।

আর যখন ব্যক্তির মধ্যে এই ৯ সংখ্যার রহস্য উদ্ধার হয়, তখন থেকেই তোমার প্রত্যক্ষ লীলা শুরু হয়, যেখান থেকে একে একে, তুমি সর্বাত্মা বেশে সমস্ত ভূতকে নিজের পরমাত্মীয় করে নিয়ে, তাদেরকে অপসারিত করে দাও। আর অন্তে ত্রিগুণের নাশ করে, ছায়াদেবীদের ভস্ম করে, পড়ে থাকে কেবল ১ অর্থাৎ অহং বা আত্ম আর তুমি অর্থাৎ শূন্য। গণিতের ভাষায় একে বলে ডিজিটাল থেকে বাইনারি, আর এই ডিজিটাল থেকে বাইনারিই হলো সাধনা।

এই ৯ থেকে ১ ও শূন্যে স্থাপনই সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য, আর সেই সাধনা নিজের পরমার্থতে স্থাপিত হয় যখন এই ১ও আর থাকেনা, কেবলই শূন্য অর্থাৎ সত্য পড়ে থাকে। ... কি অদ্ভুত না! মানুষ সমস্ত কিছু উদ্ধার করেও যেন উদ্ধার করতে পারছেনা। মোক্ষের সমস্ত তত্ত্ব তাঁরা বুদ্ধিদ্বারা কষে সামনে ফেলে রেখেছে নিজেদের। কিন্তু যেহেতু তা বুদ্ধির কষা, আর তাতে হৃদয়ের অনুভবদৃষ্টি অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি নেই, তাই সমস্ত জেনেও অজানা সকলের!

মা, এবার আমি দৃঢ়। এবার আমি বিশ্বাসীও যে, আমার পরমার্থতে আমি উপস্থিত হবই। তন্ত্র নয়, যন্ত্র নয়, মন্ত্র নয়, কেবলই নীরবতার সাধনা, এই হবে আমার সাধন ধারা। তবে এই বিশ্বাস নিজের উপর নয়, আত্মবিশ্বাস নয় এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তোমার উপর বিশ্বাস, তোমার প্রেমের উপর বিশ্বাস, আমার নিজের মায়ের উপর বিশ্বাস, আর আমার ছোট্ট ছোট্ট শিশু ভাইবোনদের মায়ের উপর বিশ্বাস, যাদেরকে সমাজ বলে অনাথ।

আমার কাছে আর এটি কর্ম নয়, দায়িত্বও নয়, কর্তব্যও নয়; এই কর্মই আমার কাছে আজ থেকে প্রেম। কারণ এই কর্মের প্রতিমুহূর্তে আমি আমার মায়ের সান্নিধ্য লাভ করবো। ...

আশীর্বাদ করো মা আমাকে। তোমার ক্রোড় যেন তেমন ভাবেই ভড়িয়ে তুলতে পারি, যেমন ভাবে বৌদ্ধরা তুলেছিলেন। প্রয়োজনে আমি বৌদ্ধদের কাছেও তোমার চিঠি পৌঁছে দেব আর বলবো, মা তোমাদের উপর আশা হারাননি, পুড়ন করবে না মায়ের আশা!

নিঃশব্দতাই আমার সাধন মত, কারণ নিঃশব্দতা যে স্বয়ং আমার ও সবার জননী"।

মা, আমার কাছে এবার আমার পরমার্থ স্পষ্ট। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি যে, আমার কর্ম কি হতে চলেছে। তাও আমি তোমার থেকে কিছু বিশেষ বিশেষ বিষয় জানতে চাইছি, যেইগুলির ক্ষেত্রে, আমি যেন ভুল না করি। তাই সেই বিষয়গুলি আমাকে আর একবার বলে দাও। করুণা করো মা। এবার তোমার কর্মে কনো প্রকার ত্রুটি রাখতে চাইনা আমি"।

কৃতান্তিকলীলা

ব্রহ্মসনাতন হাস্যবদনে বললেন, "বেশ পুত্রী, আমি তোমাকে এবার বিশেষ বিশেষ কিছু বিষয়ে বলছি, যা তোমাকে তোমার কর্মজীবনে সহায়তা করবে। পুত্রী, তোমার কর্ম হলো কৃতান্তিক নির্মাণ, অর্থাৎ তোমার নিজেরই মত অনেক কৃতান্তিকের নির্মাণ করা, যারা শতশত বৎসরব্যাপী মোক্ষের যেই পথের নির্মাণ করে দিলাম তোমাকে, তাকে জগতসংসারে প্রবাহিত রাখতে পারে, আর সমানে আমার ক্রোড়কে পূর্ণ রাখতে পারে।

এই বিষয়ে, আমি তোমাকে চার ধারার আচরণের কথা বলবো। এঁদের প্রথম হলো, নির্বাচন, অর্থাৎ কাদেরকে এই পথে অগ্রসর করবে, সেই কথা। দ্বিতীয় চরণে বলবো, সেই শিক্ষার্থীদের কর্ষণ করার কথা, অর্থাৎ তাঁদেরকে যথার্থকে ধারণ করার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে যা অবশ্যই স্মরণ রাখবে, সেই কথা।

তৃতীয় চরণে বলবো, তাঁদেরকে যখন সত্যের আলোকে স্নান করাবে, সেই সময়ে যা স্মরণে অবশ্যই রাখবে, সেই কথা। আর চতুর্থ ও অন্তিম চরণে বলবো, তাঁদেরকে যখন আর কৃতান্তিক উৎপাদন করার প্রশিক্ষণ দেবে, সেই সময়ে যা স্মরণে রাখবে, সেই কথা"।

নির্বাচন

ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, এই বিষয়ে আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আর বেশ সতর্কতা প্রদান করেই বলছি, ভুলেও কখনো সেই ব্যক্তির কর্তা ভাবের নাশ করার প্রয়াস করতে যাবেনা, যিনি নিজের কর্তাভাবকে সক্রিয় রেখে, বিবাহ করে নিয়েছেন। সংসার কামনার আঁতুড়ঘর পুত্রী, আর বিবাহ আঁতুড়ঘরের সেই অবস্থা যেখানে মা আর সদ্যজাত সন্তান একত্রে নিবাস করে, একে অপরকে মোহজালে আবদ্ধ করে নেয়।

তাই যার কর্তাভাব জাগ্রত অবস্থায় সে বিবাহ করে, সেই আঁতুড়ঘরে নিজের মোহপাশকে শক্তিশালী করে নিয়েছে, তাঁর কর্তাভাবের নাশ করতে যাওয়ার অর্থ, নিজের সময়ের অপচয়, এবং সেই ব্যক্তিকে অহেতুক হতাশার মুখে স্থিত করে দেওয়া। পুত্রী, যার হৃদয় নিদ্রিত হয়নি, তাঁরই কর্তাভাব বিনাশযোগ্য, অর্থাৎ কর্তাভাব তাঁরই নাশ হওয়া সম্ভব।

কিন্তু এক বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ, যদি নিজের কর্তাভাবকে জাগ্রত রেখে বিবাহ করে, কামনার অষ্টপাশে নিজেদের আবদ্ধ করেন, তাঁর মধ্যে হৃদয়ের জাগরণ আর সম্ভব হয়না। স্ত্রী হলে, তিনি যখন জননী হন, আর যতক্ষণ না তাঁর সন্তান ৬-৮ বৎসরের হচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর মধ্যে হৃদয় নিদ্রাথেকে জাগ্রত হয়, তবে তা সাময়িক, এবং তা কেবলই নিজের সন্তানের জন্য, অন্যদের ক্ষেত্রে নয়।

তাই সেই স্ত্রীর হৃদয়কে নিদ্রিত না দেখে, এমন ভেবে নিওনা যে, তিনি কর্তাভাবকে অতিক্রম করতে সক্ষম। তাঁর সন্তান যখনই ৬-৮ বৎসরের হয়ে গিয়ে, সে নিজের কর্তাভাবকে জাগরিত করার দিকে অগ্রসর হবে, সেই মুহূর্ত থেকে সেই সন্তানের জননীর হৃদয়ও পুনরায় নিদ্রিত হয়ে যাবে, আর যেটুকু কর্তাভাব তাঁর থেকে দূরে ছিল সেই কয় বৎসর, তা পুনরায় অতিকায় শক্তিসঞ্চয় করে সেই স্ত্রীর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাই সতর্ক করেই বলছি তোমাকে, যদি তোমার শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কনো বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ আসেন, অবশ্যই পরোখ করে নেবে যে, তাঁর কর্তাভাবের অবস্থা কিরূপ। যদি দেখো যে সেই কর্তাভাব দৃঢ় হতে পারেনি, সেই ব্যক্তি নিজের আচরণ, নিজের চরিত্র, নিজের বুদ্ধি, নিজের আবেগ, বা সম্যক নিজেকে নিয়ে বড়ই চিন্তিত, বা নিজেকে নিয়ে সে অখুশি, এবং নিজের সামর্থ্য নিয়ে হতাশ, তাহলেই জানবে যে তাঁর কর্তাভাব তখনও পাথর হয়নি, আর তাই তাঁরমধ্যে তখনো কৃতান্তিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

আর যদি দেখো যে, সেই ব্যক্তি নিজের আচরণ নিয়ে, নিজের বিদ্যা নিয়ে, নিজের বুদ্ধি নিয়ে, নিজের আবেগ নিয়ে, এবং সম্যকভাবে নিজেকে নিয়ে অখুশি নন, বরং নিজের ভাগ্যকে সর্বদা দোষারোপ করে ফিরছেন; যদি দেখো তিনি নিজের সামর্থ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন, বরং তাঁর ভাগ্য তাঁকে প্রবঞ্চনা করছে, এমন তাঁর দাবি রয়েছে, তাহলে সেইমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নাও যে ইনি কৃতান্তিক হয়ে ওঠার জন্য অযোগ্য।

কেন অযোগ্য? কারণ ইনার কামনা, ইনার অহংকারকে পর্বতের মত কঠিন করে দিয়েছে, আর ইনার অহংকার ইনার কর্তাভাবকে অভেদ্য করে দিয়েছে। তাই ইনাকে নিজের শিষ্য বা শিষ্যার তালিকা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করো। ... অর্থাৎ আমার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছ! বিবাহিত না বিবাহিত নন, এটি বিচার্য বিষয় অবশ্যই। কিন্তু বিবাহিত হলেই যে তিনি কৃতান্ত শিক্ষালাভের অযোগ্য, তেমনও নয়।

তবে হ্যাঁ, যদি তাঁর একটি সন্তানও হয়ে থাকে, তবে আর দ্বিতীয়বার বিচারেরও প্রয়োজন নেই, তিনি আধ্যাত্ম বিদ্যা হয়তো গ্রহণ করতেও পারবেন, কিন্তু কৃতান্তিক হয়ে উঠতে পারবেন না, অর্থাৎ তাঁর কর্তাভাব তাঁর সেই দেহে ঘুচবেনা। হ্যাঁ, যদি তাঁর অকালে পতিবিয়োগ বা পত্নিবিয়োগ বা সন্তানবিয়োগ হয়, তবে তাঁর মধ্যে হতাশা স্থান নিতে পারে, এবং তাঁর কর্তাভাব ভূমিকম্পে ভিটেমাটিছাড়া হয়ে যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, তিনি আধ্যাত্মিক বিদ্যা লাভ করে নেবেন, কিন্তু তাও কৃতান্তিক হতে পারবেন না।

পুত্রী, যদি এই জগতসংসারের কনো কিছুর প্রতি গভীর কামনা থাকে কারুর মধ্যে, তাহলেই তাঁর সেই বস্তু, যাকে নিয়ে তাঁর কামনা, সেই নিয়ে একটি ধারণার নির্মাণ করে ফেলে। আর সেই ধারণা সত্য না মিথ্যা, তার পরোখ তিনি কি ভাবে করেন? সাফল্যের নিরিখে। অর্থাৎ কে বা কতজন সেই ধারণা রেখে সফল হয়েছেন, তার হিসাব থেকে নিজের ধারণাকে সত্য বা মিথ্যা আখ্যা দেন।

আর সেই ধারণাই তাঁর মধ্যে আমিত্বের জন্ম দেয়, যা তাঁর আত্ম বা অহংকারকে অতিকায় শক্তিশালী করে তোলে। তাই যদি এমন কনো কেউ তোমার সান্নিধ্যে এসে তোমার শিষ্য হতে চান, তাহলে প্রথম তাঁর সেই ধারণাগুলিকে সমস্ত দিশাথেকে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে পদে পদে অপমান করে করে, প্রয়োজনে সর্বক্ষণ কটুকথা শুনিয়ে শুনিয়ে, প্রয়োজনে কনো ভাবেই সে যোগ্য নয় তা প্রমাণ করার জন্য সমস্ত দিক থেকে সে ব্যর্থ প্রমাণ করে করে, যেই ভাবেই হোক, তাঁর সেই সমস্ত পূর্ব ধারণাকে বিনষ্ট করে ফেলতে হবে।

পুত্রী, এমন করার কালে, অধিকাংশই তোমার এই বিশ্রী আচরণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, তোমার সান্নিধ্য থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করবেন। তাতে বিচলিত হবার কনো কারণ নেই। যিনি এই সমস্ত অপমান, এই সমস্ত কটুকথা, এই সমস্ত ব্যর্থতার থেকে এটি অনুভব করবেন নে, তিনি অলিক কল্পনাকেই সত্য মেনে চলেছেন, আর তেমন চললে, তিনি মার্গ থেকে বিচ্ছিন্নই ছিলেন, আর বিচ্ছিন্নই থাকবেন, তিনিই কৃতান্তিক হবার জন্য অগ্রসর হতে পারেন।

তাই অন্যরা ত্যাগ দিয়ে চলে গেলে, বিব্রত হয়েও না, ব্যথিতও হয়েও না। তবে এমনও ভেবো না যে, ১০ জনের মধ্যে একজন এমন ব্যক্তি তোমার সান্নিধ্যে থেকে গেলেন, এবং তোমার করা সমস্ত অপমান, কটুকথাকে হজম করে নিলেন, আর তাই তিনি কৃতান্তিক হয়ে যাবেন। পুত্রী, আবারও বলি, কামনার প্রতি আসক্তি জন্ম নিয়ে নিলে, হৃদয় জাগ্রত হতেই পারেনা। আর হৃদয় জাগ্রত না হলে, কর্তাভাবের নাশ হবেনা, কারণ হৃদয়ই হলেন সেই কর্তা, যা অন্য সমস্ত কর্তাকে বিনষ্ট করে দেন।

আর এই ব্যক্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই কামনা জন্ম নিয়ে নিয়েছিল। তাই তিনি তোমার সান্নিধ্যে থেকে গেলেন মানে, এমন ধারণা করে নেবেনা ভুলেও যে তিনি কৃতান্তিক হয়ে যাবেন। ইনি তোমার চরণতলে স্থিত হয়ে, সত্যজ্ঞান অবশ্যই লাভ করবেন, কিন্তু কৃতান্তিক হবেন কি হবেন না, তা নির্ভর করবে, তাঁর কঠিন বৈরাগ্য অভ্যাস।

যদি সেই ব্যক্তি অবিরাম, অনবরত, এমনকি নিজের নিদ্রার মধ্যেও বৈরাগ্যের অনুশীলন করেন, তবেই তাঁর পক্ষে তাঁর সমস্ত কামনার নাশ করা সম্ভব হবে, এবং কৃতান্তিক হয়ে ওঠা সম্ভব হবে। অর্থাৎ পুত্রী, যতই তুমি তাঁর গুরু হও, তাঁকে কৃতান্তিক গড়ে তোলা তোমার হাতে নেই, একমাত্র তাঁর নিজের হাতে আছে। একমাত্র যদি সে নিজে নিজেকে সহায়তা করে, তবেই তাঁর পক্ষে কৃতান্তিক হয়ে ওঠা সম্ভব, অন্যথা নয়।

আর সেই সম্ভাবনা তখনই প্রকট হবে, যখন তিনি ভৌতিক জীবন থেকে সমস্ত আসক্তি বিরক্তি, উভয় থেকেই মুক্ত হয়ে যাবেন, অর্থাৎ তাঁর সম্মুখে যা আসবে, তা তাঁকে সুফল দেবে না কুফল

দেবে, লেশ মাত্রও সেই বিচার না করে, যখন তিনি নির্বিচারে তা গ্রহণ করবেন, আর যা তাঁর সম্মুখে আসে নি, সেই বিষয়ে কল্পনা করা তো দূরে থাক, সেই বিষয়ে চিন্তা পর্যন্ত তিনি করবেন না, যদি এমন করতে সক্ষম হন তিনি দীর্ঘ ১২ বৎসর, তবেই তিনি নিজের অন্তরে যে কামনার বৃক্ষরোপণ করেছিলেন, তার সমূলে নাশ করে, কৃতান্তিক হয়ে ওঠার যোগ্য হয়ে উঠবেন, অন্যথা নয়।

অর্থাৎ, যদি তুমি নির্বাচনের কথাই বলো, তবে পূর্বেও যা বলেছিলাম, সেই অনুসারেই ৬ বৎসরের নিচে বয়স যেই বালক বা বালিকা, তাঁকে নির্বাচন করো। পুত্রী, ভাগ্য বলে কিচ্ছু হয়না। ভাগ্য হলো নিজের কল্পনার ব্যর্থতার ভান মাত্র। কল্পনা যে বাস্তব নয়, সত্য নয়, তাই সে যে নিষ্ফলা হয়ে সম্মুখে এসে হতাশা প্রদান করে, তাই ভাগ্য। যার অহংকার যত কঠিন হয়ে আছে, সে সেই নিষ্ফল কল্পনাকে দেখে পুনরায় কল্পনা করবেন।

যার অহংকার দুর্বল, তিনি কল্পনাকে নিষ্ফলা হতে দেখে, হতাশ হয়ে যাবেন; আর যার অহংকার পর্বত সমান হয়ে গেছে, তিনি সেই নিষ্ফল কল্পনাকে দেখে, পুনরায় কল্পনা করবেন। আর এই দুই পরিণামকেই মানুষ ভাগ্য বলে। কল্পনা কখনোই সত্য হয়না, তাই কখনই কল্পনা ফল প্রদান করেনা।

যেমন ধরে নাও একজন বিজ্ঞানী দুটি অনেক দূরে থাকা মানুষকে কাছাকাছি আনতে চান, তাই তিনি কল্পনা করেন, আর সেই কল্পনা অনুসারে তিনি দুজনের বার্তালাপ করাতে টেলিফোনের আবিষ্কার করেন। তাঁর কল্পনা কি ফলপ্রসূ হলো? না পুত্রী, হলো না। আর হলো না বলেই, আর তাঁর অহংকার সত্ত্বমে স্থিত বলেই, সে আবার প্রয়াস করলো, আর এবার সে ভিডিওকল করার ব্যবস্থা করলো, যাতে একে অপরকে সাখ্যাতে দেখতে পায়।

তাও কি তাঁর কল্পনা ফলপ্রসূ হলো? না হলো না, আর হলো না বলেই, সে এবার প্রয়াস করে যাতে এই ভিডিওকল টুডি থেকে থ্রিডি হয়ে উঠুক, আর দুজন দুজনকে অনুভব করুক। কিন্তু তা হলেও কি কল্পনা ফলপ্রসূ হবে? না হবেনা, তখন সে চেষ্টা করবে যাতে, একে অপরকে স্পর্শ

করার অনুভবও পায়। অর্থাৎ বুঝতে পারলে, কল্পনা কখনোই ফলপ্রসূ হয়না। কিন্তু কল্পনা ফলপ্রসূ না হবার পরে, যার অহংকার দুর্বল, সে হতাশ হয়ে যায়, আর এই হতাশাকে সে বলে দুর্ভাগ্য।

আর যার অহংকার পর্বতসমান, সে আবার প্রয়াস করে, আবার কল্পনা করে, আর সেই পুনপ্রয়াসের মাঝে যেই নিষ্ফল কল্পনার প্রকাশ হয়েছিল, তাকেই সে সাফল্য বা সৌভাগ্য বলে আখ্যা দেয়। তাই ভাগ্য সম্পূর্ণ ভাবে একটি অলিক কল্পনা মাত্র। তাই এমন ভাবার কনো কারণ নেই যে, যেই ৬ বৎসরের কম বয়সী বালক বা বালিকাকে তুমি শিক্ষা প্রদান করবে, তার ভাগ্য যদি থাকে তবেই সে কৃতান্তিক হতে পারবে।

হ্যাঁ, সে যেই কল্পনাকে পূর্বে অর্থাৎ পূর্বের দেহে ধারণা করে রেখেছিল, তা তাঁর সম্মুখে নিষ্ফল হয়ে প্রকাশিত হবে, এবং তাঁর অহংকারকে খর্ব করে যদি রাখতে পারো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে হতাশই হবে, আর সেই হতাশাকে তুমি মা সর্বাম্বার প্রেমের মাধ্যমে অনায়সেই অতিক্রম করিয়ে দিতে পারবে। ...

অর্থাৎ আমার কথা এই পুত্রী যে, প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য আছে কৃতান্তিক হয়ে ওঠার এবং মোক্ষলাভ করার। আর সেই মোক্ষলাভের জন্য এমন কনো ব্যাপার নেই যে, কারুর বহু জন্ম বাকি বা কারুর অল্প জন্ম বাকি। যিনিই নিজের অহংকারকে লয় করে দিয়ে, নিজের অন্তরে হৃদয়কে জাগ্রত হতে দেবেন, তিনি সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করবেন।

তাই, যেকোনো ৬ বৎসরের বালক বা বালিকাকে তুমি শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ ও নির্বাচন করতে পারো। হ্যাঁ, তাঁর পূর্বের দেহে করা কল্পনা তাঁর সম্মুখে নিষ্ফলা রূপে স্থপিত হবে, আর তোমার কর্তব্য হবে, সেই নিষ্ফলা কল্পনার প্রতি প্রথমে তাঁর হতাশাকে জন্ম দেবার। আর তারপরে, সেই হতাশাকে জগন্মাতার প্রেম দ্বারা চিকিৎসা করে, তাঁকে পূর্ণত্বয় ভাবে জগন্মাতার সন্তান করে তুলবে, এবং একমাত্র জগন্মাতাই কর্তা, আর সে তাঁর অনুগত সন্তান, এই বোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত করে, তাঁর হৃদয়কে জাগরিত করে দেবে।

একবার তা করে নিলে, এবার তাঁকে সত্যশিক্ষা অর্থাৎ শূন্য থেকে সুরু করে ইতিহাস ও ভূগোল ও গণিত প্রদান করবে, সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করবে, ক্রীড়ায় রত করে, তাঁর মধ্যে তাঁরই ন্যায় অন্যদেরকে নিজের ভ্রাতাভগিনী জ্ঞান করাবে। আর যখন সেই সমস্ত কিছু হয়ে যাবে, তখন তাঁর মধ্যে কৃতান্ত স্থাপন করবে, এবং তাঁকে দিয়ে নিঃশব্দতার ধ্যান করিয়ে, তাঁকে জগন্মাতার সম্মুখীন স্থিত করে, তাঁকে পূর্ণভাবে কৃতান্তিক করে তুলবে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “এর অর্থ এই যে, এমন কনো ব্যাপার নেই যে, এই সময়ের আগে মোক্ষ লাভ হবেনা! যদি কেউ প্রথম মনুষ্যজন্মেও নিজের অহংকারকে বিনষ্ট করে দিতে পারে, তাহলেই তাঁর পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয়ে যাবে! ... কিন্তু মা, এই ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান! ... সেই একটি জন্মতে কি সেই জ্ঞান সে অর্জন করতে পারবে?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, তুমি কত গ্রন্থ পড়েছ, আজকের আগে? ... বহু? (দিব্যশ্রীর সম্মতি) ... বেশ, কত স্থানে ভ্রমণ করেছ, আজকের আগে? বহু? (দিব্যশ্রীর সম্মতি) ... বেশ, কত কত মানুষের সাথে আলাপ করেছ, তাঁদের জানার চেষ্টা করেছ? বহু? (দিব্যশ্রীর সম্মতি)... তা বলো তো এবার, আজ যখন সত্যের দর্শন করলে, সেই সময়ের একদণ্ড আগেও কি, তোমার কাছে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান ছিল? আর তারপর কি ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান লাভ হয়েছে?”

দিব্যশ্রী বললেন, “না ... এর আগে, তুমিও তো কতবার আমাকে বলেছ, ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা মাত্র। আমি তোমার কথা শুনেছি, মেনেওছি, কিন্তু কিচ্ছুই যে বুঝিনি, তা আজ যখন তোমার স্বরূপ, আমার স্বরূপকে দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম। ... তুমি অনেকবার আমাকে বলেছ, স্বরূপে আমিও যা তুমিও তাই, কিন্তু কিচ্ছু বুঝিনি। ... অনেক বার তুমি আমাকে বলেছ, তুমি তাই যা নেই, যা নেই তাই তুমি, আর যা নেই তাই সত্য, আর তাই তুমিই সত্য। ... শুনেছি, মেনেছি, কিন্তু আজ যখন তা প্রত্যক্ষ হলো, তখন বুঝলাম, আমি কেবলই শুনেছিলাম, মেনেছিলাম, ধারণ করিনি সেই কথাগুলিকে”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তাহলে ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞান কি ভাবে লাভ করা যায় পুত্রী?”

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, “তোমাকে প্রত্যক্ষ করে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। নিজের আমি’কে, নিজের আত্মকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের থেকে খসে যেতে দেখে, তোমাকে সাখ্যাত প্রেম বলে চিহ্নিত করা থেকে। ... বুঝে গেছি মা।

তোমাকে যিনি প্রত্যক্ষ করে নেবেন, তোমাকে প্রত্যক্ষ করে যিনি তোমাতে লীন হয়ে নিজের অহংকে, নিজের আত্মকে, নিজের আমি’কে চিরকালের জন্য বিদায় জানিয়ে, তোমাকেই একমাত্র ও অবিচ্ছিন্ন সত্য বলে ধারণ করবেন, সেই মুহূর্তে তাঁর মোক্ষলাভ। ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই কথাটা তুমি বারবার বলতে, আজ তার অর্থ বুঝতে পারছি। ... নুনের পুতুল, সাগরের গভীরতা মাপতে গেল, কে আর ফিরলো, কে আর বললো, সাগর কতটা গভীর।

একবার তোমাতে নিমজ্জিত হলে, সমস্ত বন্ধন মুহূর্তের মধ্যে শেষ। আর জন্ম নেই, আর মৃত্যু নেই, আর কল্পনা নেই তাই আর ভাগ্যও নেই, আর আমিত্ব নেই, তাই আর সুখ-দুঃখ, ব্যাথাবেদনা কিচ্ছুই নেই, আর আমি নেই, তাই কনো ইচ্ছা বা চিন্তাও নেই। ... চিরতরে মুক্তি। অর্থাৎ, বয়সকাল নয়, যখন শিশু কামনামুক্ত, যখন সে ৬ বৎসরের নিচে, তাই তার অহংকার দুর্বল, তখনই তার অহংকারকে চিরতরে বিনাশ করে দাও। ব্যাস, মুক্তি, চিরতরে মুক্তি”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তবে আর একটি ব্যাপার স্মরণ রাখবে, সেই বালক বা বালিকার কাছে তুমিই যেন সর্বস্ব কিছু হও। ... যদি তাঁর অবিভাবক থাকেন, তাঁরা যদি তাঁকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা দেন নিজের সন্তানকে লালনপালনের, তবেই তাঁদেরকে নির্বাচন করবে, এই কাজে। কারণ এমন না হলে, সেই শিশু দুর্বিপাকে পরে যাবে। একদিকে তুমি বলবে অহংকার মুক্ত হবার কথা, আর অন্যদিকে তাঁর অবিভাবক তাঁকে বলবে, অহংকার ধারণ করতে, এই দুইয়ের মধ্যে পিষে গিয়ে, সেই শিশুটির নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

তাঁর কষ্ট দেখে তুমি বিষণ্ণ হয়ে যাবে পুত্রী। তাঁর পিতামাতা তো অহংকারে বদ্ধ, তাই তাঁদের কাছে তাঁদের জেদই প্রাধান্য পাবে, আর সেই কারণে, সন্তানের জীবন ওষ্ঠাগত হচ্ছে কিনা, সেই বিচারও করবে না তাঁরা, কেবলই সন্তানকে নিজের অধিকারমুক্ত হতে দেবেন না, তাই তার

উপর জোর খাটাতে থাকবে। কিন্তু তুমি? তোমার তো হৃদয় জাগ্রত! ... হৃদয়ে সাখ্যাত মাতা সর্বাম্বা বিরাজমান। তিনি তাঁর সন্তানের বেদনায় অস্থির হয়ে যাবেন। তাই যদি অবিভাবক তোমাকে পূর্ণ অধিকার না দেন, তাহলে তাঁদের সন্তানকে শিক্ষার্থী রূপে নির্বাচন করবেনা"।

দিব্যশ্রী হেসে বললেন, "আর সেই কারণে তুমি অনাথ সন্তানদের কথা বললে আমাকে। ... মাতাপিতা হারা সেই শিশুরা, তাঁদেরকে স্নেহের স্পর্শ দিয়ে, তাঁদের মুখে আনন্দের হাসি ফোটানোও যাবে, আবার অবিভাবকহীন শিশু তাঁরা। শিশু বলে তাঁদের অহংকার দুর্বল, আর অবিভাবকহীন, তাই অন্য কারুর অহংকারের বাহকও নয় তাঁরা। তাই তাঁদেরকে সত্যে স্থাপন করে, মানবজাতিকে পুনরায় মোক্ষের স্বাদ প্রদান করা হবে। ...

তুমি অদ্ভুত জানো মা! ... এত সহজ ভাবে এত জটিল সমস্যার নিদান দাও কি করে তুমি? ... হয়তো এটাই প্রেমের মাহাত্ম। ... যখন প্রেমের স্থানে মোহ মানে কামনা থাকে, তখন তো কেবলই এই চিন্তা যে আমি কি করে ভালো থাকবো, কি হলে আমার শান্তি, আমার স্বস্তি, আমার সুখ, আমার নিশ্চিন্তি। প্রেমে যে নিজের অস্তিত্বই নেই, তাই নিজের সুখ, নিজের শান্তি, স্বস্তি, নিশ্চিন্ততা, এসবের প্রশ্নই ওঠেনা। ... তাই বোধ হয়, এমন যোজনামুক্ত হয়ে সদাপ্রফুল্লতার মধ্যে বিরাজ করা সম্ভব হয় তোমার পক্ষে। ... তা মা, এবার সেই শিশুদের শিক্ষা দেবার সময়ে কি কি খেয়াল রাখবো, তা বলে দাও এবার"।

কর্ষণ

ব্রহ্মসনাতন বললেন, "পুত্রী, তোমাকে বেশ কিছু বিষয়ে এবার বলবো, যেগুলিকে সর্বদা স্মরণ রাখবে, যখন তোমার ছেলেমেয়েদের মানুষ করবে। এঁদের প্রথম হলো, সরলতা। পুত্রী, সরলতার থেকে বড় গুন একটি সাধকের জন্য আর কিছু হতে পারেনা। তবে এই সরলতা কি ভাব, তাকেও স্পষ্ট করে জেনে রাখা আবশ্যক, নাহলে প্রায়শই এই সরলতার নাট্য করা হয়ে থাকে।

সরল মানে সোজা, তাই সরলতা মানে সোজাসাপটা মনোভাব, অর্থাৎ শিশুর মনোভাব। তবে এখানে নাট্য থেকে অত্যন্ত সাবধান থাকবে। প্রায়শই দেখা যায় যে, যার মধ্যে শিশুভাবের লেশমাত্রও নেই, সে শিশুকে নকল করে কথা বলছে, বা বোঝানোর প্রয়াস করছে যে সে শিশুন্যায়। ভুল করেও সেই অভিনেতার খপ্পরে পা দেবেনা, এবং এমন অভিনেতার থেকে অত্যন্ত সাবধানে নিজেও থাকবে, এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরও।

শিশুর ভাব মানে, সহজ বিশ্বাস, কনো প্রশ্ন ছাড়া বিশ্বাস। যেমন শিশু মাকে প্রশ্ন করেনা, অমুক কাজটা কেন করবো, মা বলেছে, তাই করছি, তেমন ভাব। তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের জননী। তুমি বলেছ যে জগজ্জননী হলেন তাঁর প্রকৃত জননী, তাই সরল বিশ্বাস যে, জগজ্জননীই তাঁদের প্রকৃত জননী। এই হলো সরলতা।

তাই শিশুর মত সুরে কথা বলার অর্থ সরলতা কখনোই না। সরলতা মানে, আনন্দ হলে, বাঁধনছাড়া ভাবের উচ্ছ্বাস, যেখানে কে আমার এই উচ্ছ্বাস দেখে কি মনে করছেন, তার বোধ বা সেই বিষয়ে কুণ্ঠা ক্রিয়া করেনা কনো ভাবেই। সরলতা মানে, ক্রন্দন এলে ক্রন্দন করা, আর ক্রন্দন না এলে ক্রন্দন না করা।

অর্থাৎ যখন সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তি বা কারুকে প্রভাবিত করার জন্য নয়, কেবলই ভাবের সরাসরি অভিব্যক্তি প্রকাশ সহজ ভাবেই হয়, তাই সরলতা। এক শিশু কখনোই কারুকে কিছু প্রমাণ করতে চায়না, আর তাই যখন তোমার সম্মুখের ব্যক্তি কেবলই কিছু প্রমাণ করার জন্য কিছু ভাবের প্রদর্শন করছেন, সেই ব্যক্তি যেই হন না কেন, সমাজে যত সম্মানিতই হন না কেন, তোমার সাংসারিক সম্বন্ধেও যতই প্রিয়জন হোক না কেন, তাঁকে যথাশীঘ্র সম্ভব বর্জন করবে"।

দিব্যশ্রী বললেন, "কিন্তু বুঝবো কি করে, কে নাট্য করছে, আর কার মধ্যে সত্যভাব প্রদর্শিত হচ্ছে?"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "বুঝতে গেলে দেখবে, তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রন্দনের ভাব নেই, অথচ তাঁর নেত্রে অশ্রুবারি বর্তমান। বুঝতে গেলে এমনও দেখবে যে আকস্মিকই তাঁর ক্রন্দন থেমে গেল, আর ক্রন্দনের পরবর্তী শব্দ উচ্চারণের মধ্যে ক্রন্দনের কনো ভাবই নেই। বুঝতে গেলে দেখবে, এতক্ষণ নাচছিল সে দুই হাত তুলে, সঙ্গীত থামতেই, সেও যেন আকস্মিক থেমে গেল, ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে, দম দেওয়া পুতুল দেখেছ তো! সেইরূপ হয়।

তবে বুঝতে গেলে, না বুঝতেও পারো। তাই বোঝার প্রচেষ্টাই করো না। পুত্রী, বুদ্ধি আর মন বোঝার প্রয়াস করে, আর হৃদয় করে অনুভব। মন আর বুদ্ধি নিজের ইন্দ্রিয়দের দিয়ে যা দৃশ্য দেখে, তাই দ্বারাই কিছু বোঝে। কিন্তু হৃদয়! পুত্রী, যিনি অনুভব করেন, তিনিও তাই দেখেন, তাই শোনেন, তাই ঘ্রাণ নেন, তাই স্বাদ নেন, যা এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়দের সাহায্যে গ্রহণ করে বোঝেন, কিন্তু এই কনো কাজকে তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা করেন না, তিনি এই সমস্ত কিছুকে হৃদয় দিয়েই করেন।

তাই পুত্রী, নেত্র দিয়ে নয়, হৃদয় দ্বারা দেখো; তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর এমন অন্যেরা ভাববেন, কিন্তু বাস্তবে তা অন্তর্ভেদী হয়ে গেছে, তাই প্রত্যক্ষদর্শীরা ভাবছেন যেন তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর। তাই নেত্র দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে দেখো; নাসিকা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে ঘ্রাণ নাও; হৃদয় দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করো; হৃদয় দিয়ে ধ্বনি শ্রবণ করো; হৃদয় দিয়ে সমস্ত স্পর্শ অনুভব করো।

পুত্রী, যিনি হৃদয় দ্বারা এই সমস্ত কর্ম করেন, তিনি অচিরেই ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে যান; তাঁকে পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয়াতীত হবার জন্য সাধনা করতে হয়না। আর তার থেকেও বড় কথা, কনো জটিল বা কুটিল নাট্য দ্বারা একে মজাতে পারবেনা, কারণ হৃদয় সমস্ত কিছুর থেকে, রাজহংসের মত কেবল দুধটা গ্রহণ করেন, আর জলটা ফেলে দেন। তাই যার সমস্তটাই নাট্য, তাঁর সমস্তটাই ইনি ফেলে দেবেন, কিচ্ছু গ্রহণ করবেন না।

আরো একটি গোপন কথা তোমাকে বলি। পুত্রী, জীবের কাছে দুটি স্মৃতিপট আছে, একটি মস্তিষ্কে যা দৈহিক বা ভৌতিক, এবং একটি হৃদয়ে যা সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতিভৌতিক। আর জীব

নিজের দেহান্তরের সময়ে কেবল এই হৃদয়ের স্মৃতিকেই সঙ্গে নিয়ে যায় এবং পরবর্তী দেহতে এই হৃদয়ের স্মৃতিকেই সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে, হাজার হাজার তথ্য এবং তত্ত্ব স্মরণ রেখে কনো লাভ নেই, কারণ তা দেহান্তরে এমনিই তোমার থেকে অপসারিত হয়ে গিয়ে, তোমাকে মূর্খই করে দেবে পুনরায়।

তাই হৃদয় দ্বারা দেখো, হৃদয় দ্বারা শোনো, হৃদয়কেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম করতে দাও। সে কেবল ভৌতিক দৃশ্যকে, ধ্বনিকে, স্বাদকে, গন্ধকে এবং স্পর্শকেই গ্রহণ করবেনা। সে সেই সমস্ত দৃশ্য, ধ্বনি, স্বাদ, গন্ধ এবং স্পর্শের অন্তরে থাকা নাট্যকে বর্জন করে, তার মধ্যে থাকা ঈশ্বরীয়ভাবকে গ্রহণ করে, তাকে জন্মজন্মান্তরের জন্য তোমার স্মৃতিপটে রেখে দেবে।

তাই সরলতার পরীক্ষণ প্রায়শই করতে থাকবে। তিনিই সরল যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা নয়, হৃদয়দ্বারা সমস্ত কিছুকে অন্বেষণ করেন। আর তাই তাঁর ক্রন্দন হয় হৃদয়ের ক্রন্দন, তাঁর হাস্য হয় হৃদয়ের হাস্য, তাঁর বাক্য হয় হৃদয়ের বাক্য, তাঁর স্নেহ হয় মোহমুক্ত স্নেহ, আর তিনিই যথার্থ সাধক, কারণ তিনি পবিত্র। ঈশ্বরী সকলের জননী, তাই তিনি যখন জননী, তখন তিনি সকলের জন্য সমান।

তখন তিনি কনো ভেদাভেদ করেন না। কিন্তু যখন তিনি ঈশ্বরী, তখন তিনি একটিই ভেদ দেখে, আর তা এই যে সেই সাধকের সমস্ত কিছুর মধ্যে সুদ্ধতা কতখানি, আর নাট্য কতখানি। যার মধ্যে নাট্য অধিক, তিনি সন্তান তো তখনও থাকেন তাঁর, কিন্তু তাঁর সাধনাকে স্বয়ং ঈশ্বরী রোগভোগ, বা অন্য প্রকার সামাজিক ও সাংসারিক বিভ্রান্তিদ্বারা বিনষ্ট করে দেন, কারণ সেই সাধনা তো একটি ছলনা ছিল।

পুত্রী, এর পরবর্তী যেই ভাবকে স্মরণ রাখবে সদা, তা হলো সত্যমিথ্যার ভাব। স্মরণ রেখো পুত্রী, আমি কিন্তু সত্যকথা বা মিথ্যাকথার ব্যাপারে সতর্ক করলাম না তোমাকে। আমি তোমাকে সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে সতর্ক করলাম। মিথ্যাবাদী তো সকল জীব, কারণ সকল জীব নিজেদের কর্তাজ্ঞান করে চলেছেন। যাদের সামান্য একটি চোখের পাতা ফেলার সামর্থ্য নেই,

তাঁরা নাকি জগতকে দুষিত করছেন, জগতকে রক্ষা করছেন, সংসারকে বিনষ্ট হওয়া থেকে আটকাচ্ছেন, সন্তানকে জন্ম দিচ্ছেন, সন্তানকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, আরো কত মিথ্যাকথাই না সক্কলে সর্বক্ষণ বলে চলেছেন।

তাই মিথ্যাকথার বিষয়ে আমি তোমাকে সতর্ক করছিনা। সত্যকথা তো একমাত্র তিনিই বলছেন যিনি বলেছেন যে না তো আজ পর্যন্ত আমি কিছু করেছি, না এক্ষণে করছি, আর না ভবিষ্যতেও আমার কিছু করার সামর্থ্য আছে। বাকি সক্কলে মিথ্যাকথাই বলে চলেছেন অনুক্ষণ। তাই সত্যকথা আর মিথ্যাকথা, এই ভেদ একটি ভৌতিকজগতের কাল্পনিক ভ্রম মাত্র। তাই আমি সেই বিষয়ে বলছিনা তোমাকে। আমি বলছি, সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে।

আর যিনি, মিথ্যাকে আঁকড়ে নয়, সত্যকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছেন, সাধনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, অন্যদের পক্ষে তা অসম্ভব, আর ততক্ষণ অসম্ভব যতক্ষণ না তিনি হৃদয় থেকে সত্যকেই আঁকড়ে ধরছেন, আবার বলি হৃদয় থেকে সত্যকে আঁকড়ে ধরছেন, বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে নয়”।

দিব্যশ্রী বললেন, “সত্যকে আঁকড়ে ধরছেন মানে কি? সত্য কি তা তো তিনি প্রত্যক্ষ করেনেই নি। সত্যকে আঁকড়ে ধরছেন মানে কি এই যে আমি সত্যকে জানিনা, আর সত্যকে জানার জন্য ব্যকুল?”

ব্রহ্মসনাতন মৃদুহাস্যে বললেন, “হ্যাঁ পুত্রী, যিনি অবিরাম সত্যকে জানার, চেনার ও অনুভবের চেষ্টায় মত্ত, তিনিই সত্যবাদী, অন্য সকলে মিথ্যাবাদী। তাই সত্য মিথ্যার যথার্থতা সম্বন্ধে নিজেও সর্বক্ষণ সচেতন থাকবে, এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সেই পথে অটিক রাখবে।

এর পরবর্তী যেই ধারণাকে স্মরণ রাখবে সর্বদা, তা হলো ন্যায় ও অন্যায়ের ভেদ, ধর্ম ও অধর্মের ভেদ। পুত্রী, প্রথমে যদি ন্যায় আর অন্যায়ের কথা বলি, তাহলে এই বলতে হয় যে প্রতিটি ন্যায়ের মধ্যেই অন্যায় থাকে, আর প্রতিটি অন্যায়ের মধ্যেই ন্যায় থাকে। তাই ন্যায় অন্যায়ের ভেদ করা থেকে নিজেকেও এবং তোমার সন্তানদেরও নিবৃত্ত করবে।

যদি বিচার করে দেখো একটি তস্করের অন্যায়কে, তবে সে যেমন তস্করি করে অন্যায় করেছে, তেমন যার থেকে সে তস্করি করেছে, সেই ব্যক্তি অন্যদের থেকে ছল করে ধন উপার্জন করেছিলেন, তাঁর সেই ছলের দণ্ড প্রদান করে সেই তস্কর ন্যায় করেছে। অর্থাৎ জোর তোমার ন্যায় ও অন্যায়-এর বোধ কে নয়, কাকে তুমি ন্যায় বলছো আর কাকে তুমি অন্যায় বলছো না, তার দিকে দৃষ্টিপাত করো।

একজনকে অন্ধকারে রেখে, শর্তাবলি না বুঝিয়ে, তাঁর ধনকে করায়ত্ত করে নেওয়া, এবং সেই ধনকে করায়ত্ত করে নেবার জন্য, বেতনের বৃদ্ধি লাভ করা, বা উপরি লাভ করা, পুত্রী, যেদিন আইন এই কর্মকেও তস্করি আখ্যা দিতে সক্ষম হবে, সেদিনই সমাজকথিত ন্যায় বা অন্যায় এক সাধকের যোগ্যতাকে বিচার করতে সক্ষম।

আর সেই বিচারকের কথা দেখো এবার। তিনি ন্যায়দেবতা, কারণ তিনি সমাজে ন্যায়ের স্থাপনা করেন। আচ্ছা, এই তস্করের স্ত্রী বা সন্তানও নিশ্চয়ই সেই সমাজেই স্থিত। তাহলে সেই তস্কর যখন কারাবাস পেল, তখন তাঁর সন্তানরা যে আহার লাভ করতে পারছিলনা, আর তাই তাঁর স্ত্রী যে সমাজের সকলের দ্বারা অপদস্থ হয়ে, নিজের সন্তানের প্রাণরক্ষা করার জন্য বেশ্যা হয়ে উঠলেন, তার দায়ও নিশ্চয়ই সেই বিচারকেরই। তাই না। তা এই তস্করের স্ত্রীপরিবারের যেই পরিণাম হলো, তা ন্যায় তো?

না পুত্রী, আমি তোমাকে এই সমস্ত কিছুর পরিবর্তন করতে একটিবারও বলছি না, কারণ এটিই ভৌতিক জগতের চরিত্র। এখানে সকলে নিজের নিজের কল্পনা করছে, আর যে যেমন কল্পনা করছে, সেই অনুসারে তাঁর কাছে হতাশা নেমে আসবে। যে যত অধিক বাস্তবমুখি কল্পনা অর্থাৎ অন্যের কল্পনার সাথে মিলে যায়, তার কাছে হতাশা ততই দেরিতে আসবে, আর যে কল্পনার ভিত্তিতেই কল্পনা করছে, তাঁর কাছে হতাশা শীঘ্রই নেমে আসবে।

আর সেই হতাশার মাধ্যম হয়ে বিরাজ করবে, কারুর তস্করি তো কারুর ডাকাতি, কারুর হত্যালীলা তো কারুর শ্লীলতাহানির প্রয়াস। আর তুমি কেবলই তস্করির দিকটা, ডাকাতির

দিকটা, হত্যার দিকটা, আর শ্লীলতাহানির দিকটা দেখতে পাবে, অন্যদিকটা নয়, আর তাই তোমার ন্যায় অন্যায় বিচার সকল সময়েই হবে অর্ধেক। আর তাই ন্যায় অন্যায়ের বিচার করে, এক সাধক, সাধনা করার যোগ্য কিনা, তা কখনোই বিচার করবেনা।

আর রইল কথা ধর্মাধর্মের! ধর্ম কি পুত্রী? অধর্মই বা কি? ধর্ম হলো তা, যা সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবমান রাখে একটি ব্যক্তিকে, অর্থাৎ যা কিছু ব্যক্তিকে চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার থেকে মুক্ত করে অহংমুক্ত করে দেয়, তাই ধর্ম। আর এর ঠিক বিপরীতটি হলো অধর্ম, অর্থাৎ যা কিছু জীবকে অধিক ভাবে চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে তাঁর অহং অর্থাৎ আমিত্বের বিকাশ ঘটায়, তাই অধর্ম। তা এবার আমায় বলো তো, তুমিই নেত্র বন্ধ করে কটা ধার্মিককে দেখতে পাচ্ছ?"

দিব্যশ্রী নেত্রবন্ধ করে সামান্য সময়ের মধ্যে বলতে শুরু করলেন, "কোথায় ধার্মিক মা? ধার্মিক তো নেয়ই! ... পিতামাতা সন্তানকে যতটা আমিত্বের বিকাশ করতে প্রেরণা দিচ্ছেন, ঠিক ততটাই প্রেরণা দিচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় যতটা অহং বৃদ্ধি করছে, সর্বক্ষণ বড় হয়ে কি হবে, বড় হয়ে কি হবে বলে বলে, সেই অহংকে যেন শান দিচ্ছে কলেজ, যেখানে আমিত্বকে বিশেষ আভুসনে ভূষিত করা হয়, যাতে সে নিজের আমিকে অন্যের আমির উপর স্থাপন করতে পারে।

কলেজ আমিত্বকে যেই অবস্থায় ছাড়ছে, কর্মক্ষেত্র ঠিক সেইস্থান থেকে আমিত্বকে বিস্তার করছে। আর সেখানে যতটা আমিত্ব বিস্তার পেতে পাচ্ছেনা, তাঁর পরিবার পরিজন সেই আমিত্বকে খোঁচা মেরে মেরে সেই আমিত্বকে ঘায়েল করে দিয়ে, পুনরায় আমিত্বের বিস্তার ঘটাচ্ছে। আর এটিই তো সকলের ক্ষেত্রে হচ্ছে। ...

সর্বত্র কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার নাম করে এই আমিত্বধারিদের প্রতিযোগিতায় মাতিয়ে, আমিত্বের বিকাশ ঘটাচ্ছে। আর সর্বক্ষণ সরাকরাদি সকলে যন্ত্রাদির নির্মাণ করে করে, নতুন নতুন ভাবে এই আমিত্বকে বিভূষিত করে তুলছে, যাতে এই আমিত্বই সর্বেসর্বা হয়ে বিরাজ করে! মা, এ তো সর্বত্র কেবলই অধর্মই অধর্ম!"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, 'চিন্তা করো না পুত্রী, আর ভুল করেও কারুকে দোষ দিওনা, কারণ এটিই ভৌতিক জগতের ধারা, এটিই তার প্রাকৃতিক ধারা। পুত্রী, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া আমের স্বাভাবিক স্বভাবই হলো পচনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, আর সেটিই সমাজে হচ্ছে। যখন অতিকায় হয়ে ওঠে এই পচনের নেশা, তখন কনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে, সমস্ত কিছুকে তছনছ করে দেয়, আর আবার সেই পচনের শুরু হয় নতুন করে।

পুত্রী, ভৌতিক সংসার অধর্মেরই আঁতুড়ঘর, তাই তাঁকে দোষারোপ করো না, এটিই তার স্বভাব। হ্যাঁ, এতে যদি কনো সত্যবিস্তারের কেন্দ্র থাকে, যাকে বলা হয় আত্মর অধ্যায়ন ক্ষেত্র, বা আধ্যাত্ম ক্ষেত্র, তবে এই পচনরোগের থেকে মুক্তির ঔষধ সমাজে উপস্থিত থাকে, যাতে যেই আত্ম মনে করবেন যে তিনি সেই পচনরোগের থেকে মুক্ত হবেন, তিনি সেই ওষুধ গ্রহণ করে মোক্ষকামী হয়ে, পচনের থেকে মুক্ত হতে পারেন।

পুত্রী, যদি সমগ্র ভারতের সাথে তুলনা করো এই বঙ্গদেশের, তাহলেই বুঝতে পারবে যে তুমি কতটা ভাগ্যবান, এই ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে। যেখানে সারা ভারতবর্ষে, যদি বিহার ও বঙ্গকে বাদ দিয়ে দাও, তাহলে দেখবে, এক শঙ্কর, মিরা, আর কবির আছেন, যারা আধ্যাত্মিকতার বিস্তার করেছেন। আর সেখানে বিহারে রয়েছেন দুই প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক জাগরণের সেতু, গৌতমবুদ্ধ, এবং মহাবীর, আর বাংলায় রয়েছে একের পর এক আধ্যাত্মিক জাগরণের সেতু।

কপিল মুনি থেকে শুরু করে, গৌতমবুদ্ধের পূর্বের বৌদ্ধদের তন্ত্রবিস্তার হয়ে এই বাংলায়। সেই বাংলা একের পর এক ঈশ্বরকটিদের হস্তক্ষেপও লাভ করেছে, যেমন মার্কণ্ড, চৈতন্য মহাপ্রভু, সারদামা এবং রামকৃষ্ণ, আবার তেমনই অজস্র জীবকটিরাও সেই জাগরণকে বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন যেমন, বশিষ্ঠ, খনা, নিত্যানন্দ, রামপ্রসাদ, রামমোহন, রাশমনি, বিবেকানন্দ, আনন্দময়ী ইত্যাদিরা ।

কিন্তু এর পরেও দেখো, বঙ্গদেশ কিন্তু পচনমুক্ত নয়। কেন? কারণ এই পচনই যে স্বাভাবিক স্বভাব ভৌতিক জগতের। পুণ্যক্ষেত্রে এই পচন থেকে মুক্ত হবার ওষুধ বারবার দেওয়া হয়,

কিন্তু বারবার পচনপ্রেমী ভৌতিক সমাজ সেই ওষুধকে বিনষ্ট করে দিয়ে, পুনরায় পচনকে কার্যত করে দেয়।

তাই পুত্রী, এই ধর্মাধর্মের মানদ্বারা তুমি একজন সাধককে কি ভাবে বিচার করবে? আর সত্য বলতে, এই সমস্ত ভেদাভেদের কনো অর্থই হয়না। আমরা যতক্ষণ সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো, ততক্ষণ কল্পনা করতেই থাকবো, আর ততক্ষণ আমরা আমিত্বের আরাধনাই করতে থাকবো। আর যেইক্ষণেই আমরা সত্যের অমৃতে স্নান করবো, সেই মুহূর্তেই, আমাদের থেকে এই আমিত্বের ভ্রম খসে পড়ে যাবে, আর সেই কর্ষণ থেকেই আমরা হয়ে উঠবো ন্যায়অন্যায়, ধর্মাধর্ম ইত্যাদি সমস্ত ভেদাভেদের থেকে মুক্ত।

তাই পুত্রী, এই সমস্ত ভেদাভেদের মধ্যে মাতামাতি থেকে নিজেও দূরে থাকো, আর তোমার সন্তানদেরও দূরে রাখো, আর সত্যের অমৃততে স্নান করো। পুত্রী, কৃতান্তিক হয়ে ওঠার পথে প্রথমে নির্বাচন সম্বন্ধে জেনেছিলে, অর্থাৎ কাকে কৃতান্তিক করে তোলার পথে অগ্রসর করবে, সেই বিষয়ে জেনেছিলে। আর তারপরে, তোমার নির্বাচিত পাত্রদেরকে কর্ষণ করাই তোমার লক্ষ্য ও কর্তব্য।

সেই কর্তব্য তখনই সমাপ্ত হবে, যখন তোমার সন্তানরা আর ইন্দ্রিয়দের দ্বারা দেখবেনা, শুনবেনা, গন্ধ নেবেনা, স্বাদ নেবেনা, এবং স্পর্শ অনুভব করবেনা। যখন তাঁরা এই সমস্ত কিছুকে বন্ধ করে, হৃদয় দ্বারা দেখবে, হৃদয় দ্বারা গন্ধ নেওয়া শুরু করবে, হৃদয় দ্বারা ধ্বনিকে শুনবে, হৃদয় দ্বারা আহারের স্বাদ নেবে, আর হৃদয় দ্বারা স্পর্শ অনুভবকে অনুভব করবে, তখনই তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে উঠবে, আর তখনই তাঁদের কর্ষণপর্ব সমাপ্ত হবে।

পুত্রী, যিনি হৃদয় দ্বারা ইন্দ্রিয়দের কর্ম করেন, তাঁরই ক্ষেত্রে মন, বুদ্ধি, প্রাণ, উর্জ্জা, সকলকিছু হৃদয়দ্বারা পরিচালিত হয়, যেমন কৃতান্ততে দেখলে, মাতা সর্বাম্বার দ্বারা সমস্ত ভূত পরিচালিত হতে থাকে। আর তখনই ব্যক্তি অনুভব করেন যে, তিনি তো অনাথ নন, স্বয়ং জগদম্বা তাঁর

জননী, তাহলে তাঁর যোজনা করার প্রয়োজন কি? তাহলে তাঁর চিন্তা, ইচ্ছা, কল্পনা করার প্রয়োজনই বা কি!

যদি তিনি অনাথ হতেন, তবে তাঁকেই যোজনা করতে হতো, কিন্তু যেকালে তিনি কখনোই অনাথ নন, সেকালে তাঁর এই যোজনা নির্মাণ চেষ্টাই বৃথা সময়ের অপচয় করা। স্বয়ং নিয়তি তাঁর সম্মুখে সমানেই যোজনাকে প্রস্তুত করছেন। হৃদয় দ্বারাই সেই পথকে অনুধাবন করা সম্ভব, পঞ্চভূত দ্বারা নয়। তাই, হৃদয়কে জাগ্রত করে, তা দ্বারা নিজের জননীর নির্মিত ও প্রদর্শিত যোজনাকে অনুধাবন করতে থাকতে হয়, আর সেই যোজনা অনুসারে চলতে হয়।

পুত্রী, যিনি হৃদয়ের এই গুহ্যরহস্যকে জেনে, নিজের হৃদয়কে জাগ্রত করে নিয়ে, সমস্ত ভূতদের সেই হৃদয়ের অধীনে স্থিত করে নিয়েছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়দের ছুটি দিয়ে, সেই কর্ম হৃদয়দ্বারাই করতে শুরু করে দিয়েছেন, তিনিই সত্যকে জানার উপযুক্ত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন। আর তাই, তোমার সন্তানরা যখন এই সমস্ত ভেদভাব থেকে মুক্ত হয়ে, হৃদয়কে জাগ্রত করে, যোজনার থেকে মুক্ত হয়ে, ইন্দ্রিয় ও ভূতদের সমস্ত কার্যভার হৃদয় দ্বারাই পালন করতে শুরু করবে, তখনই কর্ষণ পর্বের সমাপ্তি রচনা করে, তাঁকে সত্য ধারণ করানো শুরু করবে”।

দিব্যশ্রী প্রশ্ন করলেন, “মা, ধারণ পর্বে যাবার পূর্বে, আমাকে এই হৃদয় দ্বারা দেখার বিষয়ে একটু বিস্তারে বলো”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “পুত্রী, তুমি দেখলে আমি তোমাকে কৃতান্ত প্রদান করছি। এটি কে দেখলো? তোমার ইন্দ্রিয়, তাই তো? ... এবার বলো এঁর মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করে বলো, যে আমি এই কর্ম কেন করছি?”

দিব্যশ্রী বললেন, “মা, বুদ্ধি একটিই প্রশ্ন করো আর তা হলো কেন। অর্থাৎ এই যে ইন্দ্রিয় দেখলো তুমি কৃতান্ত প্রদান করছো, এটি কেন করছো, তা প্রশ্ন আসবে বুদ্ধির থেকে, আর তার উত্তর এই যে, তুমি তোমার শ্রোতাদের উন্নত করতে প্রয়াসরত”।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "এবার এঁর উপর মনের প্রভাব বিস্তার হবে। তা হলে কেমন হবে, সেই সম্বন্ধে বলো এবার"।

দিব্যশ্রী বিনা বিচার করে বললেন, "মন এই কর্মের মধ্যে তোমার মানসিকতার সন্ধান করবে। আর এই মানসিকতা রূপে সে দেখবে তুমি পরোপকারী"।

ব্রহ্মসনাতন পুনরায় মৃদু হাস্যপ্রদান করকে বললেন, "এবার হৃদয় এর সঙ্গে যুক্ত হলো। হৃদয় কি করবে এখানে"।

দিব্যশ্রী আবারও বিনা বিচারে বললেন, "মা! ... হৃদয় স্পষ্ট ভাবে জানে যে এক ভগবতীই ক্রিয়া করেন, অন্য কেউ কিচ্ছু করেন না, কেবলই কল্পনা করেন। অর্থাৎ এই কর্মও সাখ্যাত তিনিই করছেন। আর তিনি এই কৃতান্ত কেন প্রদান করছেন? কারণ তিনি সমস্ত শ্রোতার হৃদয় জাগ্রত করে, তাঁদেরকে সত্যের অমৃতধারাতে স্নান করাতে চান।

আচ্ছা...! এই হলো সম্পূর্ণ দর্শন। অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যে দেখাই নয়! ... বুদ্ধি যুক্ত করে দেখলে, সেটি টুডি হয়ে যায় অর্থাৎ কেন তা দেখলাম যা দেখলাম, তা হলো টুডি। মন যুক্ত করে দেখলে, সেটি থ্রিডি হয়ে যায় অর্থাৎ কর্তার মানসিকতা কি প্রকাশ পেল, যা দেখলাম তার মধ্যে। আর অন্তে হৃদয় যুক্ত হয়ে গেলে, সেটি ফোরডি হয়ে যায় অর্থাৎ স্বয়ং নিয়তিই কর্তা, আর তিনি কেন সমস্ত কর্ম করলেন, তা দেখা।

এই হলো সম্পূর্ণ দর্শন। আর এমন সম্পূর্ণ দর্শন করিনা বলেই, আমরা তা দেখতে পাইনা, যা তুমি দেখে নাও। আর সত্য বলতে প্রথমে মন, বুদ্ধি সকলেই শায়িত হয়ে থাকে, কর্ম করতেই চায়না, আর সমস্ত কিছু অহংকার, চিন্তা, ইচ্ছা ও কল্পনা নিজেদের সন্তান অর্থাৎ আবেগদের দ্বারা করিয়ে থাকে, আর আমাদেরকে বদ্ধ করে রাখে। আর এটিই কৃতান্ত একদম প্রথমে বলেছিল। পরে যখন হৃদয় সক্রিয় হতে থাকে সঙ্গীত, জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে, তখন পরমাত্মীয়তার বোধ দ্বারা বুদ্ধি ও মনকে জাগ্রত করে, আর তখনই আমরা কেন, মানসিকতা আর নিয়তির

প্রভাবকে দেখতে শুরু করি, আর তা একসময়ে আমাদের সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়েই দেয়।

এই হলো সম্পূর্ণ দর্শন, আর এই দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণই তুমি গ্রহণ করতে বললে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ দর্শন, সম্পূর্ণ ঘ্রাণ, সম্পূর্ণ স্পর্শ, সম্পূর্ণ স্বাদ, সম্পূর্ণ শ্রবণ। এবার পরিষ্কার হয়েছে মা, এই দর্শনের রহস্য। এবার আমাকে ধারণ করার কথা বলো"।

ধারণ

ব্রহ্মসনাতন বলতে থাকলেন, "পুত্রী, ধারণ পর্বের শুরু হয় সত্যের ব্যখ্যা প্রদান থেকে, অর্থাৎ কৃতান্ত প্রদান করা থেকে, আর তা সমাপ্ত হয় এখন যেই অবস্থায় তুমি রয়েছ, অর্থাৎ যেকালে তুমি আমাকে অর্থাৎ শূন্যতাকে, নিঃশব্দতাকে বা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করে ফেলেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই সেই অধ্যায়, যেখানে এসে এক সাধক প্রকৃত অর্থে কৃতান্তিক হতে সক্ষম হন। আর এই পথ যখন তুমি তোমার সন্তানদের অতিক্রম করাবে, তখন তাঁদের ক্ষেত্রে যেই যেই ধারার পালন করবে, তার সম্বন্ধে এবার তোমাকে বলছি শ্রবণ করো।

প্রথমেই বলি পুত্রী, ধারণ স্বয়ংকেই করতে হয়। কেউ তোমাকে ধারণা করিয়ে দিতে পারবেনা। একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো পুত্রী, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ভগবৎ গীতায় অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সত্যের আভাস করাচ্ছেন, কিন্তু তিনি প্রথমেই কেন সেই দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছেন না? আমিও তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে সত্যের দর্শন করালাম, এবং সত্যে স্নানও করালাম, কিন্তু প্রথমেই কেন তা করলাম না?

পুত্রী, গীতার ন্যায় সত্যের আভাস লাভ করা হউক, বা কৃতান্তের ন্যায় সত্যে নিমগ্ন হওয়া হউক, তা হৃদয় দ্বারাই দর্শন করতে হয়। চর্ম চক্ষুর বা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের , এবং পঞ্চভূতের সত্যদর্শনের বা ঈশ্বর দর্শনের সামর্থ্য থাকেনা। তাই তাঁদেরকে প্রথমে হৃদয়ের কাছে সমর্পিত হতে হয়, তবেই তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করতে সক্ষম হন, ঠিক যেমন তুমি দেখেছিলে যে প্রথমে

চারভূত সর্বাম্বাতে মজলেন, এবং হৃদয়ে স্থিত হলেন, অতঃপরেই তাঁরা মাতা সর্বাম্বার সাথে পরিচিত হলেন।

অর্থাৎ হৃদয় দ্বারাই ঈশ্বরকে দর্শন করতে হয়, আর এখন তুমি স্পষ্টই জানো যে, সেই দর্শন নেত্রের দর্শনের থেকে অনেক অধিক স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু পুত্রী, এই ইন্দ্রিয়দের এবং ভূতদেরকে নিজে থেকেই হৃদয়ে অবগাহন করতে হয়। হ্যাঁ, হৃদয় স্বয়ং তাঁদের আহ্বান করেন, যেমন মাতা সর্বাম্বা ভূতদের মানসী, বোধি, দখিনা তথা হুতাশন রূপে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু এঁদেরকে সেই আহ্বান স্বয়ং গ্রহণ করতে হয়, এবং হৃদয়ে নিমজ্জিত হতে হয়।

আর সেই কর্ম কেউ কারুর জন্য করে দিতে পারেন না। যেমন কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য করে দিতে পারেন না, তেমনই আমিও তোমার জন্য করে দিতে পারিনা। আর সেই ধারণা করার জন্যই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বিস্তর গীতা কথা বলার পরেই, অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন, ও সত্যের আভাস প্রদান করেন। একই ভাবে, ঠিক সেই কারণেই আমি তোমাকে সুবৃহৎ কৃতান্ত কথা বলার শেষেই তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে, তোমাকে সত্যের দর্শন করাতে পারলাম আর সত্যে স্নান করাতে পারলাম।

অর্থাৎ কথা এই যে, এই ধারণা তুমি করতে সক্ষম হয়েছ বলেই তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করা সম্ভব হলো। যদি ধারণা করতে না পারতে কৃতান্তকে, তাহলে তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করা যেতই না। আর এই ধারণা তোমার হয়ে কেউ করে দিতে পারেন না, স্বয়ং তোমাকেই করতে হয়। হ্যাঁ তোমার হৃদয় তোমাকে সেই ধারণা করার জন্য আহ্বান জানাবে, তবে তোমাকে স্বয়ংকেই সেই আহ্বানে সারা দিয়ে ধারণা করতে হবে।

কেন এই স্বয়ংক্রিয়তা? কারণ তুমি অন্য কারুর প্ররোচনায় নয়, অন্য কারুর ইন্ধন লাভ করে নয়, স্বয়ং স্বয়ংকে ভ্রমিত করে, শূন্যতারপরিচয় ত্যাগ করে আমিত্ব ধারণ করেছ। তাই সেই আমিত্বকে ত্যাগ করে, সত্যকে অর্থাৎ শূন্যতার আভাসকে অনুভব করার ও ধারণ করার প্রেরণাও তোমাকে স্বয়ংকে ধারণ করতে হবে। যদি তুমি আমার প্রেরণা লাভ করে শূন্যতা ত্যাগ

করে আমিত্বকে ধারণ করতে, তাহলে আমারই কর্তব্য হতো তোমাকে পুনরায় প্রেরণা দেওয়ার যে, সত্যকে শূন্যকে আভাস করো।

কিন্তু আমি সেই প্রেরণা দিইনি তোমাকে বা কনো আত্মকে। তাঁরা স্বয়ংকে স্বয়ং ভ্রমিত করেন, সত্য থেকে। তাই আমার কর্তব্যের মধ্যেও আসেনা যে আমি তোমাদের পুনরায় প্রেরণা প্রদান করবো, সত্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য। কিন্তু আমি মা; এক মায়ের কর্তব্য, দায়িত্ব, ইত্যাদে এত ভারিভারি শব্দের বোধ কোথায় থাকে। মা যে সরল হয়, সাবলীল হয়।

তাঁর কর্তব্য কি, তাঁর দায়িত্ব কি, এইসবের চিন্তা করে সে কখনো? না কি করতে পারে? সন্তানকে বুকে করে আগলে রেখে প্রেম দেওয়াতেই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সন্তান সেই প্রেম লাভ করার জন্য উপযুক্ত কিনা, সন্তানকে সেই প্রেম প্রদান তাঁর দায়িত্ব না কর্তব্য, এই সমস্ত কিছুর বোধ তো ছেড়ে দাও, এক মা এই সবের বিচারও করতে ব্যর্থ।

তাই আমার কর্তব্য না হলেও, প্রেম বশত, আমি সকল আত্মের কাছে হৃদয় হয়ে উপস্থাপন করে থাকি সর্বক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁর কামনার অগ্নি তাঁর পঞ্চভূতকে আঁচে কঠিন করে দিয়ে আমাকে উপেক্ষা করছে ততক্ষণ। প্রেম যে কনো বাঁধা মানেনা পুত্রী। তাই শতশত উপেক্ষার পরেও, আমি তাঁদের কাছে উপস্থিত থেকেই যাই, যতই তাঁরা আমার দিকে তাকাতেও অস্বীকার করুক। এটাই আমার স্বভাব, এটাই আমার প্রেমের স্বভাব।

হ্যাঁ তুমি বলবে, আমি সত্য, আমি শূন্য। তাই না চাইতেও আমাকে সর্বত্র উপস্থিত থাকতেই হয়, কারণ আমি ছাড়া কনো কিছুর তো কনো অস্তিত্বই নেই। না পুত্রী, তোমার যুক্তি সত্য হলেও, সেই যুক্তি অসত্যও। আমি সত্য, আর কেবল সত্য বলেই অসত্য শব্দে যেমন সত্য লুকিয়ে থাকে, তেমন ভাবে আমি লুকিয়ে থাকিনা।

তুমি আত্ম, কেবল আর কেবল মাত্র তোমার ভ্রান্তভ্রমিত কল্পনার কারণে। অর্থাৎ তুমি কে? তুমি বাস্তবে সত্য হলেও, সেই সত্য তোমার অজ্ঞানে স্থিত, আর জ্ঞানে কি স্থিত? কেবলই কল্পনা,

কেবলই মিথ্যা। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বই একটি মিথ্যা। আত্ম, তা কেবল তোমার নয়, সকল জীবের, সকল গ্রহের, এমনকি ধরিত্রীরও আত্মের অস্তিত্বই একটি ভ্রম, একটি ডাহা মিথ্যা।

আর মিথ্যার মধ্যে সত্য কি করে প্রকাশিত হতে পারে। পুত্রী, তাই তোমাদের মধ্যে আমি যে বিরাজ করি, তা আমার জন্য কনো বশ্যতা নয়, এটি আমার চয়ন, কারণ আমি তোমাদের সকলকে প্রেম করি। তোমরা মানো বা না মানো, তোমরা আমারই সন্তান। আমার উপাদান হলো শূন্য, আর সেই উপাদানই তোমাদেরও উপাদান। তাই কেবলই মাতৃত্বের মমতা ও প্রেমের কারণেই, আমি তোমাদের সঙ্গে হৃদয় বেশে থাকি, তা তোমরা যতই অবহেলা করো আমাকে।

কেবল যে হৃদয় হয়ে থাকি, তাই নয়, যখন প্রতিটি আত্ম দেহ ধারণ করে শিশু হয়ে বিরাজ করে, আমিই তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকি, আর তাকে আমার প্রেমের দিকে, আমার অস্তিত্বের দিকে আকর্ষণ করতে থাকি। তাই প্রতিটি আত্মই শিশুকালে শূন্যতার আভাস অনুভব করে, হৃদয়ের টান অনুভব করে। আর সেটিই হয় আমার আহ্বান তোমাদের প্রতি।

যেমন এই দেহে থাকা আত্ম সে আকর্ষণে আকর্ষিত হয়েছিল, আর হয়েছিল বলেই সে সমাজের সমস্ত পঞ্চভূতের জয়গানকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়দের হাতছানিকে উপেক্ষা করে, আমারই কাছে নিজেকে সমর্পণ করে আজ সে ব্রহ্মসনাতন। কিন্তু যারা সেই আহ্বান গ্রহণ করেন না, তাঁরা ক্রমশ পঞ্চভূতকেই নিজের স্বামী করে নেন, ইন্দ্রিয়দেরই নিজের মন্ত্রী করে নেন, আর তাঁদের অন্তরে আমি এক অন্ধের সম্মুখে আলোকের ন্যায় বিরাজ করি।

কিন্তু তারপরেও অনেকে আমার আহ্বান গ্রহণ করেন, যেমন তুমি করলে; যেমন তোমার কাকা করেছে। কিন্তু পুত্রী, এই ব্রহ্মসনাতনকেও স্বয়ংই ধারণা করতে হয়, তোমাকেও আর তোমার কাকাকেও, অর্জুনকেও, আর বিবেকানন্দকেও। ... অর্থাৎ কথা এই যে, এটি কখনোই সত্য নয় যে, আমি তোমাকে একটি স্পর্শ করে তোমার ধারণাকে সম্ভব করে দেব, বা কেউ এমন করে দিতে পারেন।

হ্যাঁ সম্ভব হয় তা, কিন্তু তা তখনই সম্ভব হয় যখন আমি তোমাকে কনো ভৌতিক ধারণা প্রদান করতে চাই। অর্থাৎ আমি তোমাকে মুষ্ট্যাঘাতের ব্যাথা তোমাকে স্পর্শ করে প্রদান করতে পারি; কামনার নেশা তোমাকে স্পর্শ করে প্রদান করতে পারি; এমনকি জাদুশক্তির বলে আমি তোমাকে স্পর্শ করে ধনবানও করে দিতে পারি। কিন্তু সত্য কনো ভৌতিক উপলব্ধি নয়, আর না তো কনো অতিভৌতিক উপলব্ধিও। সত্য হলেন সত্য, আর তাকে তুমি ও সকল আত্ম স্বয়ং ত্যাগ করে এসেছ, যদিও সেই ত্যাগও কেবলই এক কল্পনা।

তাই সেই সত্যকে তোমাকে স্বয়ংই ধারণা করতে হবে। আমি তোমাকে উপায় বলে দিতে সক্ষম যে, সত্য হলেন শূন্য, সত্য হলেন প্রেম, সত্য হলেন নিঃশব্দতা। আর সেই উপায়ের ধ্যান করে, তুমি সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, আর এই উপায়কেই বলা হয় দিব্যদৃষ্টি, তবে সেই কর্ম তোমাকেই করতে হবে, আমি তোমার হয়ে সেই দর্শন করলে, তুমি তা দর্শন করতে পারবেনা।

পুত্রী, আমি তাজমহল দেখে এলে, তোমার তাজমহল দর্শন হয়ে যায়না। তেমনই আমি ঈশ্বরদর্শন করলে, তোমার ঈশ্বরদর্শন হয়ে যায়না। যেমন আমাকেও তাজমহল পর্যন্ত গিয়ে তাজমহল দেখে আসতে হয়, প্রেমের স্মৃতিসৌধ দেখে আসতে হয়, তেমনই তোমাকেও তাজমহল পর্যন্ত পৌঁছেই সেই প্রেমসৌধ দেখে আসতে হয়। হ্যাঁ আমি যেহেতু তোমার পূর্বে তাজমহল গেছি, তাই তোমাকে মার্গ বলে দিতে পারবো, কিন্তু যাত্রা তোমাকেই করতে হবে, আমি তোমার যাত্রা করে দিতে পারবো না।

ঠিক তেমনই আমি ঈশ্বরদর্শন করে এসে তোমাকে বলতে পারি, ঈশ্বর এমন অমন, আর বলতে পারি এই মার্গে যাত্রা করো, সহজ হবে, তাড়াতাড়ি পৌছবে, সামনাসামনি দেখতে পাবে, ভিড় এড়িয়ে দেখতে পাবে। কিন্তু সেই যাত্রা তোমাকেই করতে হবে, আমি সেই যাত্রা তোমার হয়ে করে দিতে পারবো না। কেন? কারণ আমি একটি ভিন্ন আত্ম, আর তুমি একটি ভিন্ন আত্ম। আমিও ভ্রমিত হয়েছিলাম শূন্য থেকে, আর ভ্রমিত হয়ে নিজেকে আত্মরূপে কল্পনা করেছিলাম, আর তুমিও একই করেছিলে।

কিন্তু না তো আমি তোমার সঙ্গে সলাপরামর্শ করে সেই কল্পনা করেছিলাম, আর না তুমি আমার সাথে সলাপরামর্শ করে এই কল্পনা করেছিলে। আমার কল্পনা তোমার থেকে ভিন্ন, তাই আমাকেও ভিন্ন ভাবে যাত্রা করতে হয়েছে, আর তোমার কল্পনাও আমার থেকে ভিন্ন, তাই তোমাকেও ভিন্ন ভাবেই যাত্রা করতে হবে।

আর এত কথা কেন বললাম পুত্রী? কারণ এই কল্পনায় আবদ্ধ আত্মদের সমাজে একটি মিথ্যাচার প্রচলিত আছে যে কেউ অন্যদের উদ্ধার করে দেবেন। ... হ্যাঁ পুত্রী, সম্পূর্ণ ভাবে এটি মিথ্যাচার। কনো অন্য দেহে থাকা আত্ম, অন্য দেহে থাকা আত্মকে উদ্ধার করতে সক্ষমই নন। কারণ সে দেহি, দেহি অর্থাৎ নশ্বর। ঈশ্বর তোমার অন্তরে নিবাস করছেন, আমারও, সবারই। আর তিনিই তোমাকে, আমাকে, সকলকে উদ্ধার করেন।

সমাজ এটিই বলবে তোমাকে যে, ঈশ্বর উদ্ধার করেন। এই কথার মধ্যে কনো মিথ্যা নেই, কারণ সত্য সত্যই একমাত্র ঈশ্বরই উদ্ধার করেন। একমাত্র সত্যই অসত্যের খোলস থেকে অসত্যের, 'অ' কে বিনষ্ট করে, সত্যকে উদ্ধার করে। কিন্তু আবারও বলছি, এই কর্ম করেন ঈশ্বর, নশ্বর নন। পুত্রী এই দেহ, তা সামান্য তনু হোক, ভগবৎ তনু হোক, আর আমার তোমার ন্যায় অবতারতনু হোক, সকলেই নশ্বর। আর তাই আমি, এই দেহরূপী আমি, বা কনো দেহরূপীই তোমার উদ্ধার করতে সক্ষম নন।

আমার যেই রূপ তুমি দর্শন করলে কিছুক্ষণ পূর্বে, তা কি আমার এই দেহের মধ্যে দেখলে, না কি তোমার দেহের অভ্যন্তরে?"

দিব্যশ্রী বললেন, "আমার মধ্যে ... তারপর সর্বত্র"।

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "সঠিক পুত্রী, প্রথম নিজের মধ্যে, তারপর সর্বত্র। যেই আমি এই দেহে বিরাজমান, সেই আমি সর্বত্র বিরাজমান। আর তাই প্রথম আমাকে নিজের মধ্যেই দর্শন করতে হয়, তবেই আমাকে সর্বত্র দর্শন করা যায়। ... অর্থাৎ কনো মানুষ অন্য কনো মানুষ-এর উদ্ধার করতে পারেন না। প্রতিটি মানুষকে নিজেকেই নিজে উদ্ধার করতে হয়।

আর এটিই হলো সত্য ধারণ। তাই পুত্রী, ধারণ করার ক্ষেত্রে, এই কথাকে নিজেও সর্বদা স্মরণ রাখবে, আর নিজের শিষ্যদেরও স্মরণ করাতে থাকবে যে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তবে তাঁকে প্রথমে নিজের অন্তরে দর্শন করতে হয়, কারণ সে তাঁকে দর্শন করতে পারছে না যে, তার একটিই কারণ, আর তা হলো তাঁর নিজের ভ্রম। যখন সে নিজের অন্তরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে, তখনই তাঁর সেই ভ্রমের নাশ হবে, আর তখনই সে সর্বত্র ঈশ্বরকে দর্শন করতে সক্ষম হবে।

অর্থাৎ তোমার ছেলেমেয়েরা যেন এই ধারণা না রাখে যে কনো আগন্তুক নশ্বর জীব তাঁদের সম্মুখে আসবেন, আর তাঁদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবেন। ... এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর উদ্ভ্রান্ত এক কল্পনা। ...

হ্যাঁ যখন তাঁরা সকলে এই উদ্ভ্রান্ত কল্পনাকেই সত্য বলে মানতে শুরু করবে, তখন আমি কনো না কনো তনু ধারণ করে, সেই নশ্বর তনুকে নশ্বর প্রমাণিত করে, সেই নশ্বরের অন্তরে ঈশ্বর স্থাপিত তাও প্রমাণিত করে, পুনরায় এই সত্যকে স্থাপন করে যাবো যে, ঈশ্বরকে অন্তরে দর্শন করো, বাইরে তাঁর দর্শন ততক্ষণ অসম্ভব যতক্ষণ না নিজের ভ্রম দূর করে অন্তরে তাঁকে দর্শন করছো।

সেই নশ্বর তনুতে বিরাজ করে, পুনরায় মার্গ দেখাবো সকলকে, কিন্তু সেই একই কথা উদ্ধার তাঁকে নিজেকেই নিজে করতে হবে, আমি তা বাইরে থেকে করিয়ে দেব না। তাঁদের অন্তরে থেকে সমানে তাঁদেরকে প্রেরণা প্রদান করবো যে, ইন্দ্রিয় নয়, আমি হৃদয়, আমার দ্বারা দর্শন করো; সমানে বলতে থাকবো যে পঞ্চভূতকে স্বতন্ত্র না করে, আমার অধীনে স্থিত করে রাখো। কিন্তু এই সমস্ত কিছু তাঁদের অন্তরেই হবে, বাইরে নয়।

তাই পুত্রী, এই কাল্পনিক ধারণার নাশ করো যে বাইরের কনো নশ্বর জীব তোমাদের উদ্ধার করবেন। উদ্ধার আমিই করবো তোমাদের, কিন্তু আমি তোমাদের বাইরে নয়, অন্তরে স্থিত। ... এই ধারণা নিজেও রাখো আর তোমার ছেলেমেয়েদেরও প্রদান করতে থাকবে, যাতে তাঁরা কখনোই ভ্রমিত না হয়ে যায়, আর সাধন পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায়।

আর এই চূড়ান্ত চরণে, একটি ব্যাপারকে সর্বদা স্মরণ রাখবে। এই জগতসংসারে কিচ্ছু বোঝার নেই। মিথ্যা এই জগত, আর এই মিথ্যা জগতে বোঝার মত কিছুই নেই। যা আছে এতে, তা বোঝার নয়, তা অনুভব করার, আর তা হলো প্রেম। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ঘটনা তোমাকে এই প্রেমই অনুভূতি করিয়ে চলেছে, আর তুমি সর্বক্ষণ সেই প্রেমকে উপেক্ষা করে চলেছ।

এই বাতাসকে অনুভব করো। কি বুঝছো এঁকে অনুভব করে, আর কি অনুভব করছো এর থেকে, তা আমাকে বলো"।

দিব্যশ্রী নেত্র বন্ধ করে, বাতাসকে অনুভব করে, নেত্র খুললেন আর বললেন, "এই প্রথম আমি এই বাতাসকে অনুভব করলাম মা, এর আগে আমি কেবলই বুঝেছি। আর এই বুঝতে পেরেছি যে হাওয়া বইছে, আর তা আমার অঙ্গে লাগছে"।

ব্রহ্মসনাতন হাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন, "আর আজ অনুভব করে কি অনুভব করলে?"

দিব্যশ্রী বললেন, "আমি একটি পাখির পালকের মত হাল্কা কেউ, আর এই বাতাস আমাকে প্রেম প্রদান করে, সেই পালককে দুলকি চালে দুলিয়ে যেন ঘুম পারাচ্ছে, এই অনুভব করলাম। ... ও আচ্ছা, এবার বুঝতে পেয়েছি, তুমি যে বলতে, সাগর যেন মা, আর সেই মা যেন তাঁর সন্তানকে দুলিয়ে, ভিজিয়ে, উঠিয়ে, নামিয়ে আদর করছে। এটা ছিল অনুভব। আর তাই আমি যখন সাগরে স্নান করতে গেছি, তখন কিছুতেই সেই অনুভবকে অনুভব করতে পারিনি, কারণ আমি তো বুঝতে গেছিলাম, অনুভব করতে তো যাইনি!

হ্যাঁ সত্যই তো, এই বাতাস আমাকে দুলিয়ে দুলিয়ে প্রেম দিচ্ছে; স্নান করার কালে জলধারা আমাকে স্নেহকরে প্রেমে সিক্ত করছে; আহারের কালে সমস্ত আহার আমার উর্জ্জাকে তৃপ্ত করে, আমাকে প্রেম দিচ্ছে; নিদ্রার কালে, নিদ্রা স্বয়ং আমাকে স্বস্তি ও শান্তি দিয়ে প্রেম করছে! ... মা, সর্বক্ষণ কেবলই প্রেম দেওয়া হচ্ছে আমাকে। ... কিন্তু মা, এই অনুভব তো ধ্যানস্থ করছে না আমাকে? বরং একটি ভাব প্রদান করছে, আর তা যেন ধ্যানের থেকেও মধুর!

যেন আমার আমিই খসে পড়ে যাচ্ছে এই ভাবের কারণে। যেন আমি নেই, আর এই আমি নেই যেন সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধনমুক্তি! এমন বন্ধনমুক্তি তো ধ্যানের কালেও অনুভূত হয়না মা! ... এ কি তবে? একি ধ্যানের থেকেও উচ্চ কনো কিছু? এ যেন নেত্র খুলে রেখেও আমাকে শূন্যতার অনুভব দিচ্ছে? যেন যেই সত্যের সম্মুখীন হয়ে এলাম, সেই সত্যই আমাকে ঘিরে ধরেছে? কি হচ্ছে মা এটা? একে কি বলে?

কি অদ্ভুত পরিমাণ উত্তেজনা অনুভব করছি, যেন এক বাঁধনছাড়া আনন্দ। যেন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যেন সমস্ত কিছু আমাকে অপার অপার প্রেম দিচ্ছে, আর সেই প্রেম লাভ করে করে, আমি তাতে ডুবে যাচ্ছি, মহানন্দে ডুবে যাচ্ছি। এই ডুবে যাওয়াতে যেন কনো ভয় নেই, কনো লাজ নেই, কনো চিন্তা নেই, কনো ইচ্ছা অনিচ্ছা কিচ্ছু নেই, কেবলই তৃপ্তি, কেবলই আনন্দ। একে কি বলে মা?... এর আগে এইরূপ কনোদিনও অনুভব করিনি। এ যেন ধ্যানের থেকে কয়েক সহস্রগুন অধিক মধুর? এটা কি মা?”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “কৃতান্ত পাঠের ক্ষেত্রে মাতা সর্বাম্বাকে কখনো ধ্যনস্থ হতে শুনেছ?”

দিব্যশ্রী সামান্য স্মরণ করে বললেন, “না উনাকে ভাবস্থ হতে বলা হয়েছে, ধ্যনস্থ নয়”।

ব্রহ্মসনাতন আবার হাস্যমুখে বললেন, “এই হলো সেই ভাব, আর সেই ভাবে যখন সম্পূর্ণ ভাবে ডুবে যাওয়া হয়, তাকে বলে ভাবস্থ। পুত্রী, এই ভাব একটি অন্য আমির জন্ম দেয়, আত্মকে বিলীন করে, আর তা হলো ভক্তির আমি। এই আমি জন্ম লাভ করে কেবলই সুখ লাভ করে, আর সমস্ত কিছুর প্রেম অনুভব করে। সমস্ত কিছুর থেকে প্রেম অনুভব করে, প্রেমবিকাশ করার কারণেই এই আমির জন্ম হয়।

আর সেই আমি যখন প্রেমানুভব করে তাকে বলে ভাব, আর যখন সেই আমিও প্রেমানুভব করতে করতে বিলীন হয়ে যায় শূন্যের মধ্যে, তা হলো ভাবস্থ অবস্থা”।

দিব্যশ্রী বললেন, “এই কারণে তুমি কখনোই ধ্যানসনে উপবেশন করোনা, কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই দেখে যে, আমি ধ্যানে এমন ভাবে মৃত্যুর ন্যায় শান্তি কখনোই অনুভব করিনা। এত পরিপাটি করে মেরুদণ্ড সোজা রেখে, কঠিন ভাবে বসেও এমন অপার সুখ অনুভব করিনা। কিন্তু তুমি যেন মৃত্যুর শান্তিতে তলিয়ে যাও। মুখে থাকে এক মৃদু হাসি, আর ক্রমে সেই হাসিও বিলিন হয়ে যায়। ... অর্থাৎ তুমি ধ্যান করোই না! কেবলই ভাবে ভাবস্থ হয়ে যাও!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “তুমিও তো সেই ভাবেই তলিয়ে গিয়ে, গ্রীষ্মের দুপুর থেকে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রদের সীমা ত্যাগ করে, পরমাশূন্যের মধ্যে লীন হয়ে, তাঁর অমৃতধারাতে স্নান করে এসেছ। তা তুমি কি তখন ধ্যানে ছিলে? ধ্যানে থাকলে, আমি যে তোমাকে সমানে বলতে থাকছিলাম, তা তুমি শুনতে পেতে?”

দিব্যশ্রী বললেন, “সত্যই তো, আমি তো সমস্ত কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম, আর কেবল শুনতেই পাচ্ছিলাম, তেমন নয়, এমন স্পষ্ট শব্দ, এর আগে কনোদিনও শুনিনি। ... এবার বুঝতে পারছি, আমার এই কান সেই শব্দ শ্রবণ করেই নি, তা শ্রবণ করেছিল আমার হৃদয়, আর তাই সেই শব্দসমূহ এতটা স্পষ্ট ছিল। ... অর্থাৎ ধ্যান হলো নিজেকে এই বাহ্য মিথ্যা জগতে ছড়িয়ে যাওয়া থেকে আটকানোর একটি অভ্যাস বা অনুশীলন। আর ভাব?

ভাব হলো নিজেকে প্রেমে উন্মাদিনীর মত ভাসিয়ে দেওয়া! ঠিক যেমন মিরা বোধ হারিয়ে ভাবে ভেসে ভেসে নৃত্য করতো, ঠিক যেমন মহাপ্রভু বোধ হারিয়ে নৃত্য করতে করতে ভাবসমাধিতে নিমজ্জিত হতো, ঠিক যেমন রামকৃষ্ণ ঠাকুর ভাবে গদগদ হয়ে তাঁর ভগবৎতনুকে লুটিয়ে দিতেন, এজে ঠিক তেমনই! এ যে ভাব নয় মা, এ যে মহাভাব! এ যে অভ্যাস নয় মা, এ যে নেশা! শ্রেষ্ঠ নেশা। এই নেশার কাছে মাদক যেন অতি তুচ্ছ!

আচ্ছা মা, গিরীশ ঘোষ কি এই নেশাতেই চূড় অবস্থায় দেখেছিলেন ঠাকুরকে, আর বলেছিলেন এত সুরাপান করেও তাঁর এত নেশা কনোদিন হয়নি! ... কি অদ্ভুত নেশা! এতো নেশা, মহানেশা, সমস্ত নেশার শ্রেষ্ঠ নেশা, প্রেমের নেশা! ভগবানের নেশা! ... আর এই নেশার

আকর্ষণ যেন সমস্ত নেশার থেকে শতশত গুন ভিন্ন! যেন এই নেশার থেকে মুক্ত হতেই মন চায়না!”

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, “এই হলো ধারণের উপায় পুত্রী। একবার এই ভাবের নেশায় নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারলে, আর তোমার করনিয় কিচ্ছুই থাকবে না। যেমন আজ আমাকে আর কিচ্ছু বলতে হচ্ছেনা, সমস্ত অনুভব তুমি স্বয়ং করতে পারছো, ঠিক তেমনই এই নেশায় চূড় হলে, তোমার আর কনো করনিয় থাকবেনা, তোমার ছেলেমেয়েরা অনায়সেই সত্যের সম্মুখে স্থিত হয়ে, সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, সত্যের নেশাতেই চূড় হয়ে যাবে।

হ্যাঁ পুত্রী, মিথ্যা মাদকের নেশা তো অনেক করলো সকলে। এবার সত্যের নেশার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দাও। ... এই শূন্যতার ভানই সেই নেশা, যেই নেশা সকল নেশার রাজা। যার একবার এই নেশা হয়ে যায়, মোক্ষ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তিই হয়না। ... অর্থাৎ এই নেশা এমন নেশা, যে সমস্ত কল্পনাকে বিনষ্ট করে দিতে পারে, সমস্ত যন্ত্রকে বিকল করে দিতে পারে, সমস্ত তন্ত্রকে অকেজ করে দিতে পারে, সমস্ত মন্ত্রকে নিরর্থক করে দিতে পারে।

হ্যাঁ পুত্রী, যেই ব্যক্তি এই নেশায় মজে গেছেন, তাঁকে বাস্তবেই কনো ব্যবস্থা অর্থাৎ কনো যন্ত্রই মোহিত করতে পারেনা, তাঁর উপর মায়া স্থাপন করতে পারেনা; তাঁকে কনো জাদু, না এমনি জাদু, না কালাজাদু, না তন্ত্রমন্ত্র, না কনো কিছু স্পর্শ করতে পারে। আর একবার তা হলে, কে আটকাবে তাঁকে? কে তাঁকে তাঁর জননীর থেকে দূরে আটকে রাখবে? না আধুনিক বিজ্ঞানের কনো যন্ত্রের সেই সামর্থ্য আছে, না উচাটনাদি তন্ত্রের সেই সামর্থ্য আছে, আর না কনো মন্ত্রের তাঁকে বান্ধা দেবার সামর্থ্য আছে।

এই হলো সেই দিব্যদৃষ্টি পুত্রী, যার মাধ্যমে সত্যে স্থিত হওয়া কেবলই সময়ের অপেক্ষা, আর এটিই সমস্ত সংসারের লক্ষ্য। তবে এই তত্ত্বকে, এই সত্যকে লুক্কায়িত রাখবে, তবেই তা জগতের বুকে স্থিত থাকবে। অর্থাৎ আমার কথা এই যে, একবার যদি এই তত্ত্বকে, এই নেশাকে সর্বজনীন করে দেওয়ার প্রয়াস করো, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত যন্ত্রপ্রস্তুতকারক

ধনকুবেররা, সমস্ত বশীকরণ উচাটনের বণিকরা, সমস্ত প্রকার ধনমুখিরা এই তত্ত্বকে অশুদ্ধ করে দেবার প্রায়াস করবে।

কেন করবে? কারণ তাঁদের কাছে প্রয়োজন হলো অজ্ঞানতা। যত অধিক মানুষ অজ্ঞান থাকবে, তত অধিক তাঁদের কোষাগার রত্নভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হবে; যত অধিক মানুষ জ্ঞানী হবে, ততই তাঁরা যন্ত্রের প্রয়োজন থেকে মুক্ত হবে, আর ততই তাঁর কোষাগার শূন্য হতে শুরু করবে। যত অধিক মানুষ এই ভাবের থেকে মুক্ত থাকবে, ততই তাঁদের উচাটন বশীকরণ ক্রিয়াশীল হবে। যত অধিক মানুষ এই নেশার থেকে মুক্ত হবে, তত অধিক মানুষ চমৎকারে বিশ্বাসী হবে, আর তত অধিক মানুষকে মন্ত্রাদি দ্বারা মূর্খ করা সম্ভব হবে।

তাই যদি তাঁরা, যারা মানুষের প্রবল কামনা, ইচ্ছা, চিন্তা, আর কল্পনাকেই নিজেদের কোষাগার পরিপূর্ণতার মাধ্যম করে রেখেছেন, তাঁরা যদি এই নেশার সন্ধান পায়, তবে এই নেশার বিজ্ঞানকে যতটা শীঘ্র সম্ভব মুছে ফেলার প্রয়াস করবে। আর তাই এঁদের থেকে এই নেশাকে সুরক্ষিত করে রেখে দাও, আর ততক্ষণ সুরক্ষিত করে রেখে দাও, যতক্ষণ না এই নেশায় এক বিশাল গোষ্ঠী নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন"।

দিব্যশ্রী মিষ্টহেসে বললেন, "বুঝলাম মা, যতক্ষণ না গাছ বনস্পতি হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ সেই গাছকে বেড়া দিয়ে রেখে দিয়ে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন, তবে একটি ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তাই ভেবেছিলাম এটি কেবলই একটি ব্যক্তির উন্নতির জন্য কথা। আজ বুঝলাম, এই কথা তো সমস্ত সংসারকে উদ্ধার করার মন্ত্র ছিল!"

ব্রহ্মসনাতন হেসে বললেন, "হ্যাঁ, সঠিকই ধরেছ পুত্রী। যতক্ষণ না এই নেশাতে শতশত মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, ততক্ষণ এই নেশার কথা যেন কেউ ঘনাক্ষরেও না জানতে পারে। ... কারণ যারা এই নেশা করছেন না, তাঁরা এই নেশার কথা জনেজনে বলে ফিরবে, আর যারা এই নেশা করছেন, তাঁরা কেবল তাঁকেই এই নেশার কথা বলবেন, যিনি এই নেশা করতে চান। ...

বুঝতে পারছো কি বলছি? গাঁজাখোর কেবলই আরেক গাঁজাখোরের কাছে গিয়েই প্রশ্ন করবে, "ভাই একটু প্রসাদ হবে না কি?"... অন্য কারুকে এই প্রশ্ন সে করবে না, কে জানে সে হয়তো পুলিশের লোক, তাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে। ঠিক তেমনই, এই নেশাকে প্রকাশ্যে রেখো না, লুকিয়ে রাখো, ঠিক যেমন এক গাঁজাখোর নিজের গাঁজার নেশাকে লুকিয়ে রেখে দেয়, তেমন।

তাহলেই এই নেশা সুরক্ষিত থাকবে। ভালো করে দেখো, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কারুকে তেমন নেশায় চূড় দেখেন নি, গিরীশ ঘোষ ছাড়া, তাই সকলেকে জ্ঞান নির্দেশ দিলেও, এই নেশার সংবাদ কেবলই গিরীশকে দেন, বিবেকানন্দও এই নেশার মাথামুণ্ডু কিচ্ছু জানতো না, আর কনোদিন জানেও নি। কিন্তু পাশাপাশি চৈতন্যদেবকে দেখো।

তিনি এই নেশার কথাই বলেছেন, আর প্রকাশ্যে এসে নেশা করেছেন। ফল কি হলো? এই নেশা তো কেউই করতে পারলো না, উপরন্তু এই নেশাকেই ব্যবসা করে দিলো প্রচুর ছোটবড় বণিক, আর আজ চৈতন্যদেব বাণিজ্যের এক বিশেষ পণ্যদ্রব্য হয়ে গেছেন জগতে। হ্যাঁ আমার এই কথা যদি তাঁদের কানে যায়, দেখবে, তাঁরাই এই কথার প্রতিবাদ করবেন। এঁদের জন্যও বাংলাভাষা শব্দ রেখে গেছেন, "চোরের মায়ের বড় গলা"।

তাই পুত্রী, এই নেশাকে লুকিয়ে রাখো, আর নিজের সেই ছেলেমেয়েদের কাছেই এই নেশার পরিচয় দেবে, যারা এই নেশায় চূড় হতে চাইছে, ঠিক যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব কেবল গিরীশকেই এই নেশার কথা বলেছিলেন, তেমন। দেখো, উনি এই নেশাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাই উনাকে পণ্য করতে পারেনি বণিকরা, কিন্তু যিনি লুকিয়ে রাখেন নি, তিনি পণ্য হয়ে গেছে।

অর্থাৎ পুত্রী, এই ধারণের ক্ষেত্রে যা অবশ্যই স্মরণ রাখবে, তা হলো ভাব, আর ভাবের নেশা। যদি চাও যে এই ভাবের নেশায় একদিন সম্পূর্ণ মানবজাতি উন্মাদ হয়ে গিয়ে মোক্ষের মেলা বসিয়ে দিক জগতে, তাহলে, এঁকে লুকিয়ে রাখবে। একটি নয়, যতক্ষণ না এক সহস্র মিরা হচ্ছে এই নেশা করে করে, ততক্ষণ এই নেশার কথা জগতকে জানতেও দেবেনা। ...

অর্থাৎ পুত্রী, প্রচার নয়, কর্ম করো। প্রচার অনেক করার প্রয়াস হয়েছে, কিন্তু তাতে কনো লাভ হয়নি। এই নেশাকে নিয়ে বাণিজ্যের রচনা হয়েছে খালি। তাই কনো প্রচার নয়, অনাথদের গ্রহণ করো, আর তাঁদেরকে এই নেশায় চূড় করতে থাকো। তাঁদেরকে দিয়েও অনাথদের গ্রহণ করাও, আর নেশার বিস্তার করো। ১০ট অনাথ শিশুকে ১০টি অনাথশিশুর আশ্রম করার নির্দেশ দাও, আর সেই ১০ থেকে ১০টি করে করে, ১০০টি মিরার নির্মাণ করো। সেই ১০০টির থেকে ১ সহস্র মিরার নির্মাণ করো, আর সেই ১ সহস্র থেকে ১০ সহস্র মিরার নির্মাণ করো।

আর এই ১০ সহস্র মিরাকে তারপর জগতে ছেড়ে দাও। দেখবে, এই সমস্ত বাণিজ্য, বণিক, যন্ত্র, তন্ত্র, মন্ত্র মুহূর্তের মধ্যে মানব সমাজ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে, সম্পূর্ণ মানব সমাজে সত্যযুগ স্থাপিত হয়ে গেছে। আর কেউ তখন বৈরাগ্যকে বিরক্তি বলে চালাতে পারবেনা। আর কেউ তখন মোহকে প্রেম বলে চালিয়ে দিতে পারবেনা জগতে। আর কেউ তখন ঈশ্বরের মন্দিরে গিয়ে কামনা করাকে ভক্তি বলে চালিয়ে বাণিজ্য করতে পারবেনা। আর কেউ তখন ঈশ্বরকে একচোখ বলার সাহস করবেনা।

কিন্তু ততদিন পর্যন্ত এই নেশাকে লুকিয়ে রাখো। প্রচার নয়, কর্ম করো। আশা করো না যে তোমার লেকচার শুনে কারুর মধ্যে চেতনা জাগবে। অনাথ শিশুকে কাছে টেনে, নিঃস্বার্থ প্রেম দিয়ে, তাঁর মধ্যে চেতনার উদয়কে নিশ্চিত করো”।

দিব্যশ্রী বললেন, “তুমি অনাথে দাও চেতনা, অনাথ দেবে অনাথে তা। ১০ অনাথ গড়বে শতকে, শতক গড়বে সহস্রে। সহস্র মিরা যখন উঠবে গড়ে, গর্জে উঠবে একত্রে। খবরের কাগজ, সব খবরে, থাকবে না বাণিজ্য কনো খতে। থাকবে খালি মিরার কথা, এক নয় সহস্র তথা। হয় হবে বিরক্ত, বন্ধ করবে খবর, নয় সকলে হবে আসক্ত, মিরাতে হবে মগন।

সত্যি মা, এমন যোজনা সত্যই কনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভবই নয়, কারণ মানুষ তো সবসময়ে তাৎক্ষনিক ফলের আশা করতে থাকে। এই এখনি করবো, এই এখনই ফল পেয়ে যাবো। জল খাওয়াও শেষ হলো না, প্রস্রাব করতে চলে গেলাম। মানুষ তো এই ধৈর্য ধরতেই

পারেনা। ... আর তাই এই অসাধারণ যোজনা করতেও পারেনা। সত্যই, আমরা অনাথ নই, তাই আমাদের যোজনা বানানোর কনো প্রয়োজনই নেই। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা এই যে, আমরা যোজনা করতে জানিই না, তাই যোজনার থেকে দূরে থাকা উচিত আমাদের।

আচ্ছা, এবার তো কৃতান্তিক হয়ে উঠলো সে, এবার তার করনিয় কি?”

উৎপাদন

ব্রহ্মসনাতন বললেন, “ওই যে বললে তুমি, এক মিরা গড়বে শত মিরা, শত মিরা গড়বে সহস্র মিরা, সেটাই করবে”।

দিব্যশ্রী বললেন, “কিন্তু মা, একজন ১০জন অনাথ শিশুকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। না সকলে ৬ বৎসরের মধ্যে বয়স। কিন্তু বুঝবে কি করে, কাকে নেশার সন্ধান দেবে আর কাকে দেবেনা!”

ব্রহ্মসনাতন বললেন, “পুত্রী, গুরু হয়ে যদি গুরুর নির্মাণ না করা যেতে পারে, তবে কর্ম অসম্পন্নই থাকে, ঠিক যেমন বিবাহ উপরান্তে সন্তান লাভ না হলে, বিবাহ অসম্পন্নই থাকে, তেমন। অর্থাৎ, যেই ভাবধারা ধারণ করে একজন গুরু হয়েছেন, তাঁকে সেই ভাবধারাই স্থাপন করা অন্তত একজন শিষ্য গঠন করতেই হয়, তবেই গুরুর পদে তাঁর স্থাপিত হওয়া সম্পন্ন হয়।

আমার এই কথার অর্থ একটু জটিল হবে অনুভব করা। তাই সচেতন হয়ে কথাটিকে হৃদয় দ্বারা শ্রবণ করো। একজন কৃতান্তিক সাধককে অনুভব করো। আচ্ছা তাঁর জন্য কি এটি আবশ্যক যে, তিনি গুরু হয়ে আরো কৃতান্তিকের গঠন করবেন? অবশ্যই না। পণ্ডিত হলেই যেমন শিক্ষাদান করা যায়না, তেমনই সাধক হলেই গুরু হওয়া যায়না।

গুরু হতে গেলে, আমার নির্দেশ আবশ্যক। সেই নির্দেশ সেই সাধকের কাছে সাধারণত তাঁর গুরুর মাধ্যম দিয়েই তাঁর কাছে পৌছয়। আর যদি সেই সাধক স্বয়ং আমার অবতার হন, তবে

স্বয়ং আমি নিজের শূন্যকায় নিয়তিরূপ দ্বারা প্রদান করি বা অন্য এক অবতার দ্বারা প্রদান করি। তবেই তিনি গুরু হতে পারেন, অন্যথা নন। কেন এমন ব্যাপার?

ঠিক যেমন পুত্রী, বিচার করার ক্ষমতা বা গুণ থাকলেই বিচারক হওয়া যায়না, বিচারক হতে গেলে সরকারের মদত লাগে, সরকারের ফরমাইশ লাগে, এও ঠিক তেমন। যার কাছে সরকারি ফরমাইশ আছে বিচার করার, তাঁর বিচারে যিনি দোষী সাব্যসত হবেন, তিনি হবেন রাজকারাগারে বন্দি, আর যিনি দোষী প্রমাণিত হবেন না, তিনি হবেন বেকসুর খালাস।

কিন্তু এবার বলো, একজন ব্যক্তি, যিনি বা তাঁর আশেপাশের মানুষ মনে করেন যে তিনি খুব সুন্দর বিচার করতে পারেন, তাঁর বিচারে যিনি দোষী, তিনি কি রাজকারাগারে বন্দি হবেন? তিনি কি বেকসুর খালাস হবেন? ... না, হবেন না। ঠিক তেমনই সব সাধক গুরু হননা, গুরু হতে গেলে, আমার আদেশ আবশ্যক।

এবার তুমি বলবে, এই কল্পনার জগতে, আমি আদেশ দিয়েছি, এটা তো কল্পনা করে নিলেই হয়। প্রথম কথা এই যে আমি তাঁকে হয় অবতার বেশে, নয় সম্পূর্ণ আমার শূন্যরূপ বা সত্যরূপের দর্শন প্রদান করে, তবেই আদেশ দিই। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, সেই গুরুর কাছে শিষ্যও আমিই প্রেরণ করি।

অর্থাৎ যেমন সরকারি বিচারকের কাছে বিচারের আর্জি সরকারই স্থাপন করে দেয়, সেই বিচারককে এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে, এরওর তার কাছে চেয়েচিন্তে বিচারের মামলা খুঁজতে হয়না, তেমনই যাকে আমি গুরু হবার আদেশ দিই, তাঁর কাছে শিষ্যও আমিই প্রদান করি, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি, যিনি গুরু হয়েছেন আমার নির্দেশে, তাঁর কাছে শিক্ষার্থী আমিই প্রদান করি, আর তিনি আকস্মিকই উদিত হন, তাঁর সম্মুখে।

এক তিনিই গুরু হতে পারেন। আর একবার তিনি গুরু হয়ে গেলে, তাঁর গুরুপদের কর্মভারের উত্তরদায়িত্বের মধ্যেই পড়ে যে, তিনি নিজের গুরুপদ নিজের সেই শিষ্যকে প্রদান করে যাবেন,

যিনি তাঁরই আদর্শকে ধারণ করে শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম। এবং এই উত্তরদায়িত্ব সেই শিষ্য, যিনি পরবর্তী গুরু হলেন, তাঁর ক্ষেত্রেও বর্তায়।

অর্থাৎ পুত্রী, আমি যখন একজনকে গুরু হবার নির্দেশ প্রদান করছি, এর অর্থ এই যে, আমি একটি গুরুর টোল সামিল করছি, যেখানে শতক শতক বছর ব্যাপী, একের পর এক গুরু, আর দশকের পর দশক শিষ্য জমায়েত হয়ে সাধন করে মোক্ষলাভ করবে, এবং সমাজে মোক্ষলাভের বার্তা স্থাপন করবে।

তাই যেমন তোমাকে আমি আদেশ দিলাম গুরু হবার, তেমন তোমাকে তোমার শিষ্য লাভ করার উপায়ও বলে দিলাম। আর কেবল তোমাকেই নয়, তোমার শিষ্যদেরও শিষ্যলাভের উপায় বলে দিলাম। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, একজন আমার আদেশপ্রাপ্ত গুরু কেবল একটি সম্প্রদায়ের নির্মাণ করবে, আর সেই সম্প্রদায়কে সমাজে শক্তিশালী করবে।

পুত্রী, আমি তোমাকে সমাজসংস্করকের কর্মভার দিই নি, আমি তোমাকে একটিবারের জন্যও বলিনি যে সমাজের অন্ধকার দূর করো। আমি তোমায় বলেছি যে, অনাথ শিশুদেরকে অপার প্রেম প্রদান করে, তাঁদের অন্তরে অনুভব শক্তি প্রদান করে, তাঁদেরকে কৃতান্তিক গড়ে তোলো। সমাজ সংস্কারের উপায় তো স্বয়ং আমিই নির্মাণ করে গেলাম, সেই ভার তোমাদের কি করে দিই? সেই ভার ওঠানোর সামর্থ্য তোমাদেরকে যে আমি প্রদানই করিনি, তা তোমরা করবে কি করে?

যখন তুমি ১০ট অনাথকে কৃতান্তিক গড়বে, সেই ১০ কৃতান্তিক আরো ১০টি করে কৃতান্তিক গড়বে, আবার তাঁরা এক শত কৃতান্তিক, আরো দশটি করে অনাথকে কৃতান্তিক গড়বে, আর এই ভাবে যখন সমস্ত যাত্রা চলতে থাকবে, পিড়ির পর পিড়ি বেয়ে, তখন সমাজ একজন তোমাকে কৃতান্তিক করে না পেয়ে, পেয়ে যাবে শত শত, সহস্র সহস্র কৃতান্তিক, আর তখন সমাজ সংস্কার এমনিই হয়ে যাবে।

তাই গুরুর কর্ম কখনোই সমাজ সংস্করণ করা নয়, সমাজে বসে যাকে তাকে, যে কামনার নেশায় চূড়, তার কাছেও সত্যের বিবরণ প্রদানের জন্য নয়। গুরুর কর্ম হলো প্রথম নির্বাচন করা, যা তোমাদের ক্ষেত্রে বলে দিয়েছি আমি অনাথ শিশুকে নির্বাচন করার জন্য। দ্বিতীয় কর্ম হলো, তাঁদের সকলকে এমন ভাবেই কৃতান্তিক গড়ে তোলা, যেন তিনি আরো অনেক অনাথকে কৃতান্তিক গড়ে তুলতে পারেন, সেই দিকে নিজেকে নিবদ্ধ রাখা।

তাই পুত্রী, নিজের নির্বাচন পদ্ধতি, কর্ষণ ও ধারণের উপর সমস্ত ধ্যানজ্ঞান স্থাপন করো, এবং প্রচার বিমুখ হও। প্রচার করলে, কি হয় জানো? কল্পনার প্রেরণায় কামনা করে করে, সেই কামনাপুড়নে ব্যর্থ হয়ে হয়ে, শোকেতাপে জর্জরিত মানুষ তুমি রূপী গাছের গাছতলায় ছায়া পেতে চলে আসবেন।

না তাতে কনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তুমি তেমন গাছ নও যার তলায় সমস্ত জগত চলে আসবে। তোমার সামর্থ্য সীমিত। আর তাই তাঁরা তোমার গাছতলাকে দখল করে নেবেন, যারা কৃতান্তিক হতে সক্ষম নন। তাই নিজের উদ্দেশ্যে দৃঢ় হও। উদ্দেশ্যে দৃঢ় থাকার জন্য, কল্পনাতে বদ্ধ, কামনায় জর্জরিত মানুষ তোমাকে স্বার্থপর বললেও, সেইদিকে মননিবেশ করো না। বরং নিজের কর্মে নিষ্ঠাবান হও।

পুত্রী, অনাথদের কৃতান্তিক করার পর যা আমি তোমাকে বলেছি, তা সম্পূর্ণ সমাজের কাছে সত্যকে মেলে ধরার জন্যই বলেছি। আমার কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করো। যখন এই কৃতান্তিকরা সহস্র সংখ্যা হয়ে, যথার্থ কল্পনাজয়ী, বুদ্ধিজয়ী, কামনাজয়ী মহাতেজস্বী মহাপ্রেমী হয়ে উঠবেন, তখনই সমাজ বাধ্য হবে, সত্যকে জানার জন্য, তার আগে নয়।

তাই পুত্রী, এই যে হিন্দোল স্থাপিত করা হলো সত্যলাভের, আমার এই অবতারের মাধ্যমে, তাকে এখানেই সমাপ্ত হতে দিও না। আর তা যাতে সমাপ্ত না হয়ে যায়, সেই কারণেই তোমাকে আমি বারবার বলছি, প্রচার করো না, ততক্ষণ করো না, যতক্ষণ না এই কৃতান্তিক

নামক বৃক্ষ এমন বড় হয়ে যায় যাতে সমস্ত মানবসমাজকেই নিজের মধ্যে ধারণ করে নিতে পারে।

প্রথমে এর আকার বৃদ্ধি করো, আর সেই আকার বৃদ্ধি করার কালে, তুমি বা তোমার শিষ্যরা কিছুতেই সাধারণ শোকতাপ জর্জরিত মানুষদেরকে ভিড়তে দিও না, কারণ তোমরা তখন যদি সেই কর্মে মন দাও, তবে জানবে, এই সমাজ সংস্করণও সেখানেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই যাতে সমাজসংস্করণ সঠিক ভাবে হয়, তার জন্য অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো, আর এই অপেক্ষার কালে, নিজের মত সত্যকে দর্শন করা, এই সমাজসংস্করণের বিজ্ঞানকে অনুভব করা, শত সহস্র কৃতান্তিকের নির্মাণ করো।

জানবে যে এই প্রতিটি কৃতান্তিক একটি একটি করে সেই বিশাল বনস্পতির ডাল, যার নাম মাতা সর্বাম্বা। আর যখন ডালপালা বেরিয়ে বেরিয়ে মাতা সর্বাম্বা এতটাই বড় হয়ে যাবেন যে সম্যক মানব সমাজ তাঁর মধ্যে স্থিত হয়ে যাবে, তখন আর প্রচারের প্রয়োজনই পরবে না। তখন যেমন করে আজ কল্পনা আর পঞ্চভূতের দাসত্ব করার কৌশল শেখানোই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্যে হয়ে রয়েছে, তেমন সেই সময়ে কৃতান্তিক হয়ে ওঠাই সম্যক জগতের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে।

আর পুত্রী, যেদিন তা সম্পন্ন হবে, জানবে যে, সত্যযুগের জগতবিস্তার সেদিন থেকে শুরু হলো। তাই পুত্রী, প্রচার করে, নিজেদের জনপ্রিয় করে তোলা যেন কখনোই কনো কৃতান্তিকের উদ্দেশ্য বা কর্মপদ্ধতি না হয়। কৃতান্তিকের উদ্দেশ্য যেন সর্বসময়ে একাধিক কৃতান্তিক গঠন হয়, অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তিকে আমার সত্যতাকে দর্শন করার, জানার এবং ধারণ করার অবস্থায় উন্নীত করে, আমাকে প্রত্যক্ষ করিয়ে নিজের কর্তাভাবের নাশ ঘটানোই এক কৃতান্তিকের উদ্দেশ্য হয় যেন।

পুত্রী, গুরু তাঁর শিষ্যকে প্রায়শই শিক্ষিত তো করে দেন, দীক্ষিতও করে দেন, উর্বর ও সত্যকামীও করে দেন। কিন্তু গুরুর কর্ম তখনও সমাপ্ত হয়না। গুরুর কর্ম তখন সমাপ্ত হয় যখন

তাঁর শিষ্যকে তিনি কি ভাবে শিক্ষা প্রদান করতে হয়, এবং শিক্ষা প্রদান করার ক্ষেত্রে কি কি উদ্দেশ্য স্থাপন করতে হয়, তা শেখানো। তাই তোমার এই সম্পূর্ণ আয়োজনের মধ্যে, এটিকে অবশ্যই জোর দেবে।

অবশ্যই দেখবে যাতে তোমার প্রতিটি শিষ্য কৃতানিতক হয়ে ওঠে, এবং সকলে আমাকে দর্শন করে, আমার প্রেম লাভ করে। কিন্তু পাশাপাশি এও দেখবে যাতে, সে যাতে নিজেদের মতই কৃতান্তিক রচনা করাকেই নিজের এই সমস্ত সাধনার লক্ষ্যরূপে স্থাপন করে। ... হ্যাঁ পুত্রী, অনাথদের এবার সৌভাগ্য প্রদানের হিল্লোল তলো। এমন হিল্লোল তুলে দাও, যেখানে দাঁড়িয়ে, সমাজ মানতে শুরু করবে, তাঁরা অনাথ হলেই যেন সর্বাধিক ভাগ্যবান হতো।

তবে শেষবারের মত বলছি, প্রচারে মন দেবে না। অবতারের কর্মপ্রচার কেবলই দুই কি তিন পিড়ি পর্যন্তই ব্যপ্ত হয়, তারপর অবতারকে সমাজ ভগবানের আসনে বসিয়ে, পুনরায় অন্ধবিশ্বাসের সাধনা করতে শুরু করে দেয়, আর তাঁকে ঘিরেই, নতুন করে কামনার সংসার স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। তাই প্রচার করবেই না।

কেবলই অনাথদের কৃতান্তিক গড়ে তলো। অজস্র কৃতান্তিক গড়ে তলো, যারা সকলেই হবে কল্পনাজয়ী, পঞ্চভূতজয়ী, প্রেমী, প্রেম ও অনুভব সর্বস্ব। এটিই হবে তোমাদের সকলের লক্ষ্য, সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর যখন এই উদ্দেশ্য পুড়ন হয়ে যাবে, সত্যযুগ এমনিই স্থাপিত হয়ে যাবে সম্পূর্ণ সমাজে, আর তাকে কনো কল্পনা, কনো ইচ্ছা, চিন্তা আটকাতে পারবেনা, না আর্যদের ন্যায় শঠতা তাকে আটকাতে পারবে, আর না কল্পযন্ত্র বিজ্ঞানের মত মদাচ্ছন্নতা তাকে আটকাতে পারবে, আর না বাণিজ্য সর্বস্ব মানসিকতা তাকে রোধ করতে পারবে।

তাই উদ্দেশ্য, যা তোমাদের জন্য আমি স্থির করে রাখলাম, তাকে ধারণ করো, স্বয়ং কৃতান্তিক হয়ে যাও, আর শত শত কৃতান্তিক গঠন করতে থাকো। অনুগামী নয়, কৃতান্তিক প্রয়োজন আমার। সন্তান প্রয়োজন আমার, আমার কনো প্রশংসকের প্রয়োজন নেই। এক মা, তাঁর সন্তানকে ক্রোড়ে ফিরে পেতে চায়, সে কত ভালো মা, ওসবে মায়ের কি কাজ!

আমার ক্রোড় ভরিয়ে দাও পুত্রী, আমার ক্রোড় ভরাতে থাকো পুত্রী, এই মায়ের আর কিছুই কাম্য নয়, কেবল এটিই তাঁর কামনা, যে তাঁর ক্রোড় ভর্তি থাকুক সর্বদা। তাঁর কনো পূজার থালির প্রয়োজন নেই, কনো মালা চন্দন, শাড়ী আভুশনের কনো প্রয়োজন নেই, কনো ধুপধুনাদি, পূজা অর্চনা, এইসবের তাঁর কনো প্রয়োজন নেই। তিনি জানেন তিনি ঈশ্বরী, তাঁকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কনো প্রয়োজন নেই।

এক মায়ের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ গহনা, তাঁর শ্রেষ্ঠ আভুশন, তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা, তাঁর শ্রেষ্ঠ আরাধনা, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার হলো তাঁর ক্রোড়ের সন্তান। আজ জগজ্জননী তোমার কাছে আবদার করছে যে, পুত্রী আমার মাতৃত্বকে সম্পন্ন করে দাও। আমার গহনা চাইনা, আমার পূজা চাইনা, ধুপধুনা, চন্দন, গন্ধ, পুষ্প, কিচ্ছু চাইনা।

ধরিত্রীর বুকে যা কিছু ফুল, ফল ওঠে, সেই সমস্ত আমারই, তাই আমার কাছে যা পূর্ব থেকেই আছে, তা পুনরায় প্রদান করার কনো প্রয়োজন নেই। যা কিছু মন্দিরে এসে আমাকে দাও তোমরা, সেই সব তোমরা আমাকে দেবার আগে থেকেই আমার। তা আমারই সম্পত্তি আমাকে দিয়ে উপহার দিচ্ছি বলার অর্থ কি? এই বাতুলতা, এই বাচালতা, আর এই উপরচালাকির অর্থ কি? আমার ক্রোড় শূন্য, আমাকে আমার সন্তান ফিরিয়ে দাও। তাঁদের কর্তার নাশ করে, আমার ক্রোড়ে তাঁদেরকে ফিরিয়ে দাও। এটিই আমার চাওয়া, যদি এতই পূজা করো আমাকে, এর অর্থ নিশ্চয়ই আমাকে তোমরা খুব ভালোবাসো। তা যদি সত্যিই ভালোবাসো, তবে এই মা তোমাদের কাছে ভিক্ষুক হয়ে হাত পেতে নিজের সন্তানদের ভিক্ষা চাইছে। ...

আমার সন্তানদের যেই কর্তাভাবে মজিয়ে রেখে আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছ, ঠিক সেই ভাবে তাদের কর্তাভাবের নাশ করে, আমার ক্রোড়ে ফিরিয়ে দাও। যদি দাও, তবেই জানবো মনুষ্যজাতি ভালোবাসো আমাকে, নাহলে জানবো, সমস্তটাই তোমাদের অভিনয় ছিল।

~মহাসমাপ্তি~

ওঁ সনাতনী ত্রিগুণস্য, তস্মৈ অখিল সম্ভেষ্করু।

প্রধ্মাশিন্বিশ্বঃ ত্বং ইবভব্যে, আশুহাতু ভাতিসম্যো।।

অব্যক্তব্রহ্মম ব্যক্তভব্যে, ব্রহ্মময়ী ত্বং পূর্ণখণ্ডে।

বহুদাবন্দাতি ত্বং পাদপদ্মে, নমস্তে দেবী সর্বস্বে।।